(POLITICAL THEORY)

(প্রথম পত্র)

অধ্যক্ষ ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম. এ.

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ; ভারতের শাসন-ব্যবস্থা, শাসন-ব্যবস্থা
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

ও

অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম. এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), এম. এ.
(অর্থনীতি), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি
বিভাগের অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, খড়্গপুর কলেজ এবং
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ভারতের
শাসন-ব্যবস্থা, শাসন-ব্যবস্থা, ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান,
ভারতের পরিকল্পনা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক।

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাতক পাঠক্রম (Three-Year Degree Course) অনুসারে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে স্নাতক-স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টিকে তিনটি পত্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। পুরাতন পাঠ্যসূচী অনুসারে বি. এ. পরীক্ষার্থীকে যেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে একটি মাত্র পত্রে পরীক্ষা দিতে হইত, বর্তমানে উক্ত বিষয়ে তিনটি পত্রে পরীক্ষা দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, পূর্বেকার একশত নম্বরের স্থলে বর্তমানে তিনশত নম্বরের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত হইতে হইবে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা একটু দীর্ঘতর ও উন্নত ধরনের করিতে হইয়াছে।

বর্তমানে স্নাতক পাঠক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের প্রথম পত্রে রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্রে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রুশিয়া ও সুজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা। আর তৃতীয় পত্রে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা।

বর্তমান গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের প্রথম পত্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রতত্ত্বের বিষয়গুলি বিতর্কমূলক হইলেও আমরা ইহার কোন অংশকেই উপেক্ষা করি নাই। একদিকে যেমন ভাববাদী সমাজ-দর্শনকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি আবার অপরদিকে মার্কসীয় মতবাদকেও যথাযোগ্য স্থান দিয়াছি। ব্যক্তিগত মতামতে ভারাক্রান্ত না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া প্রতিটি বিষয়ের সম্যক্ সমালোচনা করিয়াছি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষার অপ্রতুলতার জন্য বহুক্ষেত্রে আমাদের পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং সেক্ষেত্রে শব্দার্থ ও ভাবার্থ উভয়েরই সঙ্গতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে আমরা ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করিবার কালে প্রয়োজনানুসারে আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে মর্মানুবাদ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছি।

এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা-ভুক্ত ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকাবলী হইতে। বিলাতি উপকরণে দেশী-খাবার প্রস্তুত করা যে কতটা কষ্টকর তাহা রচনাকালে পদে পদে অনুভব করিয়াছি। আমরা বাঙালী বটে, কিন্তু চর্চার অভাবে স্থানে স্থানে হয়ত বাক্যবিন্যাসে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দের ও পাঠক সাধারণের সাহায্য পাইলে গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিব।

পুস্তকখানিকে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিবার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের একটি সারসংক্ষেপ ও প্রশ্নোত্তরের ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। আবার ডিগ্রী পরীক্ষায় সমালোচনামূলক প্রশ্ন থাকে বলিয়া প্রশ্নোত্তরকালে

সমালোচনা করিবার সুবিধার্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থের প্রথমেই দিয়াছি।

আমাদের এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যদি কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীর চিন্তাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া নূতন মত গঠন করিতে সাহায্য করে তাহা হইলে আমাদের সযত্ন প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

এই গ্রন্থখানি লিখিবার সময় খড়্গপুর কলেজের উপাধ্যক্ষ ভবতোষ বাড়ুরী এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক প্রশান্তকুমার রায় ও অধ্যাপক অনিল তেওয়ারী, ডায়মণ্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজের অধ্যাপক দিলীপ দে, বাগনান কলেজের অধ্যাপক শিশির সান্যাল, পাঁশকুড়া কলেজের অধ্যাপক হরিসাধন গোস্বামী ও তারাশংকর ব্যানার্জী, টেংরাখালী বঙ্কিম সরদার কলেজের অধ্যাপক বাসব সরকার, অধ্যাপক সুজিত ভট্টাচার্য, আমতা রামসদয় কলেজের অধ্যাপক নির্মলকৃষ্ণ সান্যাল গ্রন্থরচনার কার্যে উৎসাহ দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ছাত্রদের অনুরোধ ও সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দের উৎসাহে এই গ্রন্থ লিখিত হইল। এই গ্রন্থের উন্নতিসাধনে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত সহকর্মী ও বন্ধুদের সাহায্য পাইবার আশা রাখি।

কলিকাতা
৩০ শে জুলাই
১৯৬২

বিনীত
ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ইতিহাস : ১ : রাষ্ট্রচিন্তা : ২ : প্রাচ্যজগতের রাষ্ট্রচিন্তা : ৩ : ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা : ৫ :

দ্বিতীয় অধ্যায় : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, আলোচনাক্ষেত্র এবং সম্পর্ক : ১০ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার মূল্য : ১৪ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নাম : ১৫ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন পদ্ধতি : ১৮ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্র দর্শন : ১৮ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় কি ? : ১৯ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি : ২১ : অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক : ২০ :

তৃতীয় অধ্যায় : মানব ও সমাজ : ৪৩ : মানব সমাজ : ৪৩ : মানুষের উদ্ভব : ৪৩ : সমাজ ও ইহার প্রকৃতি : ৪৪ : মানব সমাজের ক্রমবিকাশ : ৪৭ : মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন ? : ৪৯ : জাতীয় সমাজের গঠন : ৫১ : প্রতিষ্ঠান : ৫১ : সম্প্রদায় : ৫২ : ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক : ৫২ : রাষ্ট্রের বিবর্তন : ৫৮ :

চতুর্থ অধ্যায় : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা : ৬০ : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য : ৬০ : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : ৬০ : রাষ্ট্রের উপাদান : ৬৪ : রাষ্ট্র ও সরকার : ৬৯ : রাষ্ট্রের ভাবগত ও ধারণাগত রূপ : ৭১ : সমাজ ও রাষ্ট্র : ৭৩ : রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন : ৭৪ : আন্তর্জাতিক ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র : ৭৫ : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ এবং ইয়র্ককে কি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে ? : ৭৭ :

পঞ্চম অধ্যায় : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ : ৮২ : ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ : ৮২ : রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকার বনাম সামাজিক চুক্তি মতবাদ : ৮৬ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ : ৮৭ : সাধারণ বা সমষ্টিগত ইচ্ছা : ১০২ : সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা ও মূল্যায়ন : ১০৬ : হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য : রুশোর সেতু রচনা : ১০৯ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও গণতন্ত্রের উন্মেষ : ১১৪ : বলপ্রয়োগ-মতবাদ : ১১৬ : পরিবার সম্প্রসারণের মতবাদ : পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ : ১২১ : ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ : ১২৫ :

অধ্যায় : রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাত : ১৩৬ : যান্ত্রিক মতবাদ : ১৩৬ : ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক মতবাদ : ১৩৭ : জৈব মতবাদ : ১৪১ : রাষ্ট্রের ভাববাদী বা আদর্শবাদী ব্যাখ্যা : ১৪৬ : আইনমূলক মতবাদ : ১৫১ : বলপ্রয়োগবাদ : ১৫২ : ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা : ১৫৩ : মার্কসীয় মতবাদ : ১৫৩ : রাষ্ট্রের ভিত্তি : ১৫৪ :

সপ্তম অধ্যায় : মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শন : ১৫৭ :

অষ্টম অধ্যায় (ক) : রাষ্ট্র ও জাতিতত্ত্ব : ১৭০ : জাতি কাহাকে বলে : ১৭০ : জাতি গঠনের বিভিন্ন উপাদানগুলি : ১৭২ : জাতি সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ম্যাক্আইভার ও মার্কসের ধারণা : ১৭৪ : জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা

একজাতি একরাষ্ট্রের যুক্তিসমূহ : ১৭৭ : জাতির অধিকারসমূহ : ১৮০ : জাতীয়তাবাদ : ১৮১ : বিকৃত জাতীয়তাবাদ : ১৮২ : জাতীয়তাবাদের বিকল্প : ১৮৪ : রাষ্ট্র ও জাতি : ১৮৭ : ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্র : ১৮৯ :

অষ্টম অধ্যায় (খ) : আন্তর্জাতিকতা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন : ১৯৬ : অতিজাতীয় আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক আদর্শের ইতিহাস : ১৯৬ : জাতিসংঘ : ১৯৮ : উদ্দেশ্য : ১৯৯ : সভ্য : সভা : ১৯৯ : কর্মদপ্তর : ২০০ : স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত : ২০০ : জাতিসংঘের ব্যর্থতা : ২০১ : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ : ২০৩ : গঠন : ২০৪ : সাধারণ সভা : ২০৪ : কার্যাবলী : ২০৪ : নিরাপত্তা পরিষদ : ২০৬ : ভিটো : ২০৬ : আন্তর্জাতিক বিচারালয় : ২০৭ : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ : ২০৭ : কর্মসংস্থা : ২০৯ : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা : ২০৯ : আন্তর্জাতিকতাবাদ : ২১১ :

নবম অধ্যায় : রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা : ২১৬ : সার্বভৌমিকতার স্বরূপ : ২১৬ : সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের বিকাশ : ২২০ : সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য : ২২৩ : সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ : ২২৭ : নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা : ২২৭ : আইনসঙ্গত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা : ২২৭ : আইনাসিদ্ধ ও বাস্তব সার্বভৌমিকতা : ২৩০ : জাতীয় সার্বভৌমিকতা : ২৩৩ : জনগণের সার্বভৌমিকতা : ২৩৩ : রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ব্যক্তিগত না স্থানগত : ২৩৫ : রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা : ২৩৬ : সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদ : ২৩৬ : সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব : ২৪১ : সার্বভৌম ক্ষমতা কি বিভাজ্য ? : ২৪৩ : সার্বভৌমিকতার অবস্থিতি ও যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা : ২৪৪ : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের স্থান : ২৪৪ : সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদ বনাম বহুত্ববাদ : ২৪৬ : একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদের যুক্তি ও বহুত্ববাদের বর্ণনা : ২৪৭ :

দশম অধ্যায় : আইন : ২৬১ : আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি : ২৬১ : বিভিন্ন মতবাদ অনুসারে আইনের সংজ্ঞা : ২৬৩ : আইনের উৎস : ২৬৮ : আইনের শ্রেণীবিভাগ : ২৭১ : জাতীয় আইন : ২৭২ : সরকারী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইন : ২৭৩ : শাসনতান্ত্রিক আইন : ২৭৩ : শাসন সংক্রান্ত আইন : ২৭৩ : ফৌজদারী আইন : ২৭৩ : আন্তর্জাতিক আইন, ইহার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি : ২৭৪ : স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক আইন : ২৭৭ : আইন কি সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ ? : ২৭৯ : লোকে আইন মান্য করে কেন ? : ২৮০ : আইন ও নৈতিক বিধি : ২৮২ : আইন, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব, জনমত ও অধিকার : ২৮৪ :

একাদশ অধ্যায় : নাগরিকতা : ২৮৯ : নাগরিকতার সংজ্ঞা : ২৮৯ : নাগরিকতা অর্জন ও বর্জনের পদ্ধতি : ২৯০ : সুনাগরিকতা : ২৯২ : সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক : ২৯৩ : সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক দূরীকরণের পন্থা : ২৯৪ : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য : ২৯৪ :

দ্বাদশ অধ্যায় : অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্য : ২৯৬ : অধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ : ২৯৬ : অধিকার সম্বন্ধে ল্যাস্কির ধারণা : ২৯৬ : অধিকার সম্বন্ধে গ্রীণের ধারণা : ২৯৮ : স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদ : ২৯৯ : নৈতিক ও

আইনসম্মত অধিকার : ৩০২ : সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার : ৩০২ : মৌলিক অধিকার : ৩০৮ : অধিকার ও কর্তব্য : ৩১০ : নাগরিকের মূল কর্তব্যগুলি : ৩১১ : স্বাধীনতা : ৩১২ : স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ : ৩১২ : স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ : ৩১২ : স্বাধীনতার রক্ষাকবচ : ৩১৭ : স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব ও আইন : ৩২১ : সাম্য : ৩২২ : সাম্যের সংজ্ঞা ও বিভাগ এবংস্বাধীনতার সহিত ইহার সম্পর্ক : ৩২৪ : সাম্যের প্রকারভেদ : ৩২৫ :

ত্রয়োদশ অধ্যায় : রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্যাবলী : ৩২৯ : রাষ্ট্রের লক্ষ্য : ৩২৯ : রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি : ৩২৯ : কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি : ৩৩৪ : নৈরাজ্যবাদ : ৩৩৪ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : ৩৩৫ : আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ : ৩৩৭ : ভাববাদী মতবাদ : ৩৩৮ : সমষ্টিবাদ : ৩৩৯ : সমাজতন্ত্রবাদ : ৩৩৯ : কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ : ৩৪০ : রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ : ৩৪১ : খ্রীস্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ : ৩৪১ : গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র : ৩৪১ : সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্র : ৩৪১ : রাষ্ট্রহীন সংঘভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ : ৩৪২ : মার্কসীয় সমাজতন্ত্র : ৩৪২ : ধনতন্ত্রবাদ : ৩৪৩ : ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ : ৩৪৫ : সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী : ৩৪৬ : চৈনিক সাম্যবাদ : ৩৪৭ : গান্ধীবাদ : ৩৪৮ :

চতুর্দশ অধ্যায় : শাসনতন্ত্র : ৩৫৩ : শাসনতন্ত্রের ইতিহাস : ৩৫৩ : শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা : ৩৫৪ : শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা : ৩৫৪ : শাসনতন্ত্রের উপাদান ও লক্ষণ : ৩৫৫ : শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ : লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র : ৩৫৭ : সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র : ৩৫৯ : শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি : ৩৬১ : সংবিধানের বৃদ্ধি : ৩৬২ :

পঞ্চদশ অধ্যায় : রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ ৩৬৫ : রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি : ৩৬৫ : মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : ৩৬৬ : ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা : ৩৭১ :

ষোড়শ অধ্যায় : সরকারের বিভিন্ন বিভাগ : ৩৭৪ : আইন বিভাগ : ৩৭৪ : আইনসভার সংগঠন : ৩৭৫ : এককপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা : ৩৭৬ : দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থাপক সভা : ৩৭৭ : এককপরিষদ বনাম দ্বি-পরিষদ : ৩৭৯ : সার্বভৌম ও অসার্বভৌম আইন সভা : ৩৮০ : অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন এবং আইন সভার ক্ষমতা হ্রাস : ৩৮২ : শাসন বিভাগ : ৩৮৫ : শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ ও স্বরূপ : ৩৮৬ : আইনসভার সহিত সম্পর্ক : ৩৮৭ : শাসনবিভাগীয় কার্যাবলী : ৩৮৯ : বিচার বিভাগ : ৩৯২ : বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা : ৩৯৩ :

সপ্তদশ অধ্যায় : সরকারের বিভিন্ন রূপ : রাজতন্ত্র, সামরিক স্বৈরতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র : ৩৯৮ : এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ : ৩৯৮ : রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেণী-বিভাগ : ৩৯৯ : সরকারের শ্রেণীবিভাগ : ৪০০ : আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ : ৪০১ : স্বৈরতন্ত্র : ৪০১ : রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র : ৪০১ : সামরিক স্বৈরতন্ত্র : ৪০৫ : অভিজাততন্ত্র : ৪০৬ :

অষ্টাদশ অধ্যায় : সরকারের বিভিন্ন রূপ, একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র : ৪০৮ : একনায়কতন্ত্র : ৪০৮ : প্রকারভেদ : ৪০৯ : ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র : ৪১০ : আমলাতন্ত্র : ৪১০ : রাজতন্ত্র : ৪১১ : দলগত ও শ্রেণীগত : ৪১১ : সমাজতান্ত্রিক : ৪১১ : ফ্যাসীবাদ : ৪১২ : নাৎসিবাদ : ৪১৩ : সামরিক : ৪১৩ : গণতন্ত্র : ৪১৫ : গণতান্ত্রিক সারকারের বিভিন্ন রূপ : ৪১৮ : পরোক্ষ ও প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : ৪১৯ : উদারনৈতিক গণতন্ত্র : ৪২০ : গণতান্ত্রিক শাসিত-ব্যবস্থার গুণাগুণ : ৪২১ : গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী : ৪২৩ : গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ : ৪২৫ : গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন : ৪২৫ ৷ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র : ৪২৬ : সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র : ৪২৮ :

ঊনবিংশ অধ্যায় : সরকারের বিভিন্ন রূপ : পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার : ৪৩৩ : পার্লামেণ্টীয় বা মন্ত্রিমণ্ডলী-শাসিত সরকার : ৪৩৩ : রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার : ৪৩৮ :

বিংশ অধ্যায় : সরকারের বিভিন্ন রূপ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা : ৪৪৫ : এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা : ৪৪৫ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য : ৪৪৭ : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা : ৪৪৭ : যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অপরাপর সমবায় রাষ্ট্রের পার্থক্য : ৪৫১ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ: ৪৫২ : যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদান কি ভারতে বর্তমান ? : ৪৫৩ : যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ : ৪৫৪ : যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের পূর্বশর্ত : ৪৫৫ :

একবিংশ অধ্যায় : রাষ্ট্রনৈতিক দল : ৪৫৮ : রাষ্ট্রনৈতিক দলের ইতিহাস : ৪৫৮ : রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা : ৪৫৮ : রাষ্ট্রনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য : ৪৬০: রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী ও উপযোগিতা : ৪৬১ : দলীয় ব্যবস্থার গুণাবলী : ৪৬১ : দ্বি-দলীয় বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থা : ৪৬৩ : একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র : ৪৬৫ : একদলীয় গণতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তি : ৪৬৬ :

দ্বাবিংশ অধ্যায় : জনমত ও গণতন্ত্র : ৪৭০ : জনমতের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি : ৪৭০ : জনমত প্রকাশের মাধ্যম : ৪৭২ : গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব : ৪৭৪ :

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় নির্বাচকমণ্ডলী : ৪৭৭ : নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যা : ৪৭৭ : সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের গুণাগুণ : ৪৭৭ : স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার : ৪৭৯ : ভোটদানের পদ্ধতি—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ : ৪৮১ : সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব : ৪৮২ : একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন : ৪৮৩ : তালিকা-প্রথায় অনুপাতিক নির্বাচন : ৪৮৪ : ভৌগোলিক এবং কর্মগত বা পেশাগত প্রতিনিধিত্ব : ৪৮৫ : নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : ৪৮৭ : গণতন্ত্রে ভোটাধিকারের গুরুত্ব : ৪৯০ :

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১ | রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ইতিহাস
[History of Political Ideals]

সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ ছিল অসহায় ও দুর্বল। তার জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল দুর্বিষহ। বন বনান্তরে সে ঘুরিয়া বেড়াইত। আর বর্তমানের মানুষ সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে: উন্নত তার জীবনযাত্রা প্রণালী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ এক সার্বিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। অবশ্য, এই বিরাট উন্নতি সাধন, এই সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা একদিনের চেষ্টায় হয় নাই। মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বর্তমান সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিকূল পরিবেশে-ঘেরা মানুষ নিজ বুদ্ধি ও যুক্তির বলে নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই নূতন নূতন উদ্ভাবনের সাহায্যে প্রতিকূল প্রকৃতিকে নিজের বশে আনিয়া **পরিবেশের (Environment)** পরিবর্তন করিয়াছে। এই বিরাট পরিবর্তন কোন একটি মাত্র লোকের চেষ্টা-প্রসূত নয়। এই পরিবর্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে অসংখ্য মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। **সংঘবদ্ধতাই সমাজ-জীবনের মূল ভিত্তি।**

(১) বর্তমান সভ্যসমাজ বহুদিনের প্রচেষ্টার ফল

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। গ্রীক্ দার্শনিক **এ্যারিস্টট্ল** বলিয়াছেন—স্বভাবগত **কারণেই মানুষ সমাজবদ্ধ** জীব। এই সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের প্রবণতা মানুষকে **পরিবার, গোষ্ঠী,** জাতি ও রাষ্ট্র গঠন করিয়া সামাজিক জীবন যাপন করিতে প্রেরণা যোগাইয়াছে।

আবার শুধু সামাজিক প্রবৃত্তিই মানুষকে সমাজবদ্ধ করে নাই। জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনও তাহাকে **সমাজবদ্ধ হইতে** বাধ্য করিয়াছে। এককভাবে **মানুষের পক্ষে** তার জীবনধারণের জন্য ভোগ্যবস্তুর সংস্থান করা কষ্টকর ছিল। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, ভোগ্যবস্তুর সংস্থানের জন্য, একক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা অনুভব করিয়া পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার (mutual aid and co-operation) প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিল: এইভাবে স্বভাবগত কারণে এবং প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ধীরে ধীরে বহু সংঘ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। শিকার, পশুপালন ও কৃষিকার্যের দ্বারা মানুষ জীবিকা অর্জনের সমস্যাকে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সহজতর করিয়া তুলিয়াছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভাব পরিতৃপ্ত হইয়াছে। এইভাবে (১) **স্বাভাবিক প্রবৃত্তি,** এবং (২) জীবন ধারণের প্রাথমিক **প্রয়োজনের তাগিদে,** (৩) **ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক** প্রভৃতি বিভিন্নমুখী **অভাবকে পরিতৃপ্ত করিবার** জন্য এবং (৪) **সমাজ-ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করিবার** জন্য মানুষ

(১) স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে

যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে **রাষ্ট্র** তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। **রাষ্ট্র মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের চরম অভিব্যক্তি।**

মানুষ সামাজিক জীব। আবার সে অবাধ স্বাধীনতাকামী। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকে মান্য করিতে হয়। সুতরাং একই সঙ্গে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা এবং অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব নয়। মানুষের এই দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রাষ্ট্রের মতো প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার জন্য মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা কিছুটা ত্যাগ করিতেই হয়। রাষ্ট্রই মানুষের অবাধ স্বাধীনতার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করিতে সাহায্য করিয়াছে

রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ইতিহাস

(History of Political Ideals)

সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্র বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। যেমন, দাসপ্রথার যুগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করে দাস-মালিকগণ। দাস-মালিকগণের স্বার্থকে কায়েম করার জন্যই সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রনীতি। কৃষিযুগে জমিদারগণ বা সামন্তগণ ছিলেন ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে প্রধান এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার। শিল্পযুগে শিল্পপতিগণই রাষ্ট্রের মালিক, কারণ তাহাদের হাতেই ছিল অর্থনৈতিক শক্তি। অতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র এবং রাষ্ট্রচিন্তার রূপ বিভিন্ন যুগের শ্রেণী-স্বার্থের রূপ অনুসারে পরিবর্তিত হয়।

রাষ্ট্রচিন্তা নূতন নহে। ইহা সেই আদিম মানুষের সমাজ সৃষ্টির কাল হইতেই শুরু হইয়াছে। আদিম মানুষ প্রকৃতির উপদ্রব হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আদিম পুরোহিতের আদেশে প্রকৃতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। তাহারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য আদিম নেতার নেতৃত্ব মানিয়া লইত। আদিমকালের মানুষের এই আনুগত্য স্বীকার, কোন নেতার নেতৃত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়া এবং প্রকৃতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা প্রভৃতির মধ্যেই বর্তমান রাষ্ট্রচিন্তার গোড়াপত্তন হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, আদিমকালে যে সমাজচিন্তা শুরু হইয়াছে তাহা আদিমকালের সামাজিক সম্পর্কেরই প্রতিফলন। কারণ সমাজচিন্তা শূন্যে সৃষ্টি হয় না। সমাজের বাস্তব অবস্থাই সমাজচিন্তার মূল বক্তব্যের স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া দেয়। বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সমাজের বাস্তব সমস্যার সমাধানেরই দর্শন রচনা করিয়াছেন। সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত এবং বাস্তব সমস্যাই প্রতিফলিত হইয়াছে রাষ্ট্রদর্শনে। এইজন্য রাষ্ট্র-দর্শনের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সমকালীন সমাজের পটভূমিতেই বুঝিতে হইবে।

কারণ বিভিন্নকালের রাষ্ট্রদর্শনের উপর তৎকালীন যুগধর্ম আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অতএব কোন রাষ্ট্রদর্শনের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সেই যুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে বুঝিতে হইবে। প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রদর্শন বুঝিতে হইলে গ্রীসের খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে হইবে। রুশোর সাম্যবাদ বুঝিতে হইলে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থাটি বুঝিতে হইবে। হবসের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রচিন্তার পশ্চাতে রহিয়াছে স্বেচ্ছাচারী রাজার সমর্থন। **রাষ্ট্রচিন্তা সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিফলন।** তাই দেখা যায় রাষ্ট্রচিন্তার রূপ বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের রূপ অনুসারে পরিবর্তিত হয়। সামন্তযুগে সামন্তগণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে রাষ্ট্রচিন্তা রাজতান্ত্রিক রূপ ধারণ করিয়াছে। আবার শিল্পযুগে শিল্পপতিগণ অধিকতর ধনশালী হইয়া সামন্তদিগের স্থান অধিকার করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এই যুগে আন্তঃরাষ্ট্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হয় এবং রাজতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের রূপ গ্রহণ করে। কারণ শিল্পপতিগণ বাহিরেও ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিবার মানসে পররাজ্য গ্রাস করে। সামন্তযুগেও যে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তৃতিলাভ করে নাই, তাহা নহে। প্রাচ্যের প্রাচীন সাম্রাজ্য এবং পাশ্চাত্যের রোমান সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্ত হইতে বলা যায় যে, শিল্পযুগের পূর্বেও দিগ্বিজয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় রাজন্যবর্গ পররাজ্য জয় করিয়া সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এই সকল যুগে ব্যবসায়ী শ্রেণীর ব্যবসাকে প্রসারিত করিবার প্রচেষ্টাও রাজন্যবর্গের দিগ্বিজয়ে কম সাহায্য করে নাই। অতএব দেখা যায় রাষ্ট্রচিন্তার বিবর্তনের পশ্চাতেও এক বিরাট অর্থনৈতিক ভূমিকা রহিয়াছে।

(৩) সমাজ'চন্তা সামাজিক সম্পর্কেরই প্রতিফলন

রাষ্ট্রদর্শনের ঐতিহাসিকেরা রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন দার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী, বিভিন্ন দেশের শাসন-ব্যবস্থা, বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রনায়কগণের বক্তৃতাবলী, সাহিত্য, কলা, স্থাপত্য এবং সরকারী দলিল হইতে। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখানো যাইতে পারে; যথা, (ক) **প্রাচ্যজগতের রাষ্ট্রচিন্তা** ও (খ) **ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা।**

(ক) প্রাচ্যজগতের রাষ্ট্রচিন্তা (Political thought of the East : প্রাচ্যজগতেই রাষ্ট্রচিন্তা সর্বপ্রথম শুরু হয়। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত ও মহাচীনের অবদান নগণ্য নহে। বর্তমানের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মতবাদ, সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রাচ্যজগতের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে নূতন নহে। প্রাচীন হিন্দু ও চৈনিক গ্রন্থসমূহেও এই সকল রাষ্ট্রাদর্শ বহু পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধ্যাপক ব্যাশাম (A. L. Basham) মন্তব্য করেন যে, মানুষে মানুষে ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় ভারত অগ্রাধিকার দাবি করিতে পারে। একমাত্র ভারতেই অতি অল্পসংখ্যক ক্রীতদাস ছিল। এই ক্রীতদাসগণ বিধিশাস্ত্রমতে অধিকার ভোগ করিত। প্রাচীন ভারতে পরাজিত শত্রুর প্রতি উদার ব্যবহার করা হইত।

(১) প্রাচীন হিন্দু ও চৈনিক গ্রন্থে প্রাচার 'দ্ধ চন্তা লক্ষ্য করা যায়

ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পরিবর্তন আসিয়াছে। ইহার কারণ সমাজ জীবনের উত্থান ও পতন। সমগ্র ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তাকে দুই

ভাগে ভাগ করিয়া দেখানো যাইতে পারে প্রাচীন ও নবীন। প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌গণের মধ্যে আছেন বুদ্ধ, মনু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শুক্রাচার্য এবং কৌটিল্য। আর আধুনিকদের মধ্যে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ইহা ছাড়া রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র এবং র‍্যানাডে প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌গণের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক অবদান আছে।

(২) প্রাচীন ও নবীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পৃথক করিয়া দেখানো হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের মতো ভারত সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করে নাই। রাজা রাজধর্ম পালন করিবেন, তিনি ন্যায়ের পথে রাজ্য রক্ষা করিবেন এবং রাজ্যে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখিবেন। প্রজাগণ রাজার অনুগত থাকিবে এবং কর দিবে। সমাজহিতকর কাজ করিবে। এইরূপে কর্মবিভাজনের মধ্য দিয়াই স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল।

(৩) সমাজ ও রাষ্ট্র অভিন্ন নয়

ঋগেবদে যুদ্ধের অস্ত্রসমূহের বর্ণনা, অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা, রাজার অভিষেকমন্ত্র, সভা ও সমিতির উল্লেখ আছে। আবার ঋগেবদের যুগে রাজাকে নির্বাচন করার রীতিরও উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাকিয়াভেলী ইটালির রাজাকে যেমন ভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি-নিয়ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, কৌটিল্যও তেমনি ভাবে রাজাকে নীতি-নিয়ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। শান্তির সময়েই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। শুক্রনীতিসার গ্রন্থে রাষ্ট্রচিন্তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে যুদ্ধের নিয়ম-সমূহ বিশদ ভাবে লেখা আছে।

(৪) প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে রাষ্ট্রদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়

আবার প্রাচ্যদেশেই সর্বপ্রথম স্থায়ী ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহা দীর্ঘকাল অব্যাহতও ছিল। প্রাচীন মিশর, আসিরীয়া ও পারস্যের স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থাই তার উদাহরণ। প্রাচীনকালে এই সকল দেশগুলি ছিল এক একটি বিরাট সাম্রাজ্য। আবার সম্রাটের অধীনে অনেক করদ রাজ্যও ছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়।

(৫) প্রাচীন গ্রন্থে গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের রূপ লিপিবদ্ধ আছে

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্যে কোন একটা শ্রেণীবিভাগ করে নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন বুঝিতে হইলে হিন্দুধর্মকে বুঝিতে হইবে, বুঝিতে হইবে পুনর্জন্মবাদ ও গীতার কর্মবাদকে। জীবনের অনিশ্চয়তার জন্য মানুষ যখনই হতাশ হইয়া পড়িয়াছে তখনই তাহাকে শোনান হইয়াছে পুনর্জন্মের বাণী (doctrine of rebirth)। ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে রাজনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। সত্য ও ন্যায় পথে চলা, হিংসা ও দ্বেষভাব ত্যাগ করা প্রত্যেক লোকেরই কর্তব্য—এই কথাই হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বলা হইয়াছে। সরল অনাড়ম্বর জীবনই ভারতবাসীর জীবন। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে ভারতবাসীর জীবনের লক্ষ্যকে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন আদর্শবাদকে আশ্রয় করিয়াছে।

(৬) ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের সন্ধান পাওয়া যায়

মহাভারতের শান্তি পর্বে ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ন্যায়ই ধর্ম। জীবনকে উন্নত করিবার জন্য ভগবান ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক রাজাকেই ধর্মের নিকট দায়ী হইতে হইবে। ধর্ম হইল একটি জীবন পদ্ধতি। ইহা হইল সামাজিক আচার-ব্যবহারের রীতি-নীতি। রাষ্ট্রনীতি ধর্মকেই আশ্রয় করিবে। এই ধর্ম কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নয়।

(৭) ধর্মের সংজ্ঞা

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে রাজাকে সহিষ্ণু, উদার ও ক্ষমাশীল হইতে বলা হইয়াছে। প্রত্যেকটি মানুষের মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে। এখানে মানুষকে শোষক ও শোষিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় নাই। মানুষকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ক্ষত্রিয়কে রাষ্ট্র শাসনের ভার বহন করিতে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের অধঃপতন হইলে অন্যশ্রেণী তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। সর্বদাই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

) চারিটি বর্ণে মানুষকে বিভক্ত করা হইয়াছে

হবস্, লক্ ও রুশোর সামাজিক মতবাদের মতো রাষ্ট্রসৃষ্টি সম্বন্ধে কোন মতবাদ ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত না হইলেও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিটি ভাগে সমাজের অগ্রগতির রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। সত্য-যুগে মানুষ ছিল সত্যাশ্রয়ী। ক্রমে মানুষ সত্যভ্রষ্ট হইয়া ত্রেতা-যুগে আসিয়া উপস্থিত হইল। এমনি ভাবে মানুষের অধঃপতনের স্তরগুলিকে বর্ণনা করা হইয়াছে। অরাজকতার যুগে রাজার প্রয়োজন এই হবসের মতোই ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

) সমাজ বিবর্তনের চারিটি যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। এই যুগে ধর্মের নামে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিলেন প্রকৃত স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য। এই স্বাধীনতা বলিতে তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বুঝেন নাই। এই প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাচীন ধর্মেরই একটি বিশিষ্ট রূপ।

) ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা

বর্তমান ভারতে বিদেশী রাষ্ট্রদর্শনের প্রভৃতি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শন, কমিউনিজম প্রভৃতি আজ ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রদর্শনের স্থান অধিকার করিয়াছে। আজ অধিকারকেই বড় করিয়া দেখা হয়। কর্তব্যকে আর বড় করিয়া দেখা হয় না। কিন্তু এমন দিন হয়ত আসিবে যখন ন্যায়, সততা, অহিংসা, শান্তি, মৈত্রী, আনুগত্য, কর্তব্য প্রভৃতি প্রাচীন রাষ্ট্রদর্শনের মূলনীতিগুলি গৃহীত হইবে।

১) উপসংহার

(খ) ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা (European Political Thought) : রাষ্ট্রচিন্তা ক্ষেত্রে যদিও প্রাচ্যজগৎ অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রচিন্তাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টায় ইউরোপের অবদানও কম নহে। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের প্রভাবে রাষ্ট্রদর্শন একটি বৈজ্ঞানিক রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীনকালে গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র (city state) গড়িয়া উঠে। "গ্রীক্ নগররাষ্ট্র ছিল রাষ্ট্র ছাড়াও অনেক কিছু; ইহা ছিল নৈতিক সমাজ, উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, মন্দির ও সত্য-সন্ধানী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।" সতাই গ্রীসকে বর্তমান রাষ্ট্রনীতির জন্মভূমি বলা যাইতে পারে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

প্রথম অধ্যায় : গ্রীসীয় রাষ্ট্রচিন্তার যুগ : এই যুগের প্রধান চিন্তানায়কদের মধ্যে **সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্লেটোর সাম্যবাদের নীতি এই যুগের মানুষের জীবনে এক নূতন আশার সঞ্চার করে। এই যুগের অন্যতম চিন্তানায়ক এ্যারিস্টটল যদিও প্লেটোর সাম্যবাদের নীতি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু তিনি প্লেটোর **রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতাবাদে** বিশ্বাসী ছিলেন। রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে উভয়েই স্বীকার করেন। তাঁহারা রাষ্ট্রকে মানুষের সামাজিক চেতনা হইতে উদ্ভূত একটি স্বাভাবিক সংগঠনরূপে রূপায়িত করেন। এই দুই রাষ্ট্রচিন্তাবীরের প্রভাবমুক্ত গ্রীসের সোফিস্ট (Sophist), স্টোইক (Stoic), এপিকিউরিয়ান দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতার নীতির প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা ছিলেন **ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী**। সোফিস্টগণ রাষ্ট্রকে প্রাকৃতিক আইনবিরুদ্ধ মনুষ্যসৃষ্ট একটি কৃত্রিম উপকরণ বলিয়া অভিহিত করেন।

(১) রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতা বনাম ব্যক্তি-স্বাধীনতা

দ্বিতীয় অধ্যায় : রোমক রাষ্ট্রচিন্তার যুগ : এই যুগের প্রধান চিন্তানায়কদের মধ্যে সিসেরো এবং পলিবিয়াসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল চিন্তানায়কদের চিন্তার উপর গ্রীসীয় দার্শনিকদের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। রোমের উন্নত শাসন-প্রণালী, আইন এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-দর্শন পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-দর্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। রোমক যুগকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতার যুগ বলা যাইতে পারে।

(২) রোমান আইন ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-দর্শন

তৃতীয় অধ্যায় : মধ্যযুগের রাষ্ট্রাদর্শ : এই যুগে পোপগণ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে খৃষ্টধর্মসম্মত এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। **পোপ সপ্তম গ্রেগরী** এই মতাবলম্বীদের নায়ক ছিলেন। **ধর্মকেন্দ্রিক** রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক-নীতির অবলুপ্ত ঘটে। আবার এই যুগেই গণতন্ত্রের পূজারী **মারসিগ্লিও** এবং বিশ্বশান্তিকামী **দান্তে** প্রভৃতি মনীষিগণ রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র-দর্শনের প্রচার শুরু করেন। এই যুগের অবসান ঘটে রেনেসাঁর আবির্ভাবের ফলে।

(৩) মধ্যযুগ হইল ধর্ম-কেন্দ্রিকতার যুগ

চতুর্থ অধ্যায় : রেনেসাঁ যুগের রাষ্ট্রচিন্তা (Renaissance) : এই যুগের বৈশিষ্ট্য হইল ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এই ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার মুক্ত হইয়া মানুষ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক **মেকিয়াভেলি** ইটালিকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। মেকিয়াভেলির মতে জাতীয় একতা ও মঙ্গল সাধনের জন্য যে কোন ঘৃণ্য নীতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই যুগেই ইংলণ্ডে বিখ্যাত দার্শনিক **স্যার টমাস মোর** সাম্যবাদের নীতি প্রচার করিতে থাকেন।

(৪) জাতীয়তাবাদ এই যুগের উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রচিন্তা

পঞ্চম অধ্যায় : রিফরমেশন যুগের রাষ্ট্রচিন্তা (Reformation) : এই যুগের বৈশিষ্ট্য হইল **রাজন্যবর্গের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার নীতি** (Theory of Divi

Right) প্রচার। এই নীতি প্রচারের ফলে রাজন্যবর্গ স্বেচ্ছাচারী হইয়া ওঠে। পোপের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আবার হল্যাণ্ডে স্পেনীয় নৃপতিবর্গের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ওলন্দাজেরা বিদ্রোহ করে। এই যুগের রাষ্ট্রচিন্তা- নায়কদের মধ্যে প্রটেস্টাণ্ট নেতা লুথারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌম রাষ্ট্রের সূচনা। ফরাসী দার্শনিক বোড্যা (Bodin) সার্বভৌমত্বের নীতি প্রচার করেন।

(৫) Theory of Divine Righ নীতির প্রচার শুরু হয়

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিপ্লবের যুগঃ এই যুগে দুইটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। একটি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আর একটি ঐ শতাব্দীর শেষভাগে। মিলটন, লক্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণসার্বভৌমত্বের বাণী প্রচার করেন। চুক্তিবাদের অন্যতম প্রণেতা লক্ (Locke) রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। লকের বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ এবং স্যার রবার্ট ফিলমার। হবস্ (Hobbes) তাঁহার বিখ্যাত লেভায়াথান গ্রন্থে চুক্তিবাদ প্রচার করেন এবং রাজার সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। রাজা জেমস্ প্রচার করেন যে, রাজার বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে।

(৬) এই যুগে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বাণী প্রচারিত হয়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণী ও গণ-সার্বভৌমত্বের নীতি (Popular Democracy) ফরাসীদের ও আমেরিকার রাষ্টনীতির উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যুগেই মণ্টেস্কিউয়ে (Montesquieu) ও রুশো (Rousseau) সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। এই যুগের বিপ্লব ও যুদ্ধবিগ্রহ সমাজতান্ত্রিকতার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং ক্রমে গণতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত হয়।

সপ্তম অধ্যায়ঃ শিল্পবিপ্লবের যুগঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পবিপ্লব এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যুগে শিল্পবিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সামন্তবর্গের হাত হইতে শিল্পপতিগণের হাতে চলিয়া গিয়াছে। মিল, স্পেনসার, প্রভৃতি মনীষিগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। এই সময়ে জার্মান দার্শনিক হেগেল বহুধাবিভক্ত জার্মানীর জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রাষ্ট্রের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বাণী প্রচার করেন। হেগেলের রাষ্ট্রদর্শনে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার পতাকাকে পদদলিত করিয়া রাষ্ট্রকে সর্বময় নিয়ন্তা হিসাবে গ্রহণ করেন হেগেল। এই যুগের শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে। শিল্পপতি ও মজুর শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস্ ও ফেডারিক এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো (Communist Manifesto) প্রকাশিত হয়; মার্কস্ প্রচার করিতে শুরু করেন সাম্যবাদের নীতি। মার্কসের সাম্যবাদ ছাড়াও বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র, গিল্ড-সমাজতন্ত্র, সিণ্ডিক্যালিজম প্রভৃতি রাষ্ট্রাদর্শও প্রচারিত হইতে থাকে। এই

(৭) একদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর একদিকে হেগেলের রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতা এই যুগের বৈশিষ্ট্য

সকল মতবাদে পুষ্ট হইয়া শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন দেশে ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

অষ্টম অধ্যায়ঃ বিশ্বযুদ্ধের যুগঃ বিংশ শতাব্দীতে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুগে জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্রবাদের সহিত মিলিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল একদিকে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন শোষণনীতি ও বর্বর জাতীয়তাবাদের প্রসার আর অপরদিকে তারই প্রতিবাদস্বরূপ রুশিয়ার মার্কসবাদের বিজয় অভিযান। রুশদেশের বিপ্লব এই যুগের এক স্মরণীয় ঘটনা। রুশবিপ্লবে রুশদেশ হইতে 'জারতন্ত্র' বা রাজতন্ত্র চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

(৮) বিশ্বযুদ্ধের যুগ

নবম অধ্যায়ঃ ফ্যাশীবাদের যুগঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যভাগে ফ্যাশীবাদ-এর আত্মপ্রকাশ হয়। ইটালির মুসোলিনী ছিলেন এই মতবাদের প্রবর্তক। এই যুগে একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ ও জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদকে বানচাল করিয়া দিয়া ফ্যাশীবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধনতন্ত্রবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। হিটলার প্রবর্তিত নাৎসীবাদ এই নীতির এক উগ্র প্রকাশ। ইটালি, জার্মানী ও জাপান এই নীতির প্রচার করে এবং বিশ্বজয়ের উগ্র নেশায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করে। এই বিশ্বযুধে গণতন্ত্রের পূজারী ইংল্যাণ্ড, সাম্যবাদী রুশিয়া ও পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রে নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং ফ্যাশীবাদের পতন ঘটায়। ফ্যাশীবাদ ধ্বংস হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্তমানে ধনতন্ত্রবাদের সহিত সাম্যবাদের আদর্শগত সংগ্রাম চলিতেছে। একদিকে ধনতন্ত্রের শিবির—অপর দিকে সাম্যবাদের শিবির।

(৯) ফ্যাশীবাদ

দশম অধ্যায়ঃ আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগঃ আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিত্তহীনদের একনায়কত্ব এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্র হইল বর্তমান যুগের মূলীভূত আদর্শ। এই সকল আদর্শ বর্তমান জগতের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। এই যুগের দুই বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়াছে। মানুষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, সভ্যতার অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তাই জাতিসংঘ (League of Nations), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিই আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তি।

(১০) আন্তর্জাতিকতাবাদ

বর্তমানে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে মানুষ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাইবার জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। মানুষ আণবিক শক্তি, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতির সন্ধান পাইয়াছে। বর্তমানে চীন ও রুশিয়ার সমাজতন্ত্রের বিস্তৃতির প্রয়াস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসারের প্রচেষ্টার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ শান্তির আশাকে ক্ষীণ করিয়া দিতেছে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস : আদিম যুগে মানুষ ছিল অসহায় ও দুর্বল। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে মানুষ সমাজ গড়িয়াছিল। সমাজ-বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র হইল মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের চরম অভিব্যক্তি।

রাষ্ট্রচিন্তা নূতন নহে। সমাজচিন্তা আদিমকাল হইতেই শুরু হইয়াছে। রাষ্ট্রচিন্তাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা প্রাচ্য ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা। প্রাচ্য ও ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা জগতের অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রচিন্তা হইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রামায়ণ, মহাভারত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতিসার, মনুসংহিতা, প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন বর্ণিত হইয়াছে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তাকে আবার বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করিয়া দেখানো যায়, যথা—গ্রীসীয়, রোমক, মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা, রেনেসাঁ যুগের রাষ্ট্রচিন্তা, রিফরমেশন যুগের, বিপ্লবের যুগের, শিল্পবিপ্লবের যুগের, বিশ্বযুদ্ধের যুগের এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগের রাষ্ট্র চিন্তা।

প্রশ্ন

Briefly narrate the history of Eastern and Western Political Thoughts.
[সংক্ষেপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রচিন্তার বিবরণ দাও] (১—৮ পৃষ্ঠা)

অতিরিক্ত পাঠ্য

Barke, E.—Political Thought in England : Spencer to Present Day—Chs. 5 and 6
Pollock, G.—Introduction to the History of the Science of Politics—Ch. 1
Halloowel, H. J.—Main Currents in Modern Political Thought—Chs. 1-3

২

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচনাক্ষেত্র এবং সম্পর্ক

[Political Science : Its Definition, Scope and Relations]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচনাক্ষেত্র (Definition and Scope) · রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিবার জন্য প্রথমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(১) মানুষ ও রাষ্ট্রের বহুবিধ দিক ও সম্পর্কের আলোচনা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্র হইল সমাজবদ্ধ মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের মূর্ত প্রকাশ। এই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষ তাহার আত্মবিকাশের সন্ধান করিতেছে।

(২) মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। আবার রাষ্ট্র ও মানুষের (Man and the State) আলোচনা করিতে গেলে বহু সংশ্লিষ্ট আলোচনার অবতারণা করিতে হয়; যেমন, (৩) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা, (৪) স্বরাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক, (৫) রাষ্ট্রের গঠন ও প্রকৃতি, (৬) রাষ্ট্রনীতি ও কার্যাবলী, (৭) রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও কর্তব্য, (৮) শাসন পদ্ধতি, (৯) রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী প্রভৃতি। মানুষ ও রাষ্ট্রের আলোচনাকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই সকল সংশ্লিষ্ট বিষয়েরও আলোচনা করে; কারণ এই সকল বিষয়গুলির সহিত মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল বলিয়াছেন যে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে একাকী বাস করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে সমাজবদ্ধভাবে বাস করিতে হয়। সমাজবদ্ধ জীবনে ব্যক্তির সহিত সমষ্টির একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবার মানুষের এই সমাজ-জীবনের ক্রমোন্নতির বিশেষস্তরে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উৎপত্তি হয়। এই রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির আত্মবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে স্বভাবতঃই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একদিকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক ও সম্পর্কের আলোচনা হয়। আবার (১০) অপর দিকে ব্যক্তির সহিত সমষ্টির সম্পর্ক সম্বন্ধেও আলোচনা চলে।

(১) আলোচনাক্ষেত্রের সারসংক্ষেপ

(২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যক্তির সহিত সমষ্টির ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর আলোচনা করে

(১১) আবার বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগ। আধুনিক মানুষ শুধু রাষ্ট্রের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকে না। স্বরাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া—আন্তর্জাতিক সমস্যা লইয়াও তাহাকে আলোচনা করিতে হয়; কারণ আন্তর্জাতিক

ঘটনা তাহার ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলীও অনেক সময় আন্তর্জাতিক রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে **আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সম্পর্কের** আলোচনা হয়।

(১২) রাষ্ট্র ও মানুষের এই বহুবিধ দিক ও সম্পর্কের আলোচনা সুষ্ঠুভাবে করিতে গেলে স্বভাবতঃই রাষ্ট্র যাহার মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া উঠে সেই সরকারকেও (Government) বুঝিতে হইবে; কারণ সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র কার্যকর করে তাহার মহান উদ্দেশ্যকে। **সরকারই রাষ্ট্রের মূর্ত প্রকাশ।** অতএব রাষ্ট্রের আলোচনাকালে সরকারের আলোচনা আসিয়া পড়ে। সরকারকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। অধ্যাপক গার্ণার (Garner), ব্লুন্টস্‌লি (Bluntschli) প্রভৃতি চিন্তাবীর সরকারকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী। অধ্যাপক গার্ণার বলেন, "**রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ হইল রাষ্ট্রকে লইয়া।**"* আবার, সরকারকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে গেটেল (R. G. Gettell), গিলক্রাইস্ট (Gilchrist), ল্যাস্কি (Laski), উইলসন (F. G. Wilson) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকারের আলোচনা করে" (Political science deals with the State and Government)। অধ্যাপক গেটেল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমে বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা যায়।" অবশ্য, তাঁহার এই উক্তির বিশ্লেষণ করার সময় তিনি বলেন যে, এই বিজ্ঞান রাষ্ট্ররূপী মানুষের সংগঠন, তার শাসনযন্ত্র অর্থাৎ সরকার এবং তার কার্যাবলীর আলোচনা করে।

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সরকারের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মতভেদ

(৪) রাষ্ট্র, সরকার ও আইন—এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান

(১৩) ইহা ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান সরকার প্রণীত আইনকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সংক্ষেপে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে তিনটি বিষয়ের আলোচনা করে তাহা হইল, "**রাষ্ট্র, সরকার** ও আইন" (**State, Government and Law**).

বস্তুতঃ সরকার ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনাও করা যায় না। সরকার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে, রাষ্ট্রের পক্ষে আইন প্রণয়ন করে, শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপ দান করে। ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যেও কেহ কেহ সরকারকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী। এখানে ভাববাদী দার্শনিক উইলসনের মত উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধ্যাপক উইলসন বলেন, "নাগরিকদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ ভাবগত। সমগ্র রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ ভাবের মধ্যে কখনই ধরা পড়ে না। সুতরাং নাগরিককে তত্ত্বগত ধারণা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। নাগরিকেরা রাষ্ট্রের সংস্রবে আসিতে পারে না।"

(৫) রাষ্ট্র ও সরকার

অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্র ও সরকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া আছে সরকারের জন্মের ইতিহাস। আবার রাষ্ট্রের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে সরকারের প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে; কারণ, সরকারের রূপ ও প্রকৃতির মধ্যেই রাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি প্রকাশিত হয়। উদাহরণ

* **"Political Science begins and ends with the State."**—*Garner*

স্বরূপ বলা যায়,—ভারত সরকারের গণতান্ত্রিক নীতি ভারতরাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতির নির্দেশ দেয়। বস্তুতঃ, সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং সার্বিক উন্নতিসাধন রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারই করিয়া থাকে। অতএব সরকারের কার্যাবলী রাষ্ট্রের কার্যাবলীর নামান্তর মাত্র। রাষ্ট্র ও সরকারের নীতি অভিন্ন। কারণ রাষ্ট্রের নীতি অনুসৃত হয় সরকারের মাধ্যমে। আবার রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের আওতায়, ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নির্ণয় করিতে হইলে সরকারকে আলোচনা ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতেই হয়। অন্যথায় নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারকে বিশ্লেষণ করা যায় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সরকারের আলোচনা শুধু অন্তর্ভুক্তই হয় না, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক বিরাট অংশ জুড়িয়া আছে সরকারের আলোচনা—পল্ জেনেট বলিয়াছেন ঃ "রাষ্ট্র-বিজ্ঞান হইল সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি ও সরকারের নীতিসমূহের আলোচনা করে।"

(৬) সরকার রাষ্ট্রের প্রতিভূ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত

(১৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই বিস্তৃত বিষয়বস্তুর কতকটা ঐতিহাসিক আলোচনা, কতকটা বর্তমানের সমালোচনা এবং কতকটা ভবিষ্যতের ইংগিত। অতীতকে আলোচনা করিতে হয় বর্তমানকে বুঝিবার জন্য। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বর্তমানের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাবলীর সমালোচনা না করিলে সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয় এবং তাহাদের সমাধানের পথ নির্দেশ করাও সম্ভব নয়। সুদূর অজ্ঞাত অতীতে মানুষের জগতে যে চিন্তা ও ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা না জানিতে পারিলে বর্তমানের রাষ্ট্রদর্শনকে সঠিকভাবে বোঝাও সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কি বলেন, "ইতিহাসের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ব্যতীত আমাদের অনুসন্ধান-ক্ষেত্রকে সঠিকভাবে বুঝিতে পারা যায় না।"* যেমন,—সাম্যবাদের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়।

(৭) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ঐতিহাসিক দিক

আদিম কাল হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে পুরাতন কঠামোর সংস্কার সাধন করিয়া সমাজব্যবস্থার বহু পরিবর্তন করিয়াছে। এই পরিবর্তন মানুষের আত্মবিকাশের কতটা সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে বর্তমান কালের রাষ্ট্রনীতির কার্যাবলীর পর্যালোচনা, ত্রুটি-বিচ্যুতির নির্ণয় এবং সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আবার বর্তমানের রাষ্ট্র-সংগঠন, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও তাহার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলী মানুষকে আত্মবিকাশের কতখানি সুযোগ দেয় তাহার বিচার-বিশ্লেষণও রাষ্ট্রবিজ্ঞান করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শুধু অতীত ও বর্তমানকে লইয়াই নয়। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেমন বর্তমানের নীতি নির্ধারিত হয়, তেমনি আবার অতীতের আলোচনা ও বর্তমানের সমালোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ইংগিত দেয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

* "Nothing in the field of investigation is capable of being rightly understood save as it is illustrated by the process of its development".—*Laski*.

গেটেলের ভাষায় বলা যায়,—"**এইরূপ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের আলোচনা হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞান**"।*

(১৫) ১৯৪৮ সালে UNESCO-এর এক সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়: (১) রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও তাহার ইতিহাস; (২) রাষ্ট্রের সংবিধান, বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান; (৩) রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ; (৪) আন্তর্জাতিক সংস্থা, নীতি ও বিধান।

(১৬) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিস্তৃত আলোচনাক্ষেত্র এই কথাই প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু সমালোচনাই করে না; রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গতি-নির্ধারক। অতীত ও বর্তমানের সাহায্যে নির্ণয় করে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গতি কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। কোন্ দিকের গতি কোন্ দিকে প্রবাহিত হইলে উহা ব্যক্তির আত্মবিকাশে ও মানুষকে সুখী করিতে কতদূর সমর্থ হইবে, তাহারও ইংগিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের ন্যায় দিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই কারণেই অধ্যাপক গেটেল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণ করিবার সময় বলিয়াছেন, "**রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল রাষ্ট্র কি ছিল তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বর্তমান রাষ্ট্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কি হওয়া উচিত তার রাষ্ট্রনৈতিক নীতিশাস্ত্রসম্মত আলোচনা**।"†

(৮) রাষ্ট্রবিজ্ঞান জীবনের গতি-নির্ধারক

উপসংহারে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা শুধু রাষ্ট্রের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্র হইল সামাজিক বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শাস্ত্রের আলোচনার প্রধান বস্তু হইল মানুষ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানও অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে এই মানুষেরই রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনা করে; ফলে মুখ্য আলোচ্য বিষয় এক হওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া আলোচনা করা যায় না। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকালে সমাজের আর্থিক ও নৈতিক দিকগুলি সম্বন্ধেও সচেতন থাকার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার সমাজচিন্তা শূন্যে সৃষ্টি হয় না। সমাজচিন্তা সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে সমাজচিন্তার আলোচনা করে, সেই আলোচনাকালে সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সতর্ক থাকারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Political Science): বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়াছেন। অধ্যাপক **গেটেল** রাষ্ট্র-

* "It is thus a study of the State in the past, present and future."—*R. G. Gettell.*

† Political Science is a historical investigation of what the State has been, an analytical study of what the State is, and a politico- ethical discussion of what the State should be.—*R. G. Gettell.*

বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক গেটেল এই সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দিবার সময় বলেন, এই বিজ্ঞান রাষ্ট্ররূপী মানুষের সংগঠন, তার শাসনযন্ত্র অর্থাৎ সরকার এবং তাহার কার্যাবলীর আলোচনা করে। অধ্যাপক গার্নার বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ হইল রাষ্ট্রকে লইয়া"। গিলক্রাইস্টের ভাষায় "রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকারের আলোচনা শাস্ত্র" ("Political science deals with the State and Government.")। পলজেনেট বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমাজ বিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি ও সরকারের নীতিসমূহের আলোচনা করে।" আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু শুধু অতীত ও বর্তমানকে লইয়া নয়, ইহা ভবিষ্যতের ইংগিতও দেয় সেইহেতু "এইরূপ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের আলোচনা হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞান" ("It is thus a study of the State in the past, present and future."—R. G. Gettell)। অতীত ও বর্তমানের সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নির্ণয় করে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গতি। অধ্যাপক গেটেল তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিবার সময় বলিয়াছেন, "**রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল রাষ্ট্র কি ছিল তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বর্তমান রাষ্ট্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কি হওয়া উচিত তার রাষ্ট্রনৈতিক** নীতিশাস্ত্রসম্মত আলোচনা ("Political science is a historical investigation of what the State has been, an analytical study of what the State is, and a politico-ethical discussion of what the State should be.—*R. G. Gettell.*

সংজ্ঞা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি শাস্ত্র। ইহা রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে। ইহা সমাজ-বিজ্ঞানের একটি অংশ হিসাবে রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি সম্বন্ধেও আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সম্পর্কের আলোচনাও হয়। আবার সরকার যেহেতু রাষ্ট্রের মূর্ত প্রকাশ অতএব ইহা সরকার সম্বন্ধেও আলোচনা করে। রাষ্ট্র, সরকার ও আইন ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। অতএব যে শাস্ত্র পাঠ করিলে রাষ্ট্র, সরকার, আইন, আন্তর্জাতিক আইন ও সম্পর্ক, রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি ও সরকারের নীতিসমূহ সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় তাহাকেই রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বলা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার মূল্য (Utility of the study of Political Science) ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা সমাজের বহু উপকারে আসে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই বিরাট তথ্যবহুল আলোচনা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রগুলি রাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধনে বিশেষ সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। রাষ্ট্রের সহায়তায় সে যুগযুগান্তর ধরিয়া আত্মবিকাশের সুযোগ খুঁজিতেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্র ও মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করিয়া মানুষ তাহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে এবং নাগরিক তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়। ইহার ফলে, মানুষ স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সমাজে পরস্পরকে ভালবাসিতে শিক্ষালাভ করে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু নানা সমস্যার আলোচনা করে, সেইজন্য বলা যায়,

রাষ্ট্রবিজ্ঞান-পাঠে মানুষ নানা বিষয়ে চিন্তাশীল হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ পায়।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলীর আলোচনা করে। সমাজবদ্ধ মানবজীবনের চরম পরিণতি লাভ হয় রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিবরণ জানা যায় এবং রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়।

সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক হিসাবে, সমাজের নীতি-নির্ধারক হিসাবে, মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা-বোধ এবং বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করিয়া বিশ্ব-শান্তিরক্ষার সহায়ক হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিরাট ভূমিকাকে কেহই অস্বীকার করে না।

বর্তমানে ভারত স্বাধীন। ভারতীয় নাগরিকের প্রত্যেকেরই এই শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আবার ভারতের মানুষ আজ সার্বজনীন ভোটাধিকারের সুযোগ ভোগ করিতেছে; সুতরাং তাহাদের নাগরিক হিসাবে কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিত। ভারত তাহার নিজ সংবিধান রচনা করিয়াছে। এই সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে তাহার দৈনন্দিন চলার পথে নির্দেশ দেয়। নাগরিক যদি এই মূল্যবান সংবিধান সম্পর্কে অবহিত না হয়, তবে স্বাধীন দেশের নাগরিকের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হইয়াছে তাহা পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই কারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান-পাঠের গুরুত্বকে আজ কেহই অস্বীকার করে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নাম (Name of the Subject) : আলোচ্য শাস্ত্রটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল এই শাস্ত্রটিকে **'রাষ্ট্রনীতি' (Politics)** নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ এই শাস্ত্রটিকে **'রাষ্ট্রদর্শন' (Political Philosophy)** নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। **'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (Theory of the State)** নামেও আমাদের শাস্ত্রটি পরিচিত। বর্তমানে আলোচ্য শাস্ত্রটি **'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science)** নামেই বিশেষ পরিচিত। বিষয়বস্তুর আলোচনার পূর্বে এই চারিটি নামের মধ্যে কোন্‌টি উপযুক্ত এবং সর্বজনগ্রাহ্য তাহা নির্বাচন করা দরকার। নিম্নে এই চারিটি নামের তুলনামূলক আলোচনা করা গেলঃ

চারিটি নাম :
১। রাষ্ট্রনীতি
২। রাষ্ট্রদর্শন
৩। রাষ্ট্রতত্ত্ব
৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান

(ক) **রাষ্ট্রনীতি (Politics) :** রাষ্ট্র-সংক্রান্ত গ্রন্থকে এ্যারিস্টট্‌ল 'রাষ্ট্রনীতি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই 'রাষ্ট্রনীতি' শব্দটি ব্যবহৃত হইত প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্র ও তাহার অনুসৃত নীতিকে বুঝাইবার জন্য। গ্রীক্-রাষ্ট্রনীতিতে আলোচিত হইত শুধু গ্রীক্ নগর-রাষ্ট্রের নীতি। বর্তমানে এই শাস্ত্রের আলোচনা-ক্ষেত্র ব্যাপক। শুধু নগর-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতিই ইহাতে আলোচিত হয় না। আর প্রাচীন গ্রীসের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের ন্যায় রাষ্ট্রের অস্তিত্বও আজ আর নাই। বস্তুতঃ রাষ্ট্রনীতি বলিতে বর্তমানে বুঝায় সরকারের সাম্প্রতিক সমস্যাবলী ও তাহার সমাধানের জন্য অনুসৃত নীতিকে। কিন্তু আলোচ্য শাস্ত্রের আলোচনাক্ষেত্র যে শুধু সাম্প্রতিক কোন বিশেষ নীতির আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের

বহুমুখী আলোচনা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এই কারণেই জেলিনেক (Jellinek), সিজউইক (Sidgwick), স্যার ফ্রেডারিক পোলক (Sir Frederick Pollock) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ্যারিস্টট্ল প্রদত্ত নামটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন না। অবশ্য এই সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'রাষ্ট্রনীতি' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রনীতিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; যথা,—(১) তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি (Theoretical Politics) এবং (২) ফলিত রাষ্ট্রনীতি (Applied Politics)। এই সকল লেখকের মতানুসারে তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্রের আইন, সরকার, রাষ্ট্রের কর্তব্য, তাৎপর্য, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ। আর রাষ্ট্র-নীতির ফলিত বিভাগে আলোচিত হয় রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন রূপ, কূটনৈতিক সম্বন্ধ এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধি প্রভৃতি। এই সকল লেখক এ্যারিস্টট্ল প্রদত্ত নামকরণটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিষয়বস্তুর শ্রেণী-বিভাগ করিয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই শ্রেণী-বিভক্ত আলোচনায় কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেক লেখক আছেন যাঁহারা 'রাষ্ট্রনীতি' শব্দটি ব্যবহারের ঘোর বিরোধী। কারণ, সরকারের নীতি ও শাসন-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা ব্যতীত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সংক্রান্ত অন্যান্য বহু বিষয়ের আলোচনাও এই শাস্ত্রে হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রনীতিকে কেহ কেহ দুই ভাগে বিভক্ত করেন:
(১) তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি
(২) ফলিত রাষ্ট্রনীতি

আবার, যেহেতু রাষ্ট্রনীতি শব্দটির দ্বারা বর্তমানে সরকারের সাম্প্রতিক সমস্যাবলীর সমাধানের নীতিকে বুঝানো হয়, সেইজন্য অনেকে রাষ্ট্রনীতিকে সমগ্র রাষ্ট্র-সংক্রান্ত আলোচনার অংশমাত্র মনে করেন। রাষ্ট্র-সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ও সমস্ত বিষয়ের আলোচনা যদি কোন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়, তবে ঐ শাস্ত্রের নামকরণ 'রাষ্ট্রনীতি' না হইয়া 'রাষ্ট্রদর্শন' হইবার পক্ষে কেহ কেহ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

(খ) **রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy)**: রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় তত্ত্বকথা আলোচনা করাই 'রাষ্ট্রদর্শনে'র মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, তাৎপর্য, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি আলোচনা করা হয় এই শাস্ত্রে। এই আলোচনা হইতে রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও কতকগুলি মূলসূত্র নির্ধারণ করা হয়। এইগুলি আবার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি-স্বরূপ। রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরও আলোচনা আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব দেখা যায়, আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের নাম যদি রাষ্ট্রদর্শন দেওয়া হয়, তবে কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রদর্শন বলিতে রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্বকেই বোঝানো হয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে শুধু রাষ্ট্রের তত্ত্বকথাই আলোচিত হয় না, এই শাস্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরও আলোচনা হইয়া থাকে। এই কারণে অনেক লেখক এই শাস্ত্রের নাম রাষ্ট্রদর্শন দিবার পক্ষপাতী নন। আবার যে শাসনপদ্ধতিতে ও যে নীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাহা রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনপদ্ধতি রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়বস্তু নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য শাস্ত্রটিকে 'তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি' ও 'ফলিত রাষ্ট্রনীতি'—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রদর্শন শুধু রাষ্ট্রের তত্ত্বকথাই আলোচনা করে

রাষ্ট্রদর্শন বলিতে শুধু তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতিকেই বোঝানো হয়। ফলে ফলিত রাষ্ট্রনীতি আমাদের আলোচনার বাহিরে থাকিয়া যায়। কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' বলিয়া এই শাস্ত্রটিকে আখ্যায়িত করিলে সমগ্র আলোচনা-ক্ষেত্রকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

(গ) **রাষ্ট্রতত্ত্ব (The Theory of the State):** রাষ্ট্রতত্ত্ব নামকরণটিকে অনেকে 'রাষ্ট্রদর্শন' অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় তত্ত্বকথা আলোচনা করাই রাষ্ট্রদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রের নীতিগত বিষয়গুলি লইয়া বেশীর ভাগ আলোচনা করিয়া থাকে। 'রাষ্ট্রদর্শন' আলোচনা করে রাষ্ট্রের দার্শনিক দিক আর 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' আলোচনা করে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উপাদানের। ইহা রাষ্ট্রের গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করে না এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারের গুণাগুণের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণও করে না। 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' বর্তমান রাষ্ট্রের আলোচনা করে এবং রাষ্ট্র সাধারণতঃ কি প্রকারের হইয়া থাকে তাহারও ইঙ্গিত দিয়া থাকে। 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' রাষ্ট্রের উন্নতির ঐতিহাসিক দিকের আলোচনাও করে না বা আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্রও অঙ্কিত করে না। ইহা রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতিরও আলোচনা করে না।

অতএব দেখা যায়, রাষ্ট্রতত্ত্ব নামকরণটি বিশেষ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এই কারণে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, 'রাষ্ট্রতত্ত্বের' পরিবর্তে, এই শাস্ত্রের নাম 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' রাখা হইলে সমগ্র আলোচনা ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়।

(ঘ) **রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science):** বর্তমানে এই শাস্ত্রটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্বগত ও ফলিত—এই দুই প্রকারের রাষ্ট্রনীতিরই আলোচনা করিয়া থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একদিকে আলোচনা করে রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যপদ্ধতি, আর অপরদিকে আলোচনা করে কতকগুলি মূলসূত্রের, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়াছে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। আর তত্ত্বগত দিকে ইহা আলোচনা করে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তাৎপর্য ও রাষ্ট্রকর্তব্য সম্বন্ধে। আলোচনার এই অংশকে কেহ কেহ 'রাষ্ট্রদর্শন' বলিয়া আখ্যায়িত করেন। আর আলোচনার অপর অংশে অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের কার্যাবলী, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ প্রভৃতি। আলোচনার এই অংশকে কেহ কেহ "তুলনামূলক রাষ্ট্রনীতি" (Comparative Politics) বলিয়া আখ্যায়িত করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনা-ক্ষেত্র অপেক্ষা ব্যাপকতর। রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বস্তু মৌলিক। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান মৌলিক তত্ত্ব ও তাহার ব্যবহারিক রূপেরও আলোচনা করে। আবার কোন কোন ফরাসী লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একক শাস্ত্র না বলিয়া অনেকগুলি শাস্ত্রের সমষ্টি (Political sciences) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল লেখকদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের বিশেষ এক দিকের আলোচনা করে। ফরাসী দার্শনিক পল জেনেট (Paul Janet) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার কালে বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা, রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি ও সরকারের নীতিসমূহের আলোচনা করে।* রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল বিশেষীকৃত

অধিকতর উপযুক্ত নাম হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞান

* 'Political Science is that part of the social science which treats of the foundations of the State and the principles of the Government.'—*Paul Janet.*

বিজ্ঞান। ইহা রাষ্ট্রের বিশেষ একটি দিকের আলোচনা করে। আবার রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানই করে না, আন্তর্জাতিক আইন, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রগুলিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় শাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহা রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় একমাত্র শাস্ত্র নহে। অবশ্য ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে যদি আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি পৃথকভাবে আলোচিত হয়, তথাপি তাহাদের আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে করা সম্ভব নয়; সুতরাং ইহাদিগকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক একটি শাখা হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচনা ক্ষেত্রের সীমানা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্র ও সরকারের গঠন ও কার্যপদ্ধতির আলোচনা করে না, ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের আলোচনা করে।

অতএব দেখা যায়, 'রাষ্ট্রনীতি' বলিতে যাহা বুঝায় তাহার আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হয়; রাষ্ট্রের 'দার্শনিক ব্যাখ্যা'ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রাষ্ট্রতত্ত্বের বিষয়বস্তুও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। ফলে আলোচ্য শাস্ত্রের নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাখা হইলে ইহা অন্যান্য নামকরণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং বিষয় অনুসারে বিশেষ উপযুক্ত হইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনপদ্ধতি (Political Science and Government): রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে কেহ কেহ শাসনপদ্ধতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। এ্যারিস্টট্‌ল, হব্‌স্, লক্, রুশোপ্রমুখ চিন্তাবীর শাসনপদ্ধতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। অংশকে বাদ দিয়া সমগ্র বস্তুকে কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমগ্র বস্তু আর শাসনপদ্ধতি তাহার অংশমাত্র। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকালে শাসনপদ্ধতির আলোচনা করিতেই হয়। আবার রাষ্ট্র মূর্ত হইয়া উঠে শাসনপদ্ধতির মধ্যে। এই শাসনপদ্ধতিই যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত না হয়, তবে রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে বুঝিতে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গে পল জেনেট (Paul Janet) বলেন: "সমাজবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্রের সামগ্রিক ভিত্তিস্বরূপ শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে।"

শাসনপদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শন (Political Science and Political Philosophy): পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই সংজ্ঞাদ্বয়কে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মূলতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপক আর রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি অপেক্ষাকৃত ছোট। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রদর্শন। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্কের যোগাযোগ কতদূর আছে তাহাও নির্দেশিত হয়। রাষ্ট্র কি? ইহার দার্শনিক বিশ্লেষণ দেয় রাষ্ট্রদর্শন। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করে এবং ব্যবহারিক দিক হইতেও বিশ্লেষণ করে। পরিশেষে বলা যায়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে এই দুইটি নামের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় কি ?
(Can Political Science be called a Science ?)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে সকলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে চান না। এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করার পূর্বে বিজ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাটি আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা না জানিতে পারিলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত কিনা বলা সম্ভব নহে। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ **বিশেষরূপ জ্ঞান**। কোন বিষয়সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আবার এই জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ হইতে হইবে ; অন্যথায় ঐ জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সংক্ষেপে বলা যায় : **"বিজ্ঞান হইল কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়বস্তুর সুসংবদ্ধ জ্ঞান।"** এই সুসংবদ্ধ জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানী কতকগুলি সাধারণ সূত্র বাহির করেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য নিরূপণ করেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিকে বিজ্ঞানপদবাচ্য করা যায়। কারণ, তাহাদের বিষয়বস্তুগুলির বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ ও পর্যবেক্ষণ করিয়া একটি সুসংবদ্ধ জ্ঞানলাভ করা যায় এবং এই লব্ধ জ্ঞান হইতে আবার কতকগুলি সূত্র নির্ধারণ করা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

এক্ষণে প্রশ্ন হইল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা। ফরাসী দার্শনিক বাকল (Buckle)*, কোঁৎ (Comte) এবং মেটল্যাণ্ড (Maitland) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানপদবাচ্য করিতে চান না। এইসব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহাদের মতের সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন। নিম্নে এই যুক্তিগুলিকে দেখানো গেল :

বিপক্ষে যুক্তি : (১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত জটিল ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ। ফলে অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর পরীক্ষাকার্য, গবেষণা এবং শ্রেণীবিভক্তিকরণ যতটা সহজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ততটা সহজ নহে।

(২) অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে যতটা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা সহজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে ততটা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা সহজ নহে।

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অর্থাৎ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্রের সমস্যাবলীর সঠিক পরিমাপ করা বা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রাখিয়া স্বরূপ নির্ণয় করাও সম্ভব নহে। **ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন** মানুষকে লইয়া গবেষণাগারে পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। গবেষকের গবেষণার বিষয় যদি সকল অবস্থায়ই অপরিবর্তিত থাকে তবেই গবেষকদের পক্ষে সাধারণ সূত্র বাহির করা সম্ভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সর্বদা পরিবর্তনশীল। অতএব, অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ইহার পরীক্ষাকার্য চলে না। ফলে ইহা বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্তও হয় না।

(৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বাহ্যিক পরিবেশের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে হয়। এই সকল কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অনুমানের উপর নির্ভর

* "In the present state of knowledge, politics so far from being a science is one of the most backward of all arts."—*Buckle*

করিতে হয়। এই জন্য অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিকে অনুমানসিদ্ধ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নির্ভরশীল ; ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞানের পদবাচ্য করা যায় না। এইজন্য লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়াছেন এবং ইহাকে আবহবিদ্যার (Meteorology) সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে যাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে চান, তাঁহাদের মধ্যে আছেন এ্যারিস্টটল, বোড্যাঁ, হব্‌স, মঁতেস্কিউয়ে, পোলক প্রভৃতি মনীষিগণ। স্যার ফ্রেডারিক পোলক বলেন : ''যাহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করেন না, তাঁহারা বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা জানেন না''। এই মতাবলম্বীদের যুক্তি হইল :

সপক্ষে যুক্তি : (১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষেও শ্রেণীবিভক্তিকরণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়।

(২) লর্ড ব্রাইস এই মত পোষণ করেন যে, মানুষের আচরণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় এবং এই সুসমঞ্জস আচরণ হইতে সুসংবদ্ধ জ্ঞানলাভও করা যায়। তাহা ছাড়া মানুষের এই আচরণ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাধারণ নিয়মও বাহির করিয়া থাকেন। আবার এই নিয়মগুলির সাহায্যে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যারও সমাধান করা যায়।

(৩) ফলে, অধ্যাপক গার্নারের মতানুসারে বলা যায়, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বস্তুর যেহেতু বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভক্তকরণ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি করা যায় এবং শ্রেণীবিভক্ত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্রের প্রতিষ্ঠাও যেহেতু সম্ভব, সেই হেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানও বিজ্ঞানপদবাচ্য।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গভীর শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহ হইতে কতকগুলি সূত্রও নির্ধারণ করিয়াছেন। এই সূত্রগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনামূলক, পরীক্ষামূলক, ঐতিহাসিক, আইনমূলক প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আদিম যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী প্রগতিশীল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই প্রগতিশীল মানবজীবনের আলোচনা করে। এই কারণেই লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রগতিশীল বিজ্ঞান।* আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও মানুষের এই ক্রমবর্ধমান উন্নত প্রণালীর রাষ্ট্রনৈতিক জীবন হইতে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। ফলে বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা সহজতর হইয়াছে। অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়া থাকেন তার অধিকাংশই নির্ভুল প্রমাণিত হয়।

মন্তব্য : রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত, যদিও ইহা সম্পূর্ণ নয়

সর্বশেষে অধ্যাপক গেটেলের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা গেল। গেটেল বলিয়াছেন

* "Political science is a progressive science."—*Bryce*

যে, "যদি বিজ্ঞান বলিতে এই বুঝায় যে, শৃংখলিত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে আহৃত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান ও আলোচনা এবং ইহা এক সুসংবদ্ধ বিষয়ের বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভক্তিকরণ, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকেও বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।*

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে কিভাবে সূত্র নির্ধারণ করেন তাহা উদাহরণের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে। বিপ্লব কেন হয়? শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কেন হইয়া থাকে? এই দুইটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা যাক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একটি শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর দেখেন যে উহা জনসাধারণ কর্তৃক কি পরিমাণ সমর্থন লাভ করিয়াছে। যদি ঐ শাসনতন্ত্র সর্ব অবস্থায়ই অগ্রাহ্য হয়, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐ শাসনতন্ত্রের বদবদল করেন এবং ঐ শাসনতন্ত্রকে বিপ্লবের কারণ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষাক্ষেত্র বিরাট হইলেও অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় এই শাস্ত্রে পরীক্ষাকার্য চলে এবং পরীক্ষার পর সূত্র নির্ধারিত হয়। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি দিক আছে; যথা, বিজ্ঞান, কলা, দর্শন ও আইন প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় সর্বদা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা সম্ভব নয় বলিয়া এই শাস্ত্রকে কেহ কেহ অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি

(Methods of Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বর্তমানে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হয়। বিজ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা করিতে হইলে কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হইত না। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় কোন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিও অবলম্বন করা হইত না। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহার করিয়া আলোচনাকে বিজ্ঞানসম্মত করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: (১) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, (২) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, (৩) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি, (৪) তুলনামূলক পদ্ধতি, (৫) ঐতিহাসিক পদ্ধতি, (৬) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (৭) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (৮) আইনমূলক পদ্ধতি, (৯) মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি ও (১০) দর্শনমূলক পদ্ধতি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা

(১) **পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method)**: পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করেন। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হইল,

* "If, however, a science be described as a mass of knowledge concerning a particular subject, acquired by systematic observation, experience and study and analysed and classified into a unified whole, then political science may justly claim to be a science."—*Gettell, R.G.*

অনুসন্ধানের প্রতিকূল বিষয়গুলি বাদ দিয়া শুধু অনুকূল ঘটনাসমূহকে লইয়াই পরীক্ষা করা হয়। রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না। এই কারণে বৈজ্ঞানিক আবার অনেক কিছুর সঠিক পরিমাপ করিয়া নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিতে পারেন ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশে ঘেরা ঘটনাসমূহের সঠিক পরিমাপ করিয়া বৈজ্ঞানিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক, জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল। এইজন্য স্যার জর্জ লিউ (Sir George Liews) বলিয়াছেন যে, রসায়নবিদ্ রসায়নের ক্ষেত্রে যেভাবে পরীক্ষা করিতে পারেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেরূপ পরীক্ষা করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যদি সমাজতন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতে চান, তবে তাঁহাকে একটি রাষ্ট্র বাছিয়া লইতে হইবে, যেখানে সমাজতন্ত্র প্রবর্তিত করিয়া উহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক সূত্র নির্ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সহজসাধ্য নহে। কারণ, অন্তর্বিপ্লব, আর্থিক সংকট ইত্যাদির দ্বারা উদ্দেশ্য বানচাল হইয়া যাইতে পারে। অতএব পরীক্ষার ফল সঠিক নাও হইতে পারে। আবার বৈজ্ঞানিক যেভাবে দেশের উষ্ণতা, আর্দ্রতা প্রভৃতির পরীক্ষা করেন সেইরূপ গণবিপ্লবের স্রোত কোন্‌দিকে প্রবাহিত হইবে তাহা রাষ্ট্রচিন্তাবীরগণ সঠিকভাবে বলিতে পারেন না।

(১) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি

কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমানে বহুঅভিজ্ঞতাপুষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই গণবিপ্লবের গতি নির্ধারণ করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকালে পরীক্ষা-মূলক পদ্ধতি অবলম্বনের বহু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও মানুষের রাষ্ট্রনীতিক জীবনে প্রতিনিয়তই পরীক্ষা চলিতেছে। রাষ্ট্রে নূতন নূতন আইন প্রণীত হয়। এই আইনের প্রয়োগ দ্বারা সমাজের কি পরিমাণ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা ধীরে ধীরে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয়। এইগুলিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি। অতএব দেখা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

(২) **পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method)**: লর্ড ব্রাইস, লাওয়েল প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মতে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি হওয়া উচিত। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলীর পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাঁহাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, কার্যকলাপ, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে এবং বিশ্লেষণ করিতে হইবে। পর্যবেক্ষণকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহ্যসাদৃশ্য ও সামান্যিকরণ যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে। এই সকল বিষয় স্মরণ রাখিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করিতে হইবে। পর্যবেক্ষণের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সূত্র নির্ধারণ করেন। এই মূলসূত্রগুলির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে রূপায়িত করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা সার্থক হইবে। লাওয়েল বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক নহে।"

(২) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সারসংক্ষেপ

উপসংহারে বলা যায় যে, পর্যবেক্ষণকারীকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ

সমাজবন্ধ জীব। তাহার স্বভাবের মূল প্রবণতাগুলি সর্বত্রই সমান। কিন্তু পরিবেশের পার্থক্যের জন্য অনেক সময় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক প্রকৃতি ও কার্যাবলী বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া সূত্র নির্ধারণকালে মানুষের এই প্রবণতার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, অন্যথায় নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হইবে না।

(৩) **পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical Method)**: পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণনাযোগ্য রাষ্ট্রনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করেন। আবার এই সকল তথ্য হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অনেক সময় আবার সরকারকে নীতিনির্ধারণে নির্দেশ দিয়া থাকেন।

(৩) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি বর্তমান যুগের এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি

বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। এই যুগে পরিসংখ্যান পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসৃত হয়। পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় তথ্য ও হিসাব ইত্যাদি পরিসংখ্যান পদ্ধতির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। আবার আদমসুমারী অর্থাৎ লোকসংখ্যা গণনাকালে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায়। অতএব দেখা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই সকল বিষয়বস্তু আলোচনাকালে পরিসংখ্যান পদ্ধতি বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

(২) **তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)**: গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া সমসাময়িক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর পর্যালোচনা করেন এবং দোষ-ত্রুটি নির্ণয় করেন। শোনা যায়, অ্যারিস্টটল ১৫৮টি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার রাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তগুলি স্থির করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে অতীত ও বর্তমান রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা করা হয়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ঐগুলির রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দোষ-ত্রুটি নির্ণয় করা যায় এবং একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা সহজতর হয়।

(৪) তুলনামূলক পদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানেও এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়

এই পদ্ধতি ব্যবহারকালে শুধু তুলনীয় বিষয়গুলিই গ্রহণ করিতে হয় এবং যে বিষয়গুলি তুলনীয় নয়, সেগুলিকে বাদ দিতে হয়। তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহারকে সাধারণতঃ দুইদিক হইতে দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক পদ্ধতির মতো অতীতের রাষ্ট্রসমূহের শাসন-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেন। আবার অতীতের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলীর সহিত বর্তমান কালের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলীর তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করেন।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান কালের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যে তুলনা করিয়া দোষ-ত্রুটি নির্ণয় করা যায়। এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করিয়া দোষ-ত্রুটি পর্যালোচনা করিয়া একটি আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অংকন করেন।

আধুনিক কালে এই পদ্ধতির সমর্থন করেন, মঁতেস্কিউয়ে, টক্‌ভিল, লর্ড

ব্রাইস প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ। লর্ড ব্রাইস বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ও শাসন-ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিয়া গণতন্ত্রের গুণাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, এই পদ্ধতি অনুসরণকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিষয় নির্বাচনকালে ভুলবশতঃ যদি অতুলনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার সিদ্ধান্তে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৫) **ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)**: রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। ইতিহাসই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন। ইতিহাসের পটভূমিকাতেই রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্যক্ আলোচনা সম্ভব। বর্তমান দাঁড়াইয়া আছে অতীতের অস্তিত্বের উপর। আবার বর্তমান ইঙ্গিত দেয় ভবিষ্যতের। অতএব ঐতিহাসিক পদ্ধতির সারকথা হইল,—ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এবং ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই বর্তমান রাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করা।

(৫) ঐতিহাসিক পদ্ধতির স্বরূপ

এই পদ্ধতি অনুসারে দেখা যায় যে, বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়া কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার অতীতকালে এই সকল প্রতিষ্ঠানের রূপ কি ছিল তাহাও এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দেখা যায়। রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা ও তাহার ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান পদ্ধতির মাধ্যমেই করা সম্ভব। কারণ, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান অবস্থায় একদিনে আসিয়া পৌঁছায় নাই। ইতিহাস আলোচনা করে কিভাবে এই রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইতিহাসের এই আলোচ্য অংশ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র উদ্ভবের মতবাদগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে বিকশিত হইয়াছিল। এই সকল মতবাদের সঠিক তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি পরিবেশকে জানিতে হইবে। ইতিহাস পাঠে আমরা এই পরিবেশ সম্বন্ধে জানিতে পারি। আবার সুদূর অতীতে যে রাষ্ট্রচিন্তা শুরু হইয়া, ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অনুসন্ধিৎসা লইয়া তাহা বিশ্লেষণ করিতে হয়।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বনকালে বিশেষ সাবধানত অবলম্বন করিতে হইবে

ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিতে হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণকালে বাহ্যসাদৃশ্যকে অভিন্ন মনে হইতে পারে। এই বাহ্যসাদৃশ্যকে অভিন্ন মনে করিলে ভুল সিদ্ধান্ত হওয়া স্বাভাবিক। আবার ব্যক্তিগত ধারণার ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাহাদের গুণাগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ইতিহাসের গতি ব্যাখ্যা করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৬) **জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method) :** এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা হয়। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা দ্বারা রাষ্ট্রের গতি বিবর্তনবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয়। ইহা সত্য যে, রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু বাহ্যসাদৃশ্যের দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ব্যাখ্যা করিলে অনেক সময় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি করা হইতে পারে। ফলে এই পদ্ধতি অনুসরণকালে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। পূর্বে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত বলিয়া পরে প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না।

(৬) জীববিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে

(৭) **সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method) :** এই পদ্ধতি জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিরই মতো আরো একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি সমাজদেহ বলিয়া কল্পনা করা হয়। সমাজদেহের কোষ হইল ব্যক্তি। দেহের কোষগুলির গুণাগুণের উপর যেমন সম্পূর্ণ দেহের গুণাগুণ নির্ভর করে, সেইরূপ নাগরিকগণের উপর সমগ্র রাষ্ট্রের গুণাগুণ নির্ভরশীল। সমাজ-বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি জীববিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতির বিবর্তনবাদ অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করে।

(৭) সমাজবিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতি

(৮) **আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method) :** এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন জার্মান ও ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ। অধ্যাপক গার্নার এই পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করিবার কালে বলিয়াছেন যে, এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে প্রধানতঃ একটি আইনমূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আইনের নীতির বিজ্ঞান বলিয়া ধরা হইয়াছে।* এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্র সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রের প্রধান কাজই হইল আইন প্রণয়ন করা ও প্রণীত আইনকে কার্যকর করা। রাষ্ট্রের কার্য-কলাপসমূহের ব্যাখ্যা এই পদ্ধতি অনুসারে করিলে, আইনের গণ্ডীর বাহিরে সামাজিক যাহা কিছু আছে তাহা সবই বাদ পড়িয়া যায়। এই কারণে এই পদ্ধতি সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট।

(৮) আইনমূলক পদ্ধতি সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট

(৯) **মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি (Psychological Method) :** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ, তাহার দলগঠনপ্রণালী এবং জনমতগঠন প্রভৃতি। কিন্তু এই সকল বিষয়ের আলোচনাকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অনেক সময় এই পদ্ধতির ব্যবহার করিয়া থাকেন। আবার মনোবিদ্যার সূত্র অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাও করা হয়। মানুষের কর্মের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য থাকে তাহার ব্যাখ্যা করে মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলি আলোচনা করিলে জানা যায় কিভাবে সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী প্রভাবান্বিত হয়; গৃহযুদ্ধ ও

(৯) মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি বর্তমানে কার্যকর নহে

* In regards the state primarily as a corporation or juridical person and views Political science as a science of legal norms.—*Garner*.

আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহের কারণগুলি মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়।

অধ্যাপক গার্নারের মতানুসারে সমাজবিজ্ঞানমূলক, জীববিদ্যামূলক এবং মনোবিদ্যামূলক—এই তিনটি পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের উপযুক্ত পদ্ধতি নহে। এই পদ্ধতিগুলি কতকগুলি বাহ্যসাদৃশ্য বর্ণনার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে. বাহ্যসাদৃশ্য বর্ণনা করিলেই অভিন্নতা প্রমাণ করা যায় না। অভিন্নতা এই প্রকারে প্রমাণ করাও সম্ভব নহে। অভিন্নতা প্রমাণ করিবার নিয়ম হইল, জীবদেহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সকল অপরিহার্য বিষয়সমূহের সমতা রহিয়াছে তাহা দেখানো।

আবার এই পদ্ধতিগুলি রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। অতএব এই পদ্ধতিগুলি এক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র।

(১০) **দর্শনমূলক পদ্ধতি (Philosophical Method)**: এই পদ্ধতি অনুসারে প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি মনঃকল্পিত ধারণা করা যায়। এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কর্তব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি স্থির করা হয়। আবার এই স্থিরীকৃত নীতিগুলির সহিত রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতির সমর্থক হইলেন **রুশো, মিল** প্রভৃতি মনীষিগণ।

(১০) দর্শনমূলক পদ্ধতি

এই পদ্ধতির প্রয়োগবিধি বাস্তব রাজনৈতিক জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য হইবার ফলে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক সময় ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণে বর্তমানে এই পদ্ধতির ব্যবহার খুবই বিরল।

সমালোচনা: উপরে দশটি অনুসন্ধান পদ্ধতি আলোচনা করা হইয়াছে। এই অনুসন্ধান পদ্ধতিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহাদের ব্যবহার এককভাবে করা বিশেষ বিপজ্জনক। ফলে এককভাবে এই পদ্ধতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাইতে হইলে এই পদ্ধতিগুলিকে কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। অন্যথায়, আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাইবে না। উদাহরণস্বরূপে বলা যায়, ঐতিহাসিক পদ্ধতির ব্যবহারকালে তুলনামূলক পদ্ধতি ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ না করিলে আশাপ্রদ ফললাভ হইবে না। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাইতে হইলে এবং এই সূত্রগুলির সাহায্যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে বিভিন্ন অনুসন্ধান পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব।

অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক

(Relation of Political Science to other Sciences)

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান—এই দুইভাগে মানুষের জ্ঞানকে বিভক্ত করা যায়। মানুষ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে, সেই পরিবেশের বিশ্লেষণ করে **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান** (Natural Science), আর সমাজবদ্ধ মানুষের সমাজ-জীবনের

আলোচনা করে সামাজিক বিজ্ঞান (Humanistic Science)। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয় প্রাণিবিদ্যা, ভূবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি। আর সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সকল বিজ্ঞানই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। এইজন্য বর্তমান আলোচনায় সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত প্রাণিবিদ্যা ও ভূ-বিজ্ঞান মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রাণিবিদ্যা আলোচনা করে প্রাণীহিসাবে মানুষের শরীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্য প্রভৃতি—আর ভূ-বিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের বাসভূমির আয়তন, অবস্থান, জলবায়ু ও সম্পদ প্রভৃতি, যাহা মানুষের কার্যাবলীর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আবার সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন, নীতিশাস্ত্রে আলোচিত হয় মানুষের নৈতিক জীবন, আর ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানুষের আর্থিক জীবন। এই ভাবে মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা কোন না কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এবং সকল সামাজিক বিজ্ঞানে হইয়া থাকে বলিয়া ইহারা সকলে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

কতিপয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সকল মানবীয় বিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

এই প্রসঙ্গে সিজউইকের (Sidgwick) মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়। সিজউইক একস্থানে বলিয়াছেন যে, কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা লাভ করিতে হইলে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত আলোচ্য শাস্ত্রের সম্পর্কটি ভালোভাবে বুঝিতে হইবে। আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে, কোন শাস্ত্র অপরাপর শাস্ত্র হইতে কতখানি দান গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্তব্য কতদূর সত্য তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন, তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ, অন্যান্য বিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের জীবন। মানবজীবনের বিভিন্ন দিক আবার পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা কালে অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই সম্পর্ককে দুই দিক হইতে দেখানো যাইতে পারে; যথা—(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত প্রাণিবিদ্যা এবং ভূ-বিজ্ঞান প্রভৃতির সম্পর্ক এবং (খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ধনবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির সম্পর্ক।

কতিপয় প্রাকৃতিক ও সকল সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত

(ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত : (১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূ-বিজ্ঞান (Political Science and Geography) : মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের আলোচনা করে ভূ-বিজ্ঞান। মানুষের বাসস্থান, তাহার আয়তন ও অবস্থান, তাহার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি যাহা মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে, তাহা ভূগোল-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রের প্রকৃতি, শক্তি, কার্যাবলী অনেকাংশে তাহার ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এ্যারিস্টটল, বোদ্যাঁ (Bodin), রুশো, মঁতেসকিউয়ে ও বাকল প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখায় ভৌগোলিক

ভৌগোলিক অবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি

পরিবেশের সহিত মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এ্যারিস্টট্‌ল এই মত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণের চরিত্র অনেকটা তাহার ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। রুশোর লেখায়ও দেশের জলবায়ুর সহিত সরকারের বিভিন্ন প্রকৃতির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উষ্ণ জলবায়ুতে স্বেচ্ছাচারিতা, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে কাম্য শাসন-ব্যবস্থা, এবং শীতপ্রধান দেশে বর্বতার উদ্ভব হয়। মঁতে-স্কিউয়ে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শীতপ্রধান দেশে মানুষ বেশী কাজ করিতে পারে: গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষ অলস প্রকৃতির হয়। ফলে শীতপ্রধান দেশের লোক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক স্বাধীনতা হারায়। আবার সমতল দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা সহজ হয় না। পার্বত্যদেশে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার প্রাকৃতিক সুযোগ অধিকতর। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে গণতন্ত্র এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে রাজতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হওয়া উচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে থমাস্ বাক্‌ল (Buckle) তাঁহার 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে এই মন্তব্য করেন যে, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাব অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অনেক বেশী। বাক্‌লের এই মত অন্যান্য বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমর্থন করেন।

এই সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মত যদিও অতিশয়োক্তি-দোষে দুষ্ট, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক বিষয়সমূহের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। আবার ইহাও সত্য যে, অতীতে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাব যতটা ছিল, বর্তমানে আর ততটা নাই। বর্তমানে মানুষ প্রকৃতিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহায়তায় অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।

(২) **প্রাণিবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Zoology and Political Science):** মানুষ অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় এক প্রকারের প্রাণী। প্রাণিবিদ্যা প্রাণীহিসাবে মানুষের দেহতত্ত্বের (anatomy) আলোচনা করে। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, জাতি, বংশগতি প্রভৃতি বিষয়ও প্রাণিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার এই মনুষ্য প্রাণী যখন সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করে, তখনই সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রয়োজন হয় মানুষের জন্ম, মৃত্যু, জাতি ও বংশগতি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য। উত্তরাধিকারের আইন, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনায় প্রাণিবিদ্যা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। অতএব দেখা যায়, প্রাণিবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকেরা রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যায় প্রাণিবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবর্তনবাদের আবিষ্কারক ডারউইন-এর সময় হইতে এই নীতি বিশেষভাবে অনুসৃত হয়। ডারউইন-এর বিবর্তনবাদ সমগ্র চিন্তা-জগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিবর্তনবাদ অনুসারে (Theory of Evolution) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে জৈব মতবাদের (Organic Theory) উদ্ভব হইয়াছে তাহাও বিবর্তনবাদের প্রভাবাধীন। জৈব মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র প্রাণীর ন্যায় জন্মায়, বাড়ে ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই মতবাদের সমর্থক

প্রাণিবিদ্যা প্রাণী-হিসাবে মানুষের দেহ-তত্ত্বের আলোচনা করে

হইলেন ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) ও জার্মান দার্শনিক ব্লুন্টস্‌লী (Bluntschly) এবং আরও অনেকে। এই সকল দার্শনিকদিগের মতানুসারে প্রাণিবিদ্যার সূত্রগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা চলে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে, হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতবাদ সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমর্থন করেন না। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পূর্ণ প্রাণিবিদ্যার মতো নহে।** প্রাণীদের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের যে সকল গুণ আছে, অন্যান্য প্রাণীদের তাহা নাই। মানুষ বাক্‌শক্তির অধিকারী। এই বাক্‌শক্তি তাহাকে অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক করিয়াছে। আবার মানুষ প্রজ্ঞাশীল জীব। সে চায় উন্নততর জীবন। ফলে মানুষের জীবন আলোচনার একটি স্বতন্ত্রতা আছে। অবশ্য, এই সকল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিবর্তনবাদ ও জৈববাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন তত্ত্বের ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

(খ) **সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত : (১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (Political Science and Sociology) :** সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। এই বহুমুখী জীবনের আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান। আদিম যুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের কার্যকলাপ, সংগঠন ও তাহার ক্রমবিকাশের আলোচনা করিয়া সমাজ সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র ও তত্ত্ব নির্ধারণ করে সমাজবিজ্ঞান (Sociology)। সমাজবিজ্ঞানে মানুষের সামাজিক জীবনের সকল রকম অবস্থার আলোচনা হয়। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনা হয় ; অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানে যে বিভিন্ন দিকের আলোচনা হয় তাহার মধ্যে সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন অন্যতম। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিম্নে ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা করা হইল :

(ক) সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। ইহা সমাজবদ্ধ মানুষের সমগ্র জীবনের আলোচনা করে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রের পরিধি সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রের পরিধির তুলনায় ক্ষুদ্রতর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে সামগ্রিক মানুষের শুধু রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। গিলক্রাইস্টের ভাষায় বলা যায় : "সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিজ্ঞান। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-নৈতিক সমাজের বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে সামাজিক মানুষের জীবন এবং একপ্রকার বিশিষ্ট সামাজিক সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের আলোচনাও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর বিশেষীকৃত বিজ্ঞান।*

(খ) সমাজবিজ্ঞান শুধু সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনই আলোচনা করে না। ইহা অসংগঠিত অবস্থার মানবসম্প্রদায়কে লইয়াও আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু সমাজবদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে লইয়াই আলোচনা করে।

---

* Sociology is the science of society. Political science is the science of the state or political society. Sociology studies man as a social being, and as political organisation is a special kind of social organisation, political science is a more specialised science than sociology"—*Gilchrist.*

মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন তাহার সমাজবদ্ধ জীবন অপেক্ষা নবীনতর। কারণ, রাষ্ট্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পরে সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে জন্মলাভ করিয়াছে। ফলে, সমাজবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা পুরাতন বিজ্ঞান বলা হয়।

(গ) সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয় সমাজজীবনের সূত্রপাত হইতে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইতে।

(ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক জীব হিসাবে গ্রহণ করে, আর সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের সামাজিক জীবে পরিণতি সম্বন্ধে।

উভয় শাস্ত্রের আলোচনা-ক্ষেত্রের মধ্যে এইভাবে সীমারেখা টানা গেলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে হইলে আমাদিগকে সমাজবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হইতে হয়; কারণ, সমাজবিজ্ঞানে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি সমগ্র জীবনের আলোচনা হয়। এই কারণে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে কল্পনা করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্র (The state)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বহু আলোচনায়-বিধৃত সমাজ-বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করিয়া মানুষের রাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর আলোচনা করে। এই কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে প্রথমে সমাজবিজ্ঞানী হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক গিডিংস (Giddings) বলেন: "যাঁহারা সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি জানেন না তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া, আর নিউটনের গতি সম্বন্ধে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া একই কথা।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা

আবার সমাজবিজ্ঞান উপাদান যোগায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানও উপাদান যোগায় সমাজবিজ্ঞানের। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞান হইতে গ্রহণ করে রাষ্ট্রজীবনের গোড়ার কথা এবং সমাজবন্ধনের বিভিন্ন সূত্রাবলী আর সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সংগ্রহ করে রাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতি ও কার্যাবলী প্রভৃতি। অতএব দেখা যায়, **উভয়েই উভয়ের কাছে ঋণী**।

অবশ্য, এই দুই শাস্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও গিডিংস এই মত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রের সহিত মিশিয়া যায় নাই। উভয়ের মধ্যে এক সীমারেখা টানা যাইতে পারে। ইহাই বর্তমানে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন।

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। ইহা মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজ-জীবনের আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের সামগ্রিক সমাজ-জীবন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামগ্রিক সমাজ-জীবনের একটি দিকের অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনা করে। যদিও বর্তমান যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক ও সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে আর ইহার আলোচনা চলে না, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানেরই একটি বিশেষীকৃত শাখা।

(২) ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (History and Political Seience): রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে

অতীতের ঘটনাবলী, অতীতের আন্দোলন এবং তার কারণ ও ফলাফল। ইতিহাসে আলোচিত হয় মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারা, অর্থনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তা এবং বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেন ইতিহাস হইতে। আবার এই সংগৃহীত তথ্য হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র নির্ধারণ করেন। ইতিহাস আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে উপাদান সংগ্রহ করে। সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ও তার কার্যকলাপের বর্ণনা যাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়, তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতেই গৃহীত। অতএব এই দুই শাস্ত্র পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রসঙ্গে স্যার জন সিলির (John Seely) মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। জন সিলির মতে, "**রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতীত ইতিহাস আলোচনা নিষ্ফল এবং ইতিহাস ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন।**"*

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

বর্তমান সভ্য সমাজের জন্ম সুদূর অতীতের কোন এক অজ্ঞাত দিনে হইয়াছে। সেইদিন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবসমাজের ক্রমবিকাশেরও মানবসভ্যতার বহুমুখী কাহিনীর আলোচনা ধারাবাহিক ভাবে ইতিহাসে হইয়া থাকে। আবার সমাজ বিবর্তনের বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উৎপত্তি হইয়াছে। রাষ্ট্র হইল মানব সমাজের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের কাহিনী ইতিহাস পাঠে জানা যায়। কারণ, ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাহিনী। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে তাহাও লিপিবদ্ধ হয় ইতিহাসে। বর্তমান মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন বহু অভিজ্ঞতায় পুষ্ট। ইতিহাস পাঠ করিয়া মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাহার ভিত্তিতেই সে নূতন সমাজ গড়িয়া তোলে। ইতিহাসের সহায়তা ছাড়া বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন ও তাহার কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করা সম্ভব নয়। এই কারণেই জেলিনেক বলিয়াছেন যে শুধু রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও কার্যকলাপের অনুধাবনের জন্যও ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে। অতএব দেখা যায়, ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বহু উপাদান সরবরাহ করে।

সমাজবিবর্তনের ধারাবাহিক আলোচনা ইতিহাস হইতে জানা যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা উদ্দেশ্যমূলক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার উদ্দেশ্য হইল বর্তমান রাষ্ট্রের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করিয়া সংশোধনের উপায় নির্ধারণ করা। বর্তমানকে সমালোচনা করিতে হইলে প্রয়োজন হয় ঐতিহাসিক তথ্যের। কারণ, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যতীত বর্তমানের রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসন-পদ্ধতির স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, বর্তমান কালের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলিকে বুঝিতে হইলে অতীতকালের সমস্যাবলীর সহিত তুলনা করিয়াই বুঝিতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র নির্ধারণ করেন। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, যত বেশী তথ্য সংগৃহীত হইবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আলোচনা ততই গভীর হইবে।

স্টা: বি

---

*"History without Political Science has no fruit,
Political Science without History has no root."—*John Seely.*

এই কারণেই সম্ভবত উইলোবী (Willoughby) বলিয়াছেন: "ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীরত্ব দান করে।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার উদ্দেশ্য হইল আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই তত্ত্বসন্ধানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজন হয়। আবার ইতিহাসের আলোচনার উদ্দেশ্য হইল আদর্শ সমাজপ্রতিষ্ঠা করা এবং অতীতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়া মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। ইতিহাসের এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে যদি কংগ্রেস ও আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস বাদ দেওয়া যায়, তবে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইবে। অতএব নিঃসন্দেহে গেটেলের ভাষায় বলা যায়, "বস্তুতপক্ষে, উভয়ের আলোচনাই পরস্পর সহায়ক ও পরিপূরক।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার উদ্দেশ্য হইল আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা

সাম্যবাদী নীতির প্রবক্তা কার্ল মার্কসের (Karl Marx) সকল রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তই ইতিহাস-ভিত্তিক। মার্কস এই মত পোষণ করেন যে, সমাজের এক একটা স্তরে ক্রমবিবর্তনের ফলে এক বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই রাষ্ট্র ও সমাজের গতি নির্ণয় করে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত বটে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনা-ক্ষেত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে এই পার্থক্যগুলিকে বর্ণনা করা হইল:

(১) ইতিহাসের সবটাই প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি নহে। ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় কলা, সাহিত্য, আচার-ব্যবহার, রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাবলী। অতএব দেখা যায় যে, এই বিরাট আলোচনা-ক্ষেত্রের সবকিছুই রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রহণ করে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শুধু সেই সকল মূলতথ্যই সংগ্রহ করেন যাহা রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে। এই প্রসঙ্গে লিয়াককের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: "ইতিহাসের কিছুটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ (সবটা নয়)"।*

(২) আবার ইহাও বলা হয় যে, "ইতিহাস অতীতকালের রাষ্ট্রনীতি। আর রাষ্ট্রনীতি বর্তমান কালের ইতিহাস" (History is the past politics and politics is the present History.)। কিন্তু এই উক্তিটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু কোন এক সময়ের মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচনাই করে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেরও ইংগিত দিয়া থাকে এবং অতীত ও বর্তমান রাষ্ট্রের সমালোচনা করাই ইহার বিষয়বস্তু নহে ইহা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি রকম হওয়া উচিত তাহারও কাল্পনিক চিত্র রচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই কল্পনাপ্রসূত চিত্র অঙ্কন এবং দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা ঐতিহাসিকদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বার্কার বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমন অনেক মতবাদ আছে যাহা ইতিহাসভিত্তিক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্লেটোর সাম্যবাদ তৎকালীন গ্রীক নগররাষ্ট্রের বাস্তব বর্ণনা নয়। ইহা

* "Some history is part of Political Science"—*Leacock*.

একটি আদর্শ মাত্র। অবশ্য ইতিহাসের পটভূমিকায় যদিও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, তথাপি ইহা অস্বীকার করিতে হইবে যে, এমন অনেক রাষ্ট্রচিন্তা আছে; যাহা শুধু কল্পনা-প্রসূত। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের ন্যায় কি হওয়া উচিত তাহারও নির্দেশ দিয়া থাকে। অতএব সিলীর উক্তি যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস পরিশেষে পরস্পর সাদৃশ্যসম্পন্ন হইবে, তাহাও ঠিক নয়।

(৩) ইতিহাসের আলোচনা-ক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপক। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি ইতিহাসের তুলনায় ক্ষুদ্রতর। ইতিহাসের আলোচনা তথ্যবহুল আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা তত্ত্ববহুল। আলোচনা-ক্ষেত্রের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই দুই শাস্ত্র বিশেষভাবে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড ব্রাইসের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লর্ড ব্রাইসের ভাষায় বলা যায়, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি" অতীত ও বর্তমানের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। ইহা ইতিহাস হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া অন্যত্র তাহা ব্যবহার করে।*

উপসংহারে বলা যায়, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইলেও বর্তমানে ইহাদের স্ব-স্ব আলোচনা-ক্ষেত্রের পরিধি এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, এই দুই শাস্ত্রের আলোচনা-ক্ষেত্র পরস্পর হইতে অনেকাংশে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

(৩) **ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Economics and Political Science) :** প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকদের যুগ হইতে শুরু করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাবীরদিগের সময় পর্যন্ত ধনবিজ্ঞানকে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হইত না। গ্রীক্ দার্শনিকগণ ইহাকে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থবিদ্যা (Political Economy) হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণায় পারিবারিক অর্থ-ব্যবস্থার মতোই রাষ্ট্রের এক অর্থ ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্র এই অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া শক্তিশালী করে। তাঁহারা মনে করিতেন, ধনবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রনৈতিক অর্থব্যবস্থা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মতবাদই বিশেষভাবে চালু ছিল। ঐ মতের পশ্চাতে এই যুক্তি ছিল যে, রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হয় : এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হয় বলিয়া রাষ্ট্রের প্রভূত রাজস্বের প্রয়োজন। অতএব ধনবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি এবং রাষ্ট্রের রাজস্ববৃদ্ধির বিভিন্ন উপায়। এইজন্য পূর্বে ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের অর্থ-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইত।

অর্থবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য দুইটি ; যথা,—(ক) শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব আদায় করার নীতি নির্ধারণ করা ; (খ) জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য যাহাতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা যায় তাহার বিবিধ উপায় নির্ধারণ করা। সংক্ষেপে বলা যায়, রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে ধনশালী করিয়া তোলাই অর্থবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য।

* "Political Science stands midway between history and politics, between the past and present. It has drawn its materials from the one, it has to apply them to the other"—*Bryce.*

উপরি-উক্ত ধারণাগুলি বর্তমানে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এই শাস্ত্রের আলোচনা রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বর্তমানে ধনবিজ্ঞান অর্থ-ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিময় ও বণ্টন-সংক্রান্ত সমস্যা লইয়া আলোচনা করে। ধনবিজ্ঞানের এই সমস্ত বিষয়ের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়। অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পৃথকভাবে আলোচিত হইলেও ইহারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই দুই শাস্ত্রই মানুষের সমাজ-জীবনের কাজ-কারবার লইয়া আলোচনা করে। আবার উভয়েরই লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধন করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেশের শান্তিরক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করে। আবার দেশের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা দেশের শান্তিরক্ষার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। আবার ধনোৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে দেশের শান্তি। কারণ ধনের বণ্টন-ব্যবস্থায় অসাম্য দেখা দিলে অন্তর্বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা থাকে। ধনোৎপাদন ব্যাহত হইলেও সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

বর্তমানে এই দুই শাস্ত্র পৃথকভাবে আলোচিত হইলেও ইহারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত

অতএব দেখা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু ধনবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুকে যেমন প্রভাবান্বিত করে, সেইরূপ ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়কে প্রভাবিত করে। সুতরাং ইহারা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র। পূর্বে ছিল পুলিস রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল শান্তিরক্ষা করা। অতএব ধন-বিজ্ঞানের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্র হইল কল্যাণকর রাষ্ট্র। এই কল্যাণকর রাষ্ট্র সমাজের সঠিক উন্নতি বিধান করে। রাষ্ট্র আজ নিজেই ব্যবসা করে, ধনোৎপাদনক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই রাষ্ট্রের আলোচনা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একদিকে করধার্য করিয়া কিভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহারও আলোচনা করে। ইহা ছাড়া আর্থিক অবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মৌলিক তত্ত্ব আলোচনা করে।

অতএব দেখা যায়, অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ও তার নীতি-নির্ধারণে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত সমভোগবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানেরও আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। উপসংহারে বলা যায়, এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইহারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

(৪) **নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Ethics and Political Science) :** প্রাচীন দার্শনিকগণ নীতিশাস্ত্রকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে নীতিশাস্ত্রই মূল শাস্ত্র, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তাঁহারা শাখারূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। প্লেটো তাঁহার **রিপাবলিক (Republic)** গ্রন্থে যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা নৈতিক আদর্শ-ভিত্তিক। এ্যারিস্টট্‌ল তাঁহার **রাষ্ট্রনীতি (Politics)** গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন যে, মঙ্গলময় সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানুষের এই সুন্দর জীবনের মধ্য দিয়াই মূর্ত হইয়া উঠে। রাষ্ট্রই নাগরিকের চরিত্র নির্ণয় করে। সুরাষ্ট্রের মধ্যেই সুনাগরিকের

সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলসূত্রগুলি নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হইত।

শুধু প্রাচীন গ্রীসেই রাষ্ট্রাদর্শ নৈতিক আদর্শভিত্তিক ছিল না। প্রাচীন ভারতের গ্রন্থসমূহেও দেখা যায় প্রাচীন ভারতে রাজা ও প্রজার দায়িত্ব ও কর্তব্য নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হইত। রাষ্ট্রের এই নৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মেকিয়াভেলি (Machiavelli) সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনীতিকে নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক্ করিয়া সুবিধাবাদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বল-প্রয়োগের মতবাদ, সামাজিক চুক্তির মতবাদ প্রভৃতি প্রচারের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। মেকিয়াভেলির পরবর্তী কালে হবস, লক, রুশো প্রমুখ দার্শনিক তাঁহাদের সামাজিক চুক্তির মতবাদ প্রভৃতি প্রচার করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে রূপদান করেন। কিন্তু ইহা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হিসাবে পরিগণিত হইলেও ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ও মিল সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ

(১) নীতিশাস্ত্র আলোচনা করে মানুষের মনের চিন্তা ও তাহার বাহ্যিক আচরণের। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে শুধু বাহ্যিক আচরণের। মনের চিন্তা লইয়া তাহার কারবার নহে। আবার মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণের।

(২) নীতিশাস্ত্রের নীতি ন্যায়-ভিত্তিক—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি ন্যায়-অন্যায়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। ইহা রাষ্ট্রের সুবিধা (expediency) দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

(৩) নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ব্যাপক, কারণ ইহা মানুষের সমগ্র জীবনের আলোচনা করে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে শুধু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রের কার্যাবলী প্রভৃতি। অতএব দেখা যায়, নীতিশাস্ত্রের তুলনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু সংকীর্ণতর।

(৪) নীতিশাস্ত্রের নীতিপালন বাধ্যতামূলক নহে; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আইন বাধ্যতামূলক। পিতা-মাতাকে ভক্তি না করিলে দৈহিক শাস্তি পাইতে হয় না, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘনকারীকে দৈহিক শাস্তি পাইতে হয়।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য একই হওয়ায় উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। উভয় শাস্ত্রই মানুষকে সুন্দর করিয়া গড়িতে চায় এবং মানুষকে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে অবহিত করে। রাষ্ট্র যে সকল আইন প্রণয়ন করে, তাহার বৈধতা নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে স্থির করা হয়। রাষ্ট্র-প্রণীত আইন যদি নীতি-বিরুদ্ধ হয়, তাহা জনগণ মান্য করিতে চায় না। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হইল সুনাগরিক সৃষ্টি করা। এই ভাবে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া জনমতের পরিবর্তন সাধন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বে ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল

এবং উহা নীতিশাস্ত্র-সম্মত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু পরে যখন রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া এই প্রথা রদ করে, তারপর ধীরে ধীরে জনগণের নৈতিক জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে সতীদাহ প্রথাটি নীতি-বিগর্হিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ-সাধনকারী সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রমাত্রই নৈতিক আদর্শ-ভিত্তিক। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক আইভর ব্রাউন একস্থানে বলিয়াছেন যে, নীতিশাস্ত্রের ধারণাসকল প্রতিফলিত না হইলে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ অর্থহীন, আবার রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ-বর্জিত নৈতিক মতবাদ অসম্পূর্ণ। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল এমন এক সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারে। এই আদর্শকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র যে সকল কার্য করে তাহার অধিকাংশই নীতিশাস্ত্রের নির্দেশে সম্পাদিত হয়। অতএব, ইহা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতি-শাস্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

নীতিশাস্ত্রের নৈতিক আদর্শ যখন মানুষের আচার ও ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং উহা সমাজবদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রীতি-নীতি হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহা মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজে যখন নীতিশাস্ত্রের সূত্রগুলি বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন আবার এইগুলি আইনরূপেও প্রণীত হয়। রাষ্ট্র-প্রণীত আইন যদি নৈতিক আদর্শ-বর্জিত হয়, তবে তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। অধ্যাপক গেটেলের ভাষায় বলা যায়, রাষ্ট্রের কার্যাবলী নির্ধারিত হয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মঙ্গলসাধনের জন্য নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। সুতরাং দেখা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এবং ইহা আশা করা যায়, এই সম্পর্ক চিরকাল থাকিবে। কারণ অন্যথায় নৈতিক আদর্শ-বর্জিত সমাজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে।

(৫) মনোবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Psychology and Political Science): মানুষ অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে অনেক কাজ করে। মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের সেই সকল কার্যাবলীর, যাহা মানুষ ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া করিয়া থাকে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী। এই রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে কতকগুলি আবার মানুষ ভাবের আবেগে করিয়া থাকে। এই ভাব-ভিত্তিক ও উত্তেজনা-প্রসূত কার্যাবলীও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। বর্তমান রাষ্ট্র-কাঠামোগুলি সাধারণত গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। এক কথায় বলা যায়, বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জনমতের উপর নির্ভরশীল। এইজন্য জনমতকে ব্যক্ত করিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। জনমত আবার মানুষের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই কারণে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বের অনুধাবন প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব

রাষ্ট্রের প্রতিভূ হইল সরকার। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের মানসিক ধারণা ও নৈতিক বিশ্বাসের উপর। মনোবিজ্ঞান পাঠ করিয়া মানুষের মানসিক ধারণা সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। এইজন্য, প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে মানুষের মানসিক ধারণা, মনোবৃত্তি ও ভাবপ্রবণতা সম্বন্ধে সম্যক্

জ্ঞানলাভ করিতে হয়। অন্যথায়, তাহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এই কারণেই লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় আছে মনোবিজ্ঞানের মধ্যে"।*

বর্তমানে জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়বস্তু। এই জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধানের সূত্রগুলি মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। মানুষের ভাবপ্রবণতা, মনোবৃত্তি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের গৌরব যাহা মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়, তাহাই জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা। অতএব দেখা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে নিকট সম্পর্ক আছে।

আবার দল ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় না। এই দলগঠনের পশ্চাতে মানুষের মনের ভাব ও সহজাত প্রবৃত্তি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনস্তত্ত্বের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

আধুনিক যুগে দলগঠনে, সেনাবাহিনী গঠনে, বিচারালয়ে বহু মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বার্কারের মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন: "রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাবলীর ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানের সমাধানসমূহের ব্যবহার যেন বর্তমান দিনের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" বেজহট (Bagehot), ম্যাকডুগাল (McDougall), লেবঁ (Le Bon), গ্রাহাম ওয়ালাস্ (Graham Wallas), স্পেনসার প্রভৃতি আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ দেশের শাসন-ব্যবস্থার উপর মনস্তত্ত্বের প্রভাব ও গুরুত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন সংস্কারের দাবিতে যে গণআন্দোলন শুরু হয়, তাহা কি ভাবাবেগ প্রসূত, না সত্যই কোন প্রকৃত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা-সম্ভূত তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। এই বিশ্লেষণকার্যে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান বিশেষভাবে সহায়তা করে। আবার বিভিন্ন দেশের শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্যের পশ্চাতে রহিয়াছে সংশ্লিষ্ট দেশের গঠন, প্রকৃতি ও মনোভাবের পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুইজারল্যাণ্ড বা ইংলণ্ডে যে শাসন-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা অন্য দেশে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। কারণ অন্য দেশের জনসাধারণের গঠন, প্রকৃতি ও মনোভাবের সহিত এই দুই দেশের জনসাধারণের গঠন, প্রকৃতি ও মনোভাবের পার্থক্য আছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কালে মনস্তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে বলা যায়, মনোবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বটে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে অবস্থার আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে আদর্শের। মনোবিজ্ঞান রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ঔচিত্য বা অনৌচিত্য লইয়া আলোচনা করে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে অবস্থা ও আদর্শের এবং নির্দেশ দেয় কি হওয়া উচিত বা কি হওয়া উচিত নয়। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজন অনুসারে তাহার ব্যবহার করে কিন্তু অন্ধভাবে তাহা অনুসরণ করে না।

(৬) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইন (Political Science and Inter-

---

* "Political Science has its roots in Psychology."—*Bryce.*

national Law) : সমাজজীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিই পরস্পর নির্ভরশীল। একের সহিত অন্যের সম্পর্ক রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের সম্পর্ক যেমন রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেইরূপ আন্তঃরাষ্ট্রের সম্পর্কও কতকগুলি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তর্জাতিক আইন হইল সেই সকল আইন যাহা এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্রের বহির্মুখী কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং এই বহির্মুখী কার্যকলাপের একটা আদর্শ মান স্থির করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার; এবং রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কও নির্ণয় করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আদর্শ রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার দুইটি দিক আছে। একটি হইল জাতীয় আর অপরটি হইল আন্তর্জাতিক। বর্তমান যুগে মানুষের জীবন বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। কর্মের ক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হইয়াছে, অন্যদিকে মানুষের জীবনও সেইরূপ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। একাধারে মানুষ যেমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সমস্যা লইয়া বিব্রত, তেমনি আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে শুধু রাষ্ট্রের গণ্ডীর ভিতর সে আর বন্ধ থাকিতে পারে না। আন্তর্জাতিক সমস্যা লইয়াও তাহাকে আলোচনা করিতে হয়। শুধু আলোচনাতেই তাহার কার্যকলাপ সীমাবন্ধ থাকে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা তাহার ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার উপর প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে। এইজন্যই বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীরও আলোচনা করে।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করিতে হইলে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে, অপরদিকে আবার আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক স্থাপনের একটি আদর্শ মান ঠিক করিতে হইবে। এই আদর্শ মান স্থির করিতে হইলে পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই ইহা করিতে হইবে। সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে বলা যাইতে পারে, আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগ। এই যুগে প্রতিটি মানুষই আন্তর্জাতিক আইনের আওতার মধ্যে বাস করে। অতএব এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং এক দেশের অধিবাসীর সহিত অপর দেশের অধিবাসীর সম্পর্ক যে আইন দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহা যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় আইনগুলির মতো আন্তর্জাতিক আইনগুলি অতটা সুস্পষ্ট নয় এবং অতটা সহজে বলবৎ করা যায় না।

(৭) **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্র (Political Science and Jurisprudence) :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার বিধিসমূহ ও রাষ্ট্রের শাসনকার্য প্রভৃতি। রাষ্ট্র দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কতকগুলি আইনকানুন প্রণয়ন করে। ব্যবহারশাস্ত্রে আলোচিত হয় রাষ্ট্রপ্রণীত এই সকল আইনকানুন এবং ইহাদের প্রয়োগবিধি। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

বর্তমান রাষ্ট্র হইল সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র; রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে তাহার সমাজ-কল্যাণকর কার্যগুলি করিয়া থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই সমাজ-কল্যাণকর আইনগুলির

আলোচনা করে। ব্যবহারশাস্ত্র এই আইনগুলির প্রকৃতি আলোচনা করে। অতএব দেখা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রের পরিধির মধ্যেই রহিয়াছে ব্যবহার-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্যবহারশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সংকীর্ণতর এবং এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ঃ রাষ্ট্র—ইহার আলোচনা-ক্ষেত্র বিশেষ ব্যাপক। ইহা রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক ও সম্পর্কের আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা, স্বরাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের গঠন ও প্রকৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও কার্যাবলী রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী প্রভৃতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সরকারকে লইয়াও আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অতীত ও বর্তমানকে আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠে মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা-বোধ জাগ্রত হয়।

নামকরণঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই শাস্ত্রটিকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেন; যথা—রাষ্ট্রনীতি (Politics), রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy), রাষ্ট্রতত্ত্ব (Theory of the State), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)। বর্তমানে ইহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিয়াই আখ্যায়িত করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায় কি না?—এই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একমত নহেন। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়া থাকেন। অবশ্য, ইহা বিজ্ঞানপদবাচ্য হইলেও ইহা বিজ্ঞান নহে। প্রকৃতপক্ষে কোন সামাজিক বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নহে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতিঃ (১) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, (২) পর্যবেক্ষণ-মূলক পদ্ধতি, (৩) পরিসংখ্যান-মূলক পদ্ধতি, (৪) তুলনামূলক পদ্ধতি, (৫) ঐতিহাসিক পদ্ধতি, (৬) জীববিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতি, (৭) সমাজবিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতি, (৮) আইনমূলক পদ্ধতি, (৯) মনোবিদ্যা-মূলক পদ্ধতি, (১০) দর্শনমূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলি এককভাবে অবলম্বন করা বিশেষ বিপজ্জনক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির সন্ধান পাইতে হইলে বিভিন্ন অনুসন্ধান পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্কঃ এই সম্পর্ককে দুইদিক হইতে দেখানো যায়; যথা—(১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক, (২) সামাজিক বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়—ভূ-বিজ্ঞান আর প্রাণিবিদ্যা। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়—সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক আইন ও ব্যবহারশাস্ত্র।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূ-বিজ্ঞানঃ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন একমাত্র ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না। অবশ্য, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক বিষয়সমূহের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকারও করা যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যাঃ এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে কতকটা সঙ্গতি আছে; কিন্তু উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানঃ সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখারূপে কল্পনা করা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস : উভয় শাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক হইলেও ইতিহাসের সবটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নহে এবং সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস নহে। অবশ্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইতিহাসের কিছুটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ। কিন্তু সমগ্র বস্তু উহার অংশ অপেক্ষা বৃহত্তর। অতএব অংশকে সমগ্র বলিয়া ভুল করা সমীচীন নহে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা : পূর্বে অর্থবিদ্যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র বলিয়া ধরা হইত। কিন্তু বর্তমানে উভয় শাস্ত্র স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন হইলেও ইহাদের সম্প্রর্ক ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান : এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র : রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শমূলক বিজ্ঞান। নৈতিক-ভিত্তির উপরই ইহা দাঁড়াইয়া আছে। ফলে এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইন : রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের আলোচনা করে। আর আন্তর্জাতিক আইন আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের নীতি নির্ধারণ করে। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ব্যবহারশাস্ত্র : রাষ্ট্র শান্তি রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন করে ব্যবহারশাস্ত্র সেই আইন ও তাহার প্রয়োগ বিধির আলোচনা করে। ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

৩

মানব ও সমাজ
(Man and Society)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শুধু রাষ্ট্র ও তার সার্বভৌমিকতা এবং সরকার লইয়াই আলোচনা করা হয় না ; সামাজিক আচার-আচরণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাস্তবধর্মী কার্যকলাপ, পরিসংখ্যান ও তথ্যের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ অতীতের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের "রাষ্ট্র" এবং সমাজ-বিজ্ঞানের "সমাজ" এই দুয়েরই আলোচনা আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হইয়া থাকে। অতএব বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) এবং সমাজবিজ্ঞান (Sociology) পরস্পরের অঙ্গীভূত হইয়াছে। সমাজকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রসম্বন্ধে আলোচনা করা যায় না ; ইহার কারণ রাষ্ট্র হইল অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজদেহ হইতেই তাহার উৎপত্তি। গিলক্রাইস্টের ভাষায় সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে সামাজিক মানুষের জীবন এবং একপ্রকার বিশিষ্ট সামাজিক সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের আলোচনাও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর বিশেষীকৃত বিজ্ঞান।* এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা করিবার সময় সমাজবিজ্ঞানের কিছুটা ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(১) সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মানব সমাজ (The Human Society) ঃ মানব সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে (ক) মানুষের জন্ম ও (খ) সমাজের জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। মানব সমাজের সৃষ্টিকর্তা হইল মানুষ। নিচে সেই মানুষের জন্ম সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে।

মানুষের উদ্ভব ঃ মানুষের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করা হইয়াছে। প্রাচীন **বাইবেল** (Old Testament) ধর্মগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর প্রথম পুরুষ আদম (Adam) এবং প্রথম নারী ঈভকে (Eve) সৃষ্টি করিয়া উদ্যানে ছাড়িয়া দিলেন। তাহাদের বাগানের কোন একটি ফল খাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল, কারণ ঐ ফলটি খাইলেই তাহাদের পতন ঘটিবে। কিন্তু শয়তানের (Satan) প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া তাহারা ঐ ফলটি খায়, ফলে তাহাদের পতন ঘটে। তাহারা আর স্বর্গের উদ্যানে বাস করিতে পারে না, তাহারা পৃথিবীতে নামিয়া আসে। তাহাদের সন্তান সন্ততিদের লইয়াই মানব জাতির উদ্ভব হয়।

(২) মানুষের উদ্ভব

ডারউইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতে মানুষ দীর্ঘ বিবর্তনের ধারা বহন করিয়া জন্মলাভ করিয়াছে। হঠাৎ একদিন খেয়ালের বশে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন নাই। জীব জগতের বিবর্তনের মধ্যেই মানুষের উদ্ভব খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

"Sociology is the science of society. Political science is the science of the state, or political society. Sociology studies man as a social being, and as political organisation is a special kind of social organisation, political science is a more specialised science than sociology"—*Gilchrist.*

মানুষের পূর্ব-পুরুষদের সামাজিক প্রবৃত্তির দরুনই মানবজাতির উদ্ভব হইয়াছে ; জন্মগতভাবেই মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তি আছে। এই সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তির দরুনই মানব সমাজের উদ্ভব হইয়াছে। যে সকল জীবের এই সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তি নাই তাহারা পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে। পুরুষের সহিত নারীর মিলন প্রাকৃতিক সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তির নজির। মানুষ পূর্ব-পুরুষের নিকট হইতে সামাজিক প্রকৃতি অর্থাৎ সংঘবদ্ধতার প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতা অথবা সামাজিক প্রকৃতি হইল **মানুষের উত্তরাধিকার** (heritage)। মানুষের জন্মের পরে মানুষ এই সকল প্রকৃতি আহরণ করে নাই। ডারউইন তাঁহার Origin of Species by Natural Selection নামক গ্রন্থে এইরূপ মত প্রচার করেন।

(৩) মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ ছিল অসহায় ও দুর্বল। তার জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল দুর্বিষহ। বনবনান্তরে সে ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই তাহাকে চলিতে হইত। এই প্রতিকূল পরিবেশকে দুইদিক হইতে বিচার করা যায় ; যথা (১) **প্রাকৃতিক পরিবেশ** (Physical environment) এবং (২) **অর্থনৈতিক পরিবেশ** (Economic Environment)। প্রাকৃতিক দিক হইতে মানুষকে ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, বন্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে হইত ; আবার শক্তিশালী জীবজন্তুর বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে হইত। শারীরিক গঠনের দিক হইতে মানুষ অনেক জীবজন্তুর তুলনায় দুর্বল ছিল। আবার অর্থনৈতিক দিক হইতেও মানুষকে অনেক বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইত। প্রথমে মানুষ ফসল ফলাইতে জানিত না। ফলমূল আহরণ করিয়া এবং জীবজন্তু শিকার করিয়া খাদ্য সমস্যার সমাধান করিত। কিন্তু জীবজন্তু শিকার করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। প্রতিকূল পরিবেশে ঘেরা মানুষ নিজ বুদ্ধি ও যুক্তির বলে নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই নূতন নূতন উদ্ভাবনের সাহায্যে প্রতিকূল প্রকৃতিকে নিজের বশে আনিয়া পরিবেশের পরিবর্তন করিয়াছে। এই বিরাট পরিবর্তন কোন একটি মাত্র লোকের চেষ্টা-প্রসূত ফল নয়। এই পরিবর্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে অসংখ্য মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সংঘবদ্ধতাই সমাজ জীবনের মূলভিত্তি।

(৪) পরিবেশের প্রভাব

মানুষ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তির (rationality) মালিক। অন্যান্য জীবের বুদ্ধিবৃত্তি খুব কমই আছে। ভাষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে। ভাষা ভাবের বাহন। ভাষার সাহায্যে চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ সংস্কৃতি অর্থাৎ সুন্দর জীবনের সত্তা বা প্রাণকে গড়িয়া তুলিয়াছে আর সভ্যতা অর্থাৎ সুন্দর জীবনের বহিরাবরণকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সভ্যতা বাড়িয়া গেলেও সংস্কৃতির পতন হইতে পারে, যেমন শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমাদের জীবনের বহিরাবরণের উন্নতি হইতে পারে অর্থাৎ সভ্যতা বাড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু এই সময়ে মানুষের সত্যাসত্য বিচার বোধ কমিয়াও যাইতে পারে অর্থাৎ মানুষের সংস্কৃতির পতন ঘটিতে পারে।

(৫) ভাষার সাহায্যে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ

সমাজ ও ইহার প্রকৃতি (Society and its nature) : ইতিহাস, প্রাণিতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, কোন জীবই একা বাঁচিতে পারে না। পূর্বে যে

সকল জীব একা বাস করিত তাহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে। এই পৃথিবীতে যাহারাই বাঁচিয়া আছে তাহারা কেহই একা বাস করে না। জীব হিসাবে মানুষও একা বাস করে না ; দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধভাবেই মানুষ বাস করে। মানুষ ছাড়া কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী সবাই দলবদ্ধভাবে বাস করে। এই দলবদ্ধতাই সমাজের মূল-ভিত্তি। দলবদ্ধতাকেই সমাজবদ্ধতা বলা হয়। দলবদ্ধতা ছাড়া জীব যেমন বাঁচিতে পারে না, তেমনি দলবদ্ধতা ছাড়া কোন জীবই পৃথিবীতে আসিতে পারে না। সংঘবদ্ধতার মাধ্যমেই নূতন জীবনের জন্ম হয়। যেমন, নারী ও পুরুষের মিলনের মধ্য হইতেই নূতন জীবনের জন্ম হয়। সঙ্গপ্রিয়তা মানুষের প্রকৃতিগত। ম্যাকআইভার ও পেজ বলেন, বিভিন্ন কারণে মানুষ পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্কস্থাপন করিয়া সমাজ সৃষ্টি করে ("Whenever living beings enter into willed relations with one another, there society exists."—*Maciver & Page*)। স্ত্রী ও পুরুষ জীবের মিলনের মধ্য হইতেই জন্ম নেয় নূতন জীবন। সুতরাং দলবদ্ধতা, সংঘবদ্ধতা ও মিলনের মধ্য দিয়াই সৃষ্টি হয় নূতন সমাজ। সকল জীবই সমাজ গঠন করিতে পারে। সমাজ গঠন মানুষের একচেটিয়া কারবার নয়। মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। তাই মানুষের একত্র হইয়া বাস করার মধ্য হইতেই সমাজ জন্মলাভ করে ; আবার প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ একতাবদ্ধ হয়। একজন লোকের পক্ষে তাহার সকল চাহিদা মিটানো সম্ভব নয় বলিয়া পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে তাহাকে একসঙ্গে বাস করিতে হয়। তাই একসঙ্গে বাস করার অর্থেই সামাজিক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধভাবে বাস করিবার জন্য মানুষ বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ **বিভিন্ন সংগঠনের সমবায়কেই সমাজ আখ্যা দেওয়া হয়।** আবার সমাজবদ্ধ মানুষের সহিত মানুষের বিভিন্ন প্রকারের **সমাজ সম্পর্ক** স্থাপিত হয়। এবং এই সমাজ সম্পর্ক হইতেই বহু প্রকারের প্রথা, আচার, রীতিনীতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। বহু সংগঠনের সমবায়ে গঠিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় আলোচ্য **'রাষ্ট্র'** নামক সংগঠনটি। এই রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ইহা সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য সংগঠন অপেক্ষা বলিষ্ঠতর সংগঠন। এই বলিষ্ঠতর সংগঠনের বাহ্যিক রূপ দেখিয়া অনেকে ইহাকেই সমাজ বলিয়া ভ্রম করেন। **বার্ক** (Edmund Burke) তাঁহার Reflections on the Revolution in France গ্রন্থে সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বার্ক বলেন : "সমাজ একটি চুক্তিগত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু রাষ্ট্রকেও সম্প্রদায়ের সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত ললিতকলা, সমস্ত সংগঠন এবং সমস্ত সার্থকতার অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর অন্য কোনরূপে গণ্য করা যায় না।" বার্কের এই ধরনের সমাজ সংগঠনকে সমাজরাষ্ট্র (Society State) বলা যাইতে পারে। গ্রীকদের নগররাষ্ট্র ছিল এই ধরনের সমাজরাষ্ট্র।

(৬) দলবদ্ধতাই সমাজবদ্ধতা

(৭) সমাজ হইল বিভিন্ন সংঘের সমবায়

বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্র এই দুইটি ধারণাই **'জাতি'** (Nation) শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে বর্তমানে কেহ কেহ সমাজকে **'জাতীয় সমাজ'** **(National Society)** বলিয়া আখ্যায়িত করেন। অবশ্য এই জাতীয় সমাজ শব্দটির দ্বারা যে সমাজকে বুঝানো হয়, তাহা দ্বারা মানুষের যে-কোন সংগঠনকে বুঝায় না। এই প্রসঙ্গে বার্কার বলেন, এই জাতীয় সমাজ শব্দটির দ্বারা কোন জাতি বা

সম্প্রদায়ের অন্তর্গত স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংঘের সমষ্টিকে বুঝানো হয়। বার্কার বলেন, "সমাজ বলিতে আমরা বুঝি কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংঘের সমষ্টি" ("By society, we mean the whole sum of voluntary bodies, or associations contained in the nation"—*Barker*. জাতীয় সমাজের উদাহরণ হইল অর্থনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি।

আবার অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে শুধু সমতার ভিত্তিতে সমাজ গড়িয়া উঠে না। সমতা ও বিভিন্নতা—এই উভয়ের ভিত্তিতেই সমাজ গড়িয়া উঠে।* একই জাতীয় জীব একসাথে বাস করে। বাদুড়ের ঝাঁকের মধ্যে টিয়া পাখীকে দেখা যায় না। মানুষ সর্প ও ব্যাঘ্রের সাথে বাস করিতে পারে না। তাই মানুষ মানুষের সাথেই বাস করে। এমনি ভাবে সমতার ভিত্তিতেই মিলন হয়। আর বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। মানুষের মধ্যেও সমতার ভিত্তিতে মিলন ঘটে। মানুষ সমতার ভিত্তিতেই মিলিত হয়। তবে মানুষের সমতার ভিত্তির প্রকারভেদ আছে। এই প্রকারভেদের জন্য মানুষের সামাজিক সম্পর্ক সহজ ও সরল হয় না। সমাজবদ্ধ জীবেরা যদি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ ধরনের আচরণে অভ্যস্ত হয় তবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহাকেই সামাজিক সম্পর্ক **(Social Relation)** বলা হয়। এই সম্পর্ক বাহ্যিক সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক তাহাকে বাহ্যিক সম্পর্ক বলা হয়। এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, একে অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। অবশ্য, একটির দ্বারা অপরটি প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু চেতনা ব্যতীত সামাজিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। মানব সমাজে শোষিত মানুষ যখন শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে তখনই একটি সামাজিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে দাস সমাজে দাস মালিকদের সহিত দাসদের একটি সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে একটি সচেতন সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ ছাড়া অন্য জীবদের সমাজে পরস্পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা অতিশয় সংকীর্ণ থাকে। শুধুমাত্র আহার সংগ্রহ করা, আত্মরক্ষার বিষয় এবং যৌনক্ষুধা মিটানোর বিষয়ে একে অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য সচেতন থাকে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব একে অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ সচেতন থাকে না। সমাজ সৃষ্টির মূলে ছিল মানুষের এক বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য। এই সামাজিক উদ্দেশ্য হইল সামাজিক উন্নতি। উন্নত সমাজ জীবনকে আরও উন্নত করা, জীবনকে সুন্দরতর করা এবং এই উন্নততর, সুন্দরতর জীবনের চির আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সঙ্গপ্রিয় করিয়াছে। মানুষ চায় উন্নততর জীবন, তাহার আকাঙ্ক্ষা অসীম। তাই তাহার দেওয়া-নেওয়া, পারস্পরিকতার (reciprocity) শেষ নাই। এই কারণে মানব সমাজের সামাজিক সম্পর্কের এলাকাও বড়। মানুষ প্রজ্ঞাশীল জীব। সে চায় জীবনকে উন্নততর করিতে। কিন্তু এই কাজ তাহার

(৮) মিলন ও বিভিন্নতা সংঘবদ্ধতার প্রকৃতি

(৯) সামাজিক সম্পর্ক

*"Society...depends on difference as well as on likeness"—*Maciver and Page*

একার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া সে সংঘবদ্ধ হয়। ইহার ফলে সমাজ জীবন গড়িয়া উঠে।

মানব সমাজের ক্রমবিকাশ (Evolution of Human Society): মানব সমাজের জন্ম কিভাবে হইয়াছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। প্রাচীন সমাজবিজ্ঞানীদের মতে প্রথমে পরিবারের (family) সৃষ্টি হয়, তারপর অনেকগুলি পরিবার মিলিত হইয়া এবং সম্প্রসারিত হইয়া গোষ্ঠী (clan) গঠন করে। বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানিগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রথমে পরিবার গঠন হয় নাই। তাঁহাদের মতে প্রথমেই মানুষ গোষ্ঠিতে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল, তারপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব (Private property) হইলে পরিবার গঠিত হয়। বর্তমান ধারণা অনুসারে সমাজ-জীবনের বিকাশের ধারাটি বর্ণনা করা যাইতেছে।

(১০) মানব সমাজের জন্ম

মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারাকে কয়েকটি যুগে ভাগ করিয়া দেখানো যায়; যেমন,—(১) শিকারের যুগ, (২) পশুপালনের যুগ, (৩) কৃষিকার্যের যুগ, এবং (৪) বর্তমান শিল্পের যুগ।

(১) প্রথম যুগটিকে **খাদ্য আহরণের যুগও (Food gathering Stage)** বলা হয়। এই যুগে মানুষ বন-বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। বনের নিকটেই তাহারা বাস করিত। বন-জঙ্গল হইতে তাহারা খাদ্য আহরণ করিত। শিকারলব্ধ পশুপক্ষী ও ফলমূল দলের সকলেই সমানভাবে ভাগ করিয়া ভোগ করিত। তখনও তাহারা সঞ্চয় করিতে শেখে নাই। লাঠি ও প্রস্তরখণ্ডই তাহাদের হাতিয়ার ছিল। শিকারের যুগে পারিবারিক জীবনও গঠিত হয় নাই। ব্যক্তির কোন ক্ষমতা ছিল না; ব্যক্তির পরিচয় ছিল গোষ্ঠীর একজন হিসাবে। আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই। সব সম্পত্তির মালিক ছিল গোষ্ঠীভুক্ত সকলে। এই সময়ে পরিবার প্রথাও ছিল না। গোষ্ঠীভুক্ত সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীই ছিল শিশুদের নিকট পিতামাতার মতো। এই গোষ্ঠীজীবনে গণতন্ত্র ও সাম্য প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই যুগের মানুষ সুখী ছিল না। ইহার কারণ মানুষ সর্বদা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য আহরণ করিতে পারিত না, আবার তাহারা যে খাদ্য সংগ্রহ করিত তাহা বেশীদিন ধরিয়া রাখাও সম্ভব হইত না; কারণ উহা পচিয়া যাইত। খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখা খুব অসুবিধাজনক ছিল। আবার কোনদিন কতটা খাদ্য পাওয়া যাইবে সেই বিষয়েও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। খাদ্য সংগৃহীত না হইলে সকলেই অনাহারে কাটাইত, আর বেশী খাদ্য সংগৃহীত হইলে সকলে মিলিয়া ভোজসভা বসাইত। এই সময়ে যাহা কিছু সংগৃহীত হইত তাহাই গোষ্ঠীর সামগ্রিক সম্পত্তি (Collective wealth)।

(১১ বিভিন্ন যুগে বিভক্ত ক্রমবিকাশের ধারায় (ক) শিকারের যুগ

এইরূপ অবস্থা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। গোষ্ঠীজীবনে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যাভাব দেখা দিলে মাঝে মাঝে এক গোষ্ঠীর সহিত অপর গোষ্ঠীর শিকারক্ষেত্রের মালিকানা লইয়া যুদ্ধ হইত। আবার একটি জলাশয়ের সব মাছ যখন ধরা হইয়া যায় অথবা একটি বনের সব পশুপক্ষী যখন শিকার করা শেষ হয় তখন একটি গোষ্ঠীকে স্থান পরিবর্তন করিয়া অপর গোষ্ঠী যে জলাশয়ে মাছ ধরে অথবা যে বনে শিকার করে সেই জলাশয়ে বা বনভূমিতে শিকার করিতে যাইতে হয়। ইহার ফলে

(১২) গোষ্ঠীর সহিত গোষ্ঠীর যুদ্ধের কারণ

দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে শিকার ক্ষেত্রের মালিকানা লইয়া যুদ্ধ বাধিত। এই যুদ্ধের সময় একজন গোষ্ঠীনায়ক নির্বাচিত হইত। গোষ্ঠীনায়ক প্রথমে যুদ্ধের সময় গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করিত, কিন্তু পরবর্তিকালে গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য, পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পাদন করিবার জন্য গোষ্ঠীনায়ক শান্তির সময়েও গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিত। এই গোষ্ঠীনায়ক হইতেই পরে রাজার উদ্ভব হয়।

(২) মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগ হইল **পশুপালনের যুগ**। এই যুগে মানুষ বন হইতে যে সকল পশু ধরিয়া আনিত তাহাদের সবটাই খাইয়া ফেলিত না। তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে তাহারা লালন-পালন করিত। এই পালিত পশু হইতে তাহারা দুধ, মাংস, চামড়া ও পশম পাইত। পশম দিয়া পোশাক তৈয়ার করিত, চামড়া দিয়া তাঁবু তৈয়ার করিত, আর দুধ ও মাংস খাইত। পূর্বে শিকারের যুগে খাদ্যের সরবরাহ ছিল অনিশ্চিত। আর পশু পালনের যুগে খাদ্যের সরবরাহকে নিশ্চিত করিবার জন্য পশুকে লালন-পালন করা হইত। শিকারের যুগ ও পশুপালনের যুগে মানুষ ছিল যাযাবর। কিন্তু পশুপালনের যুগে মানুষ সঞ্চয় করিতে শেখে এবং এই যুগেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়। এই যুগের সমাজকে **পশুপালক সমাজ** বলা হয়।

(খ) পশুপালনের যুগ

(৩) মানব ইতিহাসের তৃতীয় যুগ হইল **কৃষিকার্যের যুগ**। শিকারের যুগে পুরুষেরা যখন শিকার করিতে বাহির হইত স্ত্রীলোকেরা তখন অস্থায়ী বাসস্থানে থাকিয়া বীজ বপন করিত। এই বীজ হইতে যেদিন শস্য উৎপন্ন হইল সেইদিন মানব সমাজের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। চাষ-আবাদ শুরু হইয়া গেল। মানুষ তার চাষের ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তুলিল তার স্থায়ী বাসস্থান। তার খাদ্য **আহরণের জীবন (Food gathering life) খাদ্যোৎপাদনের জীবনে (Food producing life)** রূপান্তরিত হইল। মানুষ ইচ্ছানুসারে তখন খাদ্য উৎপাদন করিতে শিখিল। ফলে তাহাকে আর চাতক পক্ষীর মতো তৃষ্ণা মিটানোর জন্য বৃষ্টিপাতের অপেক্ষায় কালাতিপাত করিতে হইত না। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল আর তারই ধ্বংসাবশেষের উপর গড়িয়া উঠিল নূতন সমাজ-ব্যবস্থা। এই সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ **গৃহনির্মাণ** করিতে শিখিল। গড়িয়া উঠিল পারিবারিক জীবন। প্রচলিত হইল বিবাহ প্রথা। ইহার পূর্বে বিবাহ প্রথা বলিয়া কিছু ছিল না। এই পরিবার প্রথাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়; যথা, **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার** প্রথা এবং **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা**। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথায় মাতার কর্তৃত্ব আর পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথায় পিতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) কৃষিকার্যের যুগ

(ঘ) খাদ্যোৎপাদনের যুগ

কৃষিকার্যের যুগেই মানুষ স্থায়িভাবে একস্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করায় গ্রাম্য ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। গ্রামীণ সমাজে সকলেই কৃষিকার্য করিত না, কেহ কেহ কৃষিকার্য করিত আবার কেহ কেহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করিত। ইহার ফলে ক্রমে **শ্রমবিভাগ** দেখা দিল। আবার সকলেই যখন একই জিনিস উৎপাদন করিত না তখন পারস্পরিক অভাব মিটানোর জন্য **বিনিময়** প্রথার উদ্ভব হইল।

(১৩) মানুষের স্থায়ীভাবে বসবাস

আবার এক গ্রামে সকল সামগ্রী উৎপাদন করা হইত না বলিয়া বিভিন্ন গ্রামের

মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা প্রসারিত হইল। বিভিন্ন গ্রামের মধ্যবর্তী যে স্থানে দ্রব্য-সামগ্রী বিনিময় করা হইত তাহাকে বলা হইত **বাজার**। এই বাজারকে কেন্দ্র করিয়া **নগর (City)** গড়িয়া উঠিল। পশুপালনের যুগে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়, কৃষিকার্যের যুগে তাহা আরও সুস্পষ্ট হয়। ইহার পর শ্রমবিভাগ ও দ্রব্যবিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে ধনবৈষম্য আরও বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে একশ্রেণীর মানুষেরা ধনী হয় আর অপর শ্রেণীর মানুষেরা দরিদ্র হয়। দরিদ্র-শ্রেণীর মানুষেরা চুরি, ডাকাতি শুরু করে। তাহাদের হাত হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়। আবার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর পিতা ও মাতার অর্জিত সম্পত্তি যাহাতে পুত্র-কন্যাগণ ভোগ করিতে পারে তার জন্যও নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হয়। গ্রামসংস্থা কর্তৃক প্রণীত এই নিয়মকানুনগুলিই পরে **আইন** (Law) বলিয়া গৃহীত হয়।

এমনিভাবে ধীরে ধীরে শ্রমবিভাগ ও বিনিময় ব্যবস্থার প্রবর্তন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব এবং গ্রামীণ নিয়মকানুনের ভিত্তিতে মানুষ যে সুসংগঠিত গোষ্ঠীজীবন আরম্ভ করে তাহাকে **উপজাতি (Tribe)** হিসাবে অভিহিত করা হয়।

(১৫) উপজাতি

উপজাতির সহিত প্রায়ই যাযাবরদের যুদ্ধ হইত। এই যুদ্ধের সময় একজন যুদ্ধনায়ক সৃষ্টি করা হইত। পরে এই যুদ্ধনায়কই রাজা হিসাবে সমাজকে শাসন করিত। তাই বলা হয় যুদ্ধ হইতেই রাজার জন্ম হয় (War begot the King)। রাজার জন্মের পর রাজশক্তিকে পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজন হইল **ধর্মের** (religion)। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সমাজকে নূতনরূপে দৃঢ়সংবদ্ধ করে। রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ (Divine theorv) প্রচারিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে মর্তে রাজাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁহার আজ্ঞাই ঈশ্বরের আজ্ঞা। এইভাবে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। শিকারের যুগে অথবা পশু-পালনের যুগে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। কৃষিকার্যের যুগে দ্বন্দ্ব-মীমাংসকের ভূমিকায় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্র তাহার আইন, আদালত, আমলা প্রভৃতি লইয়া এক বিশেষ শক্তিরূপে সমাজে আবির্ভূত হয়। আর রাষ্ট্রের এই ক্ষমতার অধিকারী হয় বিত্তবান সামন্তশ্রেণী। **সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার** উদ্ভব হয়।

(ঘ) চতুর্থ যুগ হইল বর্তমান **শিল্পের যুগ**। শিল্পবিপ্লবের ফলে পুরাতন গ্রাম্য-সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর তারই ধ্বংসাবশেষের উপর গড়িয়া উঠিল

(৬) শিল্পের যুগ

বর্তমান শিল্প-সমাজ। বর্তমান শিল্প-সমাজে ধনবৈষম্য আরও প্রকটরূপ ধারণ করিয়াছে। এই যুগে অধিকতর বিত্তবান শিল্পপতিগণের হস্তে কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং **পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রকে বলা হয় **জাতীয় রাষ্ট্র** আর সমাজকে বলা হয় **জাতীয় সমাজ**। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়া আদিম সমাজ বর্তমান স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে আর রাষ্ট্রও বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া বর্তমান স্তরে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন ? (Why man is called a social animal ?) : বিখ্যাত গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল বলেন, "মানুষ সামাজিক জীব। যে ব্যক্তি সমাজে বাস করে না হয় সে পশু, নয় দেবতা" ("Man perfected by society is the best of all animals. If he finds himself an

individual who cannot live in society, or who pretends he has need of only his own resources, does not consider him as a member of community ; he is a savage beast or a God." —*Aristotle*) এ্যারিস্টট্‌লের মতে মানুষ সামাজিক জীব। কিন্তু সামাজিকতার ভিত্তি যদি দলবন্ধতা হয় তবে যাহারাই দলবন্ধভাবে বাস করে তাহারাই সামাজিক জীব। সুতরাং প্রায় সকল জীবই সামাজিক জীব। কারণ, সকল জীবই দলবন্ধভাবে বাস করে। আবার "মানুষ সামাজিক জীব"—এই উক্তির দ্বারা যদি বুঝানো হয় যে, সংঘবন্ধতা মানুষের সহজাত প্রকৃতি তবে তাহাও ঠিক হইবে না। তবে ইহা সত্য যে, সংঘবন্ধতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, কিন্তু এই প্রবৃত্তির ব্যাপারে সকল মানুষের ধারণা এক রকমের নয়। সংঘবন্ধতার প্রবৃত্তি কাহারও ক্ষুদ্র গ্রাম বা নগরের মধ্যে সীমাবন্ধ, আবার কাহারও সংঘবন্ধতার প্রবৃত্তি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া আছে। কেহ গ্রামকেই সম্প্রদায় (Community) বলিয়া মনে করে, আবার কেহ সারা বিশ্বকেই সম্প্রদায় (World Community) বলিয়া মনে করে। যাঁহারা বিশ্বকে সম্প্রদায় বলিয়া মনে করেন এবং সমগ্র মানব জাতিকেই তাঁহার নিজের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান তাঁহাদিগকে বিশ্বমানব (Universal man) বলা যাইতে পারে। ইহাদিগকে সাধারণ মানুষের অনেক উপরে স্থান দিতে হয় ; ইঁহারা মহামানব। যুগে যুগে ইঁহাদের আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মানুষের সংঘবন্ধ জীবনের গণ্ডি একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যেই সীমাবন্ধ নয়, ইহার গণ্ডি গ্রামকে ছাড়াইয়া সারা বিশ্বে বিস্তারলাভ করিয়াছে।

(১৬) মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন ?

আবার মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অনেক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রকৃতিতে একদিকে সংঘপ্রিয়তা আর অপরদিকে সংগ্রামপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষকে একদিকে মিলিত হইতে হয় আবার মানুষের সহিত মানুষকে যুদ্ধ করিতেও দেখা যায়। মানুষের সংঘপ্রিয়তাকে দুইদিক হইতে লক্ষ্য করা যায়। ইহার একদিকে প্রত্যক্ষ রূপ আর অপর দিকে পরোক্ষ রূপ দেখা যায়। যেমন, গ্রামের রক্ষিবাহিনী গঠন করার মধ্যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। আর শ্রম-বিভাগের মাধ্যমে উৎপাদন করার মধ্যে পরোক্ষ সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। আবার দুইটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায় আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হইল পরোক্ষ সংঘর্ষের উদাহরণ। সমাজের গঠনেও এই দুইটি প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের একটি হইল সহযোগিতা (Mutual aid), আবার অপরটি হইল সংঘর্ষ (Struggle)। এই দুইটির কোন একটির দ্বারা সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। সহযোগিতা ও সংঘর্ষের সমন্বয়েই মানব সমাজ জন্ম-লাভ করিয়াছে। এই সহযোগিতা ও সংঘর্ষের সমন্বয়ে যাহা গঠিত হয় তাহাকে সামাজিক উত্তরাধিকার (Social heritage) বলা হয়। এই সামাজিক উত্তরাধিকার মানুষের সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি লইয়া গঠিত হয়। মানুষ জন্মগ্রহণ করে, বাড়িয়া উঠে, বাঁচিয়া থাকে এই সামাজিক উত্তরাধিকারের জোরে। মানব জীবনের উন্নতি নির্ভর করে সামাজিক উত্তরাধিকারের ঐশ্বর্যের উপর। সামাজিক উত্তরাধিকার ছাড়া ব্যক্তি-মানুষ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, বাঁচিতে পারে না এবং সমাজে স্থান পায় না। এই সামাজিক উত্তরাধিকারের

(১৭) সংঘবদ্ধতা ও সংগ্রামপ্রিয়তা

(১৮) সামাজিক উত্তরাধিকারের অর্থেই মানুষ সামাজিক জীব

অর্থেই মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং দুইটি অর্থেই মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। ইহার একটি হইল, (১) সংঘবদ্ধতা আর (২) অপরটি হইল সামাজিক উত্তরাধিকার। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "সমাজ ছাড়া, সামাজিক উত্তরাধিকার ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করিতে পারে না"।*

(১৯) সামাজিক উত্তরাধিকারের প্রকৃতি

সামাজিক উত্তরাধিকার এমন কতকগুলি উপাদান লইয়া গঠিত হয় যাহারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগগুলি আনিয়া দেয়। সামাজিক উত্তরাধিকারকে যে যত বেশী নিপুণ ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে সে তত বেশী নিজের ব্যক্তিত্ববিকাশ করিতে পারিবে। প্রত্যেক সমাজই সামাজিক উত্তরাধিকারকে বাড়ানোর চেষ্টা করে এবং সকলে যাহাতে সমানভাবে উহাকে ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে। সামাজিক উত্তরাধিকার যদি সকলে সমানভাবে ভোগ করিতে পারে তবে সাম্যের নীতি কার্যকর হইবে।

জাতীয় সমাজের গঠন (Structure of National Society) : বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে জাতীয় সমাজ গঠিত হয়। সংঘ হইল সাধারণ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত মানুষের পরস্পরের সমবায়ে গঠিত সংস্থা ("a group organised for the pursuit of an interest or a group of interests in common.")।

(২০) সংঘের সংজ্ঞা

শ্রমিক সংঘ, বণিক সংঘ এবং ধর্ম সংঘকে সংঘের উদাহরণ বলা যাইতে পারে। সংঘ বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে; যেমন রাষ্ট্রীয় সংঘ, সাংস্কৃতিক সংঘ, শ্রমিক সংঘ এবং অর্থনৈতিক সংঘ ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় সংঘ কতকগুলি রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত হয়, সাংস্কৃতিক সংঘ সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করে, ধর্ম-সংঘ ধর্ম চর্চা করে, শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের স্বার্থ লইয়া আন্দোলন করে, এবং অর্থনৈতিক সংঘ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মানুষ স্বেচ্ছায় এই সকল সংঘ স্থাপন করে। রাষ্ট্র হইল একটি আবশ্যিক সংগঠন (Compulsory association)। রাষ্ট্রও একটি সংঘ। অবশ্য, অন্যান্য সংঘের তুলনায় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বড় ও ব্যাপক।

প্রতিষ্ঠান (Institution) : বিধি নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থা-সমূহকে বলা হয় প্রতিষ্ঠান। বিবাহ ও ধর্মাচরণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। একটি নির্দিষ্ট বিধি-নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়াই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং

(২১) প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা

বিবাহ একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা। অতএব সংঘবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যরূপে যে সকল ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলিত থাকে তাহাদিগকেই প্রতিষ্ঠান বলা হয় ("established conditions of procedure of group activity.")। একদিক হইতে সংঘ ও প্রতিষ্ঠান এক নয়। ইহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। মানুষ সংঘ স্থাপন করে। কিছু সংঘের যদি কোন নিয়মাবলী না থাকে তবে উহা চলিতে পারে না। সাধারণ স্বার্থ-সাধনের জন্য এবং সংঘের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি নিয়মাবলী গঠন করিতে হয়। এই নিয়মাবলীকেই বলা হয় প্রতিষ্ঠান। অতএব সংঘগুলি হইল দলীয় সংস্থা (an organised group) আর সংঘের কার্যপদ্ধতি ও নিয়মাবলী হইল প্রতিষ্ঠান।

---

* "Without society, without the support of the social heritage, the individual personality does not and cannot come into being".—*MacIver and Page.*

সুতরাং এই দিক হইতে হিন্দুধর্মকে একটি সংঘও বলা যায় আর উহার উপাসনা পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠান বলা যায়। পরিবারকে একটি সংঘ এবং বিবাহকে একটি প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে।

সম্প্রদায় (Community) ঃ যখন কোন গোষ্ঠী সাধারণ নিয়ম পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া সংঘবদ্ধভাবে বাস করে তখন তাহাকে সম্প্রদায় বলা হয়। সংঘ গড়িয়া উঠে বিশেষ স্বার্থ সাধনের জন্য আর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনই ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যক্তির সামগ্রিক সামাজিক জীবন লইয়াই সম্প্রদায়ের সীমানা। সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যক্তি তাহার পূর্ণজীবন খুঁজিয়া পায় কিন্তু কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানুষ পূর্ণ জীবন লাভ করিতে পারে না; কিন্তু উপজাতি বা নগররাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ পূর্ণজীবন লাভ করিতে পারে। সম্প্রদায়ের ভিত্তি হইল দুইটি; ইহার এইটি হইল একই ভূখণ্ডে বসবাস (Territory), আর অপরটি হইল সাম্প্রদায়িক চেতনা (Community interest)। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই কোন একটি ভূখণ্ডে বাস করে। অস্থায়িভাবে হইলেও যাযাবরেরা কোন-না কোন ভূখণ্ডে বাস করে। ভূখণ্ড ও সম্প্রদায়ের ধারণার মধ্যে গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। সম্প্রদায়ের আর একটি প্রয়োজন হইল সুসম্বদ্ধতা। কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকে সাধারণ জীবন পদ্ধতির অংশীদার হয় এবং তাহারা যখন ঐ জীবনের মূল্য ও অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন জনগোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা হয়। অতএব সামাজিক সুসম্বদ্ধতা (Social coherence) হইতেই যৌথ বসবাসের ক্ষেত্র (area of common living) প্রস্তুত হয়। এই যৌথ বসবাসের ক্ষেত্রকে সম্প্রদায় বলা হয়।

(২২) সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা

বর্তমানে জাতিকেই সম্প্রদায়ের মূর্ত প্রকাশ হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক চেতনা (Community Consciousness) দানা না বাঁধে তবে দানা বাঁধানোর জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Individual and Society) ঃ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সমাজের ভিত্তিতেই ব্যক্তির পরিচয়। ভারতের একজন নাগরিককে বিদেশে একজন ভারতীয় হিসাবেই পরিচয় দিতে হয়। আবার ভারতের মধ্যে একব্যক্তি ভারতের যে অঞ্চলে বাস করে সেই অঞ্চলের নামানুসারেই তাহাকে পরিচয় দিতে হয়; যেমন, পশ্চিমবঙ্গের একজন অধিবাসীকে বলা হয় বাঙালী। আবার আঞ্চলিক ভিত্তি ছাড়া পেশার ভিত্তিতেও একজন লোকের নির্দিষ্ট পরিচয় থাকিতে পারে। পেশার দিক হইতে একজনকে কামার বা কুমার বা শ্রমিক বা শিক্ষক বলা যাইতে পারে। বর্ণের দিক হইতে একজন লোককে বর্ণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলা যাইতে পারে। এমনভাবে মানুষের প্রত্যেকটি পরিচয়ই সামাজিক পরিচয়। স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে পরিচয়ই সামাজিক পরিচয়। স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কোন পরিচয় নাই। লোক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন রবিনশন ক্রুশোর মতো লোকের কোন সামাজিক পরিচয় ছিল না। সমাজবদ্ধ মানুষের পরিচয় সমাজের দিক হইতে বিচার্য হইবে।

(২৩) ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য

ব্যক্তির পরিচয় যেমন সমাজের দিক হইতে বিচার করা হয় তেমনি ব্যক্তি-জীবনও সমাজ-জীবনের দিক হইতে বিচার করা হয়। সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে

একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ভারতীয়, আঞ্চলিক বসতির দিক হইতে বাঙালী, পেশার দিক হইতে শিক্ষক, আর্থিক অবস্থার দিক হইতে মধ্যবিত্ত, তাহার আচার-আচরণ, বেশভূষা, শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা সবকিছুই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মতো গড়িয়া উঠিবে। আবার ব্যক্তির কার্যকলাপের দ্বারাও সমাজ প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, কোন বাঙালী যদি কাপড় ছাড়িয়া কোট প্যান্ট পরিতে শুরু করে এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া আরও ১০ জন বাঙালী তাহার মতোই কোট প্যান্ট পরিতে শুরু করে তবে উহা সমাজের উপরও প্রভাব বিস্তার করিবে। এমনি ভাবে সমাজ যেমন ব্যক্তির চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে তেমনি ব্যক্তিও সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই বলা হয়, ব্যক্তির সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা, (১) **আংগিক মতবাদ** (Organic theory) এবং (২) **যান্ত্রিক মতবাদ** (Mechanistic theory)। নিচে এই দুইটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে :

(২৪) ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন

(১) **আংগিক মতবাদ (Organic Theory) :** আংগিক মতবাদ অনুসারে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অংগাংগি সম্পর্ক রহিয়াছে। এই মতবাদ অনুসারে সমাজকে জীবদেহের মতো মনে করা হয় আর ব্যক্তিকে তাহার অংগ হিসাবে ধরা হয়। জীবের কোন অংগের যেমন আলাদা কোন সত্তা থাকে না তেমনি ব্যক্তিরও সমাজের বাহিরে কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। হাত বা পায়ের সহিত সমগ্র দেহের যেমন সম্পর্ক, ব্যক্তিরও সমাজের সহিত তেমনি সম্পর্ক রহিয়াছে।

(২৫) আংগিক মতবাদ

গ্রীক, দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিস্টট্‌লের মতবাদের মধ্যে আংগিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল মানুষকে সামাজিক জীব ('Man is a social animal') হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ উক্তি করিবার কারণ হইল মানুষ একমাত্র সমাজের মধ্যদিয়াই সুন্দর জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে এবং উহাকে সার্থক করিতে পারে। অবশ্য, পরবর্তিকালে আংগিক মতবাদকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সমালোচনা : (১) সমালোচকগণ বলেন, ব্যক্তিকে বা কোন জীবকে সমাজের সহিত পুরাপুরিভাবে তুলনা করা যায় না। ব্যক্তি বা জীব সমাজের বাহিরে যাইয়াও বাঁচিতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তির হাত বা পা কাটিয়া ফেলিলে ঐ ব্যক্তি মরিয়া যাইবে।

(২) কোন অংগের পক্ষে একটির বেশী জীবদেহের সহিত যুক্ত থাকা সম্ভব নয় কিন্তু মানুষ একটির বেশী সংঘের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে। মানুষ এক সমাজ ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজে চলিয়া যাইতে পারে কিন্তু মানুষের কোন অংগ একদেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে যাইতে পারে না।

(৩) কোন ব্যক্তি সমাজের স্বার্থবিরোধী কাজ করিতে পারে কিন্তু কোন জীবের কোন অংগ জীবদেহের স্বার্থবিরোধী কাজ করিতে পারে না ; যেমন, কালোবাজারীরা সমাজবিরোধী কাজ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হইতে পারে কিন্তু মানুষের চক্ষু যদি দেহের সহিত অসহযোগ করে তবে দেহ চলিতে পারিবে না। তাই বলা হয়, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক আর মানুষের অংগপ্রত্যংগ এবং

দেহের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে তুলনা করা যাইতে পারে না। অবশ্য ইহা সত্য যে, ব্যক্তির সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। অতএব এই মতবাদের সত্যাসত্যতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না।

(২) **যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic Theory)**ঃ এই মতবাদ অনুসারে কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিবার জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি কৃত্রিম সম্পর্ক রহিয়াছে। কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সকল উদ্দেশ্যের বাহিরে ব্যক্তি সমাজকে যেমন প্রভাবান্বিত করিতে পারে না আবার সমাজও ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না; অর্থাৎ ব্যক্তির সহিত সমাজের আর কোন সম্পর্ক থাকে না।

এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় সামাজিক চুক্তির মতবাদের মধ্যে। এই মতবাদ অনুসারে মানুষ চুক্তির মাধ্যমে সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিল। ত্রয়ী চুক্তিবাদীদের মধ্যে হবস্ মনে করেন যে, আদিম অরাজক ও বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জনাই মানুষ চুক্তি করিয়াছিল। লক্ বলেন, প্রাকৃতিক অবস্থায় অরাজকতা ছিল না কিন্তু কতকগুলি অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ চুক্তি করিয়াছিল। রুশোর মতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, সম্পত্তির উদ্ভব এবং মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ হইবার ফলে মানুষের অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইল। এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য মানুষ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে মানুষ জীবনকে নিরাপদ করিতে চাহিয়াছিল এবং ধন-সম্পত্তির অধিকারকে সংরক্ষিত করিতে চাহিয়াছিল। এই মতবাদ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু পরবর্তিকালে তীব্র সমালোচনার ফলে ইহার প্রভাব বিশেষভাবে কমিয়া আসে।

(২৬) যান্ত্রিক মতবাদ

সমালোচনাঃ (১) সমালোচকগণ বলেন যে, এই মতবাদটি ভ্রান্ত। ইহার কারণ, আইন ছাড়া কোন চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে না। অবশ্য এই আইন সামাজিক বিধি ব্যবস্থা অথবা বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রের আইনও হইতে পারে। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে কোন্ আইন অনুসারে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার কোন ব্যাখ্যা ত্রয়ী চুক্তিবাদিগণ দেন নাই। প্রাক্-সামাজিক যুগে কোন সামাজিক বিধিব্যবস্থা থাকিতে পারে না। অতএব কোন আইন অনুসারেই সমাজ সৃষ্টির জন্য চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে না। তাই এই মতবাদকে অনেকেই ভ্রান্ত বলিয়াছেন।

(২) সামাজিক চুক্তি মতবাদ মানুষের বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে প্রাক্-সামাজিক যুগে মানুষ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিত। কিন্তু মানুষের স্বভাব হইল দলবদ্ধ ভাবে বাস করা। মানুষ কখনও একাকী বাস করিতে পারে না। মানুষকে বলা হয় সংঘবদ্ধ জীব (a gregarious animal)। সামাজিক চুক্তি মতবাদ মানুষের সংঘবদ্ধতার প্রকৃতিকে অস্বীকার করে। কিন্তু সংঘবদ্ধতা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি।

(৩) সমালোচকগণ বিবর্তনবাদকে সমর্থন করিয়া বলেন যে, মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিতে থাকে। ধীরে ধীরে সে প্রতিকূল পরিবেশ নিজের বুদ্ধির দ্বারা জয় করিয়া এবং অনেক সময় পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। এমনি ভাবে ধীরে ধীরে সে সমাজ ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিবর্তনের জোয়ারের

মধ্যে কোন স্তরে আসিয়া মানুষ নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে অনুভব করিয়াছে। মানুষ যখনই নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে অনুভব করিয়াছে তখনই সে সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। সমাজকে সে নিজের ধ্যান ধারণা মতো গড়িয়া তুলিয়াছে। আলোচ্য সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে মানুষ সমাজ জীবন শুরু করিবার পূর্বেই ব্যক্তি হিসাবে সচেতন ছিল। এই ব্যক্তি জীবনের অসুবিধার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই মানুষ নিজেরা পরামর্শ করিয়া সমাজ সৃষ্টি করিল। সমালোচকগণ বলেন, সংঘবদ্ধতা মানুষের স্বভাবগত। মানুষের স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতার ফলেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব সমাজ বা ব্যক্তি—কে কাহার পূর্বে এই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মানুষ সচেতন ভাবেও সমাজের রূপ ঠিক করিয়াছে। সংঘবদ্ধতা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা এই দুইএর দ্বারাই ধীরে ধীরে বিবর্তনের ধারা বহন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজ, সংঘ, প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গ।

উপসংহারে বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক উপরি-উক্ত দুইটি মতবাদে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তবে এই দুইটি মতবাদেই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের কিছু ধারণা পাওয়া যায়। ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক আংগিকও নয় যান্ত্রিকও নয়। ব্যক্তি সমাজের অংগীভূত হইতে পারে কিন্তু অংগ নয়। মানুষ স্বেচ্ছায় সচেতন ভাবেও সমাজ গঠন করে নাই। অবশ্য, মানুষ তাহার চিন্তা ও বিশ্বাস মতো সমাজকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে, এখনও করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করিবে।

(২৭) উপসংহার

রাষ্ট্রের বিবর্তন (Evolution of the State) ঃ রাষ্ট্রের জন্ম কিভাবে, কখন হইয়াছিল তাহা বলা সহজ নয়, তবে জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা হইতে জানা যায় যে, উপজাতীয় স্তরেই (Tribal Stage) সমাজ-দেহ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। উপজাতীয় স্তরে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তাহাকে উপজাতীয় রাষ্ট্র (Tribal State) বলা হয়। এই রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা করিত যুদ্ধনায়কেরা। অবশ্য, যুদ্ধনায়কদের কাজে পরামর্শ দিবার জন্য পরামর্শ পরিষদ (Advisory Council থাকিত। আবার উপজাতীয়গণ চিরস্থায়ী ভাবে কোথাও বাস করিত না, তাই তাহাদের রাষ্ট্র ছিল যাযাবর প্রকৃতির। রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, কিন্তু উপজাতীয় রাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল না। তাই উপজাতীয় রাষ্ট্রকে অনেকে রাষ্ট্র পদবাচ্য করিতে চান না। উপজাতীয়দের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য ছিল। উদ্ভবগত ঐক্য, ধর্ম ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন উপজাতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। এই রাষ্ট্রের শাসক কখনো স্বৈরাচারী (despot) হইত আবার কোন কোন উপজাতীয় রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে শাসিত হইত। এই যুগে জনমতের ভিত্তি ছিল প্রথা। সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পরের অঙ্গীভূত ছিল।

(২৮) রাষ্ট্রের বিবর্তন

উপজাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। নীল নদ, ইউফ্রেটিস্, হোয়াংহো এবং ইয়াংসি নদীর পারে এবং প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে কতকগুলি দেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সুবিধা, উর্বর মাটি, উষ্ণ জলবায়ু উপজাতীয়দের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ধনসম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সহজে আহার্য পাওয়া যাইত বলিয়া এই অঞ্চলের মানুষ কর্মোদ্যম

হারাইয়া ফেলে। আবার জনসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় এবং প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লাগিবার ফলে সমাজে নূতন দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। যুদ্ধে যাহারা পরাজিত হইত তাহারা দাসে পরিণত হইত আর যুদ্ধে যাহারা জয়লাভ করিত তাহারা দাস-মালিকে পরিণত হইত। এমনি ভাবে সমাজে দাসশ্রেণী ও দাস-মালিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। দাস শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়া সামাজিক বৈষম্য, বর্ণভেদ প্রথা এবং স্বৈরাচারিতা দেখা দেয়। আবার ধর্মের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। পূর্বে গৃহেই ধর্ম পালিত হইত, কিন্তু পরে ইহা গৃহ ছাড়িয়া মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য মন্দিরে নিত্য পূজা দিবার জন্য পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

(২৯) সাম্রাজ্য স্তরে রাষ্ট্র

আবার প্রতিরক্ষার জন্য এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যুদ্ধ নায়কগণ রাজারূপে পাকাপাকি ভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ইহাদের বংশানুক্রমিক ভাবে রাজ-সিংহাসন অধিকার করিবার ব্যবস্থা হয়। রাজা অমাত্য ও অনুচরবর্গের সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। আবার অনেক সময় বিভিন্ন রাজার মধ্যে যুদ্ধও বাধিত অবার মিতালিও ঘটিত। যুদ্ধের মাধ্যমে যে রাজা অনেক রাজ্য জয় করিয়া লইতেন তিনি নিজেকে সম্রাট বা রাজচক্রবর্তী বলিয়া ঘোষণা করিতেন। আবার রাজারা অত্যাচারী হইয়া উঠিলে বিধিশাস্ত্র রচয়িতাগণ মনুসংহিতার মতো গ্রন্থ রচনা করিয়া রাজ-ধর্মনীতি ব্যাখ্যা করিয়া রাজার অত্যাচার রোধ করিতেন।

(৩০) রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

পূর্বে সমাজ ছিল স্বায়ত্ত শাসিত। ধীরে ধীরে ইহা রাজকর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ভ করে। পুরোহিতগণ রাজাকে কাজে সাহায্য করিত। সাম্রাজ্যের স্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক জটিল হইয়া পড়ে। প্রাচ্য দেশের নদীর উপত্যকায় আর পাশ্চাত্য দেশের সমুদ্রের উপকূলে নগররাষ্ট্রের (City States) জন্ম হয়। কালক্রমে একদল উপজাতি গ্রীসে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে গ্রীসে নগররাষ্ট্রের জন্ম হয়। গ্রীসের নগররাষ্ট্র সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এই সকল নগররাষ্ট্রগুলি সমুদ্র ও পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইহারা বাহিরের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না, ইহার কারণ কতকগুলি স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ছিল। গ্রীক্ নগররাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এখানে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হইত। গ্রীক্ নগররাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকে সমাজ হইতে পৃথক করা হইত না। তাই ইহাকে অনেকে সমাজ-রাষ্ট্র হিসাবে আখ্যায়িত করিত। এই নগররাষ্ট্র ছিল স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। নাগরিকত্বের ধারণা এই সমাজ-রাষ্ট্রেই প্রথম পরিস্ফুট হয়। গ্রীক্ নগররাষ্ট্রে ক্রীতদাস ও বিদেশীয়দের কোন অধিকার স্বীকার করা হয় নাই। গ্রীক্ নগররাষ্ট্র ক্রীতদাস-ভিত্তিক। ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ছিল। নগরবাসীরা ছিল স্বাধীন আর গ্রামবাসীরা ছিল দাস।

(৩১) সাম্রাজ্য স্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক জটিল হয়

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৬-৩২৩ অব্দে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। আলেকজাণ্ডারের পরে তাঁহার উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে রোম। রোম সাম্রাজ্য স্থায়ী ছিল এবং তাহা সমস্ত মহাদেশে বিস্তৃত ছিল। তাই রোমান সাম্রাজ্যকে অনেকে বিশ্ব সাম্রাজ্য (World Empire) বলে। রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে

সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রোমক শাসন-ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক জীবনের উপর রোমান সম্রাট কখনো হস্তক্ষেপ করিতেন না। একমাত্র পুরোহিত সম্প্রদায়ের দাবি-রক্ষার্থে রোমক শাসক পানটিয়াস পাইলেটের আদেশে যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল না। রোম ও গ্রীসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া গেটেল বলেন, গ্রীস ঐক্য ছাড়াই গণতন্ত্রকে প্রসারিত করিয়াছিল আর রোম গণতন্ত্র ছাড়া ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল ("Greece had developed democracy without unity ; Rome secured unity without democracy")। রোমক সাম্রাজ্যে সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রসারিত হইয়াছিল কিন্তু এই সাম্রাজ্যের স্বাধীনতার সহিত সার্বভৌমিকতার সমন্বয় করা হয় নাই। রোমক সাম্রাজ্যে আইন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

রোমক যুগের পরে আসে মধ্যযুগ (Middle Ages)। এই যুগে রোমক ভাবধারা বিলুপ্ত হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠান বিশেষ শক্তির অধিকারী হয়। সমাজ খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে শুরু করে। ইহার পর আসে নবজাগরণ (Renaissance)। ইহা পুরাতন ধ্যানধারণাকে জাগাইয়া তোলে। আবার টিউটনিক প্রতিষ্ঠানও ধ্যানধারণার সহিত সংঘর্ষের মাধ্যমে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

(৩২) সামন্ততান্ত্রিক যুগ

এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা (Feudal System) বলা হয়। এই ব্যবস্থার ভিত্তি হইল জমির মালিকানা। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এই জমির মালিকানা হিসাবেই ঠিক হইত। ভূম্যধিকারীর সহিত সামন্তবর্গের সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত। এই ব্যক্তিগত আনুগত্যই ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অতএব সাধারণ লোকের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ। এই যুগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ভূম্যধিকারীর হাতেই ছিল। ভূম্যধিকারীরা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করিত। তবে রাজাকে তাহারা যুদ্ধের সময় সাহায্য করিত। এই অবস্থায় ভূমিহীন মানুষ ভূমিদাসে (serf) পরিণত হইয়াছিল।

মধ্যযুগের শেষে ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হয়। নগরবাসী বণিক শ্রেণী জন্মলাভ করে। বণিকদের সহিত ভূম্যধিকারীদের সংঘর্ষ বাধে এবং এই সংঘর্ষে বণিকেরা জয়লাভ করে এবং তাহারা রাষ্ট্র কর্তৃত্বের পুনর্গঠনের দাবি করে। এই যুগে ভৌগোলিক ও জাতিগত ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সন্নিহিত ফিউডাল সংস্থাগুলি শেষে জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। ইহা কোন বাহিরের-কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। জাতীয় ভাবই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে নানা দেশে এই জাতীয় রাষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষভাবে সম্পর্কিত হইবার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের কিছু আলোচনা করা দরকার।

সমাজ ঃ দলবদ্ধতা বা সংঘবদ্ধতাকে সমাজ বলা হয়। সমতা ও বিভিন্নতার ভিত্তিতে সমাজ গড়িয়া উঠে। সংঘবদ্ধতার প্রকৃতির মধ্যে সমতা ও বিভিন্নতা বর্তমান। সমতার ভিত্তিতে মিলিত হয় আর বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়।

মানব-সমাজ ঃ মানব-সমাজ হইল পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টি। ইহা ব্যাপক ও জটিল। ইহা সংঘবদ্ধতার রূপ গ্রহণ করে এবং মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষের জন্ম : মানুষ পূর্বপুরুষের নিকট হইতে সামাজিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। সামাজিক প্রকৃতি মানুষের উত্তরাধিকার। বিরামহীন ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বিবর্তনের বিভিন্ন ধারা অতিক্রম করিয়া মানব সমাজ বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রতিকূল পরিবেশকে মানুষ জয় করিয়াছে, অর্থনৈতিক বাধাকে অতিক্রম করিয়াছে। এই দুর্বার অভিযানে মানুষকে সাহায্য করিয়াছে তাহার ভাষা।

মানব সমাজের ক্রমবিকাশ : মানব সমাজের গোড়ার দিকে প্রথমে পরিবারে মানুষেরা সংঘবদ্ধ হইয়াছিল, না গোষ্ঠীজীবনে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে অনেকেই মনে করেন যে, মানুষ গোষ্ঠীতেই প্রথম সংঘবদ্ধ হইয়াছিল তারপর তাহারা পরিবার গঠন করিয়াছিল। গোষ্ঠীজীবনের প্রথম স্তর হইল ভ্রাম্যমাণ খাদ্যাহরণের যুগ। ইহার পর আসে পশুপালনের যুগ। ভ্রাম্যমাণ যুগে সমাজ ছিল সমভোগবাদী আর পশুপালনের যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়। ইহার পরে কৃষিকার্যের আবিষ্কারের ফলে কৃষিকার্যের যুগ শুরু হইল। মানুষের খাদ্যোৎপাদনের যুগ আরম্ভ হয়। গ্রাম্য ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে এবং তাহার সাথে শ্রমবিভাগ ও বিনিময় প্রথা চালু হয়। তারপর আইন প্রণীত হয় এবং রাজশক্তির অধীনে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এমনি ভাবে কাল হইতে কালান্তরে রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের স্রোতধারার মধ্যে সমাজকে যখন বলা হইত জাতীয় সমাজ তখন রাষ্ট্রকে বলা হইত জাতীয় রাষ্ট্র।

সামাজিক সম্পর্ক : যে সম্পর্ক পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহাকে বলা হয় সামাজিক সম্পর্ক। পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন উপলব্ধির মধ্য হইতে ইহা গড়িয়া উঠে। ইহা কায়িক বা বাহ্যিক সম্পর্ক নয়। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ব্যাপক ও জটিল।

জাতীয় সমাজ : বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠান লইয়া ইহা গঠিত হয়। সাধারণ স্বার্থ-সাধনের জন্য পরস্পরের সমবায়ে গঠিত সংস্থাকে সংঘ বলে। আর বিনিময়ের উপর স্থাপিত সামাজিক ব্যবস্থাকে বলা হয় প্রতিষ্ঠান। উত্তরাধিকার, ধর্মাচরণ ও বিবাহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

সম্প্রদায় : সংঘ আর সম্প্রদায় এক নয়। সাধারণ জীবন পদ্ধতিতে অভ্যস্থ একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী কোন গোষ্ঠীকে বলা হয় সম্প্রদায়। বর্তমান জাতিকে সম্প্রদায়ের মূর্তরূপ হিসাবে ধরা হয়।

মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন ? মানুষই একমাত্র সামাজিক জীব এই অর্থে মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় না, অথবা সংঘবদ্ধতার জন্যও মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় না। "মানুষ সামাজিক জীব"—এই কথাটির দ্বারা বুঝায় যে, সংঘবদ্ধতা মানুষের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন এবং সামাজিক উত্তরাধিকার ছাড়া মানুষ আত্মবিকাশ করিতে পারে না।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক : ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ আছে, যথা, (১) আংগিক মতবাদ এবং (২) যান্ত্রিক মতবাদ। আংগিক মতবাদ অনুসারে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক অংগাংগি আর যান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক সম্পূর্ণ কৃত্রিম।

রাষ্ট্রের বিবর্তন : রাষ্ট্রের প্রথম স্তর হইল উপজাতীয় রাষ্ট্র। পরে সাম্রাজ্য স্তরে রাষ্ট্র পৌঁছায়। উপজাতীয় স্তরে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। সাম্রাজ্য স্তরে এই সম্পর্ক জটিল হয়। ইউরোপে কতকগুলি নগররাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ইহাদের মধ্যে গ্রীসের নগররাষ্ট্র চরম পরিণতি লাভ করে। সমাজের সহিত নগররাষ্ট্রের সম্পর্ক নিবিড় ছিল। কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যের যুগে সমাজ রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক হইয়া পড়ে। আলেকজাণ্ডারকে অনুসরণ করিয়াই রোম বিশ্বসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

৪ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা

[Definitions, Nature and Purpose]

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য (Definitions, Nature and Purpose) : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্রের একটি সংজ্ঞা প্রথমেই নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রকে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজের সংঘবদ্ধ জীবনের **একটি চরম অভিব্যক্তি** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতীত কাল হইতে শুরু করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একজন জার্মান লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রের একটি করিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন। ফলে সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সঙ্গতির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বাস করিত। তাহাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি এক-একটি নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত বলিয়া ইহাদের বলা হইত নগর-রাষ্ট্র (City States)। এই নগর-রাষ্ট্রগুলিকে বুঝাইতে প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানগণ যথাক্রমে **'পলিস'** ও **'সিভিটাস'** শব্দ দুইটি ব্যবহার করিত। পরবর্তী কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে রাষ্ট্রের আয়তনও বৃদ্ধি পাইল। টিউটন যুগ হইতে বৃহদায়তন রাষ্ট্রগুলিকে বুঝানোর জন্য 'স্ট্যাটাস' (Status) শব্দটি ব্যবহৃত হইত। রাষ্ট্র শব্দ প্রথম ব্যবহার করেন ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় চিন্তাবীর ম্যাকিয়াভেলী। আধুনিক কালে রাষ্ট্র শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে রাষ্ট্র বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য **'পশ্চিমবঙ্গ'** (The State of West Bengal), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ফিলাডেলফিলা (The State of Philadelphia) ইত্যাদি। আবার রাষ্ট্র শব্দটির দ্বারা অনেক সময় জাতি, সমাজ, দেশ ও সরকার প্রভৃতিকেও বুঝানো হয়।

'পলিস' ও 'সিভিটাস' শব্দ দ্বারা গ্রীক্ ও রোমানগণ নগর-রাষ্ট্রকে বুঝাইত

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

(Definition of the State)

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সংখ্যাতীত। গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ পর্যন্ত বিভিন্ন চিন্তাবীর রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন। রাষ্ট্র একটি বিশিষ্ট সামাজিক সংগঠন। প্রত্যেক সামাজিক সংগঠনেরই এক-একটি করিয়া লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে ; যেমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল ধর্ম রক্ষা করা ; শ্রমিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা। এই সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্ররূপ বিশিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও একটি

উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্য হইল বিশৃঙ্খল সমাজকে সুশৃঙ্খল করিয়া মানুষের জীবনকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর পর্যায়ে উন্নীত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। আবার রাষ্ট্র যেহেতু অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সেইজন্য রাষ্ট্রের আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতঃই সমাজের আলোচনা আসিয়া পড়ে। এই কারণেই স্ট্রং (C. F. Strong) বলিয়াছেন, রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা সমাজ হইতে শুরু করিতে হয়; কারণ রাষ্ট্র হইল অন্যতম সামাজিক সংগঠন।

রাষ্ট্রের আলোচনা সমাজ হইতে শুরু করিতে হয়।

রাষ্ট্রের জন্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জীবিকার্জনের তাগিদে বা প্রকৃতিগত কারণে যখনই কিছু সংখ্যক লোক পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে তখনই সমাজের আবির্ভাব হইয়াছে। আবার এই সমাজের বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সমাজসৃষ্টির মূলে ছিল মানুষের এক বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য। এই সামাজিক উদ্দেশ্য হইল সামাজিক উন্নতি। উন্নত সমাজ জীবন উন্নততর হইবে। এই উন্নততর, সুন্দর জীবনের চির আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সঙ্ঘপ্রিয় করিয়াছে। এই সঙ্ঘপ্রিয়তা মানুষের প্রকৃতিগত। অন্যান্য জীবের মত মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে। মানুষ কিন্তু এই ক্ষুধাতৃষ্ণার পরিপূর্তিতেই সন্তুষ্ট নয়। সে প্রজ্ঞাশীল জীব, সে চায় জীবনকে সুন্দরতর করিতে, সে চায় উন্নত জীবনকে উন্নততর জীবনে পরিণত করিতে। এই কাজ তাহার একার পক্ষে করা সম্ভব নয় বলিয়া সে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। আদিম যুগের পরিবার এই সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের একটি ধাপ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, প্রথমে সংগঠিত হইয়াছিল সমাজ এবং পরে আসিয়াছিল পরিবার। আবার কেহ কেহ ইহার বিপরীত ধারণাও পোষণ করেন।

পরিবারে বিকশিত সমাজে মানুষের জীবন ছিল বিশৃঙ্খল। পরিবারের পর আসিল মানুষের গোষ্ঠীজীবন। পূর্বপুরুষের বংশধরগণ এক-একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইত। গোষ্ঠীজীবনেও মানুষের জীবন বিশৃঙ্খল ছিল। গোষ্ঠীর পর সমাজ-বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে আসিল উপজাতি। এই স্তরেই রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্ববর্তী স্তরে সমাজ ছিল বিশৃঙ্খল। এই বিশৃঙ্খল জীবনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য এবং মানুষের জীবনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। সার্বিক উন্নতিসাধন এবং মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ হলের (Hall) ভাষায় বলা যায়ঃ "রাষ্ট্র হইল রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত, বহিঃশক্তির শাসন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ।" অধ্যাপক হল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে 'রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য' নামে অভিহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য বলিতে বুঝায় সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবনের প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

আবার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেনঃ "স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে যখন অনেকগুলি পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হয়, তখনই তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়।" এ্যারিস্টট্‌ল নগর-রাষ্ট্রকে মানুষের সমাজ-সংগঠনের এক চরম বিকাশ বলিয়া মনে করিয়াছেন। গ্রীক্ নগররাষ্ট্র ছিল রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়ই। বার্কার বলেনঃ "গ্রীক্ নগর রাষ্ট্র শুধু রাষ্ট্রই ছিল না, ইহা ছিল নৈতিক সমাজ, উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ইহা ছিল সুন্দর ও সত্য-সন্ধানী, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।" এ্যারিস্টট্‌ল

স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন বলিতে মানবচরিত্রের নৈতিক উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। আর এই মানব-জীবন চরম নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করে রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ্যারিস্টটল-প্রদত্ত রাষ্ট্রসংজ্ঞার সমালোচনা করিয়াছেন। **এই সকল সমালোচকের** মতে, রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে বহু পরিবার থাকে; এবং শিক্ষা-মূলক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠনও থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই। আবার রাষ্ট্রকে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক সংগঠনের স্বার্থের রক্ষক বলিয়া ধরিয়া লওয়াও ঠিক নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুধু পারিবারিক ও সামাজিক সংগঠনের স্বার্থরক্ষার গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ইহার উদ্দেশ্য আরও মহত্তর। **রাষ্ট্র হইল সমাজের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান। ইহা সমাজ-জীবনের সমস্ত গলদ দূরীভূত করিয়া সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের জীবনকে সুন্দর-তর ও সুশৃঙ্খল করিয়া তোলে।**

এ্যারিস্টটলের মত-বাদের সমালোচনা

আবার এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য রাষ্ট্রকে এক বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এই ক্ষমতার নাম হইল সার্বভৌম ক্ষমতা। এই ক্ষমতাকে 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন অধ্যাপক ম্যাক্‌আইভার (MacIver)। রাষ্ট্র এই ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন করে। এই রাষ্ট্রপ্রণীত আইন বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রপতি উইলসন বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।" রোমান দার্শনিক **সিসেরোর** মতে: রাষ্ট্র হইল "বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টি যাহারা অধিকার সম্বন্ধে সমচেতনতায় ও সুযোগ সুবিধায় পারস্পরিক অংশ গ্রহণে ঐক্যবদ্ধ হয়" ("a numerous society united by a commonsense of right and a mutual participation in advantages")।

রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

রেনেসাঁ যুগের লেখক **গ্রোটিয়াস** বলেন: "সকলের উপকার ও অধিকারের সুবিধাভোগের জন্য ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন মানুষের পূর্ণাঙ্গ সমাজ"কেই রাষ্ট্র বলা হয় ("a society of free men united for the sake of enjoying the advantages of right and common utility")।

বোডাঁ ১৫৭৬ সালে রাষ্ট্র সম্বন্ধে এইরূপ সংজ্ঞা দিলেন: "রাষ্ট্র হইল পরিবারসমূহ ও তাহাদের সাধারণ ধনসম্পত্তির একটি মিলিত সংস্থা যাহা একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা ও যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে" ("an association of families and their common possessions governed by a supreme power and by reason.")।

ভাববাদীদের ধারণায় রাষ্ট্র হইল "ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আত্মার প্রমূর্ত রূপ"; ("the incarnation of the objective spirit"): "মর্ত্যে ঈশ্বরের পদক্ষেপ ('March of God on Earth"); "**যুক্তির প্রকাশ**" (perfected rationality"); "**নৈতিক** চেতনার বাস্তব রূপ" ("the realisation of the moral idea"); "বাস্তব স্বাধীনতার প্রকাশ" ("actualisation of concrete freedom")।

ম্যাক্ আইভার বলেন: রাষ্ট্র হইল একটি সংগঠন যাহা পীড়নমূলক ক্ষমতার

অধিকারীর দ্বারা ঘোষিত আইনের মারফত কার্য করিয়া নির্দিষ্ট ভূখণ্ডবাসী সমাজে সামাজিক শৃংখলার সার্বজনীন ও বাহ্যিক উপকরণগুলি বজায় রাখে।*

ল্যাস্কি বলেন : বর্তমান রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমাজ, যাহা শাসকমণ্ডলী ও প্রজার মধ্যে বিভক্ত, যাহা নিজস্ব নির্ধারিত প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের উপর চরম ক্ষমতা দাবি করে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সামাজিক ইচ্ছার চূড়ান্ত আইনগত আধার। ইহা অন্যান্য সর্ববিধ সংগঠনের ভূমিকা পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইহা যে মানবিক কর্মকাণ্ডকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা বাঞ্ছনীয় বোধ করে সে সকলকেই নিজ এলাকার মধ্যে আনয়ন করে। আবার এই চরম ক্ষমতার যুক্তির পরোক্ষ অর্থ হইল যে, যাহা কিছু ইহার নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত রহিল, তাহা ইহার অনুমতি-সিদ্ধ রূপে রহিল। রাষ্ট্র হইল সমাজের মূল বুনিয়াদ। ইহা অসংখ্য মানুষের জীবনধারার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহা মানবজীবনের আকৃতি ও তাৎপর্যকে রূপায়িত করে।

মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হইল **"অন্যান্য শ্রেণীর উপর একটি শ্রেণীর প্রভুত্ব করিবার সংগঠন মাত্র"** ("an organisation of one class dominating over the other classes")।

জার্মান দার্শনিক ব্লুন্টস্‌লি ও সিডেল রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ব্লুন্টস্‌লির মতে রাষ্ট্র হইল "কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজ।" সিডেলের মতে, "রাষ্ট্রের সূত্রপাত তখনই হয়, যখন বহুসংখ্যক লোক পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া কোন উচ্চশক্তির অধীনে সম্মিলিত হয়।" আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্জেস বলেন : "রাষ্ট্র হইল কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজ।" অন্যান্য বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের বহুবিধ সংজ্ঞার নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। অনেকের মতে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় গার্ণারের সংজ্ঞা হইতে। ডাঃ গার্ণার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা আধুনিক সংজ্ঞাগুলির সমন্বয় মাত্র।

গার্ণার রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন : **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, রাষ্ট্র হইল অল্পবিস্তর বহুসংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে—যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বভাবগত আনুগত্য স্বীকার করে।**†

---

* "The State is an association which, acting through law as promulgated by a Government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated, the universal external conditions of social orders"—*Mac Iver —The Modern State.*

† "The State, as a concept of political science and Public Law is a community of persons more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory independent or nearly so, of external control, and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."—*Garner.*

রাষ্ট্রের উপাদান

(Elements of the State)

গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের পাঁচটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় ; যথা—(১) জনসমষ্টি বা ঐক্যবদ্ধ মনুষ্য সম্প্রদায়, (২) নির্দিষ্ট ভূভাগ, (৩) শাসন প্রতিষ্ঠান বা সরকার যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন ও তাহাকে কার্যকরী করে, (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা এবং (৫) স্থায়িত্ব। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এই পাঁচটি উপাদানের সমবায়ে। ইহাদের মধ্যে কোন একটি উপাদানের অভাব হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। (৬) ইহা ছাড়া অপর রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া দরকার। রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি করিবার জন্য রাষ্ট্রের এই উপাদানগুলিকে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(১) **জনসমষ্টি (Population)**ঃ সমাজের মধ্য হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। মনুষ্য ব্যতিরেকে সমাজের সৃষ্টি হয় না। সংঘবদ্ধভাবে মানুষ যখন বাস করিতে আরম্ভ করে তখনই সমাজ গড়িয়া উঠে। অতএব সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে প্রথম প্রয়োজন হয় মানুষের। বস্তুতঃ জনসমাজ ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনাও করা যায় না। অবশ্য, রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; যথা, **পূর্ণ নাগরিক (Full-fledged citizen)**, **অসম্পূর্ণ নাগরিক (Semi-citizen)** অর্থাৎ যাহারা ভোট দিতে পারে না, **বিদেশী (Alien)** এবং **প্রজা (Subject)**।

জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্রের চিন্তা করা যায় না

এই কয়েক প্রকার জনসমষ্টির মধ্যে যাহারা রাষ্ট্রের আইনসম্মত সভ্য এবং যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহারা হইল নাগরিক আর এই নাগরিকদের মধ্যে যাহাদের ভোটাধিকার নাই, তাহারা হইল অসম্পূর্ণ নাগরিক ; যেমন—শিশু, পাগল ইত্যাদি। বৈদেশিকগণ অনেক সময় অস্থায়িভাবে কোন রাষ্ট্রে বাস করে। এই বৈদেশিকদের বলা হয় বিদেশী (alien)। ইহাদেরও সাধারণতঃ কোন ভোটাধিকার নাই। উপনিবেশের জনসাধারণকে প্রজা বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের অধীনে ছিল, তখন ভারতবাসীরা ছিল তাহাদের প্রজা। অনেক লেখক আবার ভোটাধিকার প্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তিদের 'প্রজা' আখ্যা দিয়া থাকেন। বর্তমানে এই প্রজাদিগকে নাগরিক বলিয়া অভিহিত করার একটা প্রচলন দেখা যায়। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ন্যাশানালিটি আইন (British Nationality Act, 1948) নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে ইংল্যাণ্ডের ও তাহার উপনিবেশ এবং ডোমিনিয়নগুলির নাগরিককে ব্রিটিশ প্রজা বা কমনওয়েলথ নাগরিক (Commonwealth citizens)-রূপে আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই আইনবলে যে-কোন কমনওয়েলথের সভ্যরাষ্ট্রের নাগরিক যুক্তরাজ্য বা উপনিবেশে থাকাকালীন বৃটিশ প্রজা বলিয়া অভিহিত হন। কিন্তু স্বদেশে থাকাকালে তাঁহারা যুক্তরাজ্যের নাগরিকরূপে অভিহিত হন না। আবার বিদেশী বা alien এবং নাগরিক এই দুই

পূর্ণ নাগরিক, অসম্পূর্ণ নাগরিক, বিদেশী এবং প্রজা এই চারিটি শ্রেণীতে জনসমষ্টিকে ভাগ করা হয়

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন লোকদের বলা হয় স্বজাতীয় (national)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যাঁরা আনুগত্য স্বীকার করেন তাঁহারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বজাতীয়, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নহেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ইহা** প্রযোজ্য। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ঘোষণা (The Declaration as to Foreign State Order, 1950) দ্বারা কমনওয়েলথের

সভ্যরাষ্ট্রগুলির নাগরিকেরা ভারতে অবস্থানকালে বিদেশী নয়। কারণ, কমনওয়েলথের সভ্যরাষ্ট্রগুলিকে ভারত বিদেশী রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করে না।

রাষ্ট্রগঠনে জনসমষ্টির প্রয়োজন হয়, কিন্তু কতসংখ্যক লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোন প্রচলিত বিধি নাই। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বাস করিত; তাই এ্যারিস্টটল, রুশো প্রভৃতি দার্শনিকেরা সুশাসনের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক জনসাধারণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। পূর্বে দশ হাজার জনসংখ্যাকে কাম্য বলিয়া মনে করা হইত কিন্তু বর্তমানে এই সকল মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি চালু হওয়ায় চল্লিশ কোটি জনসাধারণ লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইলেও কাম্য জনসংখ্যা মনে করা যায়। সুতরাং দেখা যায় জনসংখ্যার পরিমাণের উপরই একমাত্র সুশাসন নির্ভর করে না। জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ দেশের আছে কি না তাহার উপরও জনসংখ্যা কাম্য, কি অকাম্য তাহা নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র অল্পসংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত এবং সুশাসিত হইতেছে। আবার ভারত, চীন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিরাট জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব সরকারের গঠনপ্রণালী, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনসংখ্যার পরিমাণ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য জনসংখ্যার বিচার করা প্রয়োজন। বর্তমানে কাম্য জনসংখ্যার ধারণার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোন বিধি নাই

(২) **রাষ্ট্রের ভূভাগ (Territory of the State) :** শুধু জনসমষ্টি দ্বারাই একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় না। সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি যদি সংঘবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলেও রাষ্ট্র গঠিত হয় না। উদাহরণ হিসাবে যাযাবরদের ধরা যায়। যাযাবরেরা রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। এই কারণেই যতক্ষণ পর্যন্ত না জনসমষ্টি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র গঠিত হয় না। তাই যাযাবরদের কোন রাষ্ট্র নাই। পূর্বে ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া ছিল। ইহারা যখন প্যালেস্টাইনে স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিল তখনই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সমাজ-বিবর্তনের শিকারের যুগে ও পশুপালনের যুগে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই। কারণ, এই দুই স্তরেই মানুষ ছিল যাযাবর। রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল সেই স্তরে, যখন মানুষ কৃষিকার্য শুরু করিয়া একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। এই কারণে রাষ্ট্র ও ভূমির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রসঙ্গে গেটেল বলেন যে, ভূমিগত সার্বভৌমিকতা (territorial sovereignty) ও রাষ্ট্রের সীমানা বর্তমান রাষ্ট্রচিন্তার সহিত বিশেষ-ভাবে সম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলিয়াছেন : "রাষ্ট্রের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হইল ভূখণ্ড অনুসারে প্রজাবর্গের বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়া।"*

জনসমষ্টি স্থায়িভাবে কোন ভূখণ্ডে বাস করিলে রাষ্ট্র গঠিত হয়

নির্দিষ্ট ভূভাগ বলিতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা বুঝায়। কিন্তু এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে শুধু ভূমির উপরিভাগকেই বুঝায় না, ইহা এক ব্যাপক

* "As against the ancient gentile organisations, the primary distinguishing feature of the State is the division of the subjects of the State according to territory."
—*Engles.*

অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত ভূমিতল, নদ-নদী, ভূগর্ভস্থ সমুদয় পদার্থ, আকাশপথ, গিরিপর্বত, এবং সাধারণতঃ তিন মাইল পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল প্রভৃতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উপরিউক্ত রাষ্ট্রান্তর্গত জলস্থল, অন্তরীক্ষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে রাষ্ট্রান্তর্গত ভূমি সম্বন্ধে ধারণা অনেক বদলাইয়াছে। যেমন, উপকূলবর্তী সমুদ্রের কিছু অংশ (territorial waters) ঐ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু সমুদ্রের কত মাইল পর্যন্ত রাষ্ট্রান্তর্গত হইবে তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ ব্রায়ারলি বলেন যে, দূরত্ব উপকূলে সীমারেখা হইতে ১২ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সমুদ্রের নিম্নতম জলরেখা (low water mark) হইতে তিন মাইলের অধিক সমুদ্রের যে-অংশের উপর এইরূপ বিশেষ অধিকার দাবি করা হয় তাহাকে বলে সংলগ্ন অঞ্চল (Contiguous Zone)। ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়মকানুনাদি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সংলগ্ন অঞ্চলের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বর্তমানে স্পুটনিকের যুগে ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে

আবার, রাষ্ট্রের সীমা শুধু জল স্থলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রের উপরিভাগে যে বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে তাহার উপর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং অপর কোন রাষ্ট্রকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বায়ুমণ্ডলের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে হইলে উক্ত রাষ্ট্রের আদেশ লইতে হইবে। অবশ্য বর্তমানে স্পুটনিকের যুগে এই অধিকার বহু পরিমাণে খর্ব হইয়াছে এবং বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠারও প্রচেষ্টা চলিতেছে।

কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে ইহার যেমন নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা স্থির হয় নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আয়তনেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থিরীকৃত হয় নাই। প্রাচীন গ্রীকদের রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র। আবার রোমানদের সাম্রাজ্য ছিল বিরাট। আধুনিক কালের ধারণা হইল যে, প্রাকৃতিক সীমা ও ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রের প্রাধান্য ও মর্যাদা সব সময়েই এই ভূখণ্ডের আয়তনের উপর নির্ভর করে। বর্তমান যুগে যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইয়াছে। বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। নিম্নে তাহার তুলনামূলক আলোচনা করা গেল।

(১) রাষ্ট্রের আয়তন যদি বিশাল হয় এবং লোকসংখ্যাও যদি অধিক হয়, তবে তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায়। আর রাষ্ট্রের আয়তন যদি ক্ষুদ্র হয় এবং লোকসংখ্যাও যদি সামান্য হয়, তবে তাহাকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশাল রাষ্ট্রের পর্যায়ে ধরা যাইতে পারে, আর প্রাচীন গ্রীক্ রাষ্ট্র বা বর্তমান সুইজারল্যাণ্ডকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

(২) রুশো ও অন্যান্য অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র বৃহদায়তন রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। বর্তমানের রাষ্ট্রগুলির তুলনামূলক বিচার করিলে রুশোর এই উক্তিকে সমর্থন করা যায় না। বর্তমানে দুইটি রাষ্ট্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বিশাল। আবার বিপরীতক্রমে দেখানো যায় সুইজারল্যাণ্ড, ঘানা, পাকিস্তান প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি এই দুইটি রাষ্ট্রের তুলনায় দুর্বল।

(৩) প্রাচীনকালে এই ধারণা ছিল যে, ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষের মতো বিরাট রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বৃহৎ রাষ্ট্রে সম্ভব নহে। কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্র যে বৃহৎ রাষ্ট্রেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তাহার সাক্ষ্য বহন করে।

(৪) পূর্বে ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির বহু উপনিবেশ ছিল। এই উপনিবেশগুলি হইতে তাহারা সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিত, ফলে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে বৃহৎ রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া মনে হইত। কিন্তু বর্তমানে এই উপনিবেশগুলি স্বাধীন হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির শক্তি বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে।

লর্ড এ্যাকটনের মত উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় যে, রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হইলে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা নানা কারণে সংকীর্ণ মনোভাব-সম্পন্ন হয়; সমাজের প্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং এই ধরনের রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করাও কঠিন। জার্মান দার্শনিক ট্রিটস্‌কে বলেন: "রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রত্ব রাষ্ট্রের পাপেরই প্রতীক" ("it is a sin for the State to be small".)

বর্তমান যুগের গতি হইল শক্তির দিকে। যেদিকে শক্তি সেইদিকেই গতি। বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্র দুই শিবিরে বিভক্ত। একদিকে বিশাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইহারা উভয়েই আয়তন ও জনসংখ্যার দিক দিয়া বিশেষ শক্তিশালী। এই দুই রাষ্ট্রশক্তির কবল হইতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পক্ষে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা কঠিন। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি আঞ্চলিক জোট বাঁধিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

(৩) **সরকার বা রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র (Government of the State)**: নাবিকহীন পোত যেমন অচল, শাসনহীন রাষ্ট্রও তেমন বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। **রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার শাসনযন্ত্র।** এই শাসনযন্ত্রের মাধ্যমেই রাষ্ট্র কার্যকরী করে তাহার মহান উদ্দেশ্যকে। এই শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের কর্ণধার। মানুষ যখন যাযাবর ছিল তখন রাষ্ট্রের জন্ম হয় নাই। রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে তখনই, যখন বিচ্ছিন্ন মানুষ সুসংবদ্ধ হইয়াছে। মানুষকে সুসংবদ্ধ করিয়াছে এই শাসনযন্ত্র। শাসনযন্ত্র হইল রাষ্ট্রের একটি বিশেষ শক্তি। রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র এমনভাবে মিশিয়া আছে যে, অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রকে সরকার হইতে পৃথক করেন নাই। এই সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে হবসের (Hobbes) নাম উল্লেখ করা যায়।

আবার যাঁহারা রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করেন তাঁহাদিগকেই শাসক বলা হয়। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার করেন তাঁহাদিগকেই শাসক বলা হয়। শাসনযন্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ আছে; যথা, ব্যবস্থাবিভাগ, শাসন-বিভাগ ও বিচারবিভাগ। এই তিন বিভাগের কর্মচারী সমষ্টিকে লইয়াই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র গঠিত হয়। আবার সাধারণ নির্বাচকদিগকেও শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারণ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদের নির্বাচন করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ইঁহাদের হাতে।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রাষ্ট্র সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখে। রাষ্ট্র রাষ্ট্রের

সমগ্র অধিবাসীদের মঙ্গল বিধান করে এবং সকল ব্যক্তির মধ্যে যে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয় তাহার মীমাংসা করে। আবার স্বরাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্ধারণ করে। কিন্তু রাষ্ট্র শুধু একটি তত্ত্বগত ধারণা কি না, ইহা লইয়া মতবিরোধ থাকিলেও, বাস্তব দৃষ্টিতে সরকারই যে রাষ্ট্র, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সরকারের মধ্যেই রাষ্ট্র মূর্ত হইয়া উঠে। অবশ্য, এই মতবাদ সকলে স্বীকার করেন না।

(৪) **রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা (Sovereignty of the State)**ঃ রাষ্ট্রের উপাদানগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান উপাদান হইল ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে রাষ্ট্রকে একটি অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে। এই চূড়ান্ত অপ্রতিহত ক্ষমতাকেই বলা হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা। আবার এই ক্ষমতা শুধু আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা নহে, বহিঃশক্তির অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত অবস্থা বুঝাইবার জন্যও এই 'সার্বভৌম ক্ষমতা' কথাটি ব্যবহার করা হয়। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনসাধারণের নিকট একক বা পূর্ণ আনুগত্য দাবি করিতে পারে। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রান্তর্গত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপরও প্রভুত্ব করে। রাষ্ট্রের মধ্যে এমন অন্য কোন শক্তি থাকিতে পারে না, যে শক্তি রাষ্ট্রের কোন কার্যকে অবৈধ বলিয়া অমান্য করিতে পারে। রাষ্ট্রের এই আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকে **আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (Internal Sovereignty) বলা হয়।** আবার আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অধিকারী রাষ্ট্র যদি বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার অধিকারী হয় তবে সে রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। রাষ্ট্রের এই বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত অবস্থাটিও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অপর একটি প্রকাশ। এই অংশটিকে বলা হয় **বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা (External Sovereignty)**।

রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক

কিন্তু আবার এমন কতকগুলি রাষ্ট্র আছে, যেমন—কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যেগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং বৈদেশিক ব্যাপারেও ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ডের শাসনপাশ হইতে মুক্ত। এই রাষ্ট্রগুলিকেও রাষ্ট্রপদবাচ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করিবার জন্য গার্ণার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, **বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রায় অনুরূপভাবে মুক্ত হইলেই তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায়।**

উপসংহারে বলা যায়, বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত নয়। কেহ কেহ বলেন বিশ্ব আজ দুই শিবিরে বিভক্ত। এক শিবিরের পরিচালনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর এক শিবিরের পরিচালনা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই সকল লেখকের মতে এই দুইটি রাষ্ট্র ছাড়া অপরাপর রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন ভাবে এই দুইটি রাষ্ট্রের কোন-না-কোন একটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকল লেখকের মতানুসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের পর রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বহুলাংশে খর্ব হইয়াছে। যাহারা এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য তাহাদের বৈদেশিক নীতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব দেখা যায়, অধ্যাপক গার্ণারের সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্র উপরোক্ত চারটি উপাদানের সমবায়ে গঠিত একটি সামাজিক সংগঠন বটে, কিন্তু এই উপাদানগুলির প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে।

বিশ্ব আজ দুই শিবিরে বিভক্ত

(৫) **স্থায়িত্ব ঃ** রাষ্ট্রকে স্থায়ী (Permanent) হইতে হইবে। যে রাষ্ট্র ক্ষণভঙ্গুর তাহা রাষ্ট্রের পদবাচ্য নয়। কিন্তু আজকাল দেখা যায় এক রাষ্ট্রের সীমানার কোন অংশ অন্য রাষ্ট্র দখল করে। যে রাষ্ট্র উহা দখল করে সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় ঐ অংশ।

(৬) **অপর রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃতি ঃ** একটি দেশকে রাষ্ট্র পদবাচ্য হইতে হইলে তাহাকে অপর রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া চাই। কোন রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত না অপর রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে আর রাষ্ট্রপদবাচ্য হয় না। ভিয়েতনাম আজও অনেক রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত নয়। যাহাদের কাছে ইহা রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত নয় তাহাদের কাছে ভিয়েতনাম রাষ্ট্র পদবাচ্য নয়।

রাষ্ট্র ও সরকার
(State and Government)

রাষ্ট্রের ধারণা সাধারণতঃ তত্ত্বগত। রাষ্ট্রের বাস্তবরূপ প্রকাশ পায় সরকারের মাধ্যমে। সেইজন্য রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র প্রায় প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। হব্‌স তাঁহার 'লেভায়াথান' গ্রন্থে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটিকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র" (I am the State)। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে সকল বাস্তব প্রভেদ আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১) রাষ্ট্র হইল সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী—মুক্ত সংগঠিত জনসমষ্টি, যাহার একটি শাসনযন্ত্র থাকিবে ; অর্থাৎ রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে মুক্ত, সংগঠিত জনসমাজ। আর সরকার হইল এই রাষ্ট্রের একটি যন্ত্রবিশেষ, যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করে।

(২) রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র জনসমষ্টি লইয়া। আর সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া। রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার কার্যে যাহারা নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ আইনসভার সদস্য, শাসনবিভাগীয় কর্মচারী ও বিচারবিভাগীয় কর্মচারীদের লইয়া শাসনযন্ত্র গঠিত হয়। এইদিক দিয়া বিচার করিলে রাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা ব্যাপকতর।

(৩) রাষ্ট্র একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ, আর সরকার বলিতে কোন ভূখণ্ডকে বুঝায় না।

(৪) রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান ; কিন্তু সরকার চিরন্তন নয়। আজ গণতান্ত্রিক সরকার আছে, কালই হয়ত স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অবশ্য, রাষ্ট্র যখন অপর কোন রাষ্ট্র দ্বারা বিজিত হয় তখন আর সে রাষ্ট্র থাকে না। অতএব রাষ্ট্রকেও চিরন্তন বলা চলে না।

(৫) রাষ্ট্র চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত ; যথা—জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূভাগ, শাসনযন্ত্র ও সার্বভৌম ক্ষমতা। এই চারিটি উপাদানের মধ্যে সরকার হইল একটি। অতএব সরকার রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। অংশ যেমন কখনই সমগ্রের সমান হইতে পারে না তেমনি সরকারও রাষ্ট্রের সমান হইতে পারে না।

(৬) রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই। রাষ্ট্র হইল একটি মনঃকল্পিত ধারণা মাত্র। কিন্তু সরকারের একটি বাস্তব রূপ আছে।

(৭) সরকারের মধ্যেই রাষ্ট্র মূর্ত হইয়া উঠে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ থাকিতে পারে।

(৮) অধ্যাপক গার্ণার রাষ্ট্রকে জীবদেহ ও যৌথ প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রকে জীবদেহ মনে করিলে সরকার হয় উহার মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের পরিচালনায়ই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। যদিও মস্তিষ্ক দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয় তথাপি মস্তিষ্ক বলিতে যেমন সমগ্র মানুষটিকে বুঝায় না, সেইরূপ রাষ্ট্রযন্ত্র শব্দটির দ্বারা সমগ্র রাষ্ট্র-সংজ্ঞাটির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না।*

(৯) আবার রাষ্ট্রকে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হইলে, সরকারকে ইহার পরিচালকমণ্ডলী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে যেমন যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, তেমনি সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রেও পরিচালকমণ্ডলীকে যৌথ ব্যবসায়ের সবকিছু মনে করিলে ভুল হইবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, রাষ্ট্র চিরন্তন নয়। এমন এক সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না। সমাজবিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে যখন সমাজ শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।† শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং আর্থিক প্রতিপত্তিশালীদের যন্ত্রস্বরূপ কাজ করিয়া বিত্তবানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। আবার সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক যখন পরিবর্তিত হয়, যখন একশ্রেণীর স্থলে আর একশ্রেণী শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায়, তখন রাষ্ট্র-কাঠামোও পরিবর্তিত হয়। যেমন রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হইয়া যখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্ক স্থাপিত হইল তখন রাষ্ট্র-কাঠামোও পরিবর্তিত হইল। অবশ্য, কেহ কেহ বলেন রাষ্ট্র পরিবর্তিত হয় না, শুধু রাষ্ট্রের রূপ বদলায়। কেহ কেহ আবার এইরূপ পরিবর্তনকেই রাষ্ট্রের পরিবর্তন বলিয়া ধরিয়া লন। রাষ্ট্র যদি পরিবর্তিত হয় সরকারও পরিবর্তিত হয়। অবশ্য, রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থাকিয়াও সরকারের পরিবর্তন হইতে পারে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের সরকারের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক দলের সরকার গঠিত হইতে পারে। কিন্তু ল্যাস্কি বলেন, ইহার দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না, কারণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বা সামাজিক সম্পর্কে পরিবর্তন আসে না।

আবার রাষ্ট্রকে অবিনশ্বর বলাও ভুল। কারণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ততদিনই বজায় থাকে যতদিন রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতার অধিকারী। এইভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণার বহু পরিবর্তন হইয়াছে।

*The Government is an essential element or mark of the State, but it is no more the State itself than the brain of an animal is itself the animal, or the board of directors of a Corporation is itself the Corporation." *Garner*

† "There was a time when there was no State. It appears wherever and whenever a division of society into classes appears, whenever exploiters and exploited appear."—*Lenin*

রাষ্ট্রের ভাবগত ও ধারণাগত রূপ
(Idea vs. Concept of the State)

ভাবগত ও ধারণাগত এই দুইটি দিক হইতে রাষ্ট্রসংজ্ঞার বিশ্লেষণ করা চলে। এই প্রসঙ্গে ব্লুণ্টস্‌লি (Bluntschli) বলেন ঃ "**রাষ্ট্রের ধারণা** বলিতে বুঝায় বাস্তব রাষ্ট্রগুলির প্রাকৃতিক ও অপরিহার্য গুণাগুণ ; আর **রাষ্ট্রের** ভাব বলিতে বুঝায় এক ত্রুটিহীন ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ কল্পিত চিত্র যাহা অর্জিত হয় নাই ; কিন্তু তাহাকে অর্জন করিবার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতে হইবে।" ব্লুণ্টস্‌লির সমর্থনকারীদিগের মধ্যে বার্জেসের (Burgess) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্র বস্তুনিরপেক্ষ একটি বিমূর্ত ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। হেগেলের (Hegel) মতে সংগঠনে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ভাবের মধ্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল।

রাষ্ট্রের বাস্তব ও অবাস্তব রূপ

আবার রাষ্ট্রের উপাদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বাস্তব অথবা ধারণাগত (Concept) রূপটিকে বুঝিতে পারা যায়। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রের চারিটি উপাদানের আলোচনা করা হইয়াছে। এই উপাদানগুলির মধ্যে জনসমষ্টি ও ভূখণ্ড রাষ্ট্রের বাস্তব রূপকে প্রকাশ করে। এই দুইটি উপাদানের মধ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মূর্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু রাষ্ট্রের অবাস্তব বা ভাব (Idea) রূপ ইহার বাস্তব উপাদান ব্যতীত কল্পনা করা যাইতে পারে। ভাববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাষ্ট্রের এই অবাস্তব রূপকে যৌথ কারবারের সহিত তুলনা করেন।

আবার কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পূর্বকল্পিত **আদর্শ রাষ্ট্রের** মাপকাঠিতেও রাষ্ট্রসংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করেন। এখানে আদর্শ রাষ্ট্র বলিতে বুঝানো হয় ভবিষ্যতে রাষ্ট্র কি প্রকারের হওয়া উচিত। অর্থাৎ ইহা ত্রুটিহীন ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ কল্পিত ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন এবং রাষ্ট্রের ভাবগত রূপ। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রচিন্তাবীরদিগকে অনেকে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনাকারী বলিয়া আখ্যায়িত করেন। এই সকল চিন্তাবীরদিগের মতে বর্তমান রাষ্ট্রগুলি ত্রুটিপূর্ণ এক মানবীয় প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবং থমাস মুর (Thomas Moor) প্রমুখ রাষ্ট্রচিন্তাবীরগণকে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনাকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। অবশ্য, এই আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনার রূপ সকল যুগেই এক প্রকারের ছিল না।

আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংজ্ঞার বিশ্লেষণ

(ক) প্লেটো ও এ্যারিস্টট্‌ল **নগর-রাষ্ট্রের** (City-State) ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ রাষ্ট্র ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাঁহাদের পরিকল্পনা রাষ্ট্রের সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণের জন্য করা হয় নাই। গ্রীক্ নগর-রাষ্ট্রে যে ক্রীতদাস শ্রেণী ছিল তাহাদের সুখ-সুবিধার কথা মোটেও ভাবা হয় নাই। শুধু মুষ্টিমেয় নাগরিকদের সুখ-সুবিধার জন্যই এই আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহাদের আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। এই আদর্শ রাষ্ট্র ছিল রাষ্ট্রের অবাস্তব রূপ।

(খ) রাষ্ট্রের অবাস্তব বা ভাবগত রূপের আর একটি দৃষ্টান্ত হইল **বিশ্বরাষ্ট্র** (**World State**) গঠনের পরিকল্পনা। মহাবীর আলেকজাণ্ডার হইতে শুরু

করিয়া হিটলার পর্যন্ত বহু বীর যোদ্ধা বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন। ইহাদের কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য চেষ্টাও করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল বীরগণের প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কারণ ইহাদের প্রচেষ্টা ছিল শক্তি-নির্ভর। বাহুবলে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ন্যায় কল্যাণরূপী আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপিত হইতে পারে না।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবোধ তীব্রতর আকার ধারণ করে। 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'—এই ছিল রাষ্ট্রসৃষ্টির পশ্চাতে একমাত্র আদর্শ। এই আদর্শের ভিত্তিতে বহু রাষ্ট্রও সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু জাতিগত বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন জাতি আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। ফলে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস স্তিমিত হইয়াছে। বিশ্বরাষ্ট্রগঠনের প্রয়াস আবার শুরু হইয়াছে বর্তমান যুগে। বর্তমানের মানুষ জাতিগত বৈষম্যের কুফল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। বর্তমানে জাতিসংঘের মাধ্যমে একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক পরিবার (Family of Nations) গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এই কল্পনা এখনও বাস্তবে পরিণত হয় নাই। ইহাও রাষ্ট্রের অবাস্তব রূপ।

(গ) রাষ্ট্রের বাস্তব বা ধারণাগত রূপের একটি উদাহরণ হইল রাজা কর্তৃক শাসিত রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র **বংশানুক্রমিক শাসন-ব্যবস্থার (Dynastic State)** ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংল্যাণ্ড, নেপাল, ইথিওপিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি শাসিত হয় বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতে, রাজা বা রাণী কর্তৃক। এই সকল রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌম হইতেছেন এই সকল রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গ। অবশ্য, বর্তমানে পার্লামেণ্টীয় (Parliamentary) গণতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার ফলে অনেক রাজা শুধু নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবেই শাসন করিয়া থাকেন।

উপসংহারে বলা যায়, **রাষ্ট্রের ভাবগত (Idea) ও ধারণাগত (Concept) রূপের** মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। এই প্রসঙ্গে ডঃ গার্ণার বলেন ঃ "এই সকল অতিপ্রাকৃত দার্শনিক সূক্ষ্ম বিভাগকরণের বাস্তব মূল্য খুব কমই" ("This distinction is largely Metaphysical or Philosophical and has little practical value.")। ডঃ গার্ণারের এই উক্তির সমর্থনে বলা যায়. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্পনা যখন করা হইয়াছিল তখন রাষ্ট্রের রূপ ছিল অবাস্তব কল্পনা। আর বর্তমানে রাশিয়াতে, নয়া চীনে যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন বলা যায় যে, পূর্বের কল্পনা বাস্তব রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আবার বাস্তবও যে অবাস্তবে পরিণত হয় তাহারও দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বর্তমানে দেখা যায়, একদিন যে রাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ছিল বাস্তব, তাহা আজ অবাস্তবের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহা অতীতের ইতিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে রাষ্ট্রের বাস্তব চেহারা। অতএব দেখা যায়, অতীতে যাহা বাস্তব ছিল, বর্তমানে উহা অবাস্তবে পরিণত হইয়াছে, আবার বর্তমানে যাহা অবাস্তব, ভবিষ্যতে উহা বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রসংজ্ঞা বিশ্লেষণের এই দুইটি দিকের মধ্যে পার্থক্য খুব কমই।

সমাজ ও রাষ্ট্র*
(State and Society)

বর্তমানে সমাজ-রাষ্ট্রের বা নগর-রাষ্ট্রের ধারণার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। রাষ্ট্রকে এখন আর সমাজ বলা হয় না, বা সমাজকে রাষ্ট্র বলা হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সকল পার্থক্য আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১) রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান। সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সমগ্র জীবন ; আর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। অতএব সমাজের তাৎপর্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর।

(২) সমাজবিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাষ্ট্রসৃষ্টির বহু-পূর্বেই সমাজ গঠনের সূত্রপাত হয়। সমাজ সৃষ্টির বহু পরে রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

(৩) সরকার রাষ্ট্রের একটি প্রধান উপাদান ; কিন্তু সমাজের ঐরূপ কোন শাসনযন্ত্র নাই। সরকারই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র। এই সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তাহার কাজ করিয়া থাকে।

(৪) ভূখণ্ড রাষ্ট্রের আর একটি উপাদান ; কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভূখণ্ড সমাজসংজ্ঞার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডকে কেন্দ্র না করিয়াও সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে।

(৫) রাষ্ট্রের উপাদানগুলির মধ্যে সার্বভৌমিকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সার্বভৌমিকতা ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না। সমাজ যদিও রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর তথাপি সার্বভৌমিকতার মতো কোন উপাদান সমাজের নাই। সার্বভৌমিকতা ব্যতীতই সমাজের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।

(৬) "মানুষের স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সমষ্টিকে বলা হয় সমাজ ; আর রাষ্ট্র হইল একটি "বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আবশ্যিক সংগঠন।" রাষ্ট্র-প্রণীত আইন বাধ্যতামূলক এবং উহা অমান্য করিলে দৈহিক শাস্তি পাইতে হয় ; কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা প্রভৃতি বাধ্যতামূলক নহে এবং উহা অমান্য করিলে সমাজ কোন দৈহিক শাস্তি দিতে পারে না।

(৭) সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাপকতর। ইহার উৎপত্তি হয় জৈব ধর্মের প্রেরণায়। সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সমগ্র জীবনকে। আর রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবনের আচরণ স্থির করে এবং মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকেই শুধু নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য, উভয়ের উদ্দেশ্যই মহান্ এবং নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৮) অধ্যাপক ম্যাক্ আইভার বলেন যে, রাষ্ট্রকে সমাজ এবং সমাজকে রাষ্ট্র বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। ম্যাক্ আইভার এই মত পোষণ করেন যে, সমাজে যে সকল ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে তাহা রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত হয় নাই। আবার সমাজ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে।

উপরে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে যে সকল পার্থক্য আছে তাহার আলোচনা করা

---

* ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

হইয়াছে। এক্ষণে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ আছে তাহার আলোচনা নিম্নে করা গেল।

(১) রাষ্ট্র যদিও সমাজের অন্তর্গত একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সমাজের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সকল সামাজিক সংগঠনকেই নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য, সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া রাষ্ট্র সর্বদা চলিতে সক্ষম হয় না। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর এই সামাজিক রীতি-নীতির প্রভাবও কম নহে। এইদিক হইতে সমাজও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা চলে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি গভীর।

(২) অধ্যাপক বার্কারের মতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য একই, যদিও বিভিন্নভাবে সম্পাদিত হয়; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উভয়েই পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ। অধ্যাপক ল্যাস্কি (H. J. Laski) বলেন: "রাষ্ট্র সমাজজীবনের মূলসূত্র নির্ধারণ করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজজীবন অভিন্ন নহে।" সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। আবার সামাজিক প্রথাগুলির উপর রাষ্ট্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিলে মানুষ রাষ্ট্র-প্রণীত আইনকে মান্য করিতে চাহিবে না। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। এই সংঘর্ষকে এড়াইবার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পর সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হয়।

(৩) অধ্যাপক ল্যাস্কি রাষ্ট্রকে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। সমাজজীবনে মানুষের ব্যবহার রাষ্ট্রের পরিপন্থী হইতে পারে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে হয়ত অনেক সময় সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। অবশ্য, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যদি ন্যায়বোধের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হয়, তবে উহা সমাজের উন্নতি বিধানই করিবে। আর যদি উহা অকল্যাণকর অন্যায়ের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হয়, তবে উহা উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষকে অনিবার্য করিয়া তুলিবে।

উপসংহারে বলা যায়, সমাজের সার্বিক রূপ যদিও রাষ্ট্রের মধ্যে ধরা পড়ে না; কিন্তু সামাজিক শক্তির প্রতিফলন রাষ্ট্রের মধ্যে ধরা পড়িতে বাধ্য। একদিকে রাষ্ট্র যেমন সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমন আবার সামাজিক প্রেরণা, প্রথা ও ঐতিহ্য রাষ্ট্রের গতিপথ নির্দেশ করে। রাষ্ট্রের আইন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রভৃতিকে বুঝিতে হইলে সমাজ-সম্পর্ককে বুঝিতে হইবে। এই সমাজ-সম্পর্ক ধরা পড়ে রাষ্ট্রের প্রতিটি কার্যের মধ্যে। এইভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়াই উভয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব রাষ্ট্র ও সমাজকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে চিন্তা করা যায় না।

রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন

(State and other associations)

পূর্বে রাষ্ট্র ও বহু সংগঠনের সমবায়ে গঠিত সমাজের মধ্যে মৌলিক সম্বন্ধ ও পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন

সংগঠনের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ও পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। এই সম্বন্ধ ও পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমাদিগকে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; যথা—এই সকল সংগঠনের গঠনবৈচিত্র্য, ইহাদের উদ্ভবের ইতিহাস, ইহাদের ক্ষমতা, কার্যপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য। নিম্নে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(১) রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোন এক বিশেষ স্তরে। আর সামাজিক সংগঠন জন্মলাভ করে মানুষের স্বেচ্ছামূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে। রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আনুগত্য বাধ্যতামূলক। আর অন্যান্য সংগঠনের সদস্যপদ মানুষের ইচ্ছাধীন।

(২) মানুষ একযোগে বহু সংগঠনের সদস্য হইতে পারে ; কিন্তু একই সময়ে সে একটির বেশী রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না।

(৩) রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে। কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। যেমন, রোমান চার্চ পৃথিবীব্যাপী সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

(৪) সামাজিক সংগঠনগুলির নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য থাকে ; আর শত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত।

(৫) সামাজিক সংগঠনগুলির তুলনায় রাষ্ট্র অনেক বেশী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অবশ্য, ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠান শত রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের সাক্ষ্য বহন করিয়া আজও তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

(৬) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপ্রণীত আইন সকলকেই মান্য করিতে হইবে। যাহারা রাষ্ট্রপ্রণীত আইন মান্য করিবে না, তাহাদিগকে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে। অতএব এইদিক হইতে রাষ্ট্রকে পীড়নমূলক ক্ষমতার অধিকারী বলা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা নাই।

(৭) সর্বশেষে বলা যায়, অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলির কার্যক্রম রাষ্ট্রের সম্মতিসাপেক্ষ, কিন্তু রাষ্ট্র কাহারও নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।

উপসংহারে বলা যায়, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইহারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আন্তর্জাতিক ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

(The State in International and Constitutional Law)

আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়। আবার সকল আইনই রাষ্ট্রকে একই ভাবে বিচার করে না। রাষ্ট্র বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন ধরনের গুণাবলীর অধিকারী হয়। শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইতে হইবে ; অর্থাৎ—বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আর আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে কোন প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র নামে আখ্যায়িত হইতে হইলে তাহাকে সর্বপ্রকারে

বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্রভাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করিতে হইবে এবং অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত সন্ধির শর্তাদি পালনের অধিকারী হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গার্ণারের মত এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। ডঃ গার্ণারের মতে, "আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ও স্বাধীন হইতে হইবে। রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক-সম্পর্ক স্থাপন করিবার আইনসঙ্গত যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যবৃন্দের নিকট হইতে আন্তর্জাতিক আইন যে সকল দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য বলিয়া দাবি করে তাহা করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, অনুরূপ স্বীকৃতিলাভ করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম-মর্যাদাবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-সমাজের অন্যতম রাষ্ট্র বলিয়া গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।"*

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে সার্ব-ভৌম ও স্বাধীন হইতে হইবে।

আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ অধ্যাপক হল (Hall) রাষ্ট্রকে "বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অতএব দেখা যায় আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে সকল দেশই রাষ্ট্র-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হইতে হইলে দেশে এক উন্নত পর্যায়ের সভ্যতা থাকা চাই এবং বড় বড় রাষ্ট্র-কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করা চাই।

সংক্ষেপে বলা যায়, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন হইল বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত অবস্থা;

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-স্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করা;
তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা অর্জন করা;
চতুর্থতঃ, দেশে এক উন্নত পর্যায়ের সভ্যতা থাকা প্রয়োজন; এবং

পঞ্চমতঃ, কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করা। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিবার পূর্বে উপরোক্ত বিষয়গুলির অস্তিত্বের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া থাকে।

অবশ্য, অনেক সময় এই সকল গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N.) রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি দেয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভিয়েতনামের কথা। ইহার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের আদর্শের যুদ্ধই এইজন্য দায়ী। ভিয়েতনাম রাশিয়ার আদর্শের সমর্থক বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকগণ ভিয়েতনামকে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ-প্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

উপসংহারে বলা যায়, বর্তমানে রাষ্ট্রসংজ্ঞার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে যে চারিটি উপাদানে রাষ্ট্র গঠিত হইত তাহাদের মধ্যে সার্বভৌমিকতা অন্যতম। বর্তমানে জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রসকল অনেক পরিমাণে এই সার্বভৌমিকতা স্বেচ্ছায়

* "A State in the sense of International law must be a fully sovereign and independent community with a legal capacity to enter into international relations and must possess the power and will to fulfil the obligations which international law requires of all members of the family of nations.

Furthermore, it must have been recognised as such and thereby admitted to membership in the international community on a footing of equality with other nations"—*Garner*.

জাতিপুঞ্জের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়াছে। আবার রাষ্ট্র ভূখণ্ডের অধিকারী, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উপর তাহার পূর্বে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তাহা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে এক দেশের উপর দিয়া অন্য দেশের রকেটবাহী জাহাজ উড়িয়া যায়। ইহাতে বাধা দিবার শক্তি খুব কম রাষ্ট্রেরই আছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N.), পশ্চিমবঙ্গ (The State of West Bengal) এবং নিউইয়র্ককে (New York) কি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে? **(ক) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U.N.)**: ইহা বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহা প্রশমিত করা এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা। আর এই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্রপর্যায়ভুক্ত করেন। আবার কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইহাকে অভিভাবক রাষ্ট্র (Super State) রূপে গণ্য করেন। সাধারণ রাষ্ট্রগুলির মতো এই প্রতিষ্ঠানের আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ রহিয়াছে। আবার ইহার একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র বা রাজধানী এবং একটি কোষাগারও আছে। জাতিপুঞ্জে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রেরই কূটনৈতিক প্রতিনিধি আছে। এই প্রতিষ্ঠান বিশ্ব-শান্তি রক্ষাকল্পে যে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে এবং যুদ্ধ শেষে শান্তিচুক্তিও করিতে পারে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U N.) প্রকৃত রাষ্ট্রসংজ্ঞার পদবাচ্য নহে

উপরোক্ত সাধারণ রাষ্ট্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সাধারণ রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কারণ যে কয়টি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহার কোনটিই প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের নাই। নিম্নে রাষ্ট্রের উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের অবস্থাটি আলোচনা করা হইল:

(১) রাষ্ট্রপর্যায়ভুক্ত হইতে হইলে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকা চাই; কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের এমন কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নাই। আবার ইহার কোন নিজস্ব নাগরিকও নাই।

(২) বলা হয় যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় শাসনযন্ত্র আছে; কিন্তু এই শাসনযন্ত্রের বিধি-নিষেধগুলির প্রয়োগ অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিসাপেক্ষ।

(৩) সমমর্যাদা-বিশিষ্ট সকল রাষ্ট্র নিজস্ব সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ না করিয়া এবং নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করিয়াছে। ফলে ইহাকে কাজ করিতে হয় প্রত্যেকটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্মতি লইয়া এবং তাহাদেরই মারফত। এই কারণে স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের উপর চরমতম কোন আইনগত ক্ষমতা রাষ্ট্রপুঞ্জের নাই। কাজেই রাষ্ট্রপুঞ্জকে রাষ্ট্র বলিয়া আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক।

(৪) রাষ্ট্রপুঞ্জের যে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইল, ইহা সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য বা যুদ্ধের মাল-মসলা সরবরাহ করিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে।

কিন্তু সদস্য রাষ্ট্র যে এই সুপারিশ মানিয়া লইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ, সদস্য রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রপুঞ্জে তাহাদের সার্বভৌমিকতা সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে নাই। আবার প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রেরই জাতিপুঞ্জের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

উপসংহারে বলা যায়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ রাষ্ট্রসংজ্ঞার মর্যাদা লাভ করে নাই। ইহা সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদের মধ্যস্থতা করিতে পারে। কিন্তু তাহার এই মধ্যস্থতা সদস্য রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছা করিলে উপেক্ষাও করিতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপুঞ্জের এমন কোন আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা নাই, যাহার বলে ইহা তাহার সালিশীকে মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। আবার যাঁহারা রাষ্ট্রপুঞ্জকে অভিভাবক রাষ্ট্র বলেন, তাঁহারাও রাষ্ট্রপুঞ্জের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান। রাষ্ট্রপুঞ্জ হইল স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত একটি সংঘ (voluntary association)। ইহা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের আইনগত ক্ষমতা যদিও সীমাবদ্ধ কিন্তু বর্তমানে এই সংস্থা ধীরে ধীরে প্রবলতর হইতেছে। পৃথিবীর মানুষ আজ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে, এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় যাহা শান্তি স্থাপন করিবার সকল চরম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বিশ্বে শান্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এই কারণেই বিশ্বসৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-সংগঠনের মাধ্যমেই বিশ্ব-শান্তি রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ কি রাষ্ট্র (Is the State of West Bengal a State ?): কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলকে রাষ্ট্রপদবাচ্য হইতে হইলে তাহাকে রাষ্ট্রের গুণাবলীর অধিকারী হইতে হইবে ; অর্থাৎ জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার, স্থায়িত্ব ও সার্বভৌমিকতা এই কয়টি গুণ আলোচ্য অঞ্চলের থাকা চাই। আলোচ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রথম চারিটি বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ—সার্বভৌমিকতা ইহার নাই। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গকে রাষ্ট্রপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। ভারতীয় সংবিধানের ইংরেজী সংস্করণে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে (Units) স্টেট (State) শব্দ দ্বারা তর্জমা করা হইয়াছে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রসংজ্ঞা অনুসারে এই অঙ্গরাজ্যগুলিকে রাষ্ট্র বলা চলে না। তাই বাংলায় সংবিধানের তর্জমাকালে দেখা যায় এই অঙ্গরাজ্যগুলিকে রাষ্ট্র না বলিয়া রাজ্য বলা হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ মূলতঃ রাষ্ট্র নহে।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র-পদবাচ্য নহে

আবার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পশ্চিবঙ্গের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকিলেও ইহার সার্বভৌমিকতা নাই। এই সার্বভৌমিকতা সামগ্রিক ভাবে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রেরই রহিয়াছে। অতএব পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঙ্গরাজ্যগুলিকে রাষ্ট্র বলা চলে না।

(গ) নিউ ইয়র্ক কি রাষ্ট্র (Is New York a State ?): এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে উপরোক্ত প্রশ্নের পুনরুল্লেখ করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ভারতে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (federal constitution) চালু আছে। অতএব যে কারণে পশ্চিমবঙ্গকে রাষ্ট্র বলা যায় না, সেই একই কারণে নিউ ইয়র্কও রাষ্ট্রপদ-বাচ্য নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় যে অঙ্গরাজ্যগুলি থাকে তাহাদের অপরাপর রাষ্ট্রগুলির সহিত স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করিবার বা সন্ধি স্থাপন করিবার ক্ষমতা থাকে

না। এই অঙ্গরাজ্যগুলির রাষ্ট্রিক কাঠামো থাকিলেও ইহারা যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেইজন্য স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ইহাদিগকে পরিগণিত করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলির সহিত অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির কতকগুলি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যকে রাষ্ট্রপদবাচ্য করা হয়। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলির সার্বভৌমিকতা অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ আছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ইহাদের মধ্যে কোন কোন অঙ্গরাজ্যের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি আছে এবং অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ইহাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। আবার এই অঙ্গরাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে। এই সকল কারণে অনেকে এই অঙ্গরাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সার্বভৌমিকতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ইহাদের নাই।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের জন্ম : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে একা তাহার সকল চাহিদা মিটাইতে পারে না। তাই তাহাকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মানুষ সমাজে বাস করে। আর সমাজ-বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। সমাজ-জীবনকে সুন্দর ও সুশৃংখল করিয়া তোলাই ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সংখ্যাতীত। এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সর্বাধুনিক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ডঃ গার্ণার। ডঃ গার্ণারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র পাঁচটি উপাদানে গঠিত; যথা, (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনযন্ত্র বা সরকার, (৪) সার্বভৌমিকতা এবং (৫) স্থায়িত্ব।

জনসমষ্টি : রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি জনসমাজ। অতএব একটি রাষ্ট্র সংগঠিত হইতে হইলে জনসমষ্টি একান্তভাবে প্রয়োজন। অর্থাৎ জনসমষ্টি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের কল্পনা নিরর্থক।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড : রাষ্ট্র আকাশে সংগঠিত হইতে পারে না। ইহার গঠনের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড। অবশ্য, এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপরিভাগের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। আবার এই ভূখণ্ডের কোন নির্দিষ্ট সীমা ঠিক করা নাই। ইহা ক্ষুদ্র গ্রীক্ রাষ্ট্রের ন্যায়ও হইতে পারে, আবার নয়া চীন ও ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎও হইতে পারে। বর্তমানের ঝোঁক হইল বৃহৎ রাষ্ট্রের দিকে।

সরকার : কোন শাসনযন্ত্রের মাধ্যম ছাড়া রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করা যায় না। অতএব রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনার জন্য একটি শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই শাসনযন্ত্র রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান।

সার্বভৌমিকতা : ইহা হইল রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার নাম। সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে; যথা, (১) আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা; (২) বাহ্যিক চরম ক্ষমতা। বর্তমানে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতাকে 'স্বাধীনতা' শব্দটির দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

স্থায়িত্ব : রাষ্ট্রকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইতে হইবে।

সরকার ও রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নহে। সরকার রাষ্ট্রের অংশমাত্র। সরকারের মধ্যেই রাষ্ট্র মূর্ত হইয়া উঠে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ দুইভাগে রাষ্ট্রের রূপ প্রকাশ করেন: (১) রাষ্ট্রের বাস্তব রূপ ও (২) অবাস্তব রূপ।

রাষ্ট্র ও সমাজ এক ও অভিন্ন নহে। পূর্বে অবশ্য, রাষ্ট্র ও সমাজকে এক ও অভিন্ন রূপে কল্পনা করা হইত। গ্রীক্ নগর-রাষ্ট্র প্রভৃতির বর্ণনায় গ্রীক্ দার্শনিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্রকে একই অর্থে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমানের সমাজ হইল জাতীয় সমাজ। এই জাতীয় সমাজ হইল জাতি বা সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংঘের সমষ্টি। আর রাষ্ট্র হইল একটি আবশ্যিক সংগঠন মাত্র। অবশ্য, রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতার অধিকারী। এই সার্বভৌমিকতার বলে রাষ্ট্র সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রকেও সমাজের মূলনীতিগুলিকে মান্য করিয়া চলিতে হয়। অতএব উভয়ে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

আন্তর্জাতিক ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়। শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে কোন সংগঠনকে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে উহাকে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইতে হইবে। আর আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে এবং অপরাপর রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিতে হইবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ এবং নিউইয়র্ক রাষ্ট্রপদবাচ্য নহে।

৫ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ
(Theories of the origin of the State)

একসঙ্গে বাস করিবার ইচ্ছা এবং একসঙ্গে বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে যখন সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে বাধ্য করিল তখনই সমাজ গড়িয়া উঠিল। সমাজ-সৃষ্টির পরে সমাজে বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভবের গোড়ার দিকে মানুষের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ যখন এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল তখন ইহাদিগকে পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করিতে লাগিল। আবার মানুষ যখন এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল তখন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে অনেক মতবাদেরও সৃষ্টি হইল। অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র সম্বন্ধেও বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদের সৃষ্টি

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(ক) **রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ,** (খ) **রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ।** আবার রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মতবাদ আছে যাহা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়েরই ব্যাখ্যা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় **ঐশ্বরিক মতবাদ, বলপ্রয়োগের মতবাদ** ইত্যাদি। এই কারণে অনেকে মতবাদগুলিকে বিভক্ত করার পক্ষপাতী নহেন। আবার কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতবাদ লিপিবদ্ধ করিবার কালে দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; যথা—(১) **দর্শনমূলক পদ্ধতি** এবং (২) **ঐতিহাসিক পদ্ধতি।**

দর্শনমূলক পদ্ধতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে; যথা,—

(১) **ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ**; (২) **সামাজিক চুক্তি মতবাদ**; (৩) **বলপ্রয়োগের মতবাদ।**

আর ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভিত্তিতে মতবাদ আছে; যথা,—(৪) **পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ**; (৫) **ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ।** অতএব দেখা যায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাঁচটি মতবাদ প্রচলিত আছে। পূর্বে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদগুলি ছিল কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু বর্তমানে ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা ও চর্চার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। নিম্নে এই পাঁচটি মতবাদের আলোচনা করা গেল:

(১) ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ
(Theory of Divine Origin)

মতবাদের বর্ণনা: রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া মানুষকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। এই মতবাদ অনুসারে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা হইত। বিশ্বাস করা হইত যে, রাজার মাধ্যমেই ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন। আবার রাজার

মতবাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ইচ্ছায় যে রাজকার্য পরিচালিত হইত, তাহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছাকে কার্যকরী করার নামান্তর মাত্র। কারণ রাজার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা অভিন্ন। সুতরাং প্রজাগণ কর্তৃক রাজার ইচ্ছাকে অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অমান্য করা। বস্তুত, এই মতবাদ রাজদ্রোহিতাকে ধর্মদ্রোহিতা বলিয়া অভিহিত করে। এই মতবাদকে বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়:—

(১) রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি সংগঠন; (২) রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি; (৩) রাজতন্ত্রই একমাত্র ঈশ্বরানুমোদিত শাসন-পদ্ধতি; (৪) রাজার অবর্তমানে তাঁহার পুত্র রাজা হইবেন; (৫) রাজা তাঁহার কার্যের জন্য একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়ী; (৬) সুতরাং রাজা তাঁহার কার্যের জন্য প্রজাদের নিকট দায়ী নহেন; (৭) প্রজাগণকে বিনাবিচারে রাজ-আজ্ঞা পালন করিতে হইবে; (৮) রাজা প্রজাদিগের মতামত ও আইন-কানুনের ঊর্ধ্বে।

এই ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাজতন্ত্রেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাজা বিহীন রাষ্ট্রেও ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে এমন বহু রাষ্ট্র ছিল যাহা ধর্মীয় অনুশাসনে পরিচালিত হইত। ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে রাষ্ট্র-প্রধান নির্বাচিত হইত। ধর্মীয় নীতি অনুসারে এই নির্বাচন হইত। ঐশ্বরিক মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাধীন রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় নীতিতে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের পরিচালনাধীন রাষ্ট্রকে বলা হইত **ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic State)**।

রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বিশেষ ভাবে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই মতবাদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় ভারতবর্ষ, মিশর এবং চীন প্রভৃতি দেশে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে অবশ্য এই মতবাদের প্রচলন দেখা যায় না। গ্রীসে সোফিস্ট (Sophist) নামে পরিচিত দার্শনিকগণ ঐশ্বরিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ইউরোপে এই মতবাদের প্রচলন শুরু হয় খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের ফলে। মধ্যযুগেও ঐশ্বরিক মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। ধর্মগুরু পোপ ও সম্রাটের মধ্যে রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কত্ব লইয়া বিরোধ সুরু হয়। এই বিরোধের সময় উভয়পক্ষই এই মতবাদটিকে স্ব স্ব পক্ষের স্বার্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করেন রাজার সমর্থকগণ। আর পোপের সমর্থকগণ পোপকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করেন। পরিশেষে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে পোপের পরাজয় হয়। পোপের পরাজয়ের পর সম্রাট নিজ ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই যুগের রাজন্যবর্গ এক স্বেচ্ছাচারিতার ভূমিকা গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রচিন্তাজগতে মতবাদের স্থান ও ইহার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

এই মতবাদ মানুষের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা এবং গণতন্ত্রের উত্থানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হয় নাই এবং অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও রাশিয়ায় এই মতবাদ আরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এই মতবাদের প্রচারকগণের মধ্যে সেন্ট পল (St. Paul), থমাস এ্যকুইনাস্ (Thoms Acquinus), স্যার রবার্ট ফিলমার (R. Filmer) এবং ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই সকল চিন্তাবিদ্‌দিগের

যুক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। থমাস এ্যাকুইনাস্ যদিও এই মতবাদকে সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁহার মতবাদ অপরাপর সমর্থকদের মতো নয়। তাঁহার মতে রাজা ঈশ্বরের নিকট হইতে সকল ক্ষমতা পাইয়া থাকেন জনসাধারণের মাধ্যমে এবং জনসাধারণই তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। থমাস এ্যাকুইনাসের এই মতবাদ মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মধ্যযুগেও ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ চরম রূপ ধারণ করে নাই। তখনও রাজার কর্তৃত্ব জনসাধারণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত।

এ্যাকুইনাসের মতবাদ

ষোড়শ শতাব্দীতে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ এক চরম রূপ ধারণ করে। এই যুগে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া কল্পনা করা হইত এবং বিশ্বাস করা হইত যে, রাজা একমাত্র ভগবানের নিকটই দায়ী। প্রজাদিগের উপর তাঁহার কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব নাই। এই বিশ্বাসের ফলে এই যুগে রাজন্যবর্গ চরম স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই মতবাদের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আর এই মতবাদের স্থান দখল করে সামাজিক চুক্তি মতবাদ। তারপর ইউরোপে নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক চিন্তাজগতে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আবার জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচারিত হইবার ফলে ঐশ্বরিক মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত পড়িল।

সমালোচনা : (১) এই মতবাদের বিপক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। বর্তমানে কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন না যে, রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। ইহা বলা হয় যে, রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান। মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে এবং নিজের সুবিধার জন্য ইহা সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) এই মতবাদ রাজতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করে। ফলে রাজা এবং রাজ-আজ্ঞায় যে সকল আইন-কানুন প্রণীত হয়, তাহাকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখিতে হয়। এই মতবাদ অনুসারে রাজাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়। কিন্তু অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, স্বেচ্ছাচারী ও প্রজাপীড়ক রাজাকে কেহই ভক্তি করিতে চায় না। অত্যাচারী রাজার অত্যাচারে যখন মানুষ নিপীড়িত হয়, তখন কেহই বিশ্বাস করিতে চায় না যে, রাজার ভোগবিলাসের জন্য ঈশ্বর তাহাদের প্রতি এত নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারেন। মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে, কল্যাণকামী রাজাকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হইত। কিন্তু যে রাজা প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়া প্রজারক্ষা করেন না, তাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।

অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজাকে কেহই ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করে না

(৩) বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। বর্তমান যুগে রাজতন্ত্র প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদের বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐশ্বরিক মতবাদ একটি অবাস্তব কল্পনাবিশেষ।

(৪) ধর্মযাজকগণের মধ্যেও অনেকে এই মতবাদটি বিশ্বাস করেন না। এই প্রসঙ্গে হুকারের (Hooker) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুকার বলেন যে, ধর্মের ব্যাপারেই ঈশ্বরের কল্পনা করা যায়, লৌকিক ব্যাপারে নহে। যীশুখৃষ্টের মন্তব্যটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : "সীজারের (অর্থাৎ সম্রাটের)

যাহা-কিছু প্রাপ্য, তাহা সীজারকে দাও ; আর ঈশ্বরের যাহা প্রাপ্য তাহা ঈশ্বরকে দাও" "(Render unto Cæsar the things that are Cæsar's, and render unto God the things that are God's")। অতএব রাজার ঈশ্বরের নামে যে সব কিছু পাইবার অধিকার নাই, তাহা ধর্মযাজকগণও স্বীকার করেন।

(৫) এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় রাজতন্ত্রে। প্রজাতন্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে তাহা ঐশ্বরিক মতবাদ অনুসারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(৬) ঐশ্বরিক মতবাদ অনুসারে রাজন্যবর্গ শুধুমাত্র হুকুম দিবেন আর প্রজাগণ শুধু তাঁহার প্রতি বশ্যতা প্রদর্শন করিবে। এই মতবাদ রাজার কোন দায়িত্বের নির্দেশ দেয় না। যে নীতিতে একপক্ষ বিনাবিচারে অপরপক্ষের হুকুম পালন করিবে তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তাই দেখা যায়, পরবর্তীকালে চুক্তিবাদীদের যুক্তির আঘাতে এই মতবাদ রাষ্ট্রিক চিন্তাজগৎ হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। আবার ইতিহাসেও এমন কোন প্রমাণ নাই যে, ঈশ্বর একটির পর একটি রাজ্য গঠন করিয়া চলিয়াছেন এবং এক একজন রাজাকে রাজত্ব করিবার অধিকার দান করিয়াছেন। বরং ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, কিভাবে যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, হিংস্রতা ও হীনতার ভিতর দিয়া রাজারা সিংহাসন দখল করিয়াছেন। ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজা প্রথম চার্লসের যুদ্ধে পরাজয়, তাঁহার বিচার ও মৃত্যুদণ্ড ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত রাজকীয় মর্যাদায় দারুণ আঘাত হানিয়াছে। এই মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। ইহা শুধু স্বৈরাচারিতার পক্ষপাতী প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তি প্রদর্শন করে। কালক্রমে রাষ্ট্র হইতে চার্চ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইল তখন এই মতবাদ বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

ঐতিহাসিক মূল্য : প্রথমতঃ এই মতবাদ ভ্রান্ত বটে, কিন্তু সেই সুদূর অতীতে সরল ধর্মবিশ্বাসে ভর করিয়া রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায় বিশৃংখল সমাজ-জীবনে যে শৃংখলা আনয়ন সহজতর হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তি মধ্যযুগীয় ধর্মপন্থার নাগপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পার্থিব ব্যাপারের নিয়ামকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে। জনসাধারণের নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ এই নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করে। অবশ্য, শাসকবর্গ যদি মনে করেন যে, আইনের গণ্ডীর বাহিরে নীতি-ভিত্তিক দায়িত্ব তাঁহাদের আছে তবেই শাসন-ব্যবস্থা উন্নততর হইবে।

অতএব উপসংহারে মন্তব্য করা যায় যে, এই মতবাদের যখন সৃষ্টি হইয়াছিল তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু কালান্তরে ইহার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে এই মতবাদের প্রয়োজনীয়তা অনেক পরিমাণে শেষ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য, আজও পাকিস্তান, ইজরায়েল প্রভৃতি দেশ এই মতবাদে বিশ্বাসী। এই মতবাদ একধর্মবিশ্বাসী মানুষ লইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা যোগায়। পাকিস্তান ও ইজরায়েলের উদাহরণ হইতে বলা যায় যে, পশ্চাৎপদ

চিন্তার প্রভাব মানুষের মনে আজও প্রবল। অতএব এই মতবাদ শুধু অতীত ইতিহাসের বস্তু নয়, ইহার প্রভাব আজও লক্ষ্য করা যায়।

রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকার বনাম সামাজিক চুক্তি মতবাদ

(Divine Right Theory *vs.* Social Contract Theory)

ষোড়শ শতাব্দীতে ঐশ্বরিক মতবাদ চরম রূপ ধারণ করে। ফলে রাজন্যবর্গ চরম স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। রাজা তাহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাবলে প্রজাদের উপর অত্যাচার করিত। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজাকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা হইত। বিশ্বাস করা হইত যে, ঈশ্বর রাজার মাধ্যমেই কার্য করিয়া থাকেন। রাজার শুধু ঈশ্বরের কাছেই দায়িত্ব আছে, প্রজার উপর তাহার কোন দায়িত্ব নাই। রাজ-আজ্ঞা আর ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অভিন্ন মনে করা হইত। আর রাজ-আজ্ঞাই ছিল আইন। প্রজাগণকে বিনাবিচারে রাজ-আজ্ঞা পালন করিতে হইত। রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদিগের বিদ্রোহ করার কোন অধিকার ছিল না। রাষ্ট্রদ্রোহিতাকে ধর্মদ্রোহিতা বলিয়া গ্রহণ করা হইত। কারণ, ধর্মকে রাষ্ট্রনীতি হইতে পৃথক করা হয় নাই।

রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার বর্ণনা

রাজার এই ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার নীতির বিরুদ্ধে সপ্তদশ শতাব্দীতে সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচার করেন হবস্, লক্ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক রুশো। সামাজিক চুক্তি মতবাদের উদ্গাতা এই ত্রয়ী এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল তখন মানুষ নিরাপত্তার জন্য নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ বা সমষ্টিগত ইচ্ছারূপ সার্বভৌমের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করে। হবসের মতে এই ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল এক রাজা বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে। রাজা যে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা পাইয়াছে তাহা জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু লকের মতে রাজা যদি এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করে তবে প্রজাগণ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিবে। রাজাকে তিনি চুক্তির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেন নাই। তাঁহার মতে চুক্তির একজন অংশীদার হিসাবে চুক্তির শর্ত পালন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজারও রহিয়াছে। এইভাবে লক্ প্রজাদিগের বিদ্রোহ করার অধিকারকে সমর্থন করেন। রুশো সমষ্টিগত ইচ্ছাকে (General will) সার্বভৌম বলিয়া অভিহিত করেন। এই চুক্তিবাদিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র কোন ঈশ্বরের সৃষ্ট সংগঠন নয়। মানুষের প্রয়োজনেই মানুষ এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আবার রুশো এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আদিম মানুষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে যখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে তখন সার্বভৌম ক্ষমতাও মানুষের সমষ্টিগত ইচ্ছার মধ্যেই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে রাজার কোন স্থান নাই। এইভাবে ত্রয়ী চুক্তিবাদী, হবস্, লক্ ও রুশো প্রমাণ করিলেন যে, রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন সংগঠন নয়, ইহা মানুষেরই সৃষ্টি। রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। রাজতন্ত্রই একমাত্র ঈশ্বরের অনুমোদিত শাসনপদ্ধতি নয়। রাজা তাঁহার ক্ষমতার

চুক্তিবাদীদের যুক্তির আঘাতে ঐশ্বরিক মতবাদ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে

অপব্যবহার করিলে প্রজাদিগের বিদ্রোহ করার অধিকার আছে। রাজার ক্ষমতা প্রজার স্বাধীনতা ও সম্মতির দ্বারা সীমিত হইয়াছে। রুশো ও লকের মতবাদের মধ্যে গণতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল। বলা হইয়াছে যে, রাজা শুধু ঈশ্বরের নিকটই তাঁহার কার্যের জন্য দায়ী নহেন; তিনি তাঁহার কার্যের জন্য প্রজাদিগের নিকটও দায়ী। প্রজাগণও চুক্তির অন্যতম অংশীদার হিসাবে বিনাবিচারে রাজ-আজ্ঞা পালন করিবে না। আর রাজ-আজ্ঞাই আইন নহে। রাজা যেহেতু চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, সেই হেতু প্রজাদিগের সুবিধার্থে প্রজাদিগের বিদ্রোহ করিবার অধিকারকে ধর্মদ্রোহিতা হিসাবে ধরা চলিবে না। কারণ ধর্মকে রাষ্ট্রনীতি হইতে পৃথক করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রচিন্তা-জগতে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ইহা ঐশ্বরিক মতবাদের প্রধান প্রতিবাদ হিসাবে কাজ করে **(The Social Contract Theory was the chief antidote to the Divnie Right Theory)**। এই সামাজিক চুক্তি মতবাদকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন দেশে রাজার স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ফরাসী-রাজ লুইয়ের স্বৈরাচারিতার প্রতিবাদ-স্বরূপ বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে সমগ্র ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়ে। আমেরিকায় যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তাহারও প্রেরণা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ঈশ্বর যে একের পর এক রাষ্ট্র গঠন করিয়া এক একজন রাজার হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন বা করিতে পারেন, এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন চুক্তিবাদিগণ। আর প্রজার উপর রাজার যে বিন্দুমাত্রও দায়িত্ব নাই, রাজা শুধু নিজের ভোগবিলাসের জন্য প্রজাপীড়ন করিবে, এই বিশ্বাসও চুক্তিবাদীদের যুক্তির আঘাতে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। ফলে, রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার নীতি ও ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল।

ঐশ্বরিক মতবাদের প্রতিবাদ

অবশ্য হবস্ ঈশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন নাই। তিনি ধর্ম ও রাজার কার্যের মধ্যে একটি সীমারেখা নির্দেশ করিয়া রাজাকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার অধিকারী করিয়াছেন। লক্ আবার এই রাজার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সীমিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। রুশো চাহিয়াছেন সমষ্টিগত ইচ্ছাকে সার্বভৌম ক্ষমতারূপে প্রকাশ করিতে। অতএব দেখা যায় যে, ঐশ্বরিক মতবাদ যে-রাজতন্ত্রকেই একমাত্র শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, চুক্তিবাদিগণের কেহ কেহ রাজতন্ত্রকে একমাত্র শাসন-পদ্ধতি নয় বলিয়া প্রমাণ করিয়া রাজতন্ত্রের মূলেও আঘাত করিয়াছেন।

(২) সামাজিক চুক্তি মতবাদ

(Social Contract Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ আছে তাহার মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই মতবাদ যে শুধু রাষ্ট্রের উৎপত্তিরই ব্যাখ্যা করে, তাহা নহে। ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতিরও ব্যাখ্যা করে।

মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : সামাজিক মতবাদটি নূতন নহে। রাষ্ট্র যে

মানবিক চুক্তির ফলপ্রসূতে একটি সংস্থা, এই ধরনের চিন্তা বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। **মহাভারতের শান্তিপর্বে** এই মতবাদের উল্লেখ আছে। **কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে** উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রনৈতিক জীবন শুরু হইবার পর মানুষ অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক রাজাকে নির্বাচিত করিল। এই রাজাকে প্রজাবর্গ নিয়মিতভাবে কর প্রদান করিত। আবার রাজাও প্রজাবর্গের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিত।

মতবাদটি বহু প্রাচীন

প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকদিগের মধ্যে **সোফিস্ট** (Sophist) সম্প্রদায় মনে করিতেন যে, রাষ্ট্র চুক্তির ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। গ্রীক্ দার্শনিক **প্লেটো** ও **এ্যারিস্টটলের** গ্রন্থেও চুক্তিবাদের উল্লেখ দেখা যায়—তবে এই দুই চিন্তাবীর চুক্তিবাদের যুক্তিকে খণ্ডন করিবার জন্যই এই মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা এই মতবাদকে সমর্থন করেন নাই।

প্লেটো ও এ্যরিস্টটল এই মতবাদকে সমর্থন করেন নাই

বাইবেলেও সামাজিক চুক্তিবাদের উল্লেখ আছে। **রোমান আইনেও** (Roman Law) চুক্তির কথা বলা হইয়াছে। রোমক আইন অনুসারে জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। রোমক আইনবিদ্ **আলপিয়ানের** মতে, "সম্রাটের ইচ্ছাই আইন; কারণ, জনগণ সমস্ত ক্ষমতাই সম্রাটকে সমর্পণ করিয়াছে।" রোমক যুগের পর **সামন্ত যুগেও** এই মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামন্ত যুগে রাজা ও সামন্তদিগের মধ্যে চুক্তিই সামন্ত যুগের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। **মধ্যযুগেও** বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন আলোচনায় বিভিন্ন মতবাদকে উপস্থাপিত করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে **রিচার্ড হুকারের** (Richard Hooker) Laws of Ecclesiastical Polity (১৫৯৪) নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তিবাদের উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে এই মতবাদ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে যাজক **ম্যানেগোল্ডের** (Manigold) রচনায় ইহা বিশেষ মতবাদ হিসাবে রূপ গ্রহণ করে। ম্যানেগোল্ড সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেন। এইভাবে এই মতবাদ বহু প্রাচীনকালে শুরু হইয়া ধীরে ধীরে রাষ্ট্রচিন্তাক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এত দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও মাত্র তিনজন দার্শনিকের লেখার মধ্য দিয়া এই মতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রচিন্তাক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং বর্তমানের প্রধান রাষ্ট্রাদর্শ গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। এই তিন দার্শনিক হইলেন ইংরেজ দার্শনিক **হব্স্** (Hobbes), ইংরেজ দার্শনিক **জন লক্** (John Locke) এবং ফরাসী দার্শনিক **জ্যাঁ জাক্ রুশো** (Jean Jacques Rousseau)। এই ত্রয়ী দার্শনিকদিগকে চুক্তিবাদী (Contractualists) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই তিনজন দার্শনিকের মতবাদই বর্তমান আলোচ্য বিষয়।

বাইবেলে, রোমক আইনে, সামন্ত যুগ ও মধ্যযুগে এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়

মতবাদের বর্ণনা: সামাজিক চুক্তি মতবাদকে এইভাবে বর্ণনা করা যায়: রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে আদিম মানুষ যে অবস্থায় বাস করিত, তাহাকে

প্রাকৃতিক অবস্থা (State of Nature) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হবসের মতে এই প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল **প্রাক্-সামাজিক (Pre-Social)** অবস্থা; অর্থাৎ, এই অবস্থায় সমাজের উদ্ভব হইয়াছে কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। এই প্রাক্-সামাজিক অবস্থা ছিল ঘৃণ্য, দরিদ্র ও পাশবিক। আবার অন্যতম চুক্তিবাদী লকের মতে এই প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল **প্রাক্-রাষ্ট্রনৈতিক (Pre-Political) অবস্থা**। লকের মতে এই অবস্থায় মানুষের জীবন হবস্ বর্ণিত ঘৃণ্য ও কদর্য ছিল না। ইহা ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। আবার এই প্রাকৃতিক অবস্থাকে রুশো মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তবে এই প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই ত্রয়ীর মতের মধ্যে মোটামুটি একটি ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইল প্রাকৃতিক অবস্থায় আর যাহা-কিছু হউক, কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই।

প্রাকৃতিক অবস্থা

আবার, এই অবস্থায় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও আইন-কানুনও ছিল না। অতএব প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করিত। এই যথেচ্ছচারিতার উপর একমাত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল **স্বাভাবিক আইন (Natural Law)**। প্রকৃতি হইতে মানুষ যে নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝিয়া জীবনে প্রয়োগ করিত, তাহাই স্বাভাবিক আইন। এই স্বাভাবিক আইন আবার মানুষের যে সকল চারিত্রিক দোষগুলি ছিল, যথা—হিংসা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি তাহাদিগকে দমন করিত। স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে এই তিনজন চুক্তিবাদী এক ধারণা পোষণ করিতেন না। প্রাকৃতিক অবস্থার বিধি ছিল—যাহাকে পাও তাহাকেই মার, আর যাহা পাও তাহাই কাড়িয়া লও ("Kill whom you can, take what you can.")। প্রাকৃতিক আইন প্রাকৃতিক অবস্থায় নির্ভর করিত পরিণামদর্শিতা ও প্রয়োজনীয়তার উপর (prudence and expediency)। লক্ অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। লকের মতে মানুষের সহজাত, প্রকৃতিজাত যে নৈতিক ভিত্তি মানবচরিত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া মানুষকে চালিত করে তাহাই স্বাভাবিক আইনের প্রাণবস্তু। তিনি মানুষের নৈতিক কাণ্ডজ্ঞানকে স্বাভাবিক আইনের উৎস হিসাবে ধরিতেন। হবসের মতে আদিম বিশৃঙ্খল প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন আইন থাকিতে পারে না। কারণ, আইনকে বলবৎ করিবার মতো রাষ্ট্র ও সরকার ছিল না।

স্বাভাবিক আইন

প্রাকৃতিক অবস্থায় আবার কোন অধিকার ছিল না। যাহা ছিল তাহাকে বলা হইত **স্বাভাবিক অধিকার (Right of Nature)**। এই অবস্থায় মানুষ ছিল সদা স্বাধীন। প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাকৃতিক আইন মানিয়া মানুষ যে স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করিত তাহাই ছিল স্বাভাবিক অধিকার। স্বাভাবিক অধিকার হইল জীবনের অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার।

স্বাভাবিক অধিকার

চুক্তিবাদের প্রবক্তাগণের মতে মানুষ এইভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বাস করিবার কালে স্বাভাবিক আইন ও অধিকার ভোগ করিয়া যখন বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইল তখন মানুষ নিজেদের মধ্যে **স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির** মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আওতায়, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের নিয়ন্ত্রণে এক রাষ্ট্রীয় জীবন শুরু করিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সকল চুক্তিবাদীই এই চুক্তি সম্বন্ধে এক মত পোষণ করিতেন না। হবসের মতে চুক্তি হইয়াছিল প্রজাবর্গের মধ্যে এবং প্রজাবর্গ নিজেদের মধ্যে চুক্তি

চুক্তির স্বরূপ

সম্পাদন করিয়া সকল ক্ষমতা ও অধিকার রাজার হস্তে সমর্পণ করে। লক্ আবার এই মত পোষণ করিতেন যে, চুক্তি হইয়াছিল দুইটি। প্রথম চুক্তি হয় জনসাধারণের মধ্যে এবং সকল ক্ষমতা সর্বসাধারণে সমর্পণ করা হয়। প্রথম চুক্তিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আর দ্বিতীয় চুক্তিতে রাষ্ট্রযন্ত্র বা সরকার গঠিত হয়। এই চুক্তি হইয়াছিল ব্যক্তি-সংসদ বা রাজার সহিত। হব্‌স্ ও লক্ উভয়েই ছিলেন রাজতন্ত্রের উপাসক। হব্‌স্ ছিলেন চরম রাজতন্ত্রের সমর্থক আর লক্ ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। অবশ্য লক্ সকল ক্ষমতা সর্বসাধারণে সমর্পণের এবং সার্বভৌমের ক্ষমতা জনগণের অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এমনকি প্রজার স্বার্থে প্রজাবিদ্রোহের সমর্থন করেন। এইভাবে **লক্ জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব ও গণতন্ত্রের পথ** উন্মুক্ত করেন এবং রাজাকে চুক্তির অংশীদার করিয়া রাজাকে চুক্তির শর্তপালনে বাধ্য করানোর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করেন।

রুশো যদিও হব্‌সের ন্যায় বলেন যে, চুক্তি হইয়াছিল একটি, কিন্তু তিনি রাজাকে চুক্তির অংশীদার করেন না। কারণ তাঁহার ধারণায় রাজতন্ত্রের কোন স্থান নাই। **সমষ্টিগত ইচ্ছাকেই (General will)** তিনি সার্বভৌম বলিয়া আখ্যায়িত করেন। রুশোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ ছিল সুখী ও স্বাধীন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে এবং নিজেদের মধ্যে চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা সর্বদাই সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করিত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীন থাকিবে। রুশো-বর্ণিত সামাজিক চুক্তি সমষ্টিগত ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সার্বভৌম ক্ষমতা-প্রয়োগ সমষ্টিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইল, হব্‌সের অভিমত অনুযায়ী রাজার হস্তে নয়, অথবা লকের অভিমত অনুযায়ী সংসদের হস্তে নয়, ইহা ন্যস্ত করা হইল সমাজের নিকট, যে সমাজ ছিল সুবিপুল গণশক্তির আধার। রুশোর মতে সরকারও চুক্তির পক্ষ নহে। সুতরাং সরকারও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। গণসার্বভৌম ইচ্ছা করিলেই সরকারকে রদ-বদল করিতে পারে। অবশ্য চুক্তির প্রকৃতি যাহাই হউক এবং চুক্তির সংখ্যা এক বা একাধিক হউক ইহা সকল চুক্তিবাদীই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থার সকল অসুবিধার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই আদিম মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল।

সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়

সামাজিক চুক্তিবাদের **উদ্দেশ্য ছিল দুইটি**; যথা—(১) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা আর, (২) শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের নির্দেশ দেওয়া। চুক্তিবাদ যে সময়ে প্রচারিত হয় সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের ফলে দেশে অরাজকতা আরম্ভ হয়। হব্‌স্ তাঁহার লেভায়াথান গ্রন্থে রাজতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য এই চুক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি চুক্তিবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেন এবং সেই প্রসঙ্গে রাজা ও প্রজার মধ্যে সম্পর্কের নির্দেশ দান করেন। হব্‌স্ ছাড়া অন্যান্য চুক্তিবাদীরাও চুক্তিবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা করেন এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের নির্দেশ

চুক্তিবাদের উদ্দেশ্য

দান করেন। অতএব দেখা যায়, প্রধানতঃ উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যই চুক্তিবাদ প্রচারিত হয়।

এই মতবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল ঃ (১) প্রাকৃতিক অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করা ; (২) চুক্তি হইয়াছিল মানুষের স্বেচ্ছাকৃত ; (৩) প্রাকৃতিক অবস্থায় রাষ্ট্র ছিল না ; (৪) স্বাভাবিক আইন ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক আইন ছিল না ; (৫) স্বাভাবিক অধিকার ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া কিছু ছিল না, কারণ রাষ্ট্রের তখনও জন্ম হয় নাই ; (৬) পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

এক্ষণে, এই তিনজন চুক্তিবাদী—হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইতেছে ঃ

(ক) হবসের অভিমত (Hobbes) ঃ হবস্ ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক। ১৬৫১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত লেভায়াথান (Leviathan) গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

হবসের সময়ে ইংলণ্ডে প্রজা-বিদ্রোহ এবং ক্রমওয়েলের সাধারণতন্ত্র ইংলণ্ড-বাসীদের জীবন বিপর্যস্ত করিয়া তোলে। এই সময়ে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ফলে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকাই কঠিন হইয়া পড়ে। হবস্ সমাজের এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আবার ঐশ্বরিক মতবাদের মধ্যেও তিনি বিশেষ কোন যুক্তি খুঁজিয়া পান না। তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের উপাসক। সমাজের শান্তি ফিরাইয়া আনিতে হইলে রাজার মতো শাসকের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিলেন। আবার প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী রাজাকে ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিনিধি বলিয়া যুক্তিবাদী হবস্ স্বীকার করিতে পারিলেন না। অথচ রাজাকে তাঁহার সমর্থন করিতেই হইবে। সুতরাং যুক্তির দরবারে তিনি চুক্তির মতবাদকে উপস্থাপিত করিলেন।

হবসীয় মতবাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

হবস্ মানুষের প্রকৃতির উপর তাঁহার মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ চরিত্রগতভাবে স্বার্থপর, লোভী, ধূর্ত, নির্দয় ও আক্রমণমুখী। অতএব প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ ছিল স্বেচ্ছাচারী। "জোর যার মুল্লুক তার", এই নীতিতেই স্বাভাবিক আইন পর্যবসিত হইয়াছিল। নিজের বলে যে যতটুকু অধিকার বজায় রাখিতে পারিত, ততটুকুই ছিল তাহার স্বাভাবিক অধিকার। অতএব এই স্বাভাবিক অধিকারও ছিল শক্তি-নির্ভর। হবস্ বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। হবসের মতে এই অবস্থা ছিল অতি ভয়াবহ। এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ লাগিয়াই ছিল। স্বার্থপর মানুষেরা প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভয়ে ভীত। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালাইত। প্রতিবেশীর হস্ত হইতে একমাত্র পরিত্রাণের উপায় ছিল নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা। আদিম মানুষ এই কারণে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে লাগিল। সুতরাং তাহাদের জীবন হইয়া উঠিল নিঃসঙ্গ, ঘৃণ্য, দরিদ্র,

মানুষের প্রকৃতির উপর মতবাদ রচনা করেন হবস্

হবস্-বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থা

পাশবিক এবং অনিশ্চিত।* হব্‌সের মতে এই প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল প্রাক্‌-সামাজিক (Pre-social) অবস্থা।

অতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই মানুষ মুক্তির সন্ধান খুঁজিতে লাগিল। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেকে তাহার স্বাভাবিক অধিকার চূড়ান্তভাবে কোন এক ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তি-সংসদের (assembly of men) হস্তে সমর্পণ করিল। একজন আদিম মানুষ এই শর্তে তাহার নিজেকে চালাইবার অধিকার ত্যাগ করিল এবং সমস্ত ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের হস্তে সমর্পণ করিল যে, অপর আর একজন আদিম মানুষ তাহার নিজেকে চালাইবার ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া অনুরূপভাবে সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে সমর্পণ করিবে এবং একই ভাবে উহার সকল কার্যের ক্ষমতা উহাকে প্রদান করিবে।† অতএব দেখা যায়, আদিম মানুষ যেদিন তাহার সকল ক্ষমতা ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে সমর্পণ করিল, তখন তাহার আর কোন অধিকার অবশিষ্ট রহিল না। আর এইভাবে জন্মগ্রহণ করিল সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ। ইহাই বিশাল লেভায়াথান বা শ্রদ্ধাভরে বলা যায় মরণশীল দেবতা, যিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে ও নির্দেশে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার সর্বময় নিয়ন্তা।

হব্‌সীয় মতবাদের সারকথা।

হব্‌সের মতবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১) রাজা বা কোন ব্যক্তি-সংসদ হইলেন চরম ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, আদিম মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিয়া নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া বাকী সকল অধিকার রাজা বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

(২) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ চুক্তির ঊর্ধ্বে। কারণ তাঁহারা চুক্তির অংশীদার নহেন। চুক্তির ফলেই এই সার্বভৌম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের উদ্ভব হইয়াছে, চুক্তির পূর্বে নহে। ('A superior, or sovereign exists by virtue of the pact, not prior to it.'—Dunning)।

(৩) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ করার কোন অধিকার নাই ; কারণ, ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ চুক্তির অংশীদার নয় বলিয়া, চুক্তির শর্তপালন করিবার দায়িত্বও তাহার বা তাহাদের নাই। অর্থাৎ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ যদি অত্যাচারীও হয়, তথাপি তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার প্রজাদের নাই।

এই যুক্তির দ্বারা তিনি ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, স্টুয়ার্ট রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার ইংলণ্ডের জনসাধারণের নাই। ইহাই ছিল হব্‌সের সকল বক্তব্যের সার কথা।

*"Conditions in the state of nature made man's life solitary, poor, nasty, brutish and short' —*Hobbes*,

† "as if every man should say to every man, I authorise and give up my right of governing myself to this man or this assembly of men, on this condition that thou give up thy right to him and authorise his actions in like manner."

(৪) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারেন কিন্তু প্রজাসাধারণের চুক্তি ভঙ্গ করিবার কোন অধিকার নাই। তাহারা আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া সকল অধিকারই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। কারণ, আত্মরক্ষার অধিকার সমর্পণ করা যায় না। প্রজা-সাধারণের চুক্তিভঙ্গ করিবার অধিকার না থাকার কারণ হিসাবে হবস্ বলেন যে, প্রজাসাধারণ চুক্তিভঙ্গ করিলে প্রজাদের সমস্ত অধিকার ফিরিয়া আসিবে সত্য, কিন্তু তাহা সেই ভয়ংকর প্রাকৃতিক অবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের মধ্য দিয়াই ফিরিয়া আসিবে।*

(৫) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজা বা ব্যক্তি-সংসদের আদেশই হইল আইন।

(৬) প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা সার্বভৌমের আজ্ঞা অথবা আইন দ্বারা সীমিত অর্থাৎ সার্বভৌম যতটা প্রজাসাধারণের অধিকার দান করেন ততটাই তাহাদের স্বাধীনতা। অবশ্য, প্রজাদের আত্মরক্ষার অধিকার বা স্বাধীনতা সার্বভৌমের হস্তে সমর্পণ করে নাই বলিয়া, বা হইতে পারে না বলিয়া, তাহাও প্রজাদের অন্যতম স্বাধীনতা।

(৭) হবসের মতে অবাধ রাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা। তিনি ব্যক্তি-গোষ্ঠীর শাসন অপেক্ষা রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; কারণ, রাজা শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়াছেন, তাঁহার নূতন কিছু পাইবার নাই। অপরদিকে একটি গোষ্ঠীর হস্তে শাসনক্ষমতা অর্পিত হইলে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অশান্তি সৃষ্টি হইবে।

হবসীয় মতবাদের সমালোচনা ঃ হবসের মতবাদ সমালোচনা করিতে হইলে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, হবস্ চরমতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এই চরমতন্ত্র রাজতন্ত্রের মাধ্যমেও হইতে পারে। আবার সাধারণতন্ত্রের মাধ্যমেও হইতে পারে। অবশ্য, চরম সাধারণতন্ত্রকে (assembly of men) সমর্থন করার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হবস্ ছিলেন চরম রাজতন্ত্রের সমর্থক। এই প্রসঙ্গে স্যাবাইন বলেন ঃ "হবস্ চরম রাজতন্ত্রের সমর্থনে মতবাদ রচনা করিতে গিয়া কার্যক্ষেত্রে বিরুদ্ধ কার্যই করিয়াছেন।"

দ্বিতীয়তঃ, হবস রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্যের নির্দেশ করেন নাই। রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন না করিয়াও যে সরকারের পরিবর্তন সম্ভব, তাহা তিনি বুঝিয়া হউক বা না হউক, অনুমোদন করেন নাই।

তৃতীয়তঃ, হবস্ কল্পিত চুক্তিতে একটিমাত্র পক্ষই ছিল। কিন্তু একটিমাত্র পক্ষ একাকী কোন চুক্তি করিতে পারে না। একজন লোক নিজেই নিজের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে না। হবসের চুক্তিতে যাহাকে অপর পক্ষ হিসাবে ধরা যাইতে পারে, তাহাকে আবার চুক্তির উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা বর্তমান ধারণার দ্বারা সমর্থিত হয় না।

উপসংহারে বলা যায় যে, হবসের ধারণাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা অযৌক্তিক। আইভর ব্রাউন বলেন ঃ "হবস্ হইলেন নিয়মানুবর্তিতার প্রথম দার্শনিক (Hobbes is the first philosopher of discipline)। গেটেলের মতে একদিকে চরম রাজতন্ত্র অপরদিকে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণই যে চূড়ান্ত ক্ষমতার

* For Hobbes "there is no choice except between absolute power and complete anarchy, between an omnipotent sovereign and no society wherever"—*Sabine*.

অধিকারী—এই দুইটি মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে হব্‌সের প্রচেষ্টা যে যুক্তি-বিজ্ঞানের দিক দিয়া অনন্যসাধারণ, তাহা সন্দেহাতীত। হব্‌স্ ছিলেন লক্ ও রুশোর মতবাদের পথপ্রদর্শক।

পরিশেষে বলা যায়, নিয়মানুবর্তিতার দর্শন রচনাকালে হব্‌স্ (১) আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা ও (২) রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যকে পরিস্ফুট, করিয়াছেন যাহা পরবর্তীকালে অস্টিনের সার্বভৌমত্বের ভিত্তি রচনা করিতে সাহায্য করে।

(খ) জন লকের অভিমত (John Locke)ঃ হব্‌স্ ছিলেন নিরংকুশ রাজতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু এই নিরংকুশ রাজতন্ত্রের যুক্তি মানুষ সমর্থন করিতে পারে নাই। লোকে প্রশ্ন করিতে লাগিল ঃ যে চুক্তি অতীতে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা চিরকাল অপরিবর্তনীয় থাকিবে কেন? আবার চুক্তির শর্ত পালন করিবার দায়িত্ব এক পক্ষের উপরেই বা বর্তাইবে কেন? লোকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, হব্‌স্ প্রাকৃতিক অবস্থাকে যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, প্রাকৃতিক অবস্থা কি এতই খারাপ ছিল? রাষ্ট্র বজায় রাখিয়া রাজাকে পরিবর্তন করা যাইবে না কেন? এই সকল প্রশ্নে জর্জরিত হব্‌সীয় মতবাদের বিরুদ্ধে এবং এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য লক্ তাঁহার লেখনী ধারণ করিলেন। তিনি তাঁহার ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Two Treatises on Civil Government গ্রন্থে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন।

হব্‌সীয় মতবাদের প্রতিবাদ

লকের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ছিল বিপ্লবমুখর। ইংলণ্ডের জনসাধারণের অনেকে দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্যচ্যুতি ও বেদেশী উইলিয়ামের সিংহাসনারোহণকে সমর্থন করে নাই। সুতরাং বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল। এই সময়ে যে বিপ্লব ঘটে তাহা ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব নামে খ্যাত। লক্ তাঁহার এই গ্রন্থে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত ইংলণ্ডের বিপ্লবের ন্যায্যতা প্রমাণ করেন। লক্ শুধু দ্বিতীয় জেম্‌সের সিংহাসনচ্যুতিরই যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন নাই, সকল অত্যাচারী রাজারই সিংহাসনচ্যুতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন; লক্ তাঁহার গ্রন্থে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, রাষ্ট্রশক্তি শাসিতের ইচ্ছার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাক্-সামাজিক অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর প্রাক্-রাষ্ট্রনৈতিক ছিল। এই প্রাকৃতিক অবস্থায় এক প্রকারের সমাজ-জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ, বিশৃংখল ও দুর্বিষহ। আর লকের মতে ইহা ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। লকের দর্শনে হব্‌সের ন্যায় মানুষকে ধূর্ত, নির্দয়, হিংসুক বলিয়া কল্পনা করা হয় নাই। তাঁহার মতে মানুষ মূলতঃ আত্মসর্বস্ব অসামাজিক জীব নহে। সে স্বাভাবিক আইন মানিয়া চলে।

প্রাকৃতিক অবস্থা

হব্‌সের মত লক্‌ও বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। অতএব রাষ্ট্রীয় আইন বলিতে যাহা বুঝায় তাহা প্রাকৃতিক অবস্থায় ছিল না। যাহা ছিল তাহাকে স্বাভাবিক আইন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই স্বাভাবিক আইনের (Law of Nature) অর্থ প্রাকৃতিক নিয়ম বা আইন। মানুষের সহজাত ন্যায়বোধের উপর এই আইন প্রতিষ্ঠিত ছিল। লকের মতে স্বাভাবিক আইনের উদ্দেশ্য ছিল সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রকৃতিক অবস্থায় মানুষ যুক্তি ও বিবেকের

লকের মতে স্বাভাবিক আইন

অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হইত। ন্যায়বোধ ও প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা মানুষের কার্য নিয়ন্ত্রিত হইত।

লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় সব মানুষই ছিল স্বাধীন। আবার স্বাধীনতা সম্পর্কে হব্‌স্‌ ও লক্‌ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। লকের মতে স্বাধীনতা হব্‌স'-বর্ণিত অনিয়ন্ত্রিত হিংস্র উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। ইহা ছিল স্বাভাবিক আইন ও যুক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ। লকের মতে বন্দীশালার শৃঙ্খলা মানুষের কাম্য নহে। মানুষ চায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্পত্তির নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষে মানুষে সাম্য ও সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হইত। এই অধিকার ছিল বাস্তব, সর্বজনীন, চিরন্তন এবং অবাধ ("objective, eternal and universal)। স্বাভাবিক অধিকার (**Natural Rights**) বলিতে লক্‌ ব্যক্তিগত "নিরাপত্তার" উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন। এই অধিকার স্থান, কাল ও অবস্থানির্বিশেষে স্বীকৃত হয়। তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ প্রত্যেকের এই অধিকারগুলিকে মান্য করিয়া চলিত। ফলে প্রাকৃতিক অবস্থায় সাম্য, স্বাধীনতা, সুখ ও শান্তি বিরাজ করিত।

স্বাভাবিক অধিকার

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, তবে কেন মানুষ এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল? লক্‌ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থার তিনটি অভাব ছিল; যথা—প্রথমতঃ, ন্যায় ও অন্যায়ের নির্দেশক সকল বিরোধ নিষ্পত্তির মানদণ্ড, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও সর্বজনস্বীকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত সুনির্দিষ্ট সুপরিজ্ঞাত আইন ছিল না: অর্থাৎ স্বাভাবিক আইনের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না;*

দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্‌ বিচারক ছিল না; আইনের ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থা ছিল না;

তৃতীয়তঃ, ন্যায় বিচারকে কার্যকরী করিবার মতো কর্তৃত্ব ছিল না; অর্থাৎ আইন বলবৎ করিবার কোন উপায় ছিল না।

অতএব জীবনকে সুন্দরতর ও নিরাপদ করিবার জন্য এবং স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে যথাসম্ভব ভোগ করিবার জন্য মানুষ প্রতিষ্ঠা করিল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ। মানুষ আইন প্রণয়ন করিল। প্রতিষ্ঠিত হইল শাসনযন্ত্র। এই শাসনযন্ত্র মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিল। লক্‌ এই মত ব্যক্ত করেন যে, "প্রাকৃতিক অবস্থার দায়িত্ব সামাজিক জীবনে অবলুপ্ত হইয়া যায় না।"** আবার আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আইনের উদ্দেশ্য হইল স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং তাহার পরিধিকে বিস্তৃত করিয়া লওয়া, তাহাকে ধ্বংস করা বা খর্বিত করা নহে।"†

রাষ্ট্র, সরকার ও আইনের উদ্দেশ্য

* "First the want of an established, settled, known law received and allowed by common consent to be the standard of right and wrong and the common measure to decide all controversies between them."

** "The obligations of the law of nature cease not in society."

† "The end of the law is not to abolish or restrain but to preserve and enlarge freedom"

এইভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সুশৃংখল সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য মানুষ যে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিল তাহা হবসের মতে চুক্তিরই মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য, হবসের মতে এই চুক্তি হইয়াছিল একটি। আর লকের মনে এই চুক্তি হইয়াছিল দুইটি। প্রথম চুক্তিটি হইয়াছিল আদিম মনুষ্য সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে। এই চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। প্রথম চুক্তিতে, (ক) কতকগুলি মাত্র অধিকার সমর্পণ করা হয়; (খ) এই অধিকার সমর্পণ করা হয় সর্বসাধারণ্যে অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে নহে; (গ) আর এই চুক্তি হইয়াছিল কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য

প্রথম চুক্তিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়

দ্বিতীয় চুক্তি সম্পাদিত হয় সমগ্র সম্প্রদায়ের সহিত রাজা বা সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত কোন প্রধানের সহিত। এই চুক্তিতেই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকারের প্রতিষ্ঠা হইল। বলা হয় যে, রাষ্ট্র তাহার সংগঠিত চরিত্রের সাহায্যে সরকার গঠন করিল এবং শাসক নির্বাচন করিল। অতএব দেখা যায়, লকের মতে শাসকের ক্ষমতা এই দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা সীমিত হইয়াছে। এই শাসককে সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত আইনকে বলবৎ করিতে হইবে। আর যে বিশেষ উদ্দেশ্যে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে কার্যকরী করিতে হইবে। কিন্তু সরকার যদি এই উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়, সরকার যদি অক্ষম হয় তবে নিশ্চয়ই জনসাধারণের এই সরকারকে গদীচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। কারণ চুক্তির বলে যে গদীতে সমাসীন হইয়াছে, সে যদি চুক্তির শর্ত পালন করিতে না পারে, তবে যে আসনে সে আসীন হইয়াছে সেই আসনে বসিবার অধিকার আর তাহার থাকিবে না। এইভাবে লক্ সম্প্রদায়ের ও ব্যক্তির বিদ্রোহ করিবার ও রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অধিকারের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। লক্ তাঁহার যুক্তিজালের মধ্য দিয়া প্রমাণ করিলেন যে, সরকারের উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা। আর সরকারের ভিত্তি হইল জনসাধারণের সম্মতি। অতএব প্রজার অধিকার ও স্বাধীনতার দ্বারা সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। রাজ-আজ্ঞাকে লক্ আইন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। প্রচলিত প্রথাগত আইনকে বিধিসম্মত ব্যবস্থার মাধ্যমে রূপদান করিতে হইবে। চুক্তি সম্পাদনের পর যে মূল অধিকার সকলের হাতে রহিয়া গেল তাহা হইল জীবনের অধিকার আর স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার।

দ্বিতীয় চুক্তিতে সরকার গঠিত হয়

লক্ জনগণের সার্বভৌমিকতার নীতির একজন প্রধান প্রবক্তা। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি সমর্থন করেন। সরকারী কাজগুলি সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করার জন্য সরকারী যন্ত্রকে তিনি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন; যথা,—(১) আইন প্রণয়ন বিভাগ (২) কার্যকরী বিভাগ; (৩) ফেডারেটিভ (Federative) বিভাগ (ভিন্ন রাষ্ট্রসম্পর্কিত কার্যাবলী)। এইভাবে লক্ গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন যাহা পরবর্তীকালে রুশো ও মঁতেসকিউয়ে প্রভৃতি চিন্তাবীরদের হস্তে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়।

লকের মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলির সার-সংক্ষেপ :

(১) লকের মতানুসারে প্রাকৃতিক অবস্থা জঘন্য ছিল না বটে কিন্তু কতকগুলি অসুবিধা ছিল। (২) প্রাকৃতিক অবস্থায় স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকার ছিল। (৩) রাষ্ট্র গঠিত হইল চুক্তির মাধ্যমে। (৪) চুক্তি হইয়াছিল দুইটি। প্রথম চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় আর দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা সরকার গঠিত হয়। (৫) চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইল নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র। রাজাকে চুক্তির অংশীদার হিসাবে ধরা হয়। অতএব চুক্তির অংশীদার হিসাবে তাঁহার সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে। (৬) রাজার আজ্ঞাই আইন নহে। আইনের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথাগত আইন স্বীকৃত হইল। (৭) রাজা প্রজার প্রতি কর্তব্য পালন না করিলে প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারিবে। কারণ রাজার রাজত্ব প্রজার সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। (৮) জনগণের সার্বভৌমিকতার নীতি তিনি প্রচার করেন। (৯) সরকারী কার্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। (১০) সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। (১১) প্রজাবর্গ রাজাকে সকল অধিকার সমর্পণ করে নাই। এইভাবে গণতন্ত্রের নীতি-পুষ্ট লকের মতবাদ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রচিন্তাক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

লকের মতবাদের সমালোচনা : প্রথমতঃ, লক্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। হবস্ কিন্তু রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। হবসের এই পার্থক্য না দেখানোর কারণ স্বৈরাচারিতার সমর্থন করিতে গিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা মাত্র। লক্ কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা নহে এবং 'রাষ্ট্রের ইচ্ছা সরকারের ইচ্ছা ও কার্যাবলীর সীমা নির্দেশ করে।* এখানে যদিও তিনি রাষ্ট্রকে সরকারের উপরে স্থান দিয়াছেন কিন্তু রাষ্ট্র আর সরকার যে এক নয় তাহা তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন।

রাষ্ট্র আর সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়

দ্বিতীয়তঃ, আবার রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল প্রজাসাধারণের ইচ্ছা—জনমত। রাজার ক্ষমতা জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ, রাজা জনমতের অনুশাসন অনুসারে শাসনকার্য করিয়া থাকেন। অতএব জনমত যদি কখনও উপেক্ষিত হয়, তবে জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে। লক্ জনসাধারণকে রাজার বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ভাবে বিদ্রোহ করিবার অধিকার দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডানিং-এর মন্তব উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : "ব্যক্তির সুখ ও নিরাপত্তার জন্য সরকারের অস্তিত্ব শুধু আবশ্যকীয়ই নহে, ইহা হইল সেই উদ্দেশ্য যাহা সাধন করিবার জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে"; অর্থাৎ, যে সরকার ব্যক্তিকে সুখী করিতে পারিবে না এবং নিরাপত্তা রক্ষা করিতে পারিবে না সেই সরকারের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহার পরিবর্তন আইনসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত।

ডানিং-এর মন্তব্য

তৃতীয়তঃ, এইভাবে লক্ সরকারের ক্ষমতাকে সংকুচিত করেন এবং সরকারকে

*"Sovereignty of the State is not sovereignty of the ruler and, the will of the State may limit the will and actions of a ruler."—*Locke.*

সাধারণের ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আর জনসাধারণের বিদ্রোহের ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া একদিকে যেমন স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন আবার অপরদিকে গণতন্ত্রের মতবাদকে প্রচার করিয়াছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রাধান্যের নীতি স্বীকৃত হওয়ায় জনতার সার্বভৌমিকতার নীতি উপস্থাপিত করা হইল।

লকের মতবাদ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের চিন্তা-ক্ষেত্রের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও লকের মতবাদের কতকগুলি ত্রুটি ছিল।

প্রথমতঃ, লকের মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল এই যে, তিনি সার্বভৌমিকতার নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নাই। তিনি যে সার্বভৌমিকতার নীতি প্রচার করিলেন তাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলিয়া অভিহিত করা যায়। বর্তমানে যাহাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা বলা হয়—তাহার কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা ও আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য নির্ণয় করেন নাই। অবশ্য, ইহার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাকে স্বীকার করিতে তিনি বিপ্লবের অধিকারকে সমর্থন করিতে পারিতেন না। কারণ, আইনসঙ্গত সার্বভৌমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কাম্য নহে। হবস্ প্রজাবিদ্রোহ সমর্থন না করার জন্যই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার নীতিটি প্রচার করেন।

সার্বভৌমিকতার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না

এই প্রসঙ্গে গেটেল বলেন ঃ "বিপ্লব যতই আকাঙ্ক্ষিত হউক না কেন, ইহা যে কখনও আইনসঙ্গত নয়, তাহা লক্ উপলব্ধি করেন নাই"।*

দ্বিতীয়তঃ, লক্ চরম রাজতন্ত্রের—সমর্থক ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেন এবং রাষ্ট্রশক্তিকেও সীমিত করেন।

তৃতীয়তঃ সাম্যের বিচারে লক্ স্বাধীনতার ধারণাকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, দ্বিতীয় বা সরকারী চুক্তির কথাও লক্ পরিষ্কারভাবে বলেন নাই। বার্কার এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, লক্ কোন সরকারী চুক্তির কথাই স্বীকার করেন নাই। তিনি একমাত্র সামাজিক চুক্তির কথাই উল্লেখ করেন। সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমাজগঠনের পর জিম্মা (a fiduciary sovereign) সৃষ্টি করা হয়। অনেকের মতে এই জিম্মার ধারণার মধ্যেই সরকারী চুক্তির কথা নিহিত আছে। বার্কারের মতে লক্ অবশ্য এই ধারণা পোষণ করিতেন না। এই জিম্মার ধারণায় তিনটি পক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় ;—(১) যাহারা জিম্মা সৃষ্টি করে (trustor); (২) জিম্মাদার (trustee); এবং (৩) ঐ জিম্মার সুবিধা-ভোগকারী (the beneficiary of the trust)। এই জিম্মার ব্যাপারে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ জিম্মার সৃষ্টিকারী ও জিম্মাদারের মধ্যে চুক্তি হয় ; কিন্তু তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ সুবিধা-ভোগকারী সমাজ চুক্তির বাহিরে থাকে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এই জিম্মার ধারণা প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, সমাজ হইল জিম্মার স্রষ্টা এবং সুবিধা-ভোগকারী। অর্থাৎ সমাজ হইল প্রথম ও তৃতীয় পক্ষ। আবার জিম্মাদার হইল সরকার। এখন সমাজের যে পক্ষ জিম্মার স্রষ্টা এবং জিম্মাদার তাহাদের মধ্যেই চুক্তি হয়। কিন্তু বার্কার বলেন যে, লক্ জিম্মার সুবিধা-ভোগকারী হিসাবে সমাজের সহিত জিম্মাদার সরকারের চুক্তির কথা চিন্তা করেন নাই। লক্ সমাজকে

দ্বিতীয় চুক্তি সম্পর্কে লকের ধারণা সম্বন্ধে মতভেদ

*Locke failed to see that revolution however desirable, is never legal."—*Gettel.*

প্রধানতঃ জিম্মার সুবিধা-ভোগকারী হিসাবেই দেখিয়াছেন। অতএব সমাজের সহিত সরকারের চুক্তির কথা তিনি ভাবেন নাই। সরকার একক ভাবেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য, বলা হইয়াছে যে, সরকারের হস্তে যে ক্ষমতা গচ্ছিত আছে তাহা অব্যবহৃত হইলে সরকারকে গদীচ্যুত করা যাইবে।

উপসংহারে বলা যায়, লকের মতবাদের দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র-চিন্তাজগতে লকের অবদান নগণ্য নহে। শাসিতের সম্মতির ভিত্তিতেই যে রাষ্ট্রের পরিচালনা হওয়া উচিত, তাহা লকই অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন। বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার ধারণা এবং সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য-নির্দেশ লকই প্রথম করেন।

(গ) **রুশোর (Rousseau) অভিমত :** ফরাসী দার্শনিক জঁ্যা জ্যাক্ রুশোর হস্তে সামাজিক চুক্তি মতবাদ এক নূতন রূপ ধারণ করে। এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাহায্যে হবস্ প্রমাণ করিলেন অসীম, অবাধ রাজতন্ত্রের ন্যায্যতা ; আবার লক্ এই একই মতবাদের সাহায্যে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের ন্যায্যতা প্রমাণ করেন। আর রুশো প্রমাণ করিলেন এই মতবাদের সাহায্যে গণতন্ত্রের অপরিহার্যতা। ১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয় রুশোর বিশ্ববিশ্রুত 'সামাজিক চুক্তি' (Contract Social)।

'সামাজিক চুক্তি' নামক গ্রন্থ ছাড়াও রুশো তাঁহার 'Discourse on Inequality' নিবন্ধে প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রুশো তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য হব্‌স্ ও লকের সেই প্রাকৃতিক অবস্থা ও সামাজিক চুক্তির ধারণাই ব্যবহার করিলেন বটে, কিন্ত রুশোর হস্তে এই প্রাকৃতিক অবস্থা ও সামাজিক চুক্তির ধারণা এক নূতন রূপে পরিগ্রহ করে।

রুশো তাঁহার পূর্ববর্তী চিন্তাবীর হব্‌স্ ও লকের মতো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হইয়া শুধু ব্যক্তিগত ধারণাকে রূপদান করিবার জন্যই মতবাদ প্রচার করেন। তিনি কোন প্রতিষ্ঠান বা মতবাদের সমর্থনেও এই মতবাদ প্রচার করেন নাই। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহাকে মতবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে ডানিং-এর মন্তব্যই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : "কোন ব্যক্তিবিশেষের ধারণায় যে সামাজিক চুক্তি মতবাদের মতো প্রভাবশালী মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে সত্যই বিরল।"

ব্যক্তিগত ধারণা

আবার রুশোর ব্যক্তিগত ধারণার দুইটি দিক্ আছে ; যথা—(ক) সামাজিক সচেতনতা এবং (খ) ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ। এই প্রসঙ্গে হার্নস্ বলেন : 'রুশো প্লেটোর মতই সচেতন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূজায় তিনি লক্‌কেও অতিক্রম করিয়াছেন।"*

রুশোর চিন্তার প্রধান বিষয় হইল সার্বভৌমিকতার সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন করা। আবার এই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভোগ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রের। রুশো এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতার সহিত সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন সাধারণ বা সমষ্টিগত ইচ্ছা মতবাদের (General will) মাধ্যমে।

---

*"His sense of community was as keen as Plato's and his love for individual freedom was more consuming than Locke's".—*Hearnshaw.*

রুশো হবসের মত প্রাকৃতিক অবস্থাকে ঘৃণ্য. পাশবিক ও দুর্বিষহ বলিয়া কল্পনা করেন নাই। সভ্যসমাজের কৃত্রিমতা, কুটিলতায় ক্ষুব্ধ রুশো প্রাকৃতিক অবস্থাকে শুভ ও কল্যাণময়রূপে কল্পনা করিলেন। রুশোর মতে এই প্রাকৃতিক অবস্থায় হিংসা, নিষ্ঠুরতা, হানাহানির দ্বন্দ্ব, কপটতা ও জটিলতার জটাজালের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় যাহারা বাস করিত, সেই আদিম সরল মানুষের মধ্যে ছিল সরলতা, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব। রুশোর ভাষায় বলা যায় মর্ত্যজগতে যেন স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে। এই প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ ছিল স্বাধীনচেতা, সরল ও সন্তুষ্ট। এই প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। হবস্ যে মানুষকে বলিলেন হিংস্র, স্বার্থান্বেষী, তাহাকেই রুশো বলিলেন মহান্, মুক্ত ও বন্য। হবস্ মানুষকে প্রকৃতিগত ভাবেই ঘৃণ্য, হিংস্র হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রুশো মানুষের প্রকৃতিকে মহান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে রুশোর ধারণা

প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এবং সভ্যসমাজের কপটতায় ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি মানবসমাজকে আহ্বান করিয়া বলিলেন: "সুখী হইতে হইলে আদিম, সরল, সহজ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া যাও।" রুশোর এই আহ্বানের অর্থ এই নয় যে, রুশো রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অবসান ঘটাইয়া প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। ইহার অর্থ হইল প্রাকৃতিক অবস্থায় যাহা শুভ, সুন্দর ও সত্য, তাহার মানদণ্ডে সভ্যসমাজের গুণাগুণ বিচার করিয়া, তাহার ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধন করিতে হইবে।

রুশো এই প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে শুরু করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার এই প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনায় সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে মর্লের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মর্লে বলেন: রুশোর প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে আলোচনা শুরু করিবার "কারণ তাঁহার সময়ে সকলেই প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিত এবং প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিত"।

মর্লের মন্তব্য

মানুষের সম্বন্ধে রুশো এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, "জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের বাণী" ("Voice of the people is the voice of God".)। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, "মানুষ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই মানুষ অধীনতাপাশে আবদ্ধ" ("Man is born free, but everywhere he is in chains.")। স্বাধীনতা সম্বন্ধে রুশোর ধারণা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মানুষের স্বাধীনতা জন্মগত। কিন্তু মানুষ স্বাধীন নয়। অতএব যে স্বাধীনতার অধিকার লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই স্বাধীনতা তাহাকে অর্জন করিতে হইবে (Man is born for freedom.)। অতএব যাহারা মানুষের জন্মগত স্বাধীনতাকে স্বীকার করিবে না, তাহাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ইঙ্গিত রুশোর এই ঘোষণার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে রুশোর ধারণা

রুশোর এই স্বাধীনতার ঘোষণা বিপ্লবের রণধ্বনি হইয়া দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা (Declaration of Independence)

এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে মানুষের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণায় রুশোর এই ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হইল : 'মানুষ জন্ম হইতেই স্বাধীন ও সমানাধিকার-সম্পন্ন" (' Men are from birth free and equal in rights".)। বিংশ শতাব্দীতেও এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার পরাধীন দেশের শোষিত, নিপীড়িত মানুষ মুক্তির আন্দোলনে এই একই বাণী, "স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার"—প্রচার করিতেছে।

রুশোর মতবাদের প্রভাব

রুশো-বর্ণিত এই স্বর্গরাজ্য হইতে মানুষকে দুইটি কারণে শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। এই কারণ দুইটি হইল যথাক্রমে—(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পত্তির উদ্ভব, এবং (২) মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ (dawn of reason)। এই দুইটি কারণ, রুশোর কল্পিত স্বর্গরাজ্যের সুখ, শান্তি, সাম্য ও স্বাধীনতা ধ্বংস করিয়া দিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিন যে প্রাচুর্য ছিল তাহার স্থানে দেখা দিল অভাব। ফলে শুরু হইয়া গেল সংঘাত। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল বহু জটিল সমস্যা। এই সকল সমস্যার সমাধানকল্পে মানুষকে বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইল। আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষের আদিম সরলতা ও পূর্ণ সাম্য অন্তর্হিত হইল। রুশোর মতে যে মানুষ প্রথম এক টুকরা জমি স্বতন্ত্র করিয়া নিজের বলিয়া দাবি করিল এবং অন্যান্য সরল, সহজ মানুষকে দিয়া তাহার দাবিকে স্বীকার করাইয়া লইল, সেই ব্যক্তিই নূতন ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করিল।*

চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টির কারণ

আবার সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে মানুষের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধির আবির্ভাব হইল। এই ভেদবুদ্ধি মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্মকলহ ও নানারূপ নীচতার সৃষ্টি করিল। রুশোর মতে এই প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল। রুশোর মতে মানুষ সকলে মিলিয়া চুক্তি করিয়া তাহাদের সকল অধিকার সমর্পণ করিল তাহাদের সামগ্রিক মিলিত যৌথ ব্যক্তিত্বের হস্তে। এই যৌথ ব্যক্তিত্বকেই রুশো সাধারণ বা সমষ্টিগত ইচ্ছা (general will) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি

হবসের মত রুশোও এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, চুক্তি হইয়াছিল একটি। ইহা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি। অতএব এই চুক্তির মধ্যে রাজার কোন স্থান নাই। আবার হবস্ যেমন রাজাকে চুক্তির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, রুশোও তাঁহার দৃষ্টিকোণ হইতে সার্বভৌমকে চূড়ান্ত, অপ্রতিহত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং চুক্তির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রুশোর সার্বভৌম কোন রাজা নন। তাঁহার ধারণায় এই সার্বভৌম হইল সমষ্টিগত ইচ্ছা। অতএব সাধারণ বা সমষ্টিগত ইচ্ছার বিশ্লেষণ না করিলে রুশোর মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাইবে না।

চুক্তির প্রকৃতি

*"The first man, who after enclosing a piece of ground, bethought himself to say this is mine, and found people simple enough to believe him, was the real founder of civil society."—*Rousseau.*

সাধারণ বা সমষ্টিগত ইচ্ছা

(General Will)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পারস্পরিক চুক্তির ফলেই সাধারণ ইচ্ছার জন্ম হয়। পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা আদিম ব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকে, "তাহার নিজস্ব সত্তা ও ক্ষমতা সাধারণের ইচ্ছার চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে সমর্পণ করিয়াছিল।"* অর্থাৎ এই চুক্তির দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সমস্ত ক্ষমতা পরিহার করিয়া সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ করিল। এই সমষ্টিগত ইচ্ছায় ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা ক্ষমতাকে সমর্পণ করিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবসান ঘটিল না। কারণ প্রত্যেকেই আবার এই যৌথ ব্যক্তিত্বের অংশীদার হিসাবে এবং নবগঠিত রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ হিসাবে তাহাদের সমর্পিত ক্ষমতাকে ফিরিয়া পাইবে। চুক্তির দ্বারা ব্যক্তিগত ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া কেহই পরাধীন হইল না। সবকিছু সমর্পণ করিয়াও কেহ নিঃস্ব হইল না। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত প্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। কারণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্তী ও অঙ্গীভূত।

সাধারণ ইচ্ছার সংজ্ঞা

কিন্তু সাধারণ বা সমষ্টিগত ইচ্ছা কিভাবে গঠিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে বুঝা যাইবে না। রুশোর মতে, আমরা যে-কোন সমাজে প্রত্যেকের ইচ্ছা (Will of All) অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা হইতে শুরু করিয়া সমষ্টিগত ইচ্ছায় পৌঁছাইতে পারি। সমাজের প্রত্যেক সভ্যই জাতীয় সমস্যাকে (Public Questions) তাহাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করে। অতএব বিভিন্ন ব্যক্তির বিচারে জাতীয় সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ফলে সমস্যার কোন সমাধান হয় না এবং অনেক সময় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছা এক নয়। অতএব ব্যক্তিগত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা কিছুই বিচার করা হয় তাহা অপরাপর ব্যক্তির স্বার্থে আঘাত হানে। এই ব্যক্তিগত স্বার্থ-সম্বলিত ইচ্ছাকে বলা হয় অপ্রকৃত ইচ্ছা (unreal will)। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ক-এর যাহাতে স্বার্থ খ-এর তাহাতে স্বার্থ নাও থাকিতে পারে। আবার ক ও খ উভয়েরই কতকগুলি সাধারণ স্বার্থ থাকিতে পারে। এক্ষণে ক ও খ যদি একের ব্যক্তিগত স্বার্থকে অপরের ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত কাটাকাটি করে, বাতিল (cancel) করে এবং উভয়েরই যাহাতে সাধারণ স্বার্থ তাহার সমন্বয় সাধন করে তবে সাধারণ ইচ্ছার জন্ম হয়। এইভাবে প্রত্যেকের ইচ্ছা (Will of All) হইতে সাধারণ ইচ্ছায় পৌঁছানো যায়।

সাধারণ ইচ্ছার গঠন-প্রণালী

আবার সাধারণ ইচ্ছার অর্থ আপস-নিষ্পত্তি (Compromise) বা রফা নয়। সাধারণ ইচ্ছাকে সকলের ইচ্ছার সর্বনিম্ন সাধারণ গুণিতক বলিয়া ধরিলেও ভুল হইবে। সাধারণ ইচ্ছা রাষ্ট্রের সমগ্র জনসাধারণের ইচ্ছার যোগফলও (Total Will) নহে। অর্থাৎ ক + খ-এর ইচ্ছা নহে। সাধারণ ইচ্ছা হইল প্রত্যেকের সর্বাধিক

*"Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the 'general will' and in our corporate capacity we receive each member as an individual part of the whole."—*Rousseau.*

সাধারণ প্রকৃত ইচ্ছার (Real Will) সমন্বয়। এখন প্রশ্ন উঠে, প্রকৃত ইচ্ছা কাহাকে বলে? প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছার মধ্যে 'সু' এবং 'কু' উভয়ই থাকে। এই 'সু' বা সৎ, শুভ ও কল্যাণকামী ইচ্ছাই হইল প্রকৃত ইচ্ছা। এই ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল সমষ্টির মঙ্গল সাধন করা। এই সাধারণের মঙ্গল সাধন করা যে ইচ্ছার উদ্দেশ্য নয়, সে ইচ্ছা সমষ্টিগত হইলেও তাহাকে রুশো সাধারণের ইচ্ছা বলিয়া মনে করেন না। হবসের মতো তিনি এই সাধারণ ইচ্ছাকেই সর্বশক্তিমান, অবাধ, অপ্রতিহত কর্তৃত্বের আধার বলিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মানুষের 'সু' ইচ্ছার পাশে 'কু' ইচ্ছা বাসা বাঁধিয়া আছে। 'কু' ইচ্ছার অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী ইচ্ছা, যাহা অপরের মঙ্গল কামনা না করিয়া শুধু নিজের স্বার্থকেই বজায় রাখিতে চায়। এই ইচ্ছাকে বলা হয় অপ্রকৃত ইচ্ছা (unreal will)। এক্ষণে যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সাধারণ ইচ্ছার সংঘর্ষ হয় তাহা হইলে সাধারণ ইচ্ছাই বলবৎ হইবে। বুঝিতে হইবে ব্যক্তি তাহার প্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না। সে ভুল ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াছে। এরূপ স্থলে সাধারণ ইচ্ছা বলপ্রয়োগ দ্বারা ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিবে সে ভুল ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াছে এবং সাধারণ ইচ্ছার সহিত ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার কোন অসঙ্গতি নাই, থাকিতে পারে না।

প্রকৃত ইচ্ছার সংজ্ঞা

রুশো এই সমষ্টিগত ইচ্ছাতে সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করিয়াছেন। এই ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য। একমাত্র সমষ্টিই প্রত্যক্ষভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। রাষ্ট্রের মধ্যে সমষ্টির এই ইচ্ছা হইল চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ধরিয়া লওয়া হইল A, B, C, D প্রভৃতি তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার চুক্তি অনুসারে সমর্পণ করে যৌথভাবে A + B + C + D প্রভৃতিকে, এই যৌথ সার্বভৌম ক্ষমতাতে প্রত্যেকেরই অংশ আছে। এই A + B + C + D প্রভৃতির যৌথ সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ হইল প্রত্যেকের সর্বাধিক সাধারণ কল্যাণকামী শুভ ইচ্ছার সমন্বয়। এই সার্বভৌম যখন সাধারণের স্বার্থে কোন কাজ করে, তখন সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হইবে। আইনকে প্রত্যেকেই মান্য করিবে, কারণ এই আইন তাহাদেরই সৃষ্ট (self-imposed law)। আবার আইন যদি সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী না হয় তবে বুঝিতে হইবে এই আইন সমষ্টিগত ইচ্ছারই প্রকাশ। অতএব সমষ্টিগত ইচ্ছা হইল সাধারণ স্বার্থকে বজায় রাখার ইচ্ছা। ইহা কখনও অমঙ্গলকর হইতে পারে না। ইহা সর্বব্যাপক, সর্বগ্রাসী ও সর্বকল্যাণকর।

রুশোর সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা।

বস্তুতঃ, এই সাধারণ ইচ্ছা জনগণের সরকারের মূলভিত্তি। এই সাধারণ ইচ্ছা যখন কার্যকরী হয়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অপ্রকৃত ইচ্ছা বর্জন করিয়া প্রকৃত ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে রুশোর ধারণা হইল প্রাকৃতিক অবস্থায় ও সভ্যসমাজে একই ধরনের স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করিত; কারণ, সে বাহিরের কোন ব্যক্তির হস্তে তাহার অধিকারকে সমর্পণ করে নাই। সে তাহার অধিকারকে সমর্পণ করে সমষ্টিগত ইচ্ছা যে সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে তাহার নিকট। রুশোর ভাষায় বলা যায়, তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের ব্যক্তিগত সত্তা ও সমস্ত ক্ষমতা সমষ্টিগত ইচ্ছার নির্দেশে সমর্পণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের যৌথ ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা

তাহারা প্রত্যেকেই সমগ্র সমাজের সভ্যহিসাবে ফিরিয়া পাইল। যে কোন নিয়ন্ত্রণই মানুষ তাহার নিজের উপর ধার্য করুক না কেন সে নিজের সৃষ্ট আইনকেই মান্য করে ; অতএব নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্বেও সে স্বাধীন। "আমাদের জন্য প্রণীত আইনকে আমাদের মান্য করার অর্থ স্বাধীনতা" ("Obedience to a law which we prescribe to ourselves is liberty.")। এই স্বাধীনতার অর্থকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রকৃত ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চলার অর্থই স্বাধীনতা। কোন লোক যদি অপ্রকৃত ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া চলে, অর্থাৎ পরাধীন হইয়া থাকে, তবে তাহার অপ্রকৃত ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণ ধার্য করিয়া তাহাকে বলপূর্বক প্রকৃত ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চলিতে বাধ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে জোর করিয়া স্বাধীন করানো (forced to freedom) হইবে। যেখানে সাধারণ ইচ্ছাই সার্বভৌম সেখানে অপ্রকৃত ইচ্ছাশীল মানুষ সাধারণ ইচ্ছার সহিত সংঘর্ষ করিলে সে তাহার স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে না। অতএব সাধারণের স্বার্থে এবং তাহার নিজের স্বার্থে তাহাকে প্রকৃত ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চলিতে বাধ্য করাইতে হইবে। অন্যথায় অপ্রকৃত ইচ্ছাশীল ব্যক্তি নীচুস্তরের জীবনযাপন করিবে। তাহাকে সকলের জন্য এবং তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য জোরপূর্বক উন্নত স্তরে উন্নীত করাইতে হইবে। এইভাবে রুশো, হব্‌স্‌ ও লকের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতার ধারণাকে আমূল পরিবর্তন করিলেন এবং সাধারণ ইচ্ছার নেতৃত্বে রাষ্ট্রের পরিচালনার যৌক্তিকতা প্রমাণিত করিলেন। রুশোর ধারণায় এই সমষ্টিগত ইচ্ছা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। কারণ, যে রাজতন্ত্রের সমর্থনে হব্‌স্‌ ও লক্‌ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন রুশোর ধারণায় সেই রাজতন্ত্র সমর্থনযোগ্য নহে। এতদ্ব্যতীত চুক্তি হইয়াছিল পরস্পরের মধ্যে ; সেখানে রাজার কোন স্থান নাই। অতএব এই সার্বভৌমিকতার অধিকারী কোন রাজা বা সরকার হইতে পারে না।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে রুশোর ধারণা

পরিশেষে বলা যায়, সাধারণ ইচ্ছা জনমত নহে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা নহে। রুশোর ভাষায় বলা যায় : "ইচ্ছাকে সমষ্টিগত হইতে হইলে ভোটদাতার সংখ্যা অপেক্ষা সাধারণ স্বার্থের সমন্বয়ের গুরুত্বকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্বীকৃতি দিতে হইবে"।* অতএব দেখা যায় সাধারণ ইচ্ছার দুইটি দিক্‌ আছে ; একটি হইল জনসংখ্যার পরিমাণ আর অপরটি হইল সাধারণ স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্য।

সাধারণ ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য : (১) সাধারণ ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য হইল ঐক্য (Unity)। এই ইচ্ছা পরস্পর-বিরোধী হইতে পারে না। কারণ, ইহা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে না। ইহা ব্যক্তির বিভিন্নতা স্বীকার করিয়াই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। ইহা জাতীয় চরিত্রের ঐক্য রক্ষা করে এবং প্রত্যেক নাগরিকের সাধারণ স্বার্থকে প্রকাশ করে।

(২) চিরন্তনতা ইহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। মানুষের চরিত্রের মধ্যেই ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

(৩) রুশোর ভাষায় বলা যায় যে : "মানুষ সর্বদা তাহার নিজের ভালোটাই চায় ; কিন্তু, তাহা সে সর্বদা কোন প্রকারেই পায় না। সাধারণ ইচ্ছা সর্বদাই

*"What makes the will general is less the number of voters than the common interest uniting them."—*Rousseau.*

সত্যের পথে আছে ; কিন্তু যে বিচার ইহাকে পরিচালিত করে, তাহা সর্বদা উন্নত ধরনের হয় না।''* পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাধারণ ইচ্ছা সর্বদাই সাধারণের মঙ্গলকর। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সাধারণের মঙ্গলসাধন করা যে ইচ্ছার উদ্দেশ্য নয়, সে ইচ্ছা সমষ্টিগত হইলেও তাহা সাধারণ ইচ্ছা বলিয়া অভিহিত হইবে।

(৪) সাধারণ ইচ্ছার আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহা চূড়ান্ত এবং অভ্রান্ত। ইহা চূড়ান্ত বলিয়া ইহাকে সর্বদাই ব্যক্তিগত ইচ্ছার উর্ধ্বে স্থান দিতে হয়। আবার সাধারণ ইচ্ছা যেহেতু প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়, সেই হেতু ইহা অভ্রান্তও বটে।

(৫) ইহা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। সরকার যে ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা হইল অর্পিত ক্ষমতা (delegated power)। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেই এই সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ সম্ভব, কারণ সমষ্টিগত ইচ্ছা হস্তান্তরযোগ্য নয়। রুশোর মতানুসারে সরকারের কোন নিজস্ব ক্ষমতা নাই। সরকার সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন শাসনযন্ত্র মাত্র। সরকার সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশে সাধারণ ইচ্ছা-প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে।

রুশোর মতবাদের সমালোচনা : (১) ল্যাস্কি, হবহাউস্, ম্যাক্আইভার এই মতবাদকে সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাকে সংকীর্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অনেক সমালোচক। আবার সাধারণ ইচ্ছা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা না হয় তবে ইহা সাধারণও নয়, আর ইচ্ছাও নয় বলিয়া সমালোচকগণ মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যের উত্তরে এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, ইহার মূল্য হইল এইদিক হইতে যে, ইহা সর্বসাধারণের স্বার্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(২) রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠের ইচ্ছা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তাহারা তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতেছে। অতএব দেখা যায় রুশোও বলপ্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। রুশোর মতবাদেও দমন করার প্রশ্ন আছে। বলপ্রয়োগ করিয়া স্বাধীন করার অছিলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ইচ্ছা করিলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্র (tyranny of the majority) প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তাহা জন স্টুয়ার্ট মিল উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) হবসের সহিত রুশোর পার্থক্য হইল এই যে, হবস্ ব্যক্তিগত স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করেন আর রুশো সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করেন। অতএব রুশোর প্রচেষ্টা যে সাধারণের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, তাহা সম্ভব নহে। এইজন্যই হার্ণস্ বলিয়াছেন : ''রুশোর রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমন্বয় সাধনের সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।''*

উপসংহারে বলা যায়, রুশো তাঁহার সাধারণ ইচ্ছার বিশ্লেষণে এক অস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন সন্দেহ নাই এবং তিনি সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন না করিতে পারিলেও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ সৃষ্টিতে তাঁহার অবদান নগণ্য নহে।

*"Of itself the people wills always the good, but of itself it by no means always sees it. The general will is always in the right, but the judgment which guides it is not always enlightened".—*Rousseau.*

*"Rousseau's problem of combining state sovereignty with the freedom of the subject remained unsolved."—*Hearnshaw.*

তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক মহত্বের উৎস হইল জনগণ আর এই জনগণের কল্যাণসাধন করাই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আবার রুশো গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এই কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, বলপ্রয়োগ নয়, জনগণের সম্মতিই রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি। তিনি আরও প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি হইল রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি রাষ্ট্রকে প্রাণিদেহের সহিত তুলনা করিলেন। পরবর্তীকালে হার্বার্ট স্পেনসার যে জৈব মতবাদ প্রচার করেন তাহা ইতিপূর্বে রুশোই শুরু করিয়া গিয়াছিলেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা ও মূল্যায়ন (Valuation and Limitation of the Doctrine of Social Contract Theory) : সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তাজগতে 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ এক বিশেষ উদ্দীপনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই মতবাদের ত্রয়ী প্রবক্তা—হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন স্পিনোজা (Spinoza), মঁতেসকিউয়ে, টমাস পেইন (Thomas Paine) ও জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ত (Emanuel Kant)। রুশোর মতবাদ ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে যুক্তিবাদী চিন্তার আক্রমণে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার আসরে সামাজিক চুক্তি মতবাদ পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। দার্শনিক হিউম, বেন্থাম, বার্ক, অস্টিন, লিবার, উলসি, মেইন, গ্রীণ, ব্লুণ্টসলি এবং পোলক প্রভৃতি দার্শনিকের ধারালো যুক্তির আঘাতে সামাজিক চুক্তিবাদ পর্যুদস্ত হয়। এই সকল দার্শনিকের সমালোচনাগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) ইহার পক্ষে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

প্রথমতঃ, রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' প্রকাশিত হইবার পূর্বেই হিউম (Hume) এই মন্তব্য করেন যে, সামাজিক চুক্তিবাদ একটি অনৈতিহাসিক কল্পনা মাত্র। শাসক-শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে সামাজিক চুক্তিকে কল্পনা করিয়া হব্‌স্‌ ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য, হব্‌স্‌ স্বীকার করিয়াছেন যে, এইরূপ যে চুক্তি হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেকে ইংল্যান্ড হইতে ১৬২০ সালে 'মে ফ্লাওয়ার' (May Flower) জাহাজযোগে যে অভিযাত্রী দল উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ পত্তন করিতে যান তাহাদের চুক্তিকে ইহার সাক্ষ্যরূপে হাজির করেন। কিন্তু ইহাও গ্রহণযোগ্য নয় ; কারণ, ইঁহাদের মধ্যে কেহই হব্‌স্‌ বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করিতেন না। আবার সেই সুদূর আদিম যুগে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য জগতে যে মানুষেরা বাস করিত তাহারা হঠাৎ একদিন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

(২) এইরূপ চুক্তি অসম্ভব

দ্বিতীয়তঃ, (ক) আবার এই ধরনের চুক্তি অসম্ভব। কারণ, আদিম যুগে মানুষেরা চুক্তি কাহাকে বলে তাহা ভালোভাবে জানিত না। বাণিজ্য-সমাজেই চুক্তি সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ বিকাশ লাভ করে। কিন্তু আদিম মানুষের জগতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারণা ছিল অনুন্নত। অতএব হব্‌স্‌, লক্‌, রুশো বর্ণিত চুক্তির মতো উন্নত পর্যায়ের চুক্তি সম্পাদন করা আদিম সরল লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক। রাষ্ট্রনৈতিক

চেতনা-সম্পন্ন মানুষের পক্ষেই রাষ্ট্রনৈতিক চুক্তি করা সম্ভব। কিন্তু আদিম যুগের মানুষ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন ছিল না।

(খ) আর তাহাদের সামনে এমন কোন চুক্তির দৃষ্টান্তও ছিল না যাহা দেখিয়া আদিম মানুষ চুক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। অতএব আদিম মানুষের চুক্তি সম্বন্ধে ধারণা কল্পনা-প্রসূত।

(৩) প্রাকৃতিক পরিবেশে যে স্বাধীনতা ছিল তাহা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র

তৃতীয়তঃ, আবার এই মতবাদ অনুসারে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ ছিল পূর্ণ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা সম্বন্ধে চুক্তিবাদীদিগের ধারণা ছিল ভ্রান্ত। রাষ্ট্রনৈতিক আইন ছাড়া স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা। প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাভাবিক আইন (Natural Law) ছিল, তাহা ছিল নৈতিক আইন। আবার এই আইনকে মান্য করাইবার জন্য কোন রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বেচ্ছাচারিতা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়।

(৪) স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা ভ্রান্ত

চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাভাবিক অধিকারের কল্পনা করা হইয়াছে তাহা নৈতিক অধিকার ছাড়া আর কিছু নয়। আবার অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই অধিকার ও কর্তব্যবোধ জন্মায় তখনই যখন মানুষ সমাজে বাস করে, তাহার পূর্বে নয়। এই প্রসঙ্গে গ্রীণের মত উল্লেখ করা যায়। গ্রীণ বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হইয়া না উঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার এই সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা প্রতিষ্ঠা করা হয় সমাজ-জীবনের আরম্ভের পর, তাহার পূর্বে নয়। অতএব এই চুক্তিবাদ সমাজ-সৃষ্টির পূর্বে যে স্বাভাবিক অধিকারের কল্পনা করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আবার আইনই স্বাধীনতার শর্ত (Law is the condition of liberty)। সুতরাং স্বাভাবিক অধিকারের সঙ্গে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আইন থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার আইনকে কার্যকরী করিবার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃত্ব থাকাও প্রয়োজন। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক আইনের সন্ধান পাওয়া যায় না।

(৫) বেন্থামের মত

পঞ্চমতঃ, চুক্তি মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। বলা হইয়াছে যে, আদিম মানুষেরা সকলেই চুক্তিতে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। চুক্তির ভাষ্যকারদের এই কল্পনা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। আবার বেন্থাম সমালোচনা করিয়া বলেন যে, পূর্বপুরুষেরা যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল, তাহা শুধু তাঁহারাই মানিতে বাধ্য, বর্তমানের মানুষ তাহা মান্য করিবে কেন? অবশ্য, বলা যায়, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব তথা চুক্তি মান্য না করিলে সকলেরই ক্ষতি হইবে। এইজন্য বর্তমানের মানুষেরা রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে মান্য করে।

(৬) স্বাভাবিক সাম্যও যুক্তিসঙ্গত নহে

ষষ্ঠতঃ, মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। অতএব প্রাকৃতিক অবস্থায় সব মানুষই সমান ছিল, এই কথা বিশ্বাস করা যায় না। রুশো সামাজিক চুক্তি গ্রন্থে এই বৈষম্যের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

সপ্তমতঃ, চুক্তির নিয়মই এই যে, ইহা একদিকে যেমন স্বেচ্ছায় সম্পাদিত

হয়, ঠিক তেমনি আবার ইচ্ছামূলক ভাবে সেই চুক্তির অবসানও করা যায়; কিন্তু, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যদৃচ্ছা চুক্তিতে প্রবেশ করা বা উহা হইতে বাহির হইয়া আসা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র একটি যৌথ মালিকানা স্বত্বের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নহে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককেই রাষ্ট্রের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার বদলানো যায়, কিন্তু, রাষ্ট্রকে পাল্টানো যায় না।

(৭) চুক্তির বৈশিষ্ট্য আর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এক নয়

অষ্টমতঃ, কেহ কেহ মনে করেন, সামাজিক চুক্তির মতবাদ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। ফলে তাঁহাদের মতে সামাজিক চুক্তির মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা বিজ্ঞানসম্মত রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যাও দান করে না।

(৮) বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে

নবমতঃ, পরিশেষে বার্ক ও ব্লুন্টস্লির মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। বার্ক সামাজিক চুক্তির মতবাদকে "অরাজকতার সংক্ষিপ্তসার" (digest of anarchy) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গার্ণার বলেন: "ইহা মানুষের কল্পনা-প্রসূত একটি নিছক মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে।" ব্লুন্টস্লির মতে: "এই মতবাদ রাষ্ট্রকে মানুষের খেয়ালের ফলে সৃষ্ট, এইরূপ কল্পনা করে বলিয়া, ইহাকে যতটা কল্পনা করা যায় ততটাই বিপজ্জনক।"

(৯) সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য

ঐতিহাসিক মূল্য: সামাজিক চুক্তি মতবাদ যদিও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা হিসাবে সম্পূর্ণ মূল্যহীন, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। নিম্নে এই মতবাদের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ করা গেল:

প্রথমতঃ, বার্কারের মতানুসারে বলা যায় যে, চুক্তিবাদের মধ্যে দুইটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুইটি ধারণার মধ্যে একটি হইল স্বাধীনতার আদর্শ আর অপরটি হইল ন্যায়ের আদর্শ।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের বৃহত্তম কীর্তি হইল এই যে, ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে গূঢ় ধর্মতত্ত্বের জটিল জটাজাল হইতে মুক্ত করিয়া নূতন ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে। চুক্তিবাদের যুক্তির আঘাতে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদও শিথিল হইয়া পড়িল। এই মতবাদ অতিশয় দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিল যে, রাষ্ট্র মূলতঃ মনুষ্য-প্রয়াস-উদ্ভূত মানবিক সংগঠন। এই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অবাধ রাজতন্ত্রের মূলে তাত্ত্বিক ভিত্তি-প্রস্তরও অপসারিত হইল। হব্‌স্‌ যদিও রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁহার যুক্তিতে বলিলেন যে, প্রজার ইচ্ছায়ই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং প্রজাদের নিরাপত্তা রক্ষাই এই চুক্তি সম্পাদনের উৎস, তখনই তিনি অবাধ রাজতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। হব্‌সের পরবর্তীকালে লক্‌ ও রুশো হব্‌সের এই মতবাদকে আরও প্রসারিত করিয়া ঘোষণা করিলেন: শাসিতের সম্মতিই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি (Consent of the governed)। এই শাসিতের সম্মতির উপর বর্তমানের গণতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। লকের পূর্বে আর কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টাকারে নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই।

চতুর্থতঃ, বর্তমানে সার্বভৌমিকতার যে সকল তথ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়

তাহারা অধিকাংশই সামাজিক চুক্তি মতবাদের অবদান। হবস্ প্রস্তুত করেন আইনসম্মত সার্বভৌমিকতার পথ (Legal sovereignty)। লক্ বর্তমানে যাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলা হয়, তাহার রূপদান করেন। রুশো ছিলেন জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার মন্ত্রের প্রধান প্রচারক। এই জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার নীতি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে। বর্তমানে গণভোট (Referendum), গণউদ্যোগ (Initiative), এবং পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতি যে সকল শাসন-ব্যবস্থার নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে গৃহীত হইয়াছে তাহার দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্তমানেও জনগণ প্রত্যক্ষভাবেই সরকারকে অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়।

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, জনগণের সার্বভৌমিকতা, মানুষের অধিকার এবং স্ব-শাসনের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক ধারণার বিবর্তনে সামাজিক চুক্তি মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

উপসংহারে বার্কারের মন্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, চুক্তিবাদের যুক্তির মধ্যে যে দুইটি মৌলিক ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের প্রতি মানুষের চিন্তা সর্বদা দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকিবে। এই দুইটি ধারণার মধ্যে একটি হইল স্বাধীনতার আদর্শ অথবা এই ধারণা যে শক্তি নয়, জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিত্তি। আর অপরটি হইল ন্যায়ের আদর্শ অথবা এই ধারণা যে শক্তি নয়, ন্যায়ই সকল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ ও প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতির নিয়মশৃঙ্খলার ভিত্তি।*

এই দুইটি ধারণার সহিত আরও কয়েকটি ধারণা—যথা, জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular sovereignty), সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধারণা, মানব অধিকার, মানুষের স্বাধীনতা, জন্মগত ও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র-কল্পনার অবসানের ধারণা প্রভৃতি যদিও তৎকালে চিন্তারাজ্যে অপরিচিত ছিল কিন্তু পরবর্তী চিন্তানায়কগণের হস্তে যখন এই ধারণাগুলি আরও মসৃণ, আরও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং আরও নানা ধারা আসিয়া এই ধারণাগুলির সহিত মিশিয়া ইহাকে পূর্ণতার দিকে আগাইয়া লইয়া গেল, তখন হয়তো প্রাথমিক ধারণাগুলি অস্পষ্ট আকার ধারণ করিল, কিন্তু আজিকার মানুষ নিশ্চয়ই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিবে সেই ত্রয়ী চুক্তিবাদীদের যাঁহাদের চিন্তারাজ্যেই প্রথম স্থান পাইয়াছিল এই মহান্ ধারণাসকল ও এই মানব-অধিকারের ঘোষণাবলী।

হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য : রুশোর সেতু রচনা (Points of Agreement and Difference between Hobbes, Locke and Rousseau · Bridge made by Rousseau) : হবস্, লক্ ও রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতামতের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ, এই তিনজন চিন্তাবীর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আবার এই তিনজনের মতবাদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, হবস্ ও লকের বিপরীতমুখী ধারণার মধ্যে এক সেতু রচনা করিয়াছেন রুশো। নিম্নে এই ত্রয়ী চিন্তাবীরের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করা গেল :

*"It was a way of expressing two fundamental ideas or values to which human mind will always cling—the value of Liberty, or the idea that will, not force, is the basis of government and the value of justice or the idea that right not might is the basis of all political society and of every system of political order."—*Barker*.

(১) **ঐতিহাসিক পটভূমিকা (Historical background) :** সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচারকদিগের চিন্তার উপর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই কারণে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি লক্ষ্য করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

(ক) **হবসের** সময়ে ইংলন্ডে প্রজা-বিদ্রোহ এবং ক্রমওয়েলের সাধারণতন্ত্র সাধারণ লোকের জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে। এই অশান্ত ইংলন্ডে সামাজিক শান্তি আনয়ন করার জন্য এবং মানুষের দুঃখকষ্টের অবসান ঘটানোর জন্য স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন। তাঁহার মতে স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা একমাত্র রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই কারণে তিনি রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিয়া ১৬৫১ সালে প্রকাশিত লেভায়াথান গ্রন্থে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন। আবার হবস্ ছিলেন দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক। চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করাটা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

(খ) **লক্** ছিলেন ইংলন্ডের ১৬৮৮ সালের রক্তহীন বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সমর্থক। সেই যুগে দ্বিতীয় জেমসের সিংহাসনচ্যুতি ও বিদেশী উইলিয়মের সিংহাসনারোহণকে অনেকেই সমর্থন করেন নাই। সুতরাং লক্‌কে বিপ্লবের সমর্থনে ও বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে হয় এবং এই প্রসঙ্গে তিনি সকল অত্যাচারী রাজারই সিংহাসনচ্যুতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। লক্ তাঁহার ১৬৯০ সালে প্রকাশিত Two Treatises on Civil Government নামক গ্রন্থে তাঁহার মতবাদ উপস্থাপিত করেন।

(গ) **রুশো** তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করেন দুইখানি গ্রন্থে; যথা,—(১) Contract Social এবং (২) Discourse on Inequality। রুশো কোন মতামতের সমর্থনে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন নাই। তিনি ব্যক্তিগত ধারণার বশবর্তী হইয়াই এই মতবাদ প্রচার করেন। রুশোর চিন্তাধারা ফরাসী বিপ্লবের চিন্তারাজ্যে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার মতে সুস্থ সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজন এমন এক রাষ্ট্রের, যাঁহার চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে। আবার এই সার্বভৌমিকতার সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমন্বয়-সাধনেরও তিনি চেষ্টা করেন।

(২) **প্রাথমিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা (State of Nature) :** (ক) **হবসের** মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল দুর্বিষহ। জীবন ছিল এই অবস্থায় বীভৎস, পাশবিক ও স্বল্পস্থায়ী। তাঁহার মতে মানুষ স্বভাবতঃই দুর্বৃত্ত প্রকৃতির এবং সর্বদাই অন্যের ক্ষতিসাধন করিয়া স্বীয় ইষ্টসাধনে তৎপর।

(খ) **লকের** মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারা দুর্বিষহ হয় নাই বরং মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থায় সুখে শান্তিতে বাস করিত। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল কল্যাণকর।

(গ) **রুশো** প্রাকৃতিক অবস্থাকে মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে আদিম মানুষ এই অবস্থায় স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব বজায় রাখিয়া বাস করিত। রুশো এই মত প্রকাশ করেন যে, ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল; ফলে মানুষের জীবনযাত্রা জটিলতর হইল। আদিম সরলতা ও সাম্যভাবের স্থান দখল করিল সমাজের উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান। ফলে মানুষকে হবস্-বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল।

রুশো প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে একদিকে যেমন লকের মতকে সমর্থন করিলেন, আবার শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক অবস্থা যে হবস্-বর্ণিত অবস্থার সম্মুখীন হইল তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এইভাবে, রুশো হবস্ ও লকের মতবাদের মধ্যে যোগাযোগ করিবার চেষ্টা করেন।

(৩) **স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে ধারণা** (Natural Law): (ক) হবসের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মনুষ্যকৃত কোন আইন ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশে যেহেতু কোন আইন ছিল না, সেইহেতু মানুষ ছিল অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী। এই অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা মানুষের জীবনে এক উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা আনয়ন করিয়া মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তোলে। এই অবস্থা ছিল প্রাক্-সামাজিক অবস্থা। বাহুবলই ছিল একমাত্র অধিকার এবং প্রাণ বাঁচানোর মন্ত্রই ছিল স্বাভাবিক আইন।

(খ) লক্ মানুষের বিবেকে যে নীতিবোধ নিহিত রহিয়াছে তাহাকেই স্বাভাবিক আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই নীতিবোধের দ্বারাই স্বাধীনতা সীমিত হইত। অতএব প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ছিল নীতি-নির্ভর। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের জীবন পরিচালিত হইত। মানুষ স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারী ছিল। এই অবস্থাকে লক্ প্রাক্-রাজনৈতিক অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন।

(গ) রুশোর মতে আইন ছিল কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত। স্বাভাবিক আইন কল্যাণকর মৌল প্রেরণা হইতে উদ্ভূত হয়। হবসের প্রাণ বাঁচাইবার মন্ত্রকে কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন রুশো। আর লকের নীতি-নির্ভর যে স্বাভাবিক আইন তাহা যে স্বেচ্ছাচারিতাকে সীমিত করিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, তাহারও ব্যাখ্যা রুশোর হস্তে পূর্তি লাভ করে।

(৪) **চুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা** (The Nature of Contract): (ক) হবসের মতে একটিমাত্র চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। হবসের মতে মানুষের মধ্যে একতরফা চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। রাজাকে চুক্তির কোন পক্ষ হিসাবে ধরা হয় না। এই চুক্তির ফলেই রাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয়।

(খ) লকের মতে চুক্তি হয় দুইটি, (১) সামাজিক চুক্তি (Social Compact) (২) রাজনৈতিক চুক্তি (Political or Governmental Compact)। তাঁহার মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তি হয়। এই চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয়। তারপর রাজনৈতিক চুক্তির দ্বারা সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। লকের মতে রাজা চুক্তির অংশীদার।

(গ) রুশো এই বিষয়ে হবস্‌কে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, প্রথম একটিমাত্র চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয়। পরে জনসাধারণ আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে একটি শাসনযন্ত্র গঠন করে।

এই প্রসঙ্গে রুশো একদিকে যেমন হবসের একটি চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের জন্মকে সমর্থন করেন, আবার পরে যে জনসাধারণ আইন প্রণয়ন করিয়া শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, যাহাকে লক্ রাজনৈতিক চুক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, রুশো তাহাকে সরাসরি দ্বিতীয় চুক্তি নাম না দিয়া আইন প্রণয়নের উৎসরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রুশোর চুক্তির প্রকৃতি ভিন্নরূপ। হবস্ বলেন, রাজা চুক্তি বহির্ভূত, লক্ বলেন

চুক্তি হয় রাজা ও প্রজার মধ্যে, কিন্তু রুশো বলেন, মানুষের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি হয়। ইহাতে রাজতন্ত্রের কোন স্থান নাই। মানুষের অধিকার সবই সমর্পিত হয়, তবে উহা যৌথ ব্যক্তিত্বের হস্তে। আবার যেহেতু প্রত্যেকেই এই যৌথ ব্যক্তিত্বের অংশীদার, সেইজন্য এই চুক্তির ফলে কাহারও স্বাধীনতা বা সাম্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। এই ভাবে রুশো হব্‌স্‌ ও লকের মতের মধ্যে সেতু তৈয়ার করেন।

(৫) **সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ধারণা** (Sovereignty) (ক) **হব্‌সের মতে** রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অবাধ, চূড়ান্ত, অপ্রতিহত, আদি ও অপরিসীম। রাজা বা সরকারই এই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আর রাজ-আজ্ঞাই আইন।

(খ) **লকের মতে** সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য নহে। তাঁহার মতে সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে, কিন্তু জনসাধারণের অধিকারের দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ। লকের মতে জনতার সার্বভৌমত্ব নিয়মিত ব্যবহৃত হয় না। অবশ্য জনসাধারণের বিপ্লবের অধিকার রহিয়াছে। ফলে তাহারা প্রয়োজনবোধে বিপ্লবের দ্বারা সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। সসীম রাজা এই সার্বভৌমত্বের মালিক।

রুশো হব্‌স্‌কে অনুসরণ করেন। তিনি নিরঙ্কুশ সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী। অবশ্য, রুশোর সার্বভৌমত্বের মালিক কোন রাজা বা সরকার নহে। তাঁহার মতে এই সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইল সক্রিয় সমগ্র জনতা, আইন হইল সমষ্টিগত কল্যাণকর ইচ্ছার প্রকাশ। হব্‌স্‌ তাঁহার ধারণার সর্বজনীন সার্বভৌমকে উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সমাধিস্থ করিয়াছেন, এবং আইনানুগ সার্বভৌমে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন. লক্‌ তাঁহার মতবাদে আইনানুগ সার্বভৌমকে উপেক্ষা করিয়া সর্বজনীন সার্বভৌমত্বে সমস্ত ক্ষমতা আরোপ করেন। ফলে শাসনযন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে এবং উহা জনসাধারণের খামখেয়ালের বশবর্তী হয়। রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন। তাঁহার সার্বভৌমত্বের ধারণা লকেরই মতো। তিনি রাজার হস্তে ক্ষমতা অর্পণ না করিয়া জনসাধারণের হস্তে অর্পণ করিলেন।

(৬) **শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা** (Nature of Government) : (ক) **হব্‌স্‌ সমর্থন** করিলেন অবাধ রাজতন্ত্র এবং তিনি তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বৈরাচারকে সমর্থন করেন।

(খ) **লক্‌** সমর্থন করেন সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র। তিনি তাঁহার মতবাদ দ্বারা ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবকে সমর্থন করেন।

(গ) রুশো প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন। তিনি তাঁহার মতবাদ দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেন।

(৭) **অধিকার সম্বন্ধে ধারণা** (Rights) : (ক) **হবসের** মতে রাজা চুক্তির অংশীদার নহেন। অতএব জনসাধারণের রাজার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। রাজতন্ত্রের বিনাশ নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও বিপ্লব করিবার অধিকার নাই। কারণ, মানুষ পুনঃপ্রাপ্তির দাবি না করিয়া, বিনা শর্তে নিঃশেষে সকল ক্ষমতাই রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ হইল চুক্তি ভঙ্গ করা এবং চুক্তি ভঙ্গ করিলে মানুষকে আবার প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার ধারণা বাহুবলই হইল একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার।

স্বাভাবিক অধিকারের অবশিষ্ট বিশেষ কিছু রহিল না। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইল আইনপ্রদত্ত অধিকার এবং আত্মরক্ষার অধিকার।

(খ) লকের মতে রাজা চুক্তির অংশীদার। অতএব রাজা চুক্তির শর্ত দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং রাজা যদি অক্ষমতাবশতঃ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তবে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জনসাধারণের আইনসঙ্গত অধিকার আছে। অবশ্য, এই বিদ্রোহের দ্বারা শুধু সরকারই পরিবর্তিত হয়, রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না। লকের মতে স্বাভাবিক অধিকার অনেকখানিই থাকিয়া যায়। লক্ জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং বিপ্লবের অধিকারকে স্বীকার করেন।

(গ) রুশো বলেন, স্বাধীনতা ও সাম্য মানুষের জন্মগত অধিকার। তাঁহার মতে সরকার চুক্তির পক্ষ নহে। অতএব সার্বভৌম ক্ষমতার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। সমষ্টিগত সার্বভৌম ইচ্ছা করিলেই সরকারকে পরিবর্তন করিতে পারেন। সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশের মধ্যেই স্বাধীনতা মূর্ত হইয়া উঠে।

(৮) **রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে ধারণা (Origin of the State) :** হবস্, লক্ ও রুশো বিশ্বাস করিতেন যে প্রথমে রাষ্ট্র বলিয়া কিছু ছিল না। হবসের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভয়াবহতার ও অনিশ্চয়তার হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্যই মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। লক্ যদিও হবসের সকল অসুবিধার কথা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তিনিও এই মত প্রকাশ করেন যে, মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের কতকগুলি অসুবিধা দূর করিবার জন্য চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। রুশোর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ-জীবন জটিলতর হইল তখন মানুষ পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। চুক্তি সম্বন্ধে তিনজন লেখকই একমত। রাষ্ট্রজন্মের পূর্বেও যে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে এ সম্বন্ধেও ইঁহারা একমত।

মতবাদের মধ্যে সেতু রচনা : উপসংহারে বলা যায়, সামাজিক চুক্তিবাদের চূড়ান্ত বিকাশ হয় রুশোর মতবাদের ভিতর দিয়া। রুশো সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন হবসের নিকট হইতে। কিন্তু তিনি এই সার্বভৌম ক্ষমতাকে সমষ্টিগত ইচ্ছা (General will) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লকের নিকট হইতে জনতার অধিকার সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনতার ইচ্ছাপ্রসূত রাষ্ট্রের যে কল্পনা হবস্ করিয়াছিলেন, আবার জনতার স্বীকৃতিতে ও সম্মতিতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে লকের যে মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই রুশোর হস্তে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করিল জনতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের তত্ত্বে। হবস্ যে জনতার স্বাধীনতাকে প্রায় অস্বীকার করিয়াছেন, এবং রাষ্ট্রের হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, লক সেই রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। রুশোর হস্তে সেই জনতার স্বাধীনতা সমষ্টিগত ইচ্ছার মধ্যে রূপ গ্রহণ করিল। হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় বটে ; কিন্তু তিনজনের মতবাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যও আছে। এই তিনজন লেখকই প্রাকৃতিক অবস্থার কল্পনা করেন, চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন। আর প্রাকৃতিক অবস্থার অনিশ্চয়তাই যে রাষ্ট্রসৃষ্টির মূল সে সম্বন্ধেও এই তিনজন একমত পোষণ করিতেন।

রুশো হবস্ ও লকের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছেন

সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও গণতন্ত্রের উন্মেষ (Social Contract Theory and the Rise of Democracy) : গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তিই হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সাম্য ও ব্যক্তির সম্মতির ভিত্তিতে সরকার গঠন। গণতন্ত্রেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। আর সামাজিক চুক্তি মতবাদ এই কথাই প্রচার করে যে, স্বাধীনতা ও সাম্যের স্বীকৃতির ভিত্তিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। ঐশ্বরিক মতবাদের ভিত্তিতে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচার এক বিশেষ প্রতিষেধকের কাজ করিয়াছে। এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তিতে স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশে দেশে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব এই সামাজিক চুক্তি মতবাদ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর লকের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

লক্ তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদে প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষ তাহার প্রাকৃতিক অধিকারগুলি রক্ষার্থে বিশেষতঃ সম্পত্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যে সরকার গঠন করিয়াছে সেই সরকার যখনই তাহাদিগের সম্মতি ব্যতীত তাহাদিগের প্রাকৃতিক অধিকারকে অস্বীকার করিবে তখনই জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। সরকার জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, জনগণের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত এবং প্রয়োজনবোধে জনগণ এক সরকারকে বাতিল করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে।

গণতন্ত্রের মূল কথাও সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল কথার অনুরূপ। গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলা হয় ইহা জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার। সামাজিক চুক্তি মতবাদের বক্তব্য একই। বর্তমানে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলীর মধ্যে ক্ষমতাপৃথকীকরণ নীতিকে ধরা হয়। লক্ তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদে আইন ও শাসন বিভাগকে পৃথক করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

ফরাসী দার্শনিক রুশো জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছাকে (General will) রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। জনগণের সম্মতিতেই সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সরকারের শক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের সম্মতির উপর। গণতন্ত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্বক স্বীকার করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। গণতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। রুশো বলেন মানুষের স্বাধীনতা জন্মগত (Man is born free...)। গণতন্ত্রের এই মূল কথাগুলি রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদেই প্রচারিত হইয়াছে। সরকারকে রুশো বলিয়াছেন সমাজের প্রতিনিধি মাত্র। প্রতিনিধির মত কাজ না করিলে জনগণ নিশ্চয়ই সরকারকে উচ্ছেদ করিবে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম জন্মদাতা হব্‌স্ ছিলেন গণতন্ত্রের বিরোধী। তিনি রাষ্ট্র ও সরকারকে অভিন্ন করিয়া দেখিতেন। তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে মানুষ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে চুক্তির দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থার হাতে মানুষ তাহার সকল অধিকার সমর্পণ করিয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থাই অবাধ, অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছিলেন

স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু হবস্ স্বীকার করিয়াছেন যে, স্বৈরাচারী রাজার ক্ষমতার উৎস হইল জনগণ। জনগণ নিজের ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া রাজাকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে মাত্র ; তাই রাজা ক্ষমতা পাইয়াছে। সুতরাং হবস্‌ও গণতন্ত্রের অভ্যুদয়ে সাহায্য করিয়াছেন।

হবস্, লক ও রুশোর মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য ঃ

(১) এই তিনজন দার্শনিক—হবস্, লক্ ও রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন।

(২) এই তিনজন দার্শনিক এই মত পোষণ করিতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই।

(৩) প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ যে বেশীদিন বাস করিতে পারে নাই এবং এই প্রাকৃতিক অবস্থায় অনিশ্চয়তা ও অসুবিধার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সকলে একত্রিত হইয়া যে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সে বিষয়েও সকলে একমত পোষণ করিতেন।

(৪) এই তিনজন লেখকই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, চুক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

(৫) এই তিনজন লেখকই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

(৬) সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনজনই মতবাদ প্রচার করেন। অবশ্য, প্রত্যেকের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বৈসাদৃশ্য ঃ

(১) প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনজন লেখক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল দুর্বিষহ। লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা দুর্বিষহ ছিল না। রুশো এই অবস্থাকে মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করেন।

(২) হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মনুষ্যকৃত আইন ছিল না। ছিল অবাধ স্বাধীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা। ইহা ছিল প্রাক্-সামাজিক অবস্থা। লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে মনুষ্যজীবন পরিচালিত হইত। রুশোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রথমে ছিল স্বাধীনতা, কিন্তু পরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে প্রাকৃতিক অবস্থা হবস-বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থায় পরিণত হয়।

(৩) এই প্রাকৃতিক অবস্থার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য হবসের মতে আদিম মানুষ পরস্পরের মধ্যে একটি চুক্তি করিল। লকের মতে দুইটি চুক্তি করিল। আর রুশোর মতে একটি চুক্তি করিল। লকের দ্বিতীয় চুক্তিটির দ্বারা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) হবস্ মানুষের প্রকৃতিকে হিংস্র ও কদর্য বলিয়া অভিহিত করেন। আর লক্ ও রুশোর মতে মানুষের প্রকৃতি সুন্দর, শুভ ও কল্যাণকামী।

(৫) হব্‌স্‌ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। কিন্তু লক্‌ ও রুশো রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করেন।

(৬) হব্‌সের মতে রাজা চুক্তির অংশীদার নয়। লক্‌ রাজাকে চুক্তির একটি পক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেন। রুশোর মতে মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক চুক্তি হয় তাহাতে রাজার কোন স্থান নাই।

(৭) হব্‌সের মতে মানুষ বিনাশর্তে সমস্ত ক্ষমতা রাজতন্ত্রে সমর্পণ করে। লকের মতে মানুষ শর্ত-সাপেক্ষে রাজার হস্তে আংশিকভাবে কতিপয় ক্ষমতা অর্পণ করে। রুশোর মতে ক্ষমতা সমর্পিত হয় সাধারণ ইচ্ছার হস্তে।

(৮) হব্‌সের মতে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার প্রজার নাই, কারণ রাজা চুক্তির ঊর্ধ্বে। লকের মতে রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ করার অধিকার আছে, কারণ রাজা চুক্তির অংশীদার। রুশোর মতে সরকার চুক্তির পক্ষ নহে। অতএব সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীও নহে। জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে সরকারের পরিবর্তন করিতে পারে।

(৯) হব্‌সের মতে চুক্তি অনুযায়ী বহু ব্যক্তি, এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিবার পর তাহারা দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করিল। লকের মতে ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া আংশিকভাবে ক্ষমতা সমর্পণ করে। রুশোর মতে চুক্তির পূর্বে মানুষ ছিল স্বাধীন। চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ স্বাধীনতা আরও দৃঢ় করা হয়। সমষ্টিগত ইচ্ছার হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করার অর্থ উহা জনগণেরই হস্তে থাকিয়া যায়।

(১০) হব্‌স্‌ তাঁহার মতবাদ দ্বারা সমর্থন করেন স্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বৈরাচার। লক্‌ তাঁহার মতবাদ দ্বারা সমর্থন করেন ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ইংলণ্ডের রক্তহীন বিপ্লব। রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেন।

(১১) হব্‌স্‌ আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচার করেন। লক্‌ প্রচার করেন যাহাকে বর্তমানে বলা হয় রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা। রুশো প্রচার করেন গণসার্বভৌমত্বের মতবাদ। তিনি স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন।

(৩) বলপ্রয়োগ মতবাদ

(The Theory of Force)

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা হয়। ওপেন-হাইমার (Oppenheimer), জেন্‌ক্‌স (Jenks) এবং ডঃ লীকক্‌ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মতবাদটিকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন:

মতবাদের ব্যাখ্যা: ডঃ লীকক্‌ বলেন, "ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সন্ধান করিতে হইবে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর আক্রমণ ও মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার মধ্যে, দুর্বল উপজাতিসমূহের উপর আক্রমণ ও তাহাদের অধীনতায় আনয়ন করার মধ্যে এবং স্বার্থান্ধ বলবানের প্রভুত্বলিপ্সার মধ্যে"। ওপেনহাইমারের ভাষায় বলা যায়, "উৎপত্তিতে সম্পূর্ণভাবে

এবং অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়ে অপরিহার্যরূপে এবং সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র হইল বিজয়ীর বলপ্রয়োগের দ্বারা বিজিত মনুষ্য সম্প্রদায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান।"* এই মতবাদদ্বয় ব্যাখ্যা করিলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা এইরূপে দাঁড়ায়ঃ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব; কিন্তু, তাহার চরিত্র প্রধানতঃ কলহপ্রিয়, আক্রমণ-মুখী ও ক্ষমতালিপ্সু। তাহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই সে আদিমকাল হইতে বলপ্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। আদিতে দলের শক্তিশালী ব্যক্তি বলপ্রয়োগ করিয়া দলের অপরাপর ব্যক্তিদের বশীভূত করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিত। পরে এই দলপতি দলের সকলকে লইয়া অপর কোন দলকে আক্রমণ করিত এবং উহাকে পরাজিত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাইত। এইভাবে বারে বারে একটি সমগ্র এলাকায় একটি দলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত; আর ঐ দলের দলপতি সমগ্র এলাকার উপর প্রভুত্ব করিতেন এবং তাঁহার আজ্ঞাই হইল আইন। এই আইন অমান্য করিলে দলপতি অমান্যকারীকে দণ্ড দিয়া তাঁহার প্রভুত্ব বজায় রাখিতেন। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ বলেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির গোড়ার দিকে বলশালী গোষ্ঠী (clan) দুর্বল গোষ্ঠীকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া গোষ্ঠীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিত এবং এইভাবে ধীরে ধীরে উপজাতির উদ্ভব হইল। তারপর আবার এক উপজাতির (Tribe) সহিত অপর উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিত। বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতির উপর প্রভুত্ব করিত। আর বিজয়ী উপজাতির নেতাকে নরপতি বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইত। এইভাবে এই উপজাতি অধ্যুষিত সমগ্র এলাকায় উপজাতিপতির প্রভুত্বাধীনে উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের।

মতবাদের গোড়ার কথা।

আবার, বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, বৈদেশিক শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজন হয় শক্তির প্রয়োগ। অতএব এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মূলেও শক্তি প্রয়োগের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদের বক্তব্য

আবার 'জোর যার মুল্লুক তার'-নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা নূতন নহে। প্রাচীনকালেও অনেকে এই মতবাদ বিশ্বাস করিতেন। হেরাক্লিটাস প্রভৃতি অনেক গ্রীক্ দার্শনিক বিশ্বাস করিতেন যে, বলপ্রয়োগ করিয়াই মানুষকে সুপথে চালিত করিতে পারা যায়। অতএব সুপথে সমাজকে চালনা করার জন্য রাষ্ট্র সর্বদাই বলপ্রয়োগ করিয়া যাইবে।

মধ্যযুগের ধর্মযাজকগণ প্রচার করিতেন যে, খ্রীষ্টধর্ম সংগঠন ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন; আর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। অতএব রাষ্ট্র যেহেতু ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট সেইজন্য খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বকে সকলের মান্য করা উচিত। এইভাবে মধ্যযুগের ধর্মযাজকগণ পোপের কর্তৃত্বের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) ছিলেন একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। তিনি প্রচার করিলেনঃ "সরকারের জন্ম পাপ হইতে; অশুভ জন্মের চিহ্ন সে

---

* The state "completely in its genesis, essentially and almost completely during first stages of its existence is a social institution forced by a victorious group of men on a defeated group."—*Oppenheimer*.

বহন করিতেছে" ("Government is offspring of evil, bearing about it the marks of its parentage.")। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এই মত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হইল সবলের স্বার্থে দুর্বলকে নিয়োজিত করিতে সহায়তা করা। রাষ্ট্রের মালিকানায় যখন শিল্প গড়িয়া উঠে তখন ঐ শিল্পের শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি হইতে বঞ্চনা করা হয় বলপ্রয়োগের দ্বারা। অতএব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব লুপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের যুক্তি হইল যোগ্যতমের জয় অনিবার্য (Survival of the fittest)। সমাজে যাহারা যোগ্য তাহারাই বাঁচিবে এবং একমাত্র তাহাদেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। অতএব দুর্বলকে সাহায্য করা রাষ্ট্রের কর্তব্য নহে। সুতরাং শক্তিমানেরই অস্তিত্ব বজায় থাকিবে ও শক্তিমানই প্রভুত্ব করিবে এবং দুর্বল বিনষ্ট হইবে। রাষ্ট্র দুর্বলকে রক্ষা করিয়া প্রকৃতির এই বিধানের বিরুদ্ধে কার্য করে। সুতরাং রাষ্ট্র হইল একটি অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান।

মার্কসবাদীদের মতানুসারে, "রাষ্ট্র শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র ; একশ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর নিপীড়ন চালনার যন্ত্র, ইহা 'শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, যে শৃঙ্খলা শ্রেণীসংঘর্ষকে সীমাবদ্ধ ও সংযত করিয়া এই নিপীড়নকেই আইনসিদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী করে"।* মার্কসের মতবাদকে লেনিন এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। মার্কসীয় মতবাদ শক্তিকে রাষ্ট্রের মূল আশ্রয়স্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এঙ্গেলস তাঁহার 'Origin of the Family, Private Property and the State' নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তখনই যখন সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং একশ্রেণী অপরশ্রেণীর উপর পীড়ন শুরু করে। এই দমন, পীড়ন ও শোষণকে কার্যকরী করে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে। অতএব রাষ্ট্র সমাজের এক শ্রেণীর দমনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আজ হইতে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে রাষ্ট্র ছিল না। মানুষ তখন আদিম সরল সমাজে জীবন যাপন করিত। এই সমাজে শোষণ, দমন ও নিপীড়নের অস্তিত্ব ছিল না। অতএব দেখা যায় বলপ্রয়োগের দ্বারা নিপীড়নকে কার্যকরী করার মধ্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও তাৎপর্য। মার্কসপন্থীরা আবার এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সমাজ যখন শ্রেণী-বিভক্ত হয় নাই, তখন রাষ্ট্রেরও উদ্ভব হয় নাই। আবার সমাজে যখন শ্রেণী-সংঘর্ষ থাকিবে না, তখন রাষ্ট্রও আর থাকিবে না। কারণ, শ্রেণী নিপীড়নের শক্তি যোগাইতে এবং তাহাকে বিধিসিদ্ধ করিবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণী-সংঘর্ষের অবলুপ্তির সহিত রাষ্ট্রের নিপীড়ন-মূলক শক্তি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হইবে এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র লুপ্ত হইবে।

মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের মূলকথা

বর্তমানে জার্মান রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে বলপ্রয়োগের মতবাদ এক অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। জার্মান দার্শনিক ট্রিট্‌স্কে (Heinrich Von Treitschke)

* "According to Marx, the State is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another: it creates "order", which legalises and perpetuates this oppression by moderating the collisions between the classes." *Coker—Recent Political Thought.*

প্রমুখ দার্শনিকগণ রাষ্ট্রশক্তির উপাসনা ও যুদ্ধের গৌরবগাথায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। পাশবিক বলকে জাতীয় সম্মান, সংস্কৃতিগত প্রভাব এবং বাণিজ্যিক প্রভুত্বকে বজায় রাখার অপরিহার্য মাধ্যম বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা রাষ্ট্রকে 'শক্তির প্রতীক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কোকারের ভাষায় বলা যায়, জার্মান দর্শন হইল "ভীতি-প্রদর্শন দ্বারা প্রভুত্ব বিস্তার, পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যুদ্ধবাদ এবং বলপূর্বক আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা দমনের নীতি।"* উপরিউক্ত ধারণাগুলির সমালোচনা নিম্নে দেওয়া গেল:

জার্মান দার্শনিকদের মতবাদ

সমালোচনা: সপক্ষে যুক্তি: (১) ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় তরবারির দ্বারাই পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় আছে যুদ্ধের কাহিনী। বিংশ শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন করিয়াছে। যুদ্ধশেষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রয়াস চালাইয়াছে। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আবার যুদ্ধের আতঙ্ক মানুষকে ভীত করিয়াছে। এই আতঙ্ক, ভয়, যুদ্ধ ও অশান্তিকর অবস্থা এই কথাই প্রমাণ করে যে, পাশবিক বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি। এই কারণে অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিবর্তনে পাশবিক বলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।

সপক্ষে যুক্তি

(২) রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা। এই সার্বভৌমিকতা শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ল্যাস্কি বলেন: সামাজিক শক্তির মধ্যেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নিহিত ("In the armed forces lies the heart of sovereignty.") রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখে সামাজিক শক্তি ও পুলিস বাহিনীর সাহায্যে। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এই পুলিস ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে। ডঃ ফাইনারের (Dr. Finer) মতে রাষ্ট্রের আদর্শকে রক্ষা করার জন্যও সামরিক শক্তি ও পুলিস বাহিনীর প্রয়োজন হয় এবং এই সামরিক শক্তি ও পুলিস বাহিনীর মধ্যে রাষ্ট্রশক্তি প্রকাশিত হয়; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও বলপ্রয়োগ করিয়া থাকে। জরিমানা, জেল, পুলিস, সামরিক বাহিনী হইল বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত। অবশ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতেই এই বলপ্রয়োগ হইয়া থাকে; আর যে সরকার এই বলপ্রয়োগ করে তাহা জনসাধারণেরই। কতিপয় অকল্যাণকর সমাজবিরোধী লোকের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের স্বার্থেই এই বলপ্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, যদি অর্থনৈতিক গণতন্ত্র (Economic Democracy) প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে কতিপয় বিত্তবান্ লোক স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োগ করিয়া থাকে। তখন রাষ্ট্রশক্তি অকল্যাণকর কার্যে লিপ্ত হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় বলপ্রয়োগের বিভিন্ন রূপ

(৩) শক্তি সর্বদাই যে অকল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হইবে এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। স্বেচ্ছাচারী রাজাকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজনে বা রাষ্ট্রকে বৈদেশিকদের হাত হইতে মুক্ত করিবার প্রয়োজনে এবং রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি পাইতে

* It is..."a creed of dominance by intimidation, militancy in international relations and forcible suppression of political dissent in domestic government".

পারে এমন সংস্থাকে রাষ্ট্র-রূপ দিতে হইলে বিপ্লব, যুদ্ধ ও শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অতএব শক্তির প্রয়োগ সকল অবস্থায় অন্যায় নহে এবং রাষ্ট্রের উদ্ভবের পশ্চাতে বলপ্রয়োগ যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। মানুষের মধ্যে যদি শুভবুদ্ধি না উদিত হয়, সমাজবিরোধী লোক যদি সমাজের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায় তবে শক্তি নিশ্চয়ই প্রয়োগ করিতে হইবে। তবে এই শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য মহান্ হওয়া প্রয়োজন। আদিতে সমাজ যখন বিশৃংখল ছিল তখন রাষ্ট্রের জন্ম হয় নাই। সমাজকে সুশৃংখল করার জন্য শক্তির প্রয়োগ করা হইল এবং এই শক্তিপ্রয়োগের আধার হিসাবে রাষ্ট্রের জন্ম হইল।

বিপক্ষে যুক্তি : আবার অনেক সমালোচক উপরিউক্ত যুক্তিকে স্বীকার করিতে নারাজ। তাঁহাদের মতে : যেমন, (১) বঙ্কিমচন্দ্র বলেন : "বাহুর বল পশুর বল। প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান্, নহিলে তাহার নিজ বাহুতে বল কত?" অনুরূপভাবে ম্যাক্ আইভার বলেন : "একমাত্র পাশবিক বল জনসমষ্টিকে বেশীদিন সংগঠিত রাখিতে পারে না, কারণ জনসাধারণের সম্মতির অনুবর্তী না হইলে পাশবিক শক্তি বিভেদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে ("Force always disrupts unless it is made subservient to common will")। এই প্রসঙ্গে টি. এইচ. গ্রীণ এই মন্তব্য করেন : "রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল জনসাধারণের সম্মতি, আসুরিক বল নহে" ("Will, not force is the basis of the State")। এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নিপীড়নমূলক শক্তি হইলেই চলিবে না, তাহা যখন বহিঃশত্রু বা আভ্যন্তরীণ আক্রমণ হইতে বর্তমান অধিকারসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য লিখিত বা অলিখিত আইন অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়, তখনই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে।"* গ্রীণের এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় মানুষ শক্তি-প্রয়োগের অধিকারী রাষ্ট্রকে ভয়ে মান্য করে না। মান্য করে এইজন্য যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আইনসঙ্গত ভাবে অধিকার বজায় রাখিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। অতএব (ক) রাষ্ট্রের প্রতি বশ্যতার ভিত্তি (Basis of Political Obligation) ভয় নহে, যুক্তি ও বিচার। আর (খ) রাষ্ট্রের ভিত্তি পাশবিক শক্তি নহে, ইহা হইল নৈতিক শক্তি, আইন এবং অধিকার রক্ষা করিবার জন্য মঙ্গলময় সংকল্পের শক্তি। গ্রীণের এই মন্তব্যকে আবার অনেকে সমালোচনা করিয়াছেন। এই সকল সমালোচকদিগের মতে রাষ্ট্রের আইন লোকে বিচার-বিবেচনা করিয়া মান্য করে না। রাষ্ট্রের আইন মান্য করে (ক) অভ্যাসের বশে (Habit), (খ) আলস্যবশে (Indolence), (গ) অজ্ঞতাবশতঃ (Ignorance), (ঘ) ভয়ে (Fear) এবং (ঙ) যুক্তি (Reason) দিয়া বুঝিয়া।

(২) সমালোচকগণ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইল একমাত্র শক্তিই কি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব করিয়াছে? শক্তিই যদি রাষ্ট্রের মূল বিষয়বস্তু হয় তবে রাষ্ট্রনীতিতে যুক্তি, নীতি, আদর্শ এবং জনসাধারণের সম্মতির কোন স্থানই থাকে না। বর্তমানে ইহা স্বীকৃত যে, রাষ্ট্রের উদ্ভবে শক্তির একটি মস্তবড় অংশ আছে, কিন্তু শক্তিই সব নয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে পাশবিক শক্তি ছাড়াও ধর্মের বন্ধন, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা, মানুষের সামাজিক প্রকৃতি প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করিয়াছে। লীকক্

---

* "It is not coercive power as such but coercive power exercised according to law, written or unwritten for maintenance of the existing rights from external or internal invasions, that makes a State."—*T. H. Green*.

এইজন্যই এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে শক্তি অন্যতম উপাদান বটে কিন্তু এই অন্যতমকে একমাত্র উপাদান হিসাবে কল্পনা করায় এই মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

(৩) এই মতবাদ নীতিগতভাবেও বর্জনীয়। কারণ, এই মতবাদ স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করে। এই মতবাদের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়, সে রাষ্ট্রে স্বাধীনতা, অধিকার ও গণতন্ত্রের আদর্শ স্বেচ্ছাচারী, বাহুবলে বলীয়ানের পদতলে লুণ্ঠিত হয়। অতএব নীতিবান লোকমাত্রেই এই মতবাদকে সমর্থন করিতে পারে না।

(৪) এই মতবাদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির বিরোধী। কারণ, এই মতবাদ যুদ্ধবাদকেই সমর্থন করে। ইহা বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধের দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হইবে এবং যুদ্ধের সাহায্যেই স্থির হইবে কাহারা বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী এবং কাহারা প্রভুত্ব করিবে। ইহা শুধু মানুষের চরিত্রের যাহা কলঙ্ক, যাহা নীচতা ও যাহা ঘৃণ্য তাহার উপরই আলোকসম্পাত করে।

উপসংহারে বলা যায়, মানুষের চরিত্রে শুধু নীচতারই সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব, উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলিও লক্ষ্য করা যায়। অতএব এই মতবাদের যুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না।

লিন্ড্‌সে বলেন ঃ অধিকাংশ আইনই প্রয়োগ করা সম্ভব, কারণ অধিকাংশ লোকই তাহা চালু রাখিতে চায় ; কিন্তু অধিকাংশ লোকের সাধারণতঃ মান্য করা এবং সকল লোকের সর্বক্ষণ মান্য করা এক নয়। ইহার মধ্যে একটু ফাঁক থাকিয়া যায়। এই ফাঁকটুকু পূরণের জন্যই শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

রাষ্ট্রের শক্তিপ্রয়োগকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা সম্ভব নয়। সকল সমাজেই কিছুসংখ্যক আইনভঙ্গকারী লোক আছে। এই কিছুসংখ্যক আইনভঙ্গকারীকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার যে সম্মতির বলে রাষ্ট্র তাহার শক্তিপ্রয়োগকে বিধিসঙ্গত করিয়াছে সেই সম্মতিরও প্রয়োজন আছে। অতএব শক্তি ও সম্মতির আপেক্ষিক সম্পর্কের উপর রাষ্ট্র তাহার ভিত্তি প্রস্তর রচনা করে।

(৫) পরিবার সম্প্রসারণের মতবাদ (ক) পিতৃতান্ত্রিক (খ) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ

(Patriarchal and Matriarchal Theories)

উপরোক্ত বলপ্রয়োগের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই বলিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাষ্ট্রচিন্তাবীরগণ রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রসঙ্গে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করেন। এই মতবাদ ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি হইতে বহু তথ্য গ্রহণ করিয়া এবং তাহাদের তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা বর্তমান রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করে। এই মতবাদকে পরিবার সম্প্রসারণের মতবাদ বলিয়া অভিহিত করা হয়। পরিবার সম্প্রসারণের মতবাদকে আবার দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ; যথা—(ক) পিতৃতান্ত্রিক, (খ) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজে

প্রথম স্তরে কোন রাষ্ট্র ছিল না, কিন্তু মানবসমাজ ক্রমশঃ বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই মতবাদ অনুসারে পরিবারই রাষ্ট্র-বিবর্তনের প্রথম স্তর এবং পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

(ক) **পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ:** এই মতবাদের প্রবক্তা হইলেন হেনরী মেইন (Henry Maine)। তিনি তাঁহার 'Ancient Law' (1861) এবং 'Early History of Institution' (1874) নামক দুইখানি গ্রন্থে এই মতবাদটি উপস্থাপিত করেন এবং বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মতবাদের সারকথা হইল বর্তমান রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে পরিবার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়া। এই পরিবারগুলি ছিল পিতৃকর্তৃত্ব-ভিত্তিক। এই পরিবার গঠিত হইল পিতা, মাতা ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া। পরিবারের প্রধান কর্তা ছিলেন পিতা। পিতার পরিচয়েই সন্তানেরা পরিচিত হইত। আবার সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার বিবাহ হইত এবং তাহারও সন্তান-সন্ততি হইত। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার জীবদ্দশায় পরিবারে তাঁহারই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর সমগ্র গোষ্ঠী সর্বাগ্রজ পুরুষের কর্তৃত্ব মান্য করিত। এইভাবে এক পরিবার হইতে বহু পরিবারের উদ্ভব হয়।

মতবাদের বর্ণনা

আবার এই পরিবারগুলি রক্তের সম্বন্ধ এবং পিতৃকর্তৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই পরিবারগুলি ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া একটি উপজাতি (Tribe) গঠন করে। আবার যখন বহু উপজাতি একই পদ্ধতিতে কোন রাজার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতে থাকে তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। হেনরী মেইন বাইবেল (Bible), গ্রীসের ও রোমের ইতিহাস এবং ইহুদী ও ভারতবর্ষের বহু একান্নবর্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পুরাকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্রই বর্তমান ছিল।

স্যার হেনরী মেইনের বহুপূর্বে এ্যারিস্টটল পরিবার হইতে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। এ্যারিস্টটল তাঁহার রাষ্ট্রনীতি (Politics) নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রাকৃতিক মতবাদ (Natural Theory) প্রচার করেন তাহাতে তিনি প্রথম দেখাইয়াছেন যে, প্রাকৃতিক প্রেরণায় ও জৈব প্রেরণায় প্রথমে পুরুষ ও নারী একত্রিত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। এই পুরুষ ও নারীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে সংসার (family)। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিবারের সৃষ্টি হয় এবং কতকগুলি পরিবার যখন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে তখনই উদ্ভব হয় গ্রামের। আর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম লইয়া একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। অতএব পরিবারই যে রাষ্ট্রের প্রথম স্তর এবং এই পরিবার যে পুরুষের কর্তৃত্বে পরিচালিত হইত তাহা গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টটলের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। স্যার রবার্ট ফিলমারও এই মতবাদের আর একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন।

এই মতবাদের মূলভিত্তিস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা কর্তব্য:

(১) সমাজে যে সময়ে পিতৃকর্তৃত্ব ছিল, তখন চিরস্থায়ী বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। (২) রাষ্ট্রের জনসংখ্যার উদ্ভব ও বিস্তৃতি ঘটে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বংশ-বৃদ্ধির মাধ্যমে। (৩) রাষ্ট্রকর্তৃত্বের আদিম উৎস হইল পিতার কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা। এই প্রথায় পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সেই কর্তৃত্বের অধিকারী হয়।

সমালোচনা ঃ (১) এই মতবাদের সমালোচনা করেন মর্গ্যান (Morgan), ম্যাক্‌লীনান্‌ (Mc Lenan), জেন্‌কস্‌ (Jenks) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ। ম্যাক্‌লীনান্‌ ও মর্গ্যান প্রভৃতি লেখকগণ বলেন যে, প্রাচীন রোম এবং আরও কতকগুলি দেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলেও এই ধরনের পরিবার সকল দেশে প্রবর্তিত ছিল না। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের উদাহরণও বহু দেশে প্রবর্তিত ছিল। আবার বর্তমান যুগে এমন বহু জাতি আছে যাহাদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারপ্রথা প্রবর্তিত আছে। আবার দেখা যায়, সমাজের আদিম অবস্থায় এক নারীর সঙ্গে বহু পুরুষ বাস করিত (Polyandry)। এই বহুপতির সংসারে মাতারই কর্তৃত্ব ছিল।

(২) অনেক লেখক আবার এই মত পোষণ করেন যে, এমন অনেক জাতি আছে যাহারা পরিবারে সংগঠিত না হইয়াও দলবদ্ধভাবে সমষ্টিগত জীবন যাপন করে; অতএব পরিবারই যে রাষ্ট্রের প্রথম স্তর তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই সকল লেখকগণের মতে পারিবারিক জীবন শুরু হইয়াছিল উপজাতি সংগঠিত হইবার পর, অতএব উপজাতিই রাষ্ট্রের প্রথম স্তর। আর উপজাতির পর আসিয়াছে গোষ্ঠী (clan), আর গোষ্ঠীর পর পরিবার। অতএব পরিবারকে রাষ্ট্রের প্রথম স্তর বলা চলে না।

(৩) বর্তমানেও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এক নারীর বহুপতিগ্রহণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এবং এই আদিম অধিবাসীদের সমাজে মাতার সাহায্যে সম্পর্ক নির্ণয় করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকার উদাহরণ হইতে বলা যায়, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই চিরন্তন নয়।

(৪) এই মতবাদ আদিম যুগে সমাজগঠন সম্পর্কে আলোকসম্পাত করে কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে বিশেষ আলোকসম্পাত করে না।

উপসংহারে বলা যায়, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অতি সরলভাবে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা করে, কিন্তু রাষ্ট্রের মতো এত জটিল সংস্থা অত সরলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

(খ) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ
(Matriarchal Theory)

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হিসাবে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম হয়। এই মতবাদের মতে প্রাচীনকালে এক নারীর বহুপতি বরণ প্রায় সর্বজনীন ছিল। সুতরাং মাতার সাহায্যে বংশ-সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি নির্ণীত হইত। জেন্‌কস্‌ এই মতবাদের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শনকালে অস্ট্রেলিয়া ও মালয়ের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে বহুপতি গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার নজির দেখান। আবার অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সমাজ জীবন বিশ্লেষণ করিয়া মর্গ্যান ও ম্যাক্‌লীনান্‌ প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকগণ এই মতবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেন ঃ

মতবাদের বর্ণনা

(ক) বিবাহ-সম্পর্ক চিরস্থায়ী ছিল না। উহা ছিল সাময়িক।
(খ) মাতার সম্পর্কেই বংশ-সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি নির্ণীত হইত।
(গ) সম্পত্তি ও কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী হইত নারী।
(ঘ) মাতার কর্তৃত্ব মান্য করিতে হইত।

সমালোচনা : (১) ইহা স্বীকার্য যে, প্রাচীনকালে সমাজে মাতার দিক হইতে রক্তের সম্বন্ধ নির্ণীত হইত। কারণ এই আদিম সমাজে এক নারী বহুপতি বরণ করিত। ফলে বিবাহপ্রথা ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায় এক নারীকেই তাহার পরিবারকে পরিচালিত করিতে হইত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সমালোচকগণ বলেন যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কখনও সার্বজনীন ছিল না।

(২) দৈহিক গঠনের দিক দিয়া নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল। অতএব এই দুর্বল নারী সমাজে সর্বদা পুরুষের উপরে প্রভুত্ব করিতে পারে না। অতএব এই মতবাদ যুক্তিহীন এবং ইতিহাসও এই মতবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না।

(৩) আবার মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে সমাজগঠনের আদিতে অপরিহার্য ছিল এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

(৪) এতদ্ব্যতীত, পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং জেনকসের মতে প্রথম ও আদি দল ছিল জাতি (Tribe)। এই জাতি পরে বিভক্ত হইয়া উপজাতির (clan) সৃষ্টি করে। এই উপজাতি ভাঙ্গিয়া আবার কতকগুলি গোষ্ঠী হইল এবং গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া হইল বহু পরিবার। আর পরিবার ভাঙ্গিয়া পড়িলে ব্যক্তি একক হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিই সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের প্রাথমিক উপাদান হইয়া দাঁড়ায়।

অতএব পরিবার সম্প্রসারণের নীতিকে সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের উদ্ভবের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

মূল্যায়ন : পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদকে অনেক লেখক সমালোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেখা যায় বহু ধর্মগ্রন্থে ও সাহিত্যে এমন সমস্ত উপদেশাবলী আছে যাহার প্রকৃতি পারিবারিক। যেমন রাজাকে পিতার মতো মান্য-করা এবং প্রজাকে পুত্রের মত স্নেহ করা, প্রতিবেশীকে ভাইয়ের মতো গ্রহণ করা। আদিম সমাজে যখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই, তখনকার দিনে (১) বশ্যতা, (২) ভালবাসা ও (৩) সৌহার্দভাব প্রভৃতি সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

অন্যথায় বিশৃঙ্খল সমাজকে সুশৃঙ্খল করা শক্ত ছিল। এই কারণে রাষ্ট্রের প্রকৃতির বর্ণনায় অনেকে পারিবারিক উপমা প্রয়োগ করেন। পরিবারের কর্তৃত্ব, স্নেহ ও কল্যাণকর উদ্দেশ্যকে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে মান্য করাইবার একটা অভ্যাস সৃষ্টি করার জন্যই এই মতবাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে যে রক্তের সম্বন্ধ আছে তাহা প্রচার করিবার ফলে আদিম সমাজকে সুশৃঙ্খল করা সহজতর হইয়াছিল। অতএব পরিবার সম্প্রসারণের মতবাদের সত্যতা না থাকিলেও প্রয়োজনীয়তা যে ছিল, তাহা অনস্বীকার্য।

কিন্তু এই মতবাদের সমর্থনে বহু যুক্তি থাকিলেও পরিবারই যে সমাজ-জীবনের প্রাথমিক রূপ তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। তবে সমাজ-বিবর্তনের স্রোতের মধ্যে এই মতবাদের যদি কোন অংশ থাকে তবে রাষ্ট্রের উদ্ভবের অন্যান্য উপাদানের সহিত ইহাকে তুলনা করিয়া এই মতবাদের গুরুত্বকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

(৫) ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ
(Historical or Evolutionary Theory)

মতবাদের বর্ণনা ঃ ইতিপূর্বে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ ও সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, এই সকল মতবাদের কোনটিই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে ; কারণ, কোনটিই এককভাবে যথেষ্ট নহে। এই সম্বন্ধে ডাঃ গার্ণার বলেন ঃ "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে, পাশবিক শক্তিরও ফল নহে, প্রস্তাব বা চুক্তির দ্বারাও ইহা সৃষ্ট হয় নাই, আবার শুধু পরিবারের সম্প্রসারণ হিসাবেও ইহাকে গ্রহণ করা যায় না।"* তাহা হইলে প্রশ্ন হইল রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণযোগ্য মতবাদ কি? রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অনেকেই ঐতিহাসিক মতবাদকে একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

গার্ণারের মত

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রমপ্রগতির ফল। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রাষ্ট্রগঠনের প্রথম অধ্যায়ে রাষ্ট্রের সূত্রপাত হইয়াছিল অতিশয় সরল ও সাধারণভাবে, কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ইহা ক্রমে ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়াছে। বহুবিধ উপাদানের জটিল মিশ্রণে, নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানুষের সমাজ-জীবন আদিম অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে বহু স্তর অতিক্রম করিয়া বর্তমান রাষ্ট্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বার্জেস বলেন ঃ "রাষ্ট্র হইতেছে, মানব-সমাজের বিরতিবিহীন বিকাশ, ইহার উদ্ভব হইয়াছে মোটামুটি একটা আকার লইয়া, ইহার প্রগতি হইতেছে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া মানবের ত্রুটিহীন বিশ্বজনীন সংগঠনের পথে কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ"।† বার্জেসের এই উক্তি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে

বিবর্তনবাদের সমর্থনে বার্জেসের উক্তি

* "The State is neither the handwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family."—*Garner*.

† "The State is a continuous development of human society out of a grossly imperfect beginning though crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organisation of mankind." *Burgess*.

বটে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইহাই সত্য যে, রাষ্ট্র মানব-সমাজের বিবর্তনের ফল।

রাষ্ট্রের সূত্রপাত কিভাবে হইয়াছিল তাহা বলা সহজ নয়। কিন্তু বর্তমানে জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা হইবার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। আদিম মানুষের জগতে ছিল প্রকৃতির রাজত্ব। মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইত। প্রতিকূল পরিবেশে-ঘেরা মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আহার্য সংগ্রহ করিতে হইত; পশুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইত; এবং যাহাতে পৃথিবী হইতে মনুষ্যজাতি লোপ না পায় তাহার জন্য বংশবৃদ্ধি করিতে হইত এবং জৈব প্রেরণার বশে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশকে নিজের বশে আনিয়া তাহাদের সঙ্গে নিজেদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব হয় নাই। অতএব মানুষই সমাজ সৃষ্টি করিয়া ও রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া বিশ্ববিজয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের এই সামাজিক প্রকৃতির বলেই মানুষ আজ পৃথিবী ছাড়াইয়া মহাকাশ বিজয়ে যাত্রা করিয়াছে। অবশ্য, এই বক্তব্যের দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় না যে, যাহা মানুষ করিয়াছে, তাহা সবই মানুষ সচেতন ভাবেই করিয়াছে। কাল হইতে কালান্তরে, প্রয়োজন মিটাইবার তাগিদে, পরিকল্পনা ছাড়া আবার পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। এই পরিবর্তনের স্রোতে সমাজ নব নব রূপে রূপায়িত হইয়াছে। এই সমাজ-জীবনের রূপান্তরে যে সকল উপাদান অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল:

প্রাকৃতিক অবস্থা সংঘবদ্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছে

(১) রক্তের সম্বন্ধ-বোধ (Kinship); (২) ধর্মের বন্ধন (Religion); (৩) আত্মরক্ষার তাগিদ, শক্তির সংগঠন ও ব্যবহার (Force); (৪) অর্থনৈতিক প্রয়োজন (Economic Need); (৫) যুদ্ধবিগ্রহ (War); (৬) রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন (Political Need)।

(১) **রক্তের সম্বন্ধ-বোধ (Kinship)**: (ক) মানুষ যূথবদ্ধ জীব। মানুষের এই যূথবদ্ধ জীবনযাপনের প্রকৃতির মধ্যেই রাষ্ট্রগঠনের বীজ উপ্ত আছে বলিয়া বিবর্তনবাদিগণ মনে করেন। রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান হইল পারিবারিক সংগঠন। প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পুরুষ ও নারী মিলিত হয়। এই পুরুষ ও নারীর মিলন হইতে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে। অতএব সন্তান উৎপাদন মানুষের আদিম ও মৌল প্রেরণার ফল। এই সন্তানকে বাঁচাইয়া বড় করিবার প্রয়োজনে সমগ্র যূথকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য, এই দায়িত্বভার প্রধানতঃ পড়ে নারীর উপরে। অতএব সমাজে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রয়োজন হয়। আবার বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্তান প্রতিপালনের তাগিদে একটা নৈকট্যবোধ জাগ্রত হয়। অতএব দেখা যায়, আদিম সমাজে রক্ত-সম্পর্কের বন্ধন মানুষকে পরিবার গঠন করিয়া একত্রে বাস করিতে এবং নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। আবার এই পরিবার ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইয়া উপজাতি বা জাতির

পরিবার

সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য, ইহার বিপরীত মতও প্রচলিত আছে ; পূর্বে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

রক্তের সম্বন্ধে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়

(খ) আবার পরিবারের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইল তখন আর গৃহকর্তার পক্ষে সকল পরিবারের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইল না। এই বিভক্ত পরিবার বা উপজাতির মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক রহিল রক্তের। এই সকল পরিবারের সভ্যদের মধ্যে একই পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। গেটেলের ভাষায় "এব্রাহামের সন্তান-সন্ততিদের ভগবানের নির্ধারিত ব্যক্তি হিসাবে মনে করা হইত, আর সকলে ছিল জেন্টাইল"।* এই পূর্বপুরুষরাই ছিল সংহতির প্রতীক।

(গ) এই ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন পরিবারকে সামগ্রিক ভাবে বলা হইত গোষ্ঠী (clan)। সমগ্র গোষ্ঠীর পরিচালনা করিতেন গোষ্ঠীপ্রধান। ম্যাক্ আইভার বলেন : "উত্তরপুরুষের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ ধীরে ধীরে ব্যাপকতর সামাজিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে রূপান্তরিত হইল। গৃহকর্তার কর্তৃত্ব গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্বে পরিণত হইল।" তারপর রাজতন্ত্রের অধীনে সমাজের উদ্ভব হইল। এই রাজতন্ত্র সৃষ্টি করিল সমাজ। আর পরে সমাজ সৃষ্টি করিল রাষ্ট্র।

(২) ধর্মের বন্ধন (Religion) : (ক) রক্তের বন্ধনের পরই আসে ধর্মের বন্ধনের কথা। রাষ্ট্রপতি উইলসন বলেন : "ধর্ম ছিল রক্তের বন্ধনের চিহ্ন ও প্রতীক। ইহা ঐক্যের, পবিত্রতার ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।" † আদিম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এবং মানুষ বহু পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়িলে তাহাদের মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপন করে ধর্ম। ধর্ম ও রক্তের সম্বন্ধ উভয়েই গোষ্ঠীজীবন গঠন করিতে সহায়তা করে। অতএব বলা যায়, প্রাচীনকালে এই গোষ্ঠীজীবনকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য যে ধর্ম সহায়তা করে তাহা রাষ্ট্রগঠনেও সাহায্য করে। কারণ ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীজীবনই রাষ্ট্রগঠনের গোড়াপত্তন করে।

গোষ্ঠীজীবনকে ঐক্যবদ্ধ করিতে ধর্মের অবদান

(খ) গোষ্ঠীজীবনে দেখা যায় গোষ্ঠীপ্রধান গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের পূজা-অর্চনা করিত। আবার প্রতিকূল পরিবেশে-ঘেরা আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির ভয়ে ভীত হইয়া প্রাকৃতিক শক্তি যথা—ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ঋতু-পরিবর্তন প্রভৃতিকে পূজা করিত। আদিম মানুষ এই দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যাখ্যা করিতে পারিত না। সেই যুগে সমাজের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত চতুর ব্যক্তি এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়া সমাজের অপরাপর লোকের উপর তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিত। সমাজতত্ত্বের ভাষায় ইহাদিগকে যাদুকর

চতুর ব্যক্তিদের ভূমিকা

* "The children of Abraham considered themselves God's chosen people—all others were gentiles."—*Gettel*.

† "Religion was the seal and sign of common blood the expression of its oneness, its sanctity, its obligation."—*Wilson*.

(Magician) বলা হয়। পরবর্তী কালে যখন জাতীয় সংগঠনগুলির সৃষ্টি হইল তখন ইহারা অনেকে পোপ ও খলিফা প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া সমাজের ধর্মগুরুর পদমর্যাদা লাভ করে। এই সকল ধর্মগুরুদিগের প্রকৃতি রহস্যের ব্যাখ্যা কালক্রমে ধর্ম ও দর্শনের পথ প্রশস্ত করে। প্রাচীনকালে গোষ্ঠীপতির আধিপত্য ছিল প্রচণ্ড। তখনকার লোকেরা বিশ্বাস করিত পূর্বপুরুষদের আত্মার সহিত প্রাচীন ব্যক্তিদের আত্মার যোগাযোগ আছে। অতএব শ্রদ্ধাভরে আদিম মানুষ গোষ্ঠীপতির নির্দেশে সকলে পরিচালিত হইত এবং সকলেই তাহার প্রতি বশ্যতা দেখাইত। বর্তমান যুগেও ইংলন্ডের রাজা ধর্মমহামণ্ডলের অধিকর্তা (Head of the established church) হিসাবে পরিচিত।

(গ) রাষ্ট্রের বিবর্তনে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করা চলে না। এই প্রসঙ্গে গেটেল বলেন ঃ "রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের প্রাথমিক ও সর্বাপেক্ষা সংকটময় অবস্থায় একমাত্র ধর্মই পাশবিক অরাজকতাকে দমন করিয়া মানুষকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের নীতি শিক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিল" ("In the earliest and most difficult periods of political development, religion alone could subordinate barbaric anarchy and teach reverence and obedience.")। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক স্তরে এবং পরবর্তী উন্নততর স্তরেও ধর্ম একই বিশ্বাসের বাঁধনে একই উপাসনার পদ্ধতিতে একই নির্দেশের বন্ধনে বশ্যতা ও নৈকট্যের বন্ধনে সমাজ জীবনকে অধিকতর ঘনসংবদ্ধ করিয়াছে। অতএব রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের ভিত্তিকে শক্ত করিবার ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাসের অবদান কম নহে। বর্তমানে হয়তো সেই ঐন্দ্রজালিকের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আজিকার ধর্মীয় রাষ্ট্রেও সেই চতুর লোকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

(৩) **আত্মরক্ষার তাগিদ, শক্তির সংগঠন ও ব্যবহার (Need of self-protection, place of force and its use) ঃ** রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাপারে সমাজ-বিবর্তনের গোড়া হইতেই বলপ্রয়োগের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বলপ্রয়োগের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় আদিম যুগে যখন মানুষকে বলপ্রয়োগের সাহায্যে শিকার করিয়া আহার্য সংগ্রহ করিতে হইত। আত্মরক্ষার জন্য আততায়ী পশু ও মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্যও বলপ্রয়োগ করিতে হইত। আবার গোষ্ঠী-প্রধানকে মান্য করানোর জন্য মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগেরও প্রয়োজন হইত। সামাজিক নির্দেশ যাহারা মান্য করিতে চাহিত না, তাহাদিগকে মান্য করাইবার জন্য এবং সামাজিক নির্দেশ বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজন হইত বলপ্রয়োগের।

বলপ্রয়োগের ব্যবহার

(৪) অর্থনৈতিক প্রয়োজন (Economic Need) : (ক) মানুষ বাঁচিতে চায়। এই বাঁচিবার জন্য প্রয়োজন আহার্য। আদিম মানুষ আহার্য সংগ্রহ একাকী করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে যূথবদ্ধ হইতে হইত। আবার এই যৌথ জীবনে শৃংখলা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হইত একদল নায়কের। শৃংখলা রক্ষা করার জন্য এই নায়কের প্রতি বশ্যতা ও তাহার নির্দেশ পালন করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই আহার্য সংগ্রহ করার সামাজিক ব্যবস্থাই হইল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়ার কথা। অতএব দেখা যায়, মানুষ প্রথমে যূথবদ্ধ হয় এই অর্থনৈতিক কারণে। তারপর এই যূথবদ্ধ মানুষ অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য রাষ্ট্ররূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

(খ) সমাজ-বিবর্তনের প্রথম স্তরে মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে মানুষ যখন ধনসম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয় করিতে শিখিল তখন এক নূতন অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধনসম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিবর্তনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। প্রথমে শিকারের যুগে মানুষেরা যাহা শিকার করিয়া পাইত তাহা সকলে সমানভাবে ভাগ করিয়া ভোগ করিত। তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই। তারপর পশুপালন ও পশুচারণ যুগে ধনবৈষম্য দেখা দিল। পশুর মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় পশুর মালিকগণ বিত্তবান্ হইয়া সমাজের অধিকারী শ্রেণীতে পরিণত হয়। সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গেল। যাহাদের সম্পদ বলিয়া কিছু ছিল না তাহারা হইল নিঃস্ব শ্রেণী আর যাহারা পশুর মালিক তাহারা হইল অধিকারী শ্রেণী। এইভাবে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়ায় উত্তরাধিকার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন অপরিহার্য হইয়া পড়িল। আবার সমাজে এই সময়ে দেখা দিল চৌর্যবৃত্তি। ইহার পর কৃষিযুগে ভূমি ও ক্রীতদাসকে ইহাদের মালিকের সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করা হইত। সহযোগিতার ভিত্তিতে যে সমাজ ছিল সেই সমাজের মূলমন্ত্র ছিল কতকগুলি স্বকৃত নিয়ম। সম্পদশালী মানুষের সম্পদের উপর মালিকানা সমাজে স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু উত্তরোত্তর স্তরে দেখা গেল যে, ধনবৈষম্য প্রকট হওয়ায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠিল। এই দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িল আরও আইন, আদালত আমলা প্রভৃতি যাহার দ্বারা সমাজে শান্তি রক্ষা করা হইত। কৃষিযুগের পর পণ্য বিনিময় প্রথা চালু হইলে বাণিজ্যের প্রসার হইল। ফলে সমাজে বণিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই বণিকশ্রেণীর স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হইল বলপ্রয়োগের। বলপ্রয়োগের দ্বারা একদিকে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা এবং অপরদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন হইল সৈন্যসামন্ত ও নেতার নির্দেশ। এইরূপে সামরিক প্রয়োজনে মানুষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইল।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল

(গ) সমাজে ধনসম্পত্তির বৃদ্ধির ফলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে, ব্যক্তিগত শ্রম-বিভাগের ফলে, বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে

শ্রেণী-সংঘর্ষকে সংযত রাখার জন্য আইন প্রণয়ন ও শাসনযন্ত্রের একান্ত-প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সমাজে অধিকারী শ্রেণী এই শাসনযন্ত্রকে নিজেদের করতলগত করিয়া শাসনযন্ত্রকে তাহাদের নিজেদের ব্যবহারে লাগাইতে শুরু করিল। রাষ্ট্রের সরকার হইল এই শাসনযন্ত্র।

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, আদিম যুগে যখন মানুষ শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত তখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই, কারণ সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হয় নাই এবং একশ্রেণী কর্তৃক অপরশ্রেণীকে শোষণ করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং শিকারের যুগে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তখনই যখন সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণ করিবার জন্য রাষ্ট্র-যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। অতএব অর্থনৈতিক শক্তি যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

(৫) **যুদ্ধবিগ্রহ (War) :** (ক) সমাজ-বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ যে স্তরে মানুষের গোষ্ঠীজীবন শুরু হইয়াছে, সেই স্তরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। কারণ, গোষ্ঠীর কোন সামরিক সংগঠন ছিল না। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সমাজ-বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে, যখন উপজাতি (Tribe) বলিয়া এক সংগঠনের সৃষ্টি হইল। এই উপজাতীয় সংগঠন হইল একটি সামরিক সংগঠন। গোষ্ঠীর সহিত উপজাতির পার্থক্য হইল, গোষ্ঠী অসামরিক আর উপজাতি হইল সামরিক। উপজাতির উদ্ভব হয় তখনই যখন পরিবার বা গোষ্ঠী এত বেশী সম্প্রসারিত হইল যে, একের সহিত অপরের ব্যক্তি-সম্বন্ধ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং আঞ্চলিক ও পারিবারিক সম্পর্কের স্থান অধিকার করিল ব্যাপকতর ধর্মের রূপ।

(খ) আবার সমাজে আক্রমণ ও প্রতিরোধ করিবার জন্য আবির্ভূত হইল বলপ্রয়োগকারী শক্তি। এই শক্তিই পরবর্তিকালে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে গৃহীত হইল। সমাজের মানুষ এই শক্তির প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করিত। উপজাতির মধ্যে সার্বভৌম অধিনায়ক হইলেন যুদ্ধনায়ক। যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধের নায়কত্ব করিতেন। এই কারণে বলা হয় যে, যুদ্ধের ফলেই রাজার জন্ম হয় (War begot the king)। শুধু যুদ্ধের সময়ই যুদ্ধনায়কের নেতৃত্ব বজায় থাকে না, তিনি শান্তির সময়েও অনেক সময় নেতৃত্ব দিয়া থাকেন।

(গ) রাষ্ট্রের উদ্ভবের গোড়ার দিকে সমাজের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ছিল অল্প। ইহার নেতার সংখ্যাও ছিল কম। পরবর্তিকালে যখন রাষ্ট্রের কার্যাবলী অধিকতর সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইল তখন তাহার কার্যাবলীও জটিলতর হইল এবং সরকারের গঠনেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেল। এই অবস্থায় একদিন যে রাষ্ট্র যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পরবর্তিকালে আর বুঝা গেল না।

(৬) **রাজনৈতিক প্রয়োজন (Political Need) :** (ক) রাষ্ট্রের বিবর্তনে প্রথমে রক্তের সম্বন্ধ ও ধর্মের বন্ধন, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, পরিবার ও গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অন্ধ আনুগত্যের যুগকে রাষ্ট্রনৈতিক অবচেতনার যুগ বলা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে অর্থনৈতিক

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবন জটিল হইয়া উঠিতে থাকে। তারপর উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উদ্‌বৃত্ত যুগের কিছুলোক ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া উহা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিল। আবার এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইল জটিল আইন ও শাসন-ব্যবস্থা। এই সময়েই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

(খ) রাষ্ট্রের উৎপত্তির হতিহাসে **শাসিতের ইচ্ছা (Consent of the governed)** এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সমাজের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদও প্রচার করিতে শুরু করিলেন। আবার গোষ্ঠী যখন উপজাতিতে পরিণত হইল তখন বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ -সংঘাতের ফলে মানুষ উপজাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইল। এই সকল কারণে, জনসমাজ ও তাহাদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। এই রাজনৈতিক চেতনা (Political consciousness) সাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

(গ) ইহা ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনার স্রোতে রাষ্ট্রের রূপ বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। গ্রীক্ নগররাষ্ট্র, রোমান সাম্রাজ্য, প্রাচ্যের প্রাচীন সাম্রাজ্য, মধ্যযুগের ফিউডাল রাষ্ট্র এবং ফিউডাল প্রথার অবস্থানে রাজতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্র—এইরূপ ইতিহাসের বিবর্তনের গতিপথে বহু জাতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। জনসমাজে জাতীয়তাবোধ (Principle of nationality) যতই শক্তিশালী হইল ততই জাতির দাবি স্বীকৃত হইয়া "এক জাতি এক রাষ্ট্র" (One Nation—one State) এই আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল।

(ঘ) আবার বর্তমান যুগ হইল আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগ। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে নিত্য নূতন উন্নতির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল নয় বলিয়া একজাতীয় রাষ্ট্রকে অপরজাতীয় রাষ্ট্রের উপর নানা বিষয়ে নির্ভরশীল হইতে হয়। এই কারণে, জাতিতে জাতিতে আত্মঘাতী যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতায় পুষ্ট জাতীয় রাষ্টগুলি তাহাদের উগ্র জাতীয়তাবোধকে প্রশমিত করিয়াছে। এক শতাব্দী পূর্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম

আধুনিক রাষ্ট্রের চরিত্র

রাষ্ট্র বর্তমানে পারস্পরিক প্রয়োজনের তাগিদে অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর রাষ্ট্রগোষ্ঠীর এক অংশে পরিণত হইল এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের ভয়ংকরী, বিষময় ক্রিয়ায় সভ্যতার বিলুপ্তি হইবার উপক্রম দেখিয়া পারস্পরিক সম্পর্কে শৃংখলা আনয়নের জন্য এক বিশ্বজনীন সংস্থা গড়িয়া তোলার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন ঃ (১) আলোচ্য মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র সমাজ-বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে জন্মলাভ করে। কিন্তু পরিবারের মতো সহজ সরল সংগঠনের মধ্য দিয়া যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে তাহা পরবর্তী কালে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে নানাবিধ বিকাশের মধ্য দিয়া অগ্রসর

হইয়াছে। অএএভব ইহা বলাই বাহুল্য যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির পশ্চাতে বহু উপাদান, বহু প্রভাব রহিয়াছে। রাষ্ট্র একদিনে একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। এই দিক হইতে বিবর্তনবাদী যুক্তি অভ্রান্ত।

(২) আবার এই মতবাদ এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে যে, ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বিভিন্ন ধরনের ছিল। মানুষ যতই সভ্য হইতেছে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহাদের ধারণাও ততই পরিবর্তিত হইতেছে। মধ্যযুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, আধুনিক যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সে ধারণা আর নাই।

(৩) বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তিত হইয়াছে। দাসপ্রথার আমলে রাষ্ট্রের যে চরিত্র ছিল অর্থাৎ, দাস-মালিকের শোষণ-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে বজায় রাখার যে ব্যবস্থা, আধুনিক যুগের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোতে রাষ্ট্রচরিত্র ঠিক তেমনটি আর নাই। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের চরিত্রও পরিবর্তিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের এই চরিত্র ও কাঠামো সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সংস্কৃত হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যায়, কোন্ এক সুদূর অতীতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইতিহাসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায়, ক্রম-পরিবর্তনের স্তরে প্রাচ্য সাম্রাজ্য, গ্রীক্ নগররাষ্ট্র, রোমান সাম্রাজ্য এবং মধ্যযুগের ফিউডাল প্রথার অবসানে রাজা ও সম্রাটের অধীনে আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের চরিত্র বিভিন্ন ধরনের হইয়াছে এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণাও ছিল বিভিন্ন প্রকারের। দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র যে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়, যথা—(১) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ এবং (২) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ। আবার এমন কতকগুলি মতবাদ আছে যাহা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়েই ব্যাখ্যা করে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদই একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতবাদ এবং অপরাপর মতবাদসমূহ কল্পনাপ্রসূত। অবশ্য, এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমালোচনায় অনেক কিছু দান করিয়াছে।

(১) ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহা প্রাচীনতম মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় রাজার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়ী, প্রজাদিগের উপর তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই।

সমালোচনা: ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ছাড়া অপর কোন শাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না। ইহা অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারিতার সমর্থনকারী। ইহা লৌকিক ব্যাপারে ঈশ্বরের কল্পনা করে বলিয়া ইহা কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু এই ঐশ্বরিক মতবাদই আদিম মানুষকে আনুগত্যের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিল। অতএব ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে।

(২) বলপ্রয়োগের মতবাদ ঃ এই মতবাদ অনুসারে একমাত্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে এবং একমাত্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইতেছে। এই মতবাদ রাষ্ট্রের

উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়েরই ব্যাখ্যা করে। এই মতবাদকে সমর্থন করেন সমাজতান্ত্রিক জার্মান আদর্শবাদিগণ এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ।

সমালোচনা: সমালোচকগণ বলেন, "রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল ইচ্ছা, শক্তি নয়" ("Will, not force is the basis of the State.")। এই মতবাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয় সমর্থনযোগ্য হইলেও, রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদকে সমর্থন করা যায় না। এই মতবাদের কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। আবার ইহা আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির পরিপন্থী। পরিশেষে বলা যায়, এই মতবাদ শুধু যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের মতবাদ। ইহা মানব-ঘৃণাকারী মতবাদ।

(৩) সামাজিক চুক্তি মতবাদ: রাষ্ট্রেরউৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল কল্পনাকরী মতবাদ আছে, তাহার মধ্যে এই মতবাদই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। এই মতবাদ যদিও অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তথাপি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক হবস্, লক্ ও রুশো এই মতবাদকে পরিস্ফুটিত করেন।

এই ত্রয়ী দার্শনিকের মতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করিল। এই প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই ত্রয়ী দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। (১) হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল দুর্বিষহ; এই দুর্বিষহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হস্তে আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া আর সমস্ত অধিকার সমর্পণ করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। হবসের মতবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা। (২) লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। কিন্তু এই অবস্থা ছিল অসম্পূর্ণ। ফলে এই অসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছিল। লকের মতবাদের সার কথা হইল রাজতন্ত্রকে সীমিত করিয়া উহাকে শাসকের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠা করা। (৩) রুশোর হস্তে সামাজিক চুক্তি মতবাদ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। প্রাকৃতিক অবস্থাকে রুশো মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং চিন্তার উন্মেষের ফলে প্রাকৃতিক অবস্থায় যে সুখশান্তি ছিল তাহা লুপ্ত হইল। তাই মানুষ পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পত্তন করিল হৃত সুখ ও শান্তিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য। রুশোর ব্যক্তিগত ধারণাই ছিল তাহার মতবাদের ভিত্তি। তিনি জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার সমর্থনে মতবাদ প্রচার করেন।

সমালোচনা: এই মতবাদকে অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক এবং বিপজ্জনক মতবাদ বলিয়া সমালোচকগণ সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মতবাদের ব্যবহারিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না, আবার সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের বিবর্তনে এই মতবাদের অবদান কম নহে।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ: এই মতবাদের সার কথা হইল-পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

সমালোচনা: এই মতবাদের বিরুদ্ধে যদিও যথেষ্ট সমালোচনা করা হইয়াছে কিন্তু এই মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে।

(৫) ঐতিহাসিক মতবাদ: এই মতবাদ কল্পনাপ্রসূত নহে। ইহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ বহুদিন ধরিয়া, বহু ধারা

বহিয়া বিবর্তিত হইয়া বর্তমানে জটিল রাষ্ট্ররূপ ধারণ করিয়াছে। এই বিবর্তনে বিভিন্ন উপাদান অংশ গ্রহণ করে; যথা, (ক) রক্তের সম্বন্ধ, (খ) ধর্মের সম্বন্ধ, (গ) যুদ্ধবিগ্রহ, (ঘ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং (ঙ) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসকল শক্তিগুলির প্রভাব সমাজজীবন এবং রাষ্ট্রজীবন গড়িয়া তোলায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

৬ | রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ
(Theories of the Nature of the State)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিয়াছেন। রাষ্ট্র কতকগুলি উপাদানে গঠিত। এই উপাদানগুলি হইল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, স্থায়ী সরকার ও সার্বভৌমত্ব। কিন্তু রাষ্ট্র-চরিত্র শুধু এই উপাদানগুলির সাহায্যেই বুঝিতে পারা যায় না। ' রাষ্ট্র হইল সমাজবদ্ধ মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের একটি **চরিত্রপন্থী সংগঠন**। এই উপাদানগুলি ছাড়াও রাষ্ট্রের একটা সামগ্রিক সত্তা আছে। ইহার একটা নির্দিষ্ট রূপ আছে, চরিত্র আছে। রাষ্ট্রের এই রূপ ও চরিত্র একমাত্র দার্শনিকের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটি বুঝিতে পারেন। আবার তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে

সমাজবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রকে দেখিয়াছেন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। ঐতিহাসিকগণ রাষ্ট্রকে একটি ঐতিহাসিক বিবর্তন-প্রসূত প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্গণ রাষ্ট্রকে একটি আইনমূলক-প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। নীতিশাস্ত্রবিদ্গণ রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরিয়া থাকেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করেন। এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়। নিম্নে এই মতবাদগুলির একটা ছক দেওয়া গেল :

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

যান্ত্রিক মতবাদ	ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মূলক মতবাদ	জৈব মতবাদ	ভাববাদী মতবাদ	আইনমূলক মতবাদ	বলপ্রয়োগ মতবাদ	ঐশ্বরিক মতবাদ	মার্কসীয় মতবাদ

(১) (ক) **যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic View)** : যান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র একটি যন্ত্রবিশেষ। কার্ল মার্কসও বলিয়াছেন, ইহা একটি নিষ্পেষণের যন্ত্র (apparatus for organised class coercion)। রাষ্ট্র মানুষের ইচ্ছায়, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট একটি কৃত্রিম সংস্থা। বিশেষ কারণে মানুষ এই যন্ত্রস্বরূপ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। হব্স্ ও লক্ ও হিতবাদীদের ধারণায়ও রাষ্ট্রকে একটি যন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হব্স্ ও লক্ বলেন যে, মানুষ প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। লকের মতে সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্যই মানুষ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। হব্সের মতে সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করিবাব জন্য মানুষ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। হিতবাদিগণের মতে সর্বাধিক জনের সর্বাধিক মঙ্গল সাধনের জন্যই মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি

করিয়াছে। গ্রীসের স্টোইক সম্প্রদায়ও রাষ্ট্রকে একটি কৃত্রিম সংগঠন হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার একশ্রেণীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রকে যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রকে বলা হইয়াছে ব্যক্তির হাতের যন্ত্র। মানুষ তাহার প্রয়োজনে এই যন্ত্ররূপ রাষ্ট্রকে তাহার ব্যবহারে কাজে লাগায়; আবার প্রয়োজনবোধে তাহাকে পরিবর্তন করিয়া লয়। সুতরাং রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই যান্ত্রিক মতবাদ নানাদিক হইতে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

সমালোচনা ঃ (১) সমালোচকগণ বলেন যে, রাষ্ট্রকে যন্ত্রের সহিত তুলনা করা যায় না। ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষ লইয়াই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ইহা যন্ত্রবৎ-ও নয়। জীববাদিগণ রাষ্ট্রকে একটি সজীব প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন। (২) আদর্শবাদিগণ রাষ্ট্রকে প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত ইচ্ছার এই সমন্বয় স্বাভাবিক। স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে। জোর করিয়া মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করে নাই। (৩) রাষ্ট্র সমাজদেহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে ইহার জন্ম। মানুষ তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় ইহাকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্বাভাবিক ভাবেই ইহা জন্মলাভ করিয়াছে। ইহা কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়। (৪) যান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করা যায় না; পরিবর্তন করা যায় সরকারকে।

মূল্যায়ন ঃ এই মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা যতই তীব্র হউক না কেন, ইহা ঠিক যে, রাষ্ট্রের প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য ইহাকে যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া বুঝানো যাইতে পারে এবং তাহাতে বুঝানোর পক্ষে সুবিধা হয়।

(খ) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক মতবাদ (Individualistic Theory of the Nature of the State) ঃ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। এই মতবাদ সর্বপ্রথম প্রচার করেন গ্রীক্ দার্শনিকগণ। এই দার্শনিকগণের মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এ্যাস্টিকোণ, ক্যালিক্লিস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল ও প্লেটোর দর্শনে এই মতবাদের বিপরীতমুখী চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহারা ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে স্থাপন করিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে এই মতবাদকে সমর্থন করেন সপ্তদশ শতকের চুক্তিবাদী হব্‌স্ ও লক্, অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী নামে পরিচিত এক শ্রেণীর দার্শনিকগণ, জার্মান দার্শনিক কান্ত, ও হামবোল্ড (Humbold) এবং উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক বেন্হাম্, জে. এস্. মিল এবং সিজউইক প্রভৃতি।

মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মতবাদের বর্ণনা ঃ এই মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর মতবাদ এবং আধুনিক মতবাদ এই দুইভাগে বিভক্ত। ইহার আধুনিক মতবাদ সংঘস্বাতন্ত্র্যবাদ। স্টোইকদের ধারণায় ব্যক্তির কাম্য জীবন ব্যক্তির উপরেই নির্ভর করে। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের মতে ব্যক্তিকে তাহার ভালমন্দ বিচার করিবার ভার দিতে হইবে। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতার রূপ (individual liberty) গ্রহণ করে। ইংল্যাণ্ডে বেন্থাম, এ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ এই মতবাদ প্রচার করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদের অবাধ নীতি (*Laissez*

Faire) নাম ধারণ করে। এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি অতিশয় সংকীর্ণ হইবে। ব্যক্তির স্বাধীনতায় রাষ্ট্র বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে। নিজের উপর, নিজ দেহ ও মনের উপর মানুষ সার্বভৌম ("Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.")। এই মতবাদের সারকথা হইল রাষ্ট্র মনুষ্যসৃষ্ট একটি কৃত্রিম (artificial) প্রতিষ্ঠান। প্রকৃতির মৌল নিয়মের সহিত রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নাই। অতএব সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কোন মূল্য নাই। ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। তাহার স্বার্থরক্ষা করাই রাষ্ট্রের প্রধানতম কাজ। ব্যক্তিকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রকে চিন্তা করা যায় না। কবির ভাষায় বলা যায়ঃ "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" এই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যাঁহারা দাবি করেন তাঁহাদিগকে বলা হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির স্বার্থবাহী হইতে হইবে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপই বাঞ্ছনীয় নহে। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ ব্যক্তির অধিকার দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিতে চান। এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তিরই শুধু অস্তিত্ব আছে, রাষ্ট্রের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। রাষ্ট্রকে শুধু রাষ্ট্রের অধিবাসী ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদিগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে, স্বাধীন সত্তার অধিকারী মানুষ যখন নিজের প্রয়োজন মিটাইবার তাগিদে ঐরূপ অন্যান্য মানুষের সহিত মিলিত হয় তখনই সমাজে বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অতএব রাষ্ট্র হইল রাষ্ট্রান্তর্গত স্বাধীন সত্তার অধিকারী ব্যক্তির সমষ্টি। রাষ্ট্র হইল ব্যক্তি-স্বার্থলাভের যন্ত্র-বিশেষ। এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক কার্যাবলীর (Self-regarding activities) উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না কিন্তু তাহার যে কার্যাবলী অপরকে স্পর্শ করে (Other-regarding activities) তাহাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে। রাষ্ট্র শুধু ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করিবে। এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তি নিজের ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারে। সমাজে অবাধ প্রতি-যোগিতার মাধ্যমে যে শ্রেষ্ঠ সেই শুধু বাঁচিবে (survival of the fittest)। ফলে সমাজ যোগ্যতমের সমাজ হইবে। অর্থনীতিক দিক হইতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে খাঁটি জিনিসটি বাহির হইয়া আসিবে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে সামগ্রিক উৎপাদন বাড়ে, সমাজ সুন্দর হয়।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সারকথা:—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'

আবার কোন কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রকে যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রকে নিজের মঙ্গলসাধনে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করে। রাষ্ট্রকে এই **ব্যক্তির হাতের যন্ত্র** হিসাবে যে মতবাদ অভিহিত করে তাহাকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বিষয়ক মতবাদও (Mechanistic Theory of the State) বলা হয়।

বস্তুতঃ এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হইল মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান, যাহাকে সে নিজের খুশিমতো নিজের প্রয়োজনবোধে কাজে লাগায়।

সমালোচনাঃ প্রথমতঃ, ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীন সত্তা

আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্য তাহাকে অপরাপর ব্যক্তি হইতে পৃথক করিয়াছে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্রের অর্থ বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যই সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া না লইলে সমাজ তাহার সকল সৌন্দর্য হারাইবে; কারণ বৈচিত্র্যের মধ্যেই সৌন্দর্যের বাস।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র-বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই বিবর্তনের প্রতি স্তরে মানুষের প্রচেষ্টা ও তাহার ইচ্ছাকৃত পরিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট রহিয়াছে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনেই মানুষ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে এবং মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, আবার রাষ্ট্র যদি মানুষের **কৃত্রিম সংগঠন** হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র ব্যক্তির ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপও করিতে পারে না। নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিকাশে, মানুষের মধ্যে যে ইচ্ছা ও প্রতিভা সুপ্ত রহিয়াছে যাহা রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া প্রকাশিত হইতে পারে না, সেই ইচ্ছা, সেই সুপ্ত অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করানোর কাজে সহায়তা করানোর জন্যই মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব রাষ্ট্র ব্যক্তির সেই অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ না করিয়া বরং তাহার বিকাশে সহায়তা করিবে, ইহাই ব্যক্তি-স্বতন্ত্র্যবাদিগণের দাবি। তাঁহাদের এই দাবি ন্যায্য ও যথার্থ।

আবার একদল লেখক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। এই সকল সমালোচকদিগের সমালোচনা নিম্নে দেওয়া গেল:

প্রথমতঃ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অর্থ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করা। অতএব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে যদি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক নানাবিধ কার্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। এই মতবাদ এই কথাই বলিতে চায় যে, রাষ্ট্র জানে না ব্যক্তির প্রয়োজন কি। আবার ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাইতে রাষ্ট্র ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী আগ্রহশীলও হইতে পারে না। অতএব ব্যক্তির হস্তেই তাহার মঙ্গলের সকল ভার অর্পণ করা বিধেয়। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ প্রয়োগ করা হইলে সমাজে যাহারা দুর্বল ব্যক্তি, যাহাদের শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে না। একমাত্র রাষ্ট্রই দুর্বল ব্যক্তিকে বলবান্ ব্যক্তির কবল হইতে মুক্ত করিতে পারে। দুর্বল ও বলবানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ভূমিকায় রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রই একমাত্র শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ, সমাজ-কল্যাণকর কার্যাবলী, হাসপাতাল, শিক্ষায়তন, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাহার কার্য সম্প্রসারিত করিয়া মানুষের ব্যাপক কল্যাণ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্র ও সমাজকে শুধু কৃত্রিম যন্ত্র হিসাবে গণ্য করেন। রাষ্ট্র মানুষের কৃত্রিম যন্ত্র মাত্র নহে। সমাজ ও রাষ্ট্রে চেতন ও মননশীল মানুষের সহ-অবস্থানের মধ্য দিয়া সংঘবদ্ধ একটি সত্তা গড়িয়া উঠে। আবার সমাজে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিতও করে। এই প্রভাবান্বিত করার মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রিক মনের সৃষ্টি হয়। মানুষের মনোজগতে তাহার নিজেরই অলক্ষ্যে

এই সৃষ্টি মানুষকে তাহার ব্যক্তি-স্বার্থের ঊর্ধ্বে সামাজিক ও রাষ্ট্রিকভাবে চিন্তা করিতে সহায়তা করে। রুশোর মতে রাষ্ট্রের সামগ্রিক ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই তাহার প্রাণবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ জাতীয়তাবাদের কথা ধরা যাইতে পারে। জাতীয়তাবোধ ব্যক্তি-স্বার্থকে অতিক্রম করিয়া মানুষকে সামগ্রিক স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে। এই সমালোচকগণের মতে ব্যক্তির সত্তা রাষ্ট্রের সামগ্রিক ইচ্ছাশক্তির মধ্যে যদি মূর্ত হইয়া উঠে তবে ব্যক্তির **প্রকৃত স্বাধীনতার** প্রকাশ হইবে। আবার রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে, যাহার সহায়তায় ব্যক্তির সত্তা পরিণত লাভ করিতে পারে। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রসত্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ বিশ্বাস করেন যে, সমাজে প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়াই প্রমাণিত হয় যে কাহার অস্তিত্ব বজায় থাকিবে। নিকৃষ্ট, দুর্বল ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রামে জয়ী না হইলে সে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইবে আর বলবান্ ব্যক্তিই শুধু সমাজে বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু এইভাবে উপযুক্ত ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকিবার-(Snrvival of the fittest) যে নীতি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ প্রচার করেন, তাহা দোষমুক্ত নহে ; কারণ এই প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের ফলে সমাজ এক সংগ্রামস্থলে পরিণত হইবে।

আবার ব্যক্তি-স্বতন্ত্র্যবাদিগণ ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পত্তি রক্ষা করার পক্ষপাতী। তাহাদের যুক্তি হইল ব্যক্তি-মালিকানায় সম্পত্তি যত বেশী দরদ ও যত্ন সহকারে রক্ষিত হইবে, রাষ্ট্রমালিকানায় তত বেশী দরদ ও যত্নসহকারে রক্ষিত হইতে পারে না। কার্যাবলীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। সর্বজনীন মালিকানায় কোন কাজ যত্ন সহকারে হইতে পারে না। এই মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি হইল রাষ্ট্র-মালিকানায় রষ্ট্রের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিই লাভবান্ হয় এবং সামাজিক জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র-মালিকানায় সকলের উন্নতি, সকলের কল্যাণ এবং সকলের স্বার্থ সমান ভাবে রক্ষিত হয়, আর ব্যক্তিগত মালিকানায় শুধু ব্যক্তি-বিশেষের উন্নতি হইতে পারে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ অপেক্ষা সমষ্টিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ অনেক পরিমাণে প্রগতিশীল মতবাদ।

চতুর্থতঃ, এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বড় করিয়া দেখে। কিন্তু এক ব্যক্তির স্বাধীনতার অর্থ অন্যান্যদের স্বাধীনতার অস্বীকৃতি। অর্থাৎ একজনের যাহতে অধিকার অপর কেহ তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কিন্তু সমষ্টিগত স্বাধীনতার জন্য এক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করিতে হয়। অন্যথায় কাহারও স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে না। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু হইতে পারে।

উপসংহারে বলা যায় যে, পরস্পর-বিরোধী এই দুই মতের সংমিশ্রণেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সত্যকার রূপ প্রকাশিত হয়। একদিকে যেমন রুশোর ভাষায় বলা যায়, রাষ্ট্রের সামগ্রিক ইচ্ছার মধ্যেই তাহার প্রাণবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, আবার ব্যক্তির অনন্যতা ও স্বাধীকার অনস্বীকার্য। ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিবার যে মতবাদ তাহাও গ্রহণযোগ্য নহে। আবার রাষ্ট্র যদি সামগ্রিক স্বার্থের নামে সমাজের অধিকারী শ্রেণীর স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য শোষিত

মানুষকে নিষ্পেষিত করে, তাহা হইলে অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রকর্তৃত্বকেও সমর্থন করা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে হইলে এই দুই মতের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(২) জৈব মতবাদ (The Organic Theory or the Organismic Theory of the State) : সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি যে সমস্ত মতবাদ রাষ্ট্রের কৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে সেই সকল মতবাদগুলির অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য একদল লেখক জৈব মতবাদ প্রচার করেন।

মতবাদের বর্ণনা : এই মতবাদের দুইটি দিক আছে। প্রথমতঃ, (ক) সাদৃশ্যমূলক যুক্তির ভিত্তিতে দেখানো হয় যে, রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব সত্তা আছে, ইহা একটি যন্ত্রবিশেষ নহে ; এবং (খ) রাষ্ট্রকে একটি প্রাণবন্ত সামাজিক জীব হিসাবেও কল্পনা করা হয়।

(ক) সাদৃশ্যমূলক চুক্তির ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব সত্তা আছে। ইহাকে যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা যায় না। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহ বা উদ্ভিদ-দেহের সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি-গত ও গঠনগত সমতা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। জীবদেহের যেমন একটি সামগ্রিকতা আছে রাষ্ট্রেরও তেমনি একটি সামগ্রিকতা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ প্রচার করে, জীবদেহের বিভিন্ন অংশের সহিত জীবের যে সম্পর্ক, রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রেরও সেই সম্পর্ক। জীবদেহের অংশগুলি যেমন পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলিও তেমনি পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। রাষ্ট্রের এই অংশগুলি হইল তাহার শাসন-পদ্ধতির বিভিন্ন বিভাগ।

তৃতীয়তঃ, জীবদেহের বিভিন্ন অংশ যেরূপ পরস্পর পরস্পরের উপর এবং সমগ্র জীবদেহের উপর নির্ভরশীল, তাহাদের যেরূপ কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই, তেমনি রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের উপর এবং রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। তাহাদেরও পৃথক সত্তা বলিয়া কিছু নাই। মানুষের হস্তপদাদি যেমন মনুষ্যদেহের অংশবিশেষ, তেমনি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রদেহের অঙ্গীভূত। আবার গাছের সহিত তাহার শাখা-প্রশাখার যেমন যোগ রহিয়াছে, তেমনি রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গেরও যোগ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে লিকক্ বলেন যে, মনুষ্যের হস্তের সঙ্গে তাহার শরীরের যেরূপ সম্পর্ক অথবা বৃক্ষপত্রের সঙ্গে বৃক্ষের যেরূপ সম্বন্ধ, মানুষের সঙ্গে সমাজের সেইরূপ সম্পর্ক— ("as is the relation of the hand to the body, or the leaf to the tree, so is the relation of man to society,"—*Leacock*)।

চতুর্থতঃ, আরও বলা হয় যে, জীবদেহের পরিবর্তন হয়। জীবদেহের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রেরও পরিবর্তন হয় ; রাষ্ট্রেরও জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে।

পঞ্চমতঃ, এই মতবাদ অনুসারে বলা যায়, জীবদেহ যেমন কোষের সমবায়ে সৃষ্ট হয়, রাষ্ট্রও সেইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত হয়।

এইভাবে সাদৃশ্যমূলক আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সমাজ বা রাষ্ট্রের একটি সামগ্রিক সত্তা আছে। রাষ্ট্রের সামগ্রিক

সত্তার অঙ্গীভূত হইল ব্যক্তি। রাষ্ট্রিক সত্তার মঙ্গলকল্পে রাষ্ট্র যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাহা ব্যক্তির পক্ষেও কল্যাণপ্রসূ হইবে। কারণ, সমগ্রের মধ্যেই অংশের মঙ্গল হইতে পারে। সমগ্রকে বাদ দিয়া অংশ কখনও তাহার সত্তাকে বজায় রাখিতে পারে না। অতএব এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ভ্রমাত্মক।

এইভাবে জৈব মতবাদ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, ব্যক্তি বা ব্যষ্টির পৃথক সত্তা নাই। ব্যক্তি বা ব্যষ্টি সমাজ বা রাষ্ট্রদেহে বিলীন হইয়াছে। রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি মূর্ত হইয়া উঠিতে পারে। প্লেটো, এ্যারিস্টট্‌ল ও রুশো প্রমুখ দার্শনিকগণ জৈব মতবাদকেই এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(খ) আবার অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে তুলনাকে আরও এক স্তর উপরে উঠাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি শুধু প্রাণিদেহের মতো নহে, রাষ্ট্র নিজেই একটি জীবন্ত প্রাণী (living organism) অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি প্রাণহীন যন্ত্র মাত্র নহে। ইহা সজীব। রাষ্ট্র ও জীবন্ত প্রাণীর কার্যকলাপ প্রভৃতি একই ধরনের। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক জীব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রিক কার্যকলাপ ও জৈবিক কার্যকলাপকে একজাতীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। ব্লুণ্টস্‌লি প্রভৃতি দার্শনিকের হস্তে এই মতবাদ চরম রূপ ধারণ করে।

রাষ্ট্র নিজেই একটি জীবন্ত প্রাণী

মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: এই মতবাদ অতি প্রাচীন। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত হইতেই এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্রকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

রোমান দার্শনিক সিসেরো রাষ্ট্র ও প্রাণিদেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। সেণ্ট পল চার্চকে খ্রীস্টের জীবন্ত দেহের সঙ্গে তুলনা করেন। মধ্যযুগে সলসবেরির জন (John of Salisbury) এবং মার্সিগ্‌লিও প্রমুখ চিন্তাবীর রাষ্ট্র ও জীবদেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করেন। চুক্তিবাদী হব্‌স্‌ ও রুশোও এই মতবাদকে পরিস্ফুট করেন। হব্‌স্‌ 'লেভায়াথান' নামক এক দৈত্যাকৃতি মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, মানুষের যেমন দুর্বলতা আছে রাষ্ট্রেরও তেমনি দুর্বলতা আছে। মানুষের যেমন ঘা, ব্যথা ও প্লুরোসি প্রভৃতি হয় রাষ্ট্রেরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। রুশো রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে মানুষের হৃদয়ের সহিত এবং শাসন-ক্ষমতাকে (executive power) মানুষের মস্তিষ্কের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই মতবাদ রুশো পর্যন্ত শুধু বাহ্য সাদৃশ্যের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু কোনে বৈজ্ঞানিক মতবাদই বাহ্য সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিতে পারে না। এই কারণে, রুশোর সময় পর্যন্ত এই মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে মতবাদের জগতে মতবাদ হিসাবে ইহার বিশেষ স্থান নাই।

জৈব মতবাদের আধুনিক রূপ: ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এই মতবাদ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। ইহার কারণস্বরূপ বলা যায় যে, পূর্ববর্তী লেখকগণ রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহ বা উদ্ভিদ-দেহের

সাদৃশ্যই শুধু বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী লেখকগণ রাষ্ট্রকে জীবদেহের অনুরূপ একটি দেহী বলিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পান। আবার চুক্তিবাদ যখন রাষ্ট্রকে চুক্তির দ্বারা সংগঠিত একটি কৃত্রিম সংগঠন বলিয়া ব্যাখ্যা করে তখন এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এবং বিবর্তনবাদের মতো বৈজ্ঞানিক মতবাদের আবির্ভাবের পরে রাষ্ট্রকে ক্রমবিকশিত সংগঠন বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বিবর্তনবাদকে সমর্থন করিবার কালে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র ও প্রাণিদেহের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা করিলেন এবং রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত প্রাণী হিসাবে বর্ণনা করিলেন। তাই এই মতবাদের নূতন রূপের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন যে, জৈব মতবাদের উদ্ভব প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই মতবাদ প্রবল হইয়া উঠে

জৈব মতবাদকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করেন জার্মান দার্শনিক ব্লুন্টস্লি এবং ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার। ব্লুন্টস্লির মতে রাষ্ট্র মানবের প্রতিমূর্তি। তিনি রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রকে পুরুষ এবং চার্চকে প্রকৃতি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পোলিস দার্শনিক গামপ্লাউইট্‌স্ ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার Sociological Idea of the State গ্রন্থে এই উক্তি করেন, রাষ্ট্র একটি জীবন্ত সামাজিক প্রাণী। রাষ্ট্রের জীবসত্তা অনস্বীকার্য

ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) এবং অস্ট্রীয় সমাজবিজ্ঞানী এ্যালবার্ট শাফল্ জৈব মতবাদের সমর্থক বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্লুন্টস্লির মতো রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত সামাজিক প্রাণী বলিয়া অভিহিত করেন নাই। অবশ্য, ইহা অনস্বীকার্য যে, হার্বার্ট স্পেনসার জৈব মতবাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দান করেন। স্পেনসার সমগ্র জগৎ সম্বন্ধেই এক বিবর্তনমূলক ধারণা প্রচার করেন। তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে, জীবদেহ এবং সমাজদেহ উভয়ই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে জীবন শুরু করিয়াছে, তারপর একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উভয়ই বিবর্তিত হয়। কিন্তু ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে তাহাদের গঠন জটিলতর হয়। এই অবস্থায় তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের জটিলতা আসে, কিন্তু সাদৃশ্য বাহির করা কঠিন হয় না। আবার বিবর্তনের সকল স্তরেই লক্ষ্য করা যায় যে, জীবদেহের ও সমাজদেহের অংশগুলি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। "হস্ত যেমন বাহুর উপর নির্ভরশীল, আবার বাহু যেমন শরীর ও মস্তিস্কের উপর নির্ভরশীল, তেমনি সমাজদেহের বিভিন্ন অংশও পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল" ("Just as the hand depends on the arm and the arm upon the body and the head, so do the parts of the social organism depends on each other".)। স্পেনসার আরও বলেন যে, সরকার বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া ইহা প্রাণীর নিয়মিতকরণ পদ্ধতির অনুরূপ। এইভাবে স্পেনসার সমাজ ও প্রাণীর মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন।

হার্বার্ট স্পেনসারের মতবাদ

স্পেনসার একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি আবার রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে যে সকল বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই ধারণা পোষণ করেন যে, জীবদেহের অংশগুলি সমগ্র দেহের সহিত ও পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ; কিন্তু রাষ্ট্রদেহের অংশসমূহ ঠিক তেমনি অঙ্গাঙ্গী সম্মন্ধে আবদ্ধ নহে। ব্যক্তির একটি স্বাধীন সত্তা আছে। জীবদেহে যেমন চেতনা, সুখদুঃখ অনুভূতির ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, রাষ্ট্রদেহে তেমনটি নয়। শুধুমাত্র চেতনশীল ব্যক্তিমাত্রই সুখদুঃখ অনুভব করিতে সক্ষম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী স্পেনসারের মতে বিবর্তনের প্রারম্ভ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত জীবদেহ ও সমাজদেহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সমতার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ব্যক্তির স্বাধীন চেতনাশীল সত্তাকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বীকৃতি দেওয়ার সমর্থনেও মত প্রকাশ করিয়াছেন। এখভাবে তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও জৈব মতবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ যে জৈব মতবাদকে অস্বীকার করে তাহা স্পেনসারের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই।

স্পেনসার সমাজ ও প্রাণীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করেন

সমালোচনা ঃ প্রথমতঃ, স্পেনসারের মতে মানবদেহের গঠন দৃঢ়-সংবদ্ধ, কিন্তু রাষ্ট্রান্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নহে। তাহারা খুবই অসংলগ্ন। অতএব এই মতবাদ যে সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, তাহা অভ্রান্ত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মানবদেহের একটি ক্ষুদ্র অংশে ইহার সমগ্র চেতনা পুঞ্জীভূত থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত হয় না। এই মতবাদ রাষ্ট্র ও জীবদেহের একটি তুলনামাত্র। ইহা কখনও সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে বহু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; যথা—(ক) জীবদেহ হইতে যদি কোন বিচ্ছিন্ন হয়, তবে ইহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্র হইতে যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অপর রাষ্ট্রে চলিয়া যায়, তাহাতে সেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট হয় না।

তৃতীয়তঃ, জীবদেহের কোন কোষের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই বা ইচ্ছা নাই। সমগ্র দেহকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার অস্তিত্ব। কিন্তু রাষ্ট্রান্তর্গত কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিতে পারে।

চতুর্থতঃ, জীবদেহের চেতনা মস্তিষ্কে কেন্দ্রভূত, আর রাষ্ট্রের চেতনা সরকারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত নহে। রাষ্ট্রের চেতনা বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে।

পঞ্চমতঃ, জীবদেহের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্ম ও বৃদ্ধি আছে; কিন্তু ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়।

ষষ্ঠতঃ, জীবদেহে অনবরত মস্তিষ্কের পরিবর্তন হয় না; কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারের অনবরত পরিবর্তন হয়।

সপ্তমতঃ, এক জীবদেহ হইতে অন্য জীবদেহ জন্মলাভ করে, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহা নাও হইতে পারে। সম্পূর্ণ নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব অসম্ভব নয়।

অষ্টমতঃ, ডঃ লিকক্ বলেন যে, "অতিরিক্ত ভাবে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের একীভূতকরণ যেমন ভয়াবহ মতবাদ তেমনি অতিরিক্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতাও বিপজ্জনক মতবাদ" "(Too great amalgamation of the individual and the State is as dangerous an ideal as too great emancipation of the individual will".)। লিককের মতে জৈব মতবাদ বিবর্তনবাদকে সমর্থন করিয়া রাষ্ট্রনীতির কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে নাই।

নবমতঃ, জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধেও কোন পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের সমর্থনে জৈব মতবাদকে ব্যবহার করেন এবং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ দিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেনসার এই মতবাদকে তাঁহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে ব্যবহার করেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী শুধু শান্তিরক্ষার কার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। আবার ব্লুন্টস্‌লি রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রকে সীমিত করার বিরোধী। ব্লুন্টস্‌লির এই মতবাদ হইতে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ও সর্বময়তার নীতির উদ্ভব হয়। ইহার ফলে আদর্শবাদ এমন কি সমাজতন্ত্রবাদেরও উদ্ভব হয়।

দশমতঃ, পরিশেষে বলা যায়, জৈব মতবাদ যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি বা নাগরিক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয় এবং সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে। এককথায় বলা যায়, জৈব মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছাড়া মানবসমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর নয়।

উপরোক্ত ত্রুটির জন্য অধ্যাপক গেটেল বলেন, "যদিও রাষ্ট্র-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তথাপি জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দিতে পারে না" ("The organismic theory is neither a satisfactory explanation of the nature of the State nor a trustworthy guide to State activity.")। অধ্যাপক হবহাউসের মতে রাষ্ট্রকে প্রাণী বলিয়া কল্পনা করা নিরর্থক।

মূল্যায়ন ঃ এই মতবাদের যথেষ্ট ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, এই মতবাদের যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রথমতঃ, এই মতবাদের তত্ত্বগত মূল্য হইল, ইহা রাষ্ট্রান্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পর-নির্ভরশীলতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের মূলগত ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের নির্দেশই জৈব মতবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রাচীন গ্রীসে নাগরিকেরা যখন ব্যক্তিগত স্বার্থ-সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছিল তখন তাহাদিগকে সমাজপ্রীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্লেটো ও এ্যারিস্টট্‌ল এই মতবাদ প্রচার করেন। জৈব মতবাদ সমগ্রতার দাবি করে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে ইহা এক চরম প্রতিবাদ।

তৃতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রকে কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করা

হয়। জৈব মতবাদ প্রচার করিতে শুরু করে যে, রাষ্ট্র কোন কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়, রাষ্ট্র ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট।

উপসংহারে, অধ্যাপক গার্ণারের ভাষায় বলা যায়, যদি এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এই হয় যে, সমাজবদ্ধ মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সমগ্র সমাজের উপর নির্ভরশীল এবং বিপরীতক্রমে সমাজও ইহার অংশস্বরূপ ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল তবে এই মতবাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি দাঁড় করানো যায় না। কিন্তু, এই মতবাদ জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের সাদৃশ্য বর্ণনার উপর বড় জোর দিয়াছে। অবশ্য, এই সাদৃশ্য বর্ণনা যদি সকল দিক হইতেই করা হইত তবে বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু এই মতবাদ সাদৃশ্যকে সকল দিক হইতে ধরে নাই; ধরিয়াছে শুধু উপরিতলগত ভাবে। এই কারণে জেলিনেক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে চান। কোকারের ভাষায় বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে হেগেলীয় দর্শন ছাড়া এই মতবাদের অস্তিত্বের সন্ধান খুব কমই পাওয়া যায়। হেগেলীয় দর্শনে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাহার নিজের জন্যই। রাষ্ট্রের বিবর্তন তাহার নিজের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ইহার অংশগুলি পরস্পর-নির্ভরশীল এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

গার্ণার, জেলিনেক, হেগেল প্রমুখ চিন্তাবীরদের মতামত

(৩) রাষ্ট্রের ভাববাদী বা আদর্শবাদী ব্যাখ্যা (Idealist Theory of the State): রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই মতবাদটিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মতবাদটিকে চরম মতবাদ (Absolute Theory of the State); আধ্যাত্মিক মতবাদ (Metaphysical Theory of the State); অলৌকিক মতবাদ (Mystical Theory of the Stete) এবং ভাববাদী মতবাদ (Idealist Theory of the State) প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই সকল নামের মধ্যে রাষ্ট্রের ভাববাদী বা আদর্শবাদী ব্যাখ্যা নামটিই বিশেষ পরিচিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) আদর্শবাদ (Idealism) হইতেই রাষ্ট্রের আদর্শবাদ বা ভাববাদী ব্যাখ্যা নামকরণটির উৎপত্তি হইয়াছে।

মতবাদের নামকরণ

আদর্শবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: জোডের (C. E. M. Joad) মতানুসারে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের, বিশেষ করিয়া প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের ধারণার মধ্যেই আদর্শবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত রিপাবলিক (Republic) গ্রন্থে এই মতবাদের ভিত্তিতে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা রচনা করেন। প্লেটোর এই আদর্শ রাষ্ট্র ছিল ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিক যাহাতে তাহার জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া পূর্ণ পরিণতির দিকে চালিত করিতে পারে তাহার জন্যই প্লেটো এই পরিকল্পনা রচনা করেন। প্লেটোর পর এ্যারিস্টটল প্লেটোর মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন না করিলেও রাষ্ট্রের আদর্শ পরিণতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এ্যারিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্র প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ন্যায় সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়। এই দুই দার্শনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্যের নির্দেশ করেন নাই এবং মানুষকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীব হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্র (Good life) হইল পরিপূর্ণ জীবনের প্রতীক আর প্লেটো বলেন রাষ্ট্র (Perfect Morality) হইল সর্বোচ্চ নীতির পূর্ণ প্রকাশ

গ্রীক দার্শনিকদিগের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

এই মতবাদের ভিত্তিতেই প্লেটো রাষ্ট্র ও মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

আদর্শবাদের জন্মের সন্ধান গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনে পাওয়া গেলেও ইহা জার্মান দার্শনিকগণের হস্তে, বিশেষ করিয়া কান্ত্ (Immanuel Kant), হেগেল (Hegel), ট্রিটস্কে (Treitschke) ও ফিচে (Fichte) প্রভৃতির হস্তে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, কান্ত্ই আদর্শবাদের জনক। রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ঐশ্বরিক অবদান বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন কান্ত্। কান্তের মতে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা নাগরিকের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে হেগেলের মতবাদ

কান্তের পর জার্মান দার্শনিক হেগেলের হস্তে এই মতবাদ এক অভিনব রূপ ধারণ করে। হেগেল রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ করেন। রাষ্ট্রকে হেগেল অতি-মানবীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সকল ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে। হেগেলের ভাষায় রাষ্ট্র হইল, "অন্যতম আত্মসচেতন নৈতিক বস্তু এবং আত্মসচেতন ও আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি" ("Self-conscious ethical substance and a self-knowing and self-actualising individual.")। আবার রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন: রাষ্ট্র পৃথিবীতে মঙ্গলময় ঈশ্বরের জয়-যাত্রার অন্যতম প্রকাশ ("The State is the March of God on Earth.")।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে হেগেলের মতবাদ

মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে হেগেলের ধারণা হইল সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজে বাস করিয়া যে স্বাধীনতা ভোগ করে, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। আবার রাষ্ট্রাধীনে বাস করিয়া মানুষ রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া, রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না; আবার রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। এই ধরনের রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কেহ কেহ সাধারণ ইচ্ছার (General Will) সমতুল্য বলিয়া মনে করেন। রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যেই এই সাধারণ ইচ্ছা মূর্ত হইয়া উঠে। আবার সাধারণ ইচ্ছা যেহেতু সকল ব্যক্তির ইচ্ছার সমন্বয় সেইজন্য ইহার প্রকাশ যে সকল কার্যাবলীর মধ্যে হইয়া থাকে তাহা সমালোচনার ঊর্ধ্বে। সুতরাং যদি কখনও ব্যক্তির ইচ্ছার সহিত সাধারণের ইচ্ছার সংঘর্ষ বাধে, তখন ব্যক্তির ইচ্ছাকে সাধারণের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে যে সাধারণের ইচ্ছা ব্যক্ত হয় এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যে যে সাধারণের ইচ্ছা রূপায়িত হয় তাহার কাছে ব্যক্তির ইচ্ছা বশ্যতা স্বীকার করিবে। এককথায় বলা যায়, রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির ইচ্ছাকে বলি দেওয়াই এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ট্রিট্স্কের মতবাদ

হেগেলের এই মতবাদ পরবর্তীকালে ট্রিট্স্কে (Treitschke) প্রমুখ দার্শনিকের হস্তে যুদ্ধবাদে (Militarism) ও সাম্রাজ্যবাদে (Imperialism) পরিণত হয়। ট্রিট্স্কে রাষ্ট্রকে শক্তির প্রতীক হিসাবে কল্পনা করেন এবং তাঁহার মতে প্রতিটি মানুষের উচিত এই শক্তির প্রতীককে পূজা করা। ট্রিট্স্কে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে পাপের প্রতীক বলিয়া মনে করিতেন এবং তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে, যুদ্ধ করিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি গ্রাস করিতে হইবে। ট্রিট্স্কের এই মতবাদকে সমালোচনা করিয়া কেহ কেহ এই মন্তব্য করেন যে, ট্রিট্স্কে ও তাঁহার সমর্থকগণের যুদ্ধবাদী নীতির প্রচারের ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এইভাবে জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে সমগ্র সত্তার অধিকারী করিয়া বর্ণনা করেন। একমাত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই তাঁহারা স্বীকার করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) রাষ্ট্রকে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের (Common good) প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রান্তর্গত জনসমষ্টির সাধারণ মঙ্গল ইচ্ছার (General will) মধ্যেই এই সামগ্রিক কল্যাণের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার জার্মান ও ফরাসী দার্শনিকগণের আদর্শবাদ ইংরেজ আদর্শবাদীদের দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। ইংল্যাণ্ডের ভাববাদীদের মধ্যে আছেন ব্রাড্‌লে (Bradley), গ্রীণ (T. H. Green) এবং ডঃ বোসানকেত (Bosanquet)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজ আদর্শবাদীদের মধ্যে কেহই ট্রিট্‌স্‌কের আদর্শবাদকে সমর্থন করেন নাই। ইংরেজ দার্শনিক গ্রীণ এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, রাষ্ট্রাধীনে থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তির জীবনের অধিকারের ন্যায় কতকগুলি মৌলিক অধিকারকে স্বীকার করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের এই মৌলিক অধিকারগুলিকে স্বীকার করে তাহা হইলে যুদ্ধের সময়েও ব্যক্তির জীবনের উপর রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকিতে পারে। গ্রীণ হেগেলের ন্যায় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিবার পক্ষপাতী নন। সুতরাং গ্রীণের দর্শনে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একটা সীমা আছে। রাষ্ট্র এই সীমা অতিক্রম করিলে ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। বোসানকেতও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তাঁহার মতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যে সকল বাধা আছে রাষ্ট্র তাহা অপসারিত করিবে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিবে।

রুশোর মতবাদ

ইংরেজ দার্শনিকদের মতবাদ

আদর্শবাদের বর্ণনা ঃ এই মতবাদ অনুসারে বাহ্য-বস্তুসমূহ ভাব মাত্র এবং ভাবেরই শুধু অস্তিত্ব আছে। যে সকল বাহ্য বস্তু দর্শন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করা যায় তাহা ভাবের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এই অনন্তলোক একটা ভাবরাজ্য। রাষ্ট্র তাহার একটি অংশ। ভাবরাজ্য অবচেতন। যেখানে রাষ্ট্র লক্ষ্য করা যায় সেখানেই ভাব চেতনা লাভ করে। ঈশ্বরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই চেতনার উন্মেষ হয়। ঈশ্বর এই চেতনার প্রতীক। যেখানে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় সেখানেই ঈশ্বরের অর্থাৎ চেতনার অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। "State is the Divine Idea as it exists on earth." হেগেলের ভাষায় ইহাই বিশ্বে ঈশ্বরের অর্থাৎ চেতনার পদক্ষেপ (March of God on Earth.)।

ভাববাদী দার্শনিকগণের মতে রাষ্ট্রও একটি ভাব (Idea)। রাষ্ট্র মনুষ্য সমাজের সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শের মূর্ত প্রতীক। অতএব রাষ্ট্রের আদেশ সর্বদা পালন করা উচিত। রাষ্ট্রের একটি ইচ্ছা আছে। এই ইচ্ছা সকল প্রকৃত বা উত্তম ইচ্ছার সমন্বয়। ব্যক্তির ইচ্ছা স্বার্থযুক্ত হইতে পারে, উহা অপ্রকৃত হইতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকৃত হইবে। সুতরাং ব্যক্তির অপ্রকৃত ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের শুভ সমষ্টিগত ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। এই শুভ সমষ্টিগত ইচ্ছা নির্ভুল হইবে, সত্যের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, ইহা ন্যায়, অসীম, ঈশ্বরের ইচ্ছার মতো যাহা সকলের মঙ্গল চায়। সুতরাং, রাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করার অর্থ ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা এবং ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা। রাষ্ট্রের উৎপত্তি

সম্বন্ধে ঐশ্বরিক মতবাদের সহিত রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাববাদী মতবাদের যে অনেক মিল আছে, তাহা এখানে লক্ষ্য করা যায়।

আদর্শবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) রাষ্ট্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। সমাজে সংগঠনগুলির মধ্যে রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা সমাজ-বিবর্তনের সর্বশেষ স্তরে জন্মলাভ করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্ররূপ স্তরের উপর আর কোন স্তর থাকিতে পারে না।

(২) সমাজ-বিবর্তনের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম স্তর বলিয়া রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের অধীন নহে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের উপর কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্ব করিতে পারে না।

(৩) রাষ্ট্রদেহ জীবদেহের ন্যায় চেতন, প্রত্যক্ষ ও মননশীল। মানুষের মতোই রাষ্ট্রের একটি ইচ্ছাশক্তি আছে। এই ইচ্ছাশক্তিকে হেগেল যুক্তি-মূলক ইচ্ছা (Rational will), আর রুশো সামগ্রিক ইচ্ছা (General will) নামে অভিহিত করিয়াছেন। হেগেলের মতে রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই এই ইচ্ছা প্রকাশ পায়। রুশো ও হেগেল এই ইচ্ছাশক্তিকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার অধিকারী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) এই মতবাদে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অংশমাত্র কল্পনা করা হইয়াছে। ফলে ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া হেগেল রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়াছেন। কিন্তু গ্রীণ প্রমুখ ভাববাদী ব্যক্তির জীবনের মৌলিক অধিকারকে স্বীকার করিয়া ব্যক্তির যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

(৫) রাষ্ট্রকে হেগেল স্বাধীনতার প্রতীক (Actualisation of freedom) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষ স্বাধীনতা চায়। কিন্তু এই স্বাধীনতা বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। অতএব মানুষ যদি বুদ্ধি ও যুক্তির নির্দেশে কাজ করে তবেই সে স্বাধীন হইতে পারিবে ; অন্যথায় নহে। আবার একক প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল হইলে ব্যক্তি শুধু নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের কথাই চিন্তা করিবে। অতএব ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে। রাষ্ট্র হইল এই নৈর্ব্যক্তিক প্রজ্ঞার অধিকারী। রাষ্ট্রের এই সামগ্রিক প্রজ্ঞা ব্যক্তির ক্ষুদ্রস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে, তাই হেগেল রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার মূর্তপ্রকাশ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।

(৬) আদর্শবাদিগণের মতে নৈতিক আদর্শের প্রকাশ হয় রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যে। সুতরাং, রাষ্ট্র সামাজিক নীতির ঊর্ধ্বে। ভাববাদীদিগের মতে ব্যক্তি যুদ্ধের সময় আপন স্বার্থ বিসর্জন দিয়া সামগ্রিক স্বার্থের জন্য প্রাণ বিসর্জনের মধ্য দিয়া নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারে।

সমালোচনা ঃ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যে সকল সমালোচনা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(ক) সমালোচনায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে শুধু ভাব ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিলেই চলিবে না। রাষ্ট্রের বাস্তব জীবনকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড, জনসমষ্টি ও

শাসন-পদ্ধতির ন্যায় বাস্তব উপাদানগুলিকেও ভাববাদ অগ্রাহ্য করে। ফলে এই মতবাদ অবাস্তবতা দোষে দুষ্ট। অধ্যাপক বার্কার এই মত পোষণ করেন যে, ভাববাদিগণ রাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন, তাহা স্বর্গরাজ্যে হয়তো বা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু মাটির পৃথিবীতে তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব।*

ভাববাদ অবাস্তব

(খ) ভাববাদী আদর্শে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বাহিরে যে বিরাট ও ব্যাপক কর্মক্ষেত্র আছে, সেখানে সমাজ সক্রিয়। যেমন ধর্মীয় কার্যাবলী, সাংস্কৃতিক কার্যাবলী প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বহির্ভূত। সুতরাং দেখা যায়, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ছাড়াও সমাজের একটা নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র আছে, যেখানে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত। অতএব রাষ্ট্র ও সমাজকে এক করিয়া দেখানো বাঞ্ছনীয় নয়।

রাষ্ট্রও সমাজ অভিন্ন নয়

(গ) এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী। ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করিতে চায় না। অর্থাৎ ভাববাদিগণ রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থক। এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের যুপকাষ্ঠে বলি দিয়া ব্যক্তির নৈতিক, চারিত্রিক, মানসিক উন্নতি করিবার সকল অর্গল বন্ধ করিয়া দিতে চায়।

(ঘ) ভাববাদিগণ রাষ্ট্রের যে জৈব মতবাদকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহা ভ্রান্ত; কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের সাদৃশ্য বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় না।

(ঙ) রাষ্ট্রকে এই মতবাদ অনুসারে সকল নৈতিক মানের উপরে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু এই মতের পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই। ফলে ইহাকে কোন কোন সমালোচক যুক্তিবর্জিত মতবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(চ) ভাববাদী হেগেলের মতানুসারে দেখা যায়, যুদ্ধের একটা নৈতিক মূল্য আছে। তাঁহার এই মতবাদ অতি মারাত্মক। কারণ, বিগত দুইটি বিশ্ববিধ্বংসী যুদ্ধের জন্য জার্মান দার্শনিক হেগেল, ট্রিট্‌সকে প্রভৃতির এই মতবাদ প্রচার বহুলাংশে দায়ী। এই মতবাদই জার্মানীর মানুষের মধ্যে যুদ্ধের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছিল; এই কারণে, অনেকে এই মতবাদকে সমর্থন করেন না।

(ছ) রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিয়াছিলেন ভাববাদী হেগেল। রাজতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নৈতিক উন্নতির যে সম্ভাবনার কথা তিনি বলিয়াছিলেন তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ, ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের নৈতিক অবনতিই হয়, উন্নতি বড় একটা হয় না।

(জ) হেগেলের মতে প্রজ্ঞাই রাষ্ট্রের ভিত্তি। কিন্তু প্রজ্ঞা ছাড়া মানুষ রাগ, দ্বেষাদিরও বশীভূত। অতএব শুধু প্রজ্ঞাই রাষ্ট্রের ভিত্তি নয়।

(ঝ) হবহাউস এই মন্তব্য করেন যে, আদর্শবাদে যে প্রকৃত স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা স্বাধীনতার অস্বীকার মাত্র। রাষ্ট্র একটি কল্যাণকর সংগঠন বটে, কিন্তু সেইজন্য ইহার সার্থকতা ইহার মধ্যে নিহিত বলিয়া মনে করিয়া ইহাকে পূজা করিলে মিথ্যা দেবতার অর্চনা করা হইবে।

---

* "The State of which it conceives may be laid up in heaven, but it is not established on Earth."—*Barker*.

উপসংহারে বলা যায়, রাষ্ট্রের প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় ভাববাদী ব্যাখ্যা যদিও বহু দোষে দুষ্ট তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মতবাদের মধ্যে কতকগুলি সত্য নিহিত আছে। ইহা রাষ্ট্রের একতা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্রের হস্তে সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনীয়তা এবং সকলের জন্য ব্যক্তির স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি আদর্শকে প্রচার করিয়া সমাজের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছে। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই যে নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্র তাহাদের এই অধিকার-ভোগে সহায়তা করে এই সত্যটি এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রই এই অধিকারের রক্ষক ও স্রষ্টা হিসাবে নাগরিকের নিকট যে আনুগত্য ও ত্যাগস্বীকার দাবি করে তাহা অন্যায় নহে। এই কারণেই এই মতবাদের যে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মূল্য আছে তাহা কেহই অস্বীকার করে না। আদর্শবাদের আর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রই আইনের উৎস এবং রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগের দ্বারা আইনকে বলবৎ করে। এই যুক্তিও অভ্রান্ত। অবশ্য, আদর্শবাদ বলপ্রয়োগকে অতিরিক্তভাবে সমর্থন করিয়াছে। বর্তমানে আদর্শবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহা যুদ্ধবাদী ট্রিট্‌স্‌কের প্রচারের ফল।

(৪) **রাষ্ট্রের আইনমূলক মতবাদ (Juristic Theory of the State)ঃ মতবাদের সংক্ষিপ্তসার ঃ** রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাষ্ট্রকে আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেন এবং আইনের বাহিরে রাষ্ট্রের কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকিতে পারে বলিয়া স্বীকার করেন না। আবার এমন কি কেহ কেহ এই মন্তব্য করেন যে, রাষ্ট্রের একটি আইনগত ব্যক্তিত্ব (Legal personality) রহিয়াছে। ব্যক্তির মতোই রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্য আছে বলিয়া এই মতবাদ বিশ্বাস করে। আবার বলা হয় যে, ব্যক্তি যেমন ধনসম্পত্তির মালিক হইতে পারে, রাষ্ট্রও তেমনি ধনসম্পত্তির মালিক হইতে পারে। ব্যক্তির মতো রাষ্ট্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিতে পারে। আবার বিপরীতক্রমে ব্যক্তিরও অধিকার আছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করার। অতএব দেখা যায়, এই মতবাদও ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সাদৃশ্য বর্ণনা করে।

মতবাদের বর্ণনা

কিন্তু আইনশাস্ত্র (Jurisprudence) ব্যক্তির আইনগত সত্তাকে যেমন স্বীকার করে তেমনি অধিকার-সমন্বিত রাষ্ট্রেরও আইনগত ব্যক্তিত্বকে (Legal personality) স্বীকার করা হয়। কিন্তু এই আইনগত ব্যক্তিত্বকে (Legal personality) প্রকৃত ব্যক্তিত্ব (Real personality) বলা হয় না। ইহা হইল রাষ্ট্রের কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব (Fictitious personality)। কিন্তু জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গিয়ার্কে (Giarke) এবং ইংরেজ ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ মেইটল্যাণ্ড (Maitland) রাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ও কাল্পনিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা রাষ্ট্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যক্তিত্বের নীতিকে (Doctrine of Real Personality) সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের আইনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মতোই অধিকার ও আইনসম্মত কর্তব্য রহিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রকে আইনগত প্রকৃত সত্তার অধিকারী বলা চলে। অবশ্য, রাষ্ট্রের এই ইচ্ছা, অধিকার ও স্বার্থের সহিত রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তির ইচ্ছা, অধিকার ও স্বার্থের কোন গভীর সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না। রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল সমষ্টির ইচ্ছা, রাষ্ট্রের অধিকার সমষ্টির অধিকার এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থ।

রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা

আবার কেহ কেহ রাষ্ট্রকে একটি যৌথ কারবারের সহিত তুলনা করেন। যৌথ কারবার যেমন শুধু বর্তমান স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, ইহা ভবিষ্যতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও পরিচালিত হয়, তেমনি রাষ্ট্রও শুধু বর্তমান স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, ইহা ভবিষ্যতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও পরিচালিত হয়। এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে, সমষ্টির স্বার্থের জন্য ব্যক্তির স্বার্থকে ত্যাগ করিতে হইতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকেও ত্যাগ করিতে হইতে পারে।

সমালোচনা : (ক) এই মতবাদকে সকলে স্বীকার করেন না। ব্যক্তি আর রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নহে। যে অর্থে ব্যক্তি আইনের চক্ষে চেতন ও মননশীল সেই অর্থে রাষ্ট্র আইনের চক্ষে চেতন ও মননশীল নহে। অবশ্য, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, এই দুই-এর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রের কাল্পনিক সত্তাকে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু ইহার প্রকৃত সত্তাকে স্বীকার করা যায় না।

(খ) আবার কেহ কেহ মনে করেন, রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে (The State is the parent of Law) ; অর্থাৎ, রাষ্ট্র আইন সৃষ্টি করে। অতএব রাষ্ট্র আইনের ঊর্ধ্বে। এইদিক দিয়া বিচার করিলে রাষ্ট্রকে সংবিধান দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনমূলক প্রতিষ্ঠান (The State is the Child of Law) বলা যায় না। অর্থাৎ, রাষ্ট্র আইনের সৃষ্টি (Creature of law) নয়। কিন্তু রাষ্ট্রকে আইনমূলক প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে এই অর্থে যে, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য আইন-প্রণয়ন, আইনকে বলবৎ করা এবং আইনসঙ্গত অধিকারের সংরক্ষণ করা। আইন লইয়াই ইহার কারবার। আবার আইন দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র স্বীকৃত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভূখণ্ড রাষ্ট্রসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু পার্লামেণ্টে যখন এমন আইন পাস করা হইল যাহা দ্বারা ভারতকে রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল, তখনই ভারত রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হইল। এখানে আইন রাষ্ট্রের সৃষ্টিকর্তা।

(৫) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলপ্রয়োগবাদ (Theory of Force) : মতবাদের বর্ণনা : রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে, শেষ বিশ্লেষণে রাষ্ট্র হইল শক্তির প্রকাশ। গ্রীক্ দার্শনিক থ্যাসিমেকাস্ খ্রীঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই বলপ্রয়োগবাদ প্রচার করেন। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে, সমাজের শক্তিশালী শ্রেণী বলপূর্বক সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং বলপ্রয়োগের সাহায্যেই রাষ্ট্রের পত্তন হয়। শক্তির মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালীয় দার্শনিক মেকিয়াভেলির মতে শক্তিই রাষ্ট্রের প্রাণ এবং শক্তির মধ্যেই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হেগেলীয় দর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যাকার জার্মান দার্শনিক ট্রিট্‌সকে ও বার্ণহার্ডি রাষ্ট্রকে শক্তির এক বিশিষ্ট প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধকে এই সকল চিন্তাবীর সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। এই সকল চিন্তাবীরদিগের মতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারে। কার্ল মার্কসও রাষ্ট্রকে বিশেষ অর্থে শক্তির প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজে যাহারা অধিকারী শ্রেণী, তাহারাই উৎপাদন যন্ত্রের মালিক ও সকল সম্পদের মালিক। সমাজের এই ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রকে তাহাদের শ্রেণীস্বার্থের যন্ত্র হিসাবে দরিদ্রশ্রেণীকে শোষণ করার কাজে

ব্যবহার করে। রাষ্ট্রের পুলিস, সৈন্য, আমলা প্রভৃতি ধনিকশ্রেণীর সম্পত্তির পাহারাদার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অতএব দেখা যায়, সমাজে যাহারা আর্থিক বলে বলীয়ান তাহারাই রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিক।

সমালোচনা : সমালোচকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের শক্তিময় রূপটির মধ্যে সত্য নিহিত আছে। কারণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে সংহত শক্তির উপর। রাজা-মহারাজারা শক্তিপ্রয়োগে স্ব স্ব রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছে। আবার শক্তিপ্রয়োগে যে নূতন নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উদাহরণও বিরল নহে। কিন্তু শুধু শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের ন্যায় জটিল প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত চরিত্র বুঝা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক অবস্থা, মানুষের ধ্যান-ধারণা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মানুষের অনুভূতি ও প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া শুধু বলপ্রয়োগের ব্যাখ্যা রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র উদ্ঘাটিত করিতে পারে না।

(৬) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা (**Divine Theory**) **:** পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই মতবাদ আলোচিত হইয়াছে। অতএব এখানে এই মতবাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য, রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যা রাজতন্ত্রের ও নৃপতিবর্গের নিরংকুশ ক্ষমতার সমর্থন করে। ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ধর্মসংস্কারের ভিত্তিতেই এই মতবাদ দাঁড়াইয়া আছে। এই মতবাদ লৌকিক ব্যাপারেও দেবত্বকে আরোপ করে। অতএব ইহা যুক্তিতর্কের বহির্ভূত। অবশ্য রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজনীয়তা ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে নাই। একদিন মানুষকে বশ্যতা শিক্ষা দিবার জন্য এই ধরনের মতবাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই মতবাদের প্রয়োজনীয়তা আর নাই বলিলেও চলে।

(৭) রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদ (**Marxian Theory of the State**) **:** আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত মতবাদগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে ; যেমন, (১) বহুত্ববাদিগণের মতবাদ আর (২) স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ। প্রথমোক্ত মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র সমাজের বহুবিধ সংঘের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। স্কুল, কলেজ, শ্রমিক-সংঘের মতোই রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রের কার্যও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। বহুত্ববাদিগণের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সমাজজীবনে প্রথম প্রয়োজন ঐক্য ও শৃংখলা। এই ঐক্য ও শৃংখলা রক্ষা করে রাষ্ট্র। সুতরাং সমাজজীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকাই শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় মতবাদটিকে ইতালির একনায়ক মুসোলিনির ভাষায় বলা যায় যে, সকলেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ("All within the State.")। অর্থাৎ রাষ্ট্র ছাড়া আর কোন ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যে মতবাদ ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, সেই মতবাদ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্যই রাষ্ট্রের অবস্থিতি। সেই রাষ্ট্রে যদি ব্যক্তির গলা টিপিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হয় তবে তাহা রাষ্ট্রের পদবাচ্য হইতে পারে না। এমন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন নাই।

রাষ্ট্রের ভিত্তি

(Basis of the State)

উপরে যে সকল মতবাদ আলোচিত হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র তাহার সভ্যদের নিকট হইতে আনুগত্য দাবি করে। সভ্যগণ যদি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য না দেখায় তবে রাষ্ট্র তাহাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের আনুগত্যের সম্পর্কের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র গঠিত হয়। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি নাগরিকের সহিত রাষ্ট্রের কোন চুক্তি নয়। পরিবারের সহিত পরিবারের যে সম্পর্ক নাগরিকের সহিত রাষ্ট্রেরও সেই সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়াই নাগরিকগণ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে। কার্ল মার্কসের মতে শক্তিই রাষ্ট্রের ভিত্তি। শক্তি বা বলপ্রয়োগ করিয়াই রাষ্ট্র শোষক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। এখানে রাষ্ট্র নিষ্পেষণের যন্ত্র স্বরূপ। মার্কসের মতে ইহাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভিত্তি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিপ্লবকে বাঁচাইয়া রাখিবার ও প্রতি-বিপ্লবের যন্ত্র বিশেষ।

আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি সকলের সম্মতি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাহার বিচারবুদ্ধি আছে এবং সে চেতনা-সম্পন্ন। সামাজিক চুক্তিকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। ইহাই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তি। প্রত্যেকেই স্বাভাবিক আইনের দ্বারা শৃংখলাবদ্ধ। সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেকের অধিকার স্থির করা হয় এবং রাষ্ট্র এই অধিকারকে সংরক্ষণ করে। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। এই আইন প্রণয়নে সকলে অংশগ্রহণ করে। সকলে অংশ গ্রহণ করে বলিয়া আইন বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাষ্ট্র যদি চুক্তিমতো কাজ না করে তবে আবার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সকলের বিদ্রোহ করিবার অধিকারও আছে। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকারই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের প্রকৃতির অর্থ হইল রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত সত্তা ও তাহার চরিত্রের রূপ। বিভিন্ন দার্শনিক রাষ্ট্রের চরিত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদগুলি হইল (ক) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক মতবাদ, (খ) জৈব মতবাদ, (গ) আদর্শবাদী ব্যাখ্যা, (ঘ) আইনমূলক মতবাদ, (ঙ) বলপ্রয়োগবাদ, (চ) ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা, (ছ) মার্কসীয় মতবাদ।

(ক) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হইল ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র। রাষ্ট্র হইল ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের যন্ত্রমাত্র। কিন্তু এই মতবাদ সমষ্টিকে ও সমষ্টির স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়াছে।

এই মতবাদ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বিশেষভাবে সংকোচনের পক্ষপাতী। এই মতবাদ রাষ্ট্রকে জনকল্যাণকর কর্মপ্রচেষ্টা হইতে বিরত করে।

(খ) জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহের সাদৃশ্য বর্ণনা করে। এই মতবাদ সমষ্টিগত জীবনকে বড় আসন দিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিয়াছে।

(গ) ভাববাদী মতবাদ রাষ্ট্রকে একটি ভাবরূপে কল্পনা করে এবং রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ নীতির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। ইহা রাষ্ট্রের জৈব মতবাদকে সমর্থন করে। কিন্তু এই মতবাদ অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত। অবশ্য, রাষ্ট্রের সামগ্রিক সত্তা এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য প্রভৃতি এই মতবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

(ঘ) আইনমূলক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র আইনগত সত্তার অধিকারী এবং ইহা ব্যক্তির মতো প্রকৃত সত্তার অধিকারী। কিন্তু এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ চেতন ও মননশীল মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন তুলনা চলে না।

(ঙ) বলপ্রয়োগবাদ প্রমাণ করিতে চায় যে, রাষ্ট্র শক্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এই মত একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট।

(চ) ঐশ্বরিক মতবাদ রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করিয়া এই মতবাদকে যুক্তিতর্কের বহির্ভূত করিয়াছে। বলা হয়, এই মতবাদ অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক। অবশ্য, ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

(ছ) মার্কসীয় মতবাদ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

(জ) রাষ্ট্রের ভিত্তি।

মার্ক'সীয় রাষ্ট্রদর্শন
(Marxian Theory of the State)

কার্ল মার্কস্ (Karl Marx 1818-83) : বর্তমান রাষ্ট্রচিন্তাজগতে কার্ল মার্কস্ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কার্ল মার্কস্ ছিলেন একজন জার্মান ইহুদী। জার্মানীর বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন মার্কস্। দুর্ভাগ্যবশতঃ মার্কস্ জার্মানীতে বেশীদিন বাস করিতে পারেন নাই। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম প্রভৃতি রাষ্ট্রের সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করিবার জন্যই এই সকল রাষ্ট্র হইতেও তাঁহাকে বিতাড়িত করা হয়। এই সকল রাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত হইয়া মার্কস্ ১৮৪৯ সালে লণ্ডন শহরে জীবনের অবশিষ্ট ৩৪ বৎসর অতিবাহিত করেন। মার্কসের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের সমর্থক বন্ধু ছিলেন ফেডারিক এংগেলস্ (Frederick Engels)। মার্কস্ ও এংগেলস্ একযোগে ১৮৪৮ সালে বিখ্যাত কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো (Communist Manifesto) প্রকাশ করেন। কার্ল মার্কসের অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে Das Capital বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তার সন্ধান পাওয়া যায়। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে কার্ল মার্কসের মতো অন্য কোন মনীষী এইরূপ স্বীকৃতি লাভ করেন নাই।

মার্কসীয় দর্শনের মূলকথা ঃ মার্কসের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন বুঝিতে হইলে মার্কসীয় দর্শনের কয়েকটি মূলসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন ; যথা, (১) মার্কসীয় দর্শন (Marxian Philosophy), (২) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism), (৩) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic interpretation of History), (৪) শ্রেণী সংগ্রাম (Class Struggle), (৫) উদ্বৃত্ত মূল্যের মতবাদ (Theory of Surplus Value), (৬) সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of Proletariat) এবং (৭) রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ (Marxian Theory of the State)।

(১) মার্কসীয় দর্শন ঃ মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করিতে হয় এংগেলসের একটি উক্তি দিয়া। এংগেলস্ বলেন ঃ "ডারউইন যেমন জীবজগতের বিবর্তন নীতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মার্কস্ তাঁহারই মতো মানব ইতিহাসের বিবর্তনের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা চিরন্তন সত্য। মার্কস্ আবিষ্কার করিলেন যে মানুষকে রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম এবং অন্য কিছু চর্চায় নিযুক্ত হইবার পূর্বে তাহাকে তাহার খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আবাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু অলস ভাববিলাসিতা ও শৌখিন আদর্শবাদিতার আগাছার চাপে এই সত্য কথাটি এতদিন কেহ উপলব্ধি করেন নাই। মার্কসের এই মতবাদের ব্যাখ্যাকে বুঝিতে হইলে ভাববাদী দর্শনের সহিত মার্কসীয় দর্শনের পার্থক্যটি বুঝিতে হইবে। ভাববাদী দর্শনে ভাবই প্রধান আর মার্কসীয় দর্শনে বস্তুই প্রধান। ভাববাদী হেগেলের মতে ভাব (Idea) ও মতাদর্শের পরিবর্তনের ফলে ইতিহাসের গতিধারা পাল্টায়

(১) ভাববাদ ও বস্তুবাদ

এবং সমাজ পরিবর্তিত হয়। আর মার্কসের মতে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলেই সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো বদলায় এবং তাহারই সঙ্গে তাল রাখিয়া ভাব (Idea) ও মতাদর্শ পরিবর্তিত হয়। হেগেল বলেন, অর্থনীতি ভাবের অনুগামী। মার্কস্ বলেন, ভাব অর্থনৈতিক অবস্থার অনুগামী। মার্কস্ ধর্মনীতি, আদর্শ ও ভাব প্রভৃতিকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি শুধু অর্থনৈতিক সম্পর্কের অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভাব, আদর্শ, ধর্ম, কলা ও সাহিত্য প্রভৃতিকে সমসাময়িক সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বা উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিফলের হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।

মার্কস্ বিশ্লেষণ করিলেন যে, জড়জগতের সহিত মনুষ্যসমাজের সম্বন্ধ বিশ্লেষণের উপর ভাবচরিত্র নির্ভর করে; নির্ভর করে সমাজের ধর্ম ও মতাদর্শ। মার্কস্ বলেন, সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন হইতেই মানুষের মনে তত্ত্বমূলক ভাবের সৃষ্টি হয় ("With me...the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind, and translated, into forms of thought.")। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে ধনিকশ্রেণী উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক এবং তাহারাই সমাজে প্রতিপত্তিশালী। তাহারা রাষ্ট্রশক্তিকে তাহাদের শ্রেণীস্বার্থের আনুকূল্যে ব্যবহার করে। তাহাদেরই প্রয়োজনমতো আইন প্রণয়ন করে, সাংস্কৃতিক দিকে কলা ও সাহিত্য সৃষ্টি করে। আবার সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে আইন, রীতি-নীতি, কলা, সাহিত্য ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই আইন প্রণীত হয় শোষণ ব্যবস্থাকে নির্মূল করিবার জন্য। অতএব দেখা যায় আইন, কলা, আদর্শ প্রভৃতি সমাজ সম্পর্কের বা উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়।

মার্কসবাদীরা বলেন, সারা ইউরোপ যখন ধারণাসর্বস্ব রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের দ্বারা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল তখন মার্কস্ সমাজের বর্তমান অবস্থার বস্তুগত রূপের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া সামাজিক ব্যাধির কারণ ও তাহার নিরসনের উপায় নির্ধারণ করিলেন।

(২) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism): মার্কসীয় তত্ত্ব শুধু বস্তুবাদী নয় উহা দ্বন্দ্বমূলকও বটে। মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ (dialectics) অনুসারে পৃথিবীর সকল বস্তুই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক বস্তুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। অবশ্য, এই পরিবর্তন সহজ প্রণালীতে হয় না। বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন ধীর গতিতে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তনের উল্লম্ফনকেই (Leaps or jumps) বলা হয় "বিপ্লব"। অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হইতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উল্লম্ফিত হইলে তাহাকেই বলে বিপ্লব। বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন একগ্লাস জলের অত্যধিক ঠাণ্ডায় বরফে পরিণতি হইল, বস্তুর পরিমাণগত রূপের গুণগতরূপে রূপান্তর (transformation of quantity into quality)। আবার সকল বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা অসামঞ্জস্য (contradictions) থাকে। এই অসামঞ্জস্যই পরিবর্তনের মূল। সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের মধ্যে মুনাফার জন্য, বাজার দখলের জন্য, অত্যধিক

(২) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

উৎপাদনের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব গড়িয়া উঠে, এবং শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়। মার্কস বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার ঐক্য (Law of the unity of opposites) রহিয়াছে। নদীর যেমন এককূল ভাঙ্গে আবার আর এক নূতন কূল গড়িয়া উঠে, তেমনি প্রত্যেক জিনিসেরই একদিক লুপ্ত হইতেছে আবার নূতন দিক গড়িয়া উঠিতেছে। এমনি ভাবে বিপরীতমুখী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়া পুরাতন ধ্বংস হইতেছে আর নূতন গড়িয়া উঠিতেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে তেমনি পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস হইতেছে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্মেষ হইতেছে। এই দ্বন্দ্বশীল শক্তির দুইটি দিকের একটিকে বলা হয় বাদ (thesis) আর অপরটিকে বলা হয় প্রতিবাদ (antithesis)। এই বাদ ও প্রতিবাদের সংঘাতের মধ্য হইতে জন্মলাভ করে সম্বাদ (synthesis)। সম্বাদ হইল একটি নূতন অবস্থা। অবশ্য এই নূতন অবস্থার মধ্যে পুরাতন অবস্থার কিছুটা থাকিয়া যায়। সামাজিক ক্ষেত্রে এই নীতিকে প্রয়োগ করিলে দেখা যায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রয়োজনের তাগিদেই শ্রমিকশ্রেণী জন্মলাভ করে। পুঁজিবাদিগণ শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া চলিতে পারে না। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে "বাদ" (thesis) ধরিলে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট শ্রমিকশ্রেণীকে "প্রতিবাদ" (antithesis) হিসাবে ধরিতে হয়। এই বাদ ও প্রতিবাদের সংঘাতের মধ্য হইতে প্রতিবাদও বাতিল হইয়া গিয়া সমাজতন্ত্ররূপে এক "সম্বাদ" (synthesis) জন্মলাভ করে। সুতরাং দেখা যায়, যে প্রতিবাদ বাদকে অস্বীকার করিল আবার সেই প্রতিবাদই বাতিল হইয়া গেল। সুতরাং সমাজতন্ত্র হইল এক অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি (negation of negation)।

বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদ

মার্কস্ হেগেলেরই দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে রূপ দিলেন। হেগেলের মতে ভাব (Idea) দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতেই মানব ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটায়। মার্কসের মতে বস্তুই দ্বন্দ্বমূলকভাবে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটায়। ভাব বস্তুজগতেরই প্রতিফলন (reflex)।

(৩) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ঃ মার্কস মানব-ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, যে মানুষের প্রয়োজনীয় উৎপাদন এবং সেই উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাবে মানবসমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে কোন সমাজের যে-কোন সময়ের বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান, আইন-ব্যবস্থা, কলা, সাহিত্য এবং ধর্ম—সেই সমাজের সেই সময়কার প্রচলিত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। অতএব আইন, কলা, ধর্ম ও সামাজিক অন্যান্য বিষয়ের স্বরূপ সমসাময়িক অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর সম্পূর্ণভাবে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক দিক হইতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; মার্কসের এইরূপ ব্যাখ্যাকে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (Economic Interpretation of History) বলা হয়। মার্কসের মতে উৎপাদন পদ্ধতির (Mode of production) উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে নির্দিষ্ট ধরনের সমাজ ও শ্রেণীসম্পর্ক। এই উৎপাদন পদ্ধতির আবার দুইটি দিক আছে; (১) উৎপাদন শক্তি (The forces of production), (২) উৎপাদন সম্পর্ক (The relation of production)। উৎপাদন শক্তি বলিতে বুঝায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, শ্রমিক ও তাহার দক্ষতা আর উৎপাদন

উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক

সম্পর্ক বলিতে বুঝায় প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সম্পর্ক, তাহাকে। এখন উৎপাদন ব্যবস্থায় যে শ্রেণী উৎপাদন শক্তির মালিক তাহারাই সমাজের প্রতিপত্তিশালী এবং তাহারাই ঐ প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ককে প্রচলিত রাখিতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য শ্রেণীর উপর তাঁহাদের শোষণকে অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু নিত্যনূতন উৎপাদন শক্তি আবিষ্কারের ফলে নূতন উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন দেখা যায়। কারণ পূর্বেকার উৎপাদন শক্তির মালিক পূর্বেকার প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন সম্পর্ককে বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। আর নূতন উৎপাদন শক্তির মালিক নূতন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে। ফলে পূর্বেকার উৎপাদন শক্তির মালিকের সহিত উন্নততর উৎপাদন শক্তির মালিকের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠে। এইভাবে সমাজবিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই সমাজ প্রগতির পথে পরিচালিত হয়।

(৪) শ্রেণীসংগ্রাম ঃ উপরোক্তভাবে ইতিহাসের পর্যালোচনা করিয়া মার্কস্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, একমাত্র প্রাক্-ঐতিহাসিক সমাজ ছাড়া অন্যান্য যুগে ইতিহাস মূলতঃ শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস ("The history of all hitherto existing society is the history of class struggle."—Communist Manifesto)। মানব ইতিহাসকে শিকারের যুগ, পশুপালনের যুগ, সামন্তযুগ ও শিল্পযুগে বিভক্ত করিয়া মার্কস্ দেখাইয়াছেন যে, পশুপালনের যুগে যে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সামন্তযুগে তাহা হইতে উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। ফলে পশুপালনের যুগে যে শ্রেণীসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে সামন্তযুগে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়াছে। শিল্পযুগে আবার আরও উন্নততর উৎপাদন শক্তির আবিষ্কারের ফলে নূতনতর উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এই নূতন শ্রেণীর উদ্ভবের মধ্য দিয়া এই শ্রেণী-সংঘর্ষ আরও চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। মার্কস্ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রতি যুগেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। একশ্রেণী অপর শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। যে শ্রেণী উৎপাদন শক্তির মালিক সে তাহার শোষণ পদ্ধতিকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে। আর একশ্রেণী—যে শ্রেণী শোষিত সে শ্রেণী শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইবে।

শিকারের যুগ
পশুপালনের যুগ
সামন্ত যুগ ও
শিল্প যুগ

মার্কস্ বিশ্বাস করেন যে, ক্রমবর্ধমান বিরামহীন শোষণের দ্বারা বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণী বলিষ্ঠ সংগঠন সৃষ্টি করিয়া ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ করিবে। এই প্রসঙ্গে মার্কসের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। মার্কস বলেন ঃ "বর্তমান সমাজে শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্য আমার কোন কৃতিত্ব নাই; এমনকি শ্রেণীসংগ্রামের আবিষ্কারের জন্যও আমার কোন কৃতিত্ব নাই। আমার বহু পূর্বেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক পরিস্ফুটনের বর্ণনা করিয়াছেন। বুর্জোয়া ধনবিজ্ঞানীরা শ্রেণীতে শ্রেণীতে অর্থনৈতিক সম্পর্কের আলোচনা করিয়াছেন। আমি যাহা প্রমাণ করিয়াছি তাহা নূতন, তাহা হইল, (১) উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়নের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরের সহিতই শুধু শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব সংলগ্ন থাকিবে, (২) শ্রেণীসংগ্রাম

নিশ্চিতভাবে সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে এবং (৩) এই একনায়কত্ব নিজেই সকল শ্রেণীর বিলোপের মধ্যে এবং শ্রেণীহীন সমাজে রূপান্তরিত হইবে।"* কার্ল মার্কসের এই উক্তির সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হইয়াছে। প্রতি যুগেই লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি যুগেই শোষিত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জোয়ারের মুখে অধিকারী শ্রেণী স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে।

(৫) **উদ্বৃত্ত মূল্যের মতবাদ:** মার্কসের মতে একটি সামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে উহা উৎপাদন করিতে ব্যয়িত শ্রমের উপর। যেমন যে সামগ্রী উৎপাদন করিতে অধিক শ্রম ব্যয় হয় তাহার উৎপাদন ব্যয় বেশী, ফলে তাহার বিনিময় মূল্যও বেশী। আবার কম পরিমাণ শ্রমব্যয়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার বিনিময় মূল্যও কম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকেরা যে পরিমাণ মজুরি পায় তাহা তাহাদের ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের তুলনায় কম। আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায়, বাজারে যে মূল্যে দ্রব্য বিনিময় হয় তাহা অপেক্ষা কম হারে শ্রমিক মজুরি পায়। বাজারে সামগ্রীর বিনিময় মূল্য যদি সামগ্রীর উৎপাদনের ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের সমান না হয় তাহা হইলেই সামগ্রীর বিনিময় মূল্য হইতে যে পরিমাণ মজুরি শ্রমিককে দেওয়া না হইবে তাহাই মার্কসের মতে **উদ্বৃত্ত মূল্য** (Surplus value)। উৎপাদনের উপায়-গুলির মালিক শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি হইতে বঞ্চিত করে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার আইনসিদ্ধ থাকায় উৎপাদনের উপায়গুলি, যথা—খনিজ সামগ্রী, কৃষিজাত দ্রব্য যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতির উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে পারে। উৎপাদনের উপাদানগুলি আবার মালিক-শ্রেণীর করায়ত্ত বলিয়া শ্রমিকশ্রেণী এই মালিকশ্রেণীর নিকট তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। শ্রমিকের ব্যয়িত শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয় করিয়া মালিকশ্রেণী যাহা পায় তাহার একটা সামান্য অংশ শ্রমিকদিগকে পারিশ্রমিক বাবদ দিয়া অবশিষ্ট একটা বৃহত্তর অংশ মালিকশ্রেণী আত্মসাৎ করে। মার্কস্ মুনাফাকে আইনসিদ্ধ চৌর্যবৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মালিকশ্রেণী এইভাবে শ্রমিক-দিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া অধিকতর ধনবান হইতে থাকে এবং অপরদিকে শ্রমিকগণ অধিকতর নির্ধন হইতে থাকে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে না। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এই পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হইবে এবং নূতন ব্যবস্থার আবির্ভাব হইবে।

(৬) **সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব:** মার্কসের মতে সকল যুগেই শোষকশ্রেণী অর্থাৎ মালিকশ্রেণী তাহার শোষণকে অব্যাহত রাখিবার জন্য পুলিস, সৈন্য এবং অন্যান্য শক্তিকে একত্রিত করিয়া বিরাট শক্তি প্রয়োগের দ্বারা শোষিতশ্রেণীকে দাবাইয়া

* 'No credit is due to me for discovering the existence of classes in modern society, nor yet the struggle between them. Long before me bourgeois historians had described the historic development of the class struggle, and bourgeois econmists the economic anatomy of the classes. What I did that was new was to prove : (i) that the existence of classes is only bound up with particular historic phases in the development of production : (ii) that the class struggle necessarily leads to the dictatorship of the proletariat ; (iii) that dictatorsnip itself only constitues the transition to the abolition of all classes and to a classless society'. (*The correspondence of Marx and Engels.*)

রাখে। কেন্দ্রীভূত পশুশক্তির সাহায্যে গঠিত এই যে সংগঠন—যাহা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীকে দাবাইয়া রাখে, তাহাই রাষ্ট্র। মার্কস্ ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পশুপালনের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল ঘটনা একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষমতায় আসীন অধিকারী-শ্রেণী প্রতি যুগেই পশুশক্তির দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র নামক সংগঠনের দ্বারা নিজ শ্রেণী-স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করে। এই অধিকারীশ্রেণীকে ধ্বংস করিবার জন্য শোষিতশ্রেণীকে বিপ্লবের পথ গ্রহণ করিতে হয়। মার্কস্ বিশ্বাস করেন যে, সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারাই একমাত্র মালিকশ্রেণীকে পরাজিত করা সম্ভব। মার্কসের মতে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ধনিকশ্রেণীকে পরাজিত করিয়া শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিয়া সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠা করিবে। এই সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রথমত ধনিকশ্রেণী ও ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করিবে তারপর দ্বিতীয় স্তরে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (State Socialism) প্রতিষ্ঠা করিবে এবং তৃতীয় স্তরে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের স্থানে সাম্যবাদ (Communism) প্রতিষ্ঠা করিবে। এই সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন মতো ভোগ করিবে এবং নিজ সাধ্যমত উৎপাদনে শ্রম প্রদান করিবে ("From each according to his capacity and to each according to his need.")।

(৭) **রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ (Marxian theory of the state) :** কার্ল মার্কসের বন্ধু ফ্রেডারিক এংগেলসের ভাষায় রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদটি এইরূপ : "রাষ্ট্র শাশ্বত বা চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নহে। এমন এক সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না। সমাজের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ম-শৃঙ্খলা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির দ্বারাই নির্ধারিত হইত। সমাজ বিবর্তনের এক স্তরে উৎপাদনের উন্নতি ও শ্রমবিভাগের ফলে ধনবৈষম্যের উদ্ভব হয়। ফলে মানুষের সহিত মানুষের, শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত দেখা দিল। এই সংঘাতের মধ্য হইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।"*

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে রাষ্ট্র বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় নাই। মানুষ তখন সরল আদিম জীবন যাপন করিত। এই সময়কে আদিম সাম্যবাদের যুগ (Primitive Community) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মানুষের মধ্যে তখনও কোন স্বার্থের সংঘাত শুরু হয় নাই। সেই যুগে মানুষ বন-বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত, আর শিকারলব্ধ পশু-পক্ষী, ফল-মূল খাইয়া জীবন যাপন করিত।

(১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ : শিকারের যুগ

শিকারের উপরই মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। বনের শিকারলব্ধ বস্তু সকলেই সমানভাবে ভাগ করিয়া ভোগ করিত। সেই আদিম সমাজে মানুষ অভাবের তাড়না ভোগ করিত না; কারণ, লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যসংস্থান ছিল প্রচুর। আর শিকারের যুগে মানুষ যে সকল যন্ত্রের দ্বারা শিকার করিত এবং শিকারলব্ধ প্রাণী প্রভৃতি সবই ছিল শিকারী সমাজের সাধারণ সম্পত্তি। এই সাম্যবাদী শিকারের যুগে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই। মানুষ তখনও সংঘবদ্ধভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত।

* "The State has not existed from all eternity. There has been societies which have managed whithout it, which had no notion of the State or State power. At a definite stage of economic development, which necessarily involved the cleavage of society into classes the state became a necessity because of this cleavage."—*Engels.*

কালক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের অভাব দেখা দিল। একমাত্র বনের পশু শিকার করিয়াই মানুষ আহার্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। মানুষকে তখন পশুপালন করিতে হইত। কারণ, বনের পশু-পক্ষী শিকার ছিল অনিশ্চিত। পশু পালনের দ্বারা খাদ্যের ও পশমের যোগান কিছুটা নিশ্চিত হইত। এই যুগে যাহারা পশুর মালিক ছিল তাহারাই সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইত এবং যাহাদের মালিকানায় কোন পশু থাকিত না তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিত। এইভাবে পশুপালন সমাজে পশুর মালিক ও মালিকহীন জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষের বীজ রোপিত হইল।

(২) পশুপালনের যুগ

পশুপালনের যুগের পর অর্থনৈতিক বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে দেখা যায় কিছু-সংখ্যক লোকের জমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কখনও কখনও শিকার-ক্ষেত্রের নিকটেই আদিম মানুষ বসবাস করিত এবং তথায় চাষ-বাস শুরু করিত। যাহারা এই জমির মালিক হইল তাহারাই সমাজে ধনোৎপাদনের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ও লাভজনক উৎসের মালিক হইল। আর এই সমাজে যাহারা জমির মালিকানা হইতে বঞ্চিত হইল, তাহারা হইল নিঃস্ব; তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র, বাসস্থানের জন্য মালিকশ্রেণীর উপর নির্ভর করিতে হইত। এই অসহায় মানুষ জমির মালিকদের দাসে পরিণত হইল। মধ্যযুগে ইহাদিগকে বলা হইত ভূমিদাস (Serf)। এই যুগের জমির মালিক বা সামন্তবর্গ এবং ভূমিদাসশ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষ এই যুগের এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

(৩) কৃষিযুগ বা সামন্ত প্রথা

ইহার পরের যুগে শিল্পের উন্নয়ন সমাজ-ব্যবস্থাকে নূতন ধাঁচে গঠন করে। শিল্পযুগে সমাজ-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। শিল্পের মালিক শ্রমিকদের শ্রম ব্যয়ে উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় মূল্যের সমস্তটা শ্রমিকদের না দিয়া বেশ কিছুটা নিজের ভোগের জন্য এবং মূলধন বৃদ্ধির জন্য রাখিয়া দেয়। যেমন ভাবে সামন্তশ্রেণীকে উচ্ছেদ করিয়া শিল্পী মালিক-গোষ্ঠী রাষ্ট্র দখল করিয়াছে তেমনিভাবে শ্রমিকশ্রেণীও পুঁজিপতি শ্রেণীকে উচ্ছেদ করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে।

(৪) ধনতান্ত্রিক যুগ

শিকারের যুগে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই, শোষণেরও কোন প্রকার সুযোগ বা অবকাশ ছিল না এবং বলপ্রয়োগের যন্ত্র রাষ্ট্রেরও কোন প্রয়োজন হয় নাই।

মানব-ইতিহাসের প্রথম শোষণমূলক ব্যবস্থায় দাসসমাজ (Slave Society) প্রবর্তিত হয়। দাস সমাজে দাসেরা দাস-প্রভুদের (Slave-owners) পণ্যে পরিণত হয়। আর দাসদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের উদ্বৃত্তাংশ ভোগ করিত দাস-মালিকগণ। এই দাস সমাজেই প্রথম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। দাস-প্রভুরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে দাসদের শোষণ করার কাজে ব্যবহার করে। এই সময়কার রাষ্ট্রকে দাসরাষ্ট্র (Salve State) বলা যাইতে পারে।

(১) দাসসমাজে প্রথম রাষ্ট্রের আবির্ভাব

দাস সমাজের পরবর্তী সমাজ হইল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা (Feudal Society)। এই সমাজে ভূমিদাসেরা (Serf) সামন্ত প্রভুদের জমিতে আবদ্ধ থাকিত এবং নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সামন্তপ্রভুর জন্য কার্য করিতে বাধ্য

থাকিত। সামন্ত প্রথার যুগে ভূমিদাসকে শাসন ও শোষণ করিবার জন্য সামন্ত-প্রভু রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করিত। এই দুই স্তরের, অর্থাৎ দাসপ্রথা ও সামন্ত প্রথার যুগে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ছিল যথাক্রমে দাস-প্রভু ও সামন্তদিগের হস্তে। আর দাসেরা ছিল শোষিত শ্রেণী। অতএব শোষক ও শোষিত এই দুইয়ের যে সম্পর্ক ছিল তাহাই ছিল তদানীন্তন কালের শ্রেণী সম্পর্ক। এই সময়কার রাষ্ট্রকে **সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র (Feudal State)** বলা যায়।

(২) সামন্ত প্রথা

ইহার পর বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আসে। যে আদিম মানুষ একদিন লাঠি ও প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করিত সমাজ বিবর্তনের কোন এক স্তরে, তাহারা ধাতুর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। তারপর নূতন নূতন উদ্ভাবনের ফলে কলকারখানা গড়িয়া উঠে। দাস-সমাজে ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে যে ধনতন্ত্রের বীজ অংকুরিত হয় এবং মানুষ সঞ্চয়ের মাধ্যমে যে ধন নিজেদের হস্তগত করে তাহাই ধীরে ধীরে শিল্পবিপ্লবে সাহায্য করে। পণ্যের বাজার প্রসারিত হওয়ায় এবং উৎপাদনের কলা-কৌশলের উন্নতির ফলে শিল্পের উদ্ভব হয়। এই যুগে নূতন ব্যবসায়ী ও বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মার্কস ইহাই প্রমাণ করেন যে, উৎপাদনের উপকরণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদন সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা অন্তর্হিত হইলে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের স্থলে শিল্পের মালিকশ্রেণী ও মজুর-শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং এই দুই-শ্রেণীর মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়।

(৩) শিল্পকলা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান

এই যুগে শিল্পায়নের ফলে সমাজের উৎপন্ন ধনের বড় একটা অংশ মালিকেরা ভোগ করে। কারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাহারা তাহাদের উৎপাদনের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হয়। যে অংশ শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা, তাহা মালিকেরা তাহাকে না দিয়া নিজেরাই ভোগ করে। এই ন্যায্য পাওনাকেই বলা হয় **উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)**। অর্থাৎ শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যমূল্য ও শ্রমমূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ফলে যে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় তাহাই পুঁজিপতির আয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকশ্রেণী রাষ্ট্র-যন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহার করে তাহাদের স্বার্থানুকূলো আইনকানুন প্রবর্তিত হয় এবং পুলিস ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণীর উপর তাহাদের শোষণ ব্যবস্থাকে বজায় রাখে। এই যুগের রাষ্ট্রকে **পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Capitalist State)** বলা হয়।*

আবার অর্থনীতির অমোঘ বিধানে ধনিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে একমাত্র বৃহৎ শিল্পগুলিই বাঁচিয়া থাকে। বৃহৎ শিল্পগুলি আবার অধিক লাভের আশায় আরও বৃহত্তর সংস্থা গঠন করে এবং প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া এক-চেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে। ইহার ফলে শ্রমিকশ্রেণী—যাহাদের শ্রমবিক্রয় করা ছাড়া আহার্য সংগ্রহ করার অন্য কোন উপায় নাই, তাহারা আরও শোষিত হয়।

* "According to Marx, the State is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another"—*Lenin.*

এইভাবে একদিকে দেশে দেশে ধনোৎপাদনের উৎসসকল মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে জমায়েত হয়; আর অধিকাংশ মানুষ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া শোষিত ও সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং শ্রেণী-সংঘর্ষ তীব্রতর আকার ধারণ করিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করে।*

(৪) সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা

এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হইল, অন্যান্য বিপ্লবের মাধ্যমে যেমন এক শোষকশ্রেণীর পরিবর্তে অন্য এক শোষকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সেইরূপ কোন নূতন শোষকশ্রেণীর জন্ম হয় না। মানুষ আর মানুষকে শোষণ করে না। উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর করায়ত্ত হয় এবং তাহা সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। অতএব রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়ও রহিয়াছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বহারার একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat)। রাষ্ট্র তখন শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে মার্কস্ এক বৈপ্লবিক নীতি প্রচার করেন। তাঁহার মতে (১) সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাভূত করিতে হইবে; (২) এই কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ মানুষকে সমাজ সচেতন ও বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করিতে হইবে; আর (৩) শোষিতশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৫) সর্বহারা একনায়কত্ব

এই সর্বহারার একনায়কত্বের উদ্দেশ্য হইবে তিনটি: যথা, (১) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে ধনিকশ্রেণীকে ধ্বংস করা, (২) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, আর (৩) সমাজতন্ত্রের স্থানে ধীরে ধীরে সাম্যবাদী সমাজ (Communist Society) গড়িয়া তোলা। বস্তুতঃ, সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় যেহেতু কোন শোষণব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে না, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অবসান হইতে থাকিবে এবং সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা অর্থাৎ "যে কাজ করিবে না সে খাইতে পাইবে না" ("He who does not work, neither shall he eat.") এবং শ্রমিকের শ্রমানুপাতে তাহার মজুরির বিধান ('An equal amount of product for an equal amount of labour".) ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতে থাকিবে। রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তি প্রয়োগ ও সামাজিক সম্পর্কে হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে এবং শ্রেণীহীন সমাজে আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকিবে না বলিয়া রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইবে।† অর্থাৎ শোষণ-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য শোষণহীন সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন আর থাকিবে না। এই সমাজে বিশ্বজনীন শান্তি বিরাজ করিবে। এই সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি সাধ্য মতো উৎপাদন করিবে এবং প্রয়োজন মতো ভোগ করিবে ("From each according to his capacity to each according to his need.")।

(৬) সাম্যবাদী সমাজ

কার্ল মার্কসের এই উক্তির সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হইয়াছে। প্রতি যুগেই লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, শ্রেণী-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব অনিবার্য

* "The State is the product and manifestation of the irreconcilability of class antagonisms. —*Lenin—State and Revolution.*

† "The State is not abolished. *It withers away.*"—*Engels.*

হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি যুগেই শোষিতশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জোয়ারের মুখে অধিকারী শ্রেণী তাহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য বেতনভোগী সৈন্যদল, অধীনস্থ অন্নদাস ও পরগাছা শ্রেণীর মানুষদের সংঘবদ্ধ করিয়া এক বিরাট শক্তি সঞ্চয় করে। এই শক্তির দ্বারাই অধিকারী শ্রেণী শোষিত শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখে। কেন্দ্রীভূত পশুশক্তি বলে গঠিত এই যে সংগঠন ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে শোষিতশ্রেণীকে দাবাইয়া রাখে, নিষ্পেষিত করে, তাহাকে বলে রাষ্ট্র ("The State is an instrument of organised class coercion")। আর এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল দুইটি ; যথা (১) সমাজের প্রচলিত শ্রেণী-সম্পর্ককে (class relation) বজায় রাখা, আর (২) অধিকারী শ্রেণীর স্বার্থানুকূল্যে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করা। রাষ্ট্রের প্রকৃতি-চরিত্র রাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্যের মধ্যে ধরা পড়ে। দাসরাষ্ট্র (Slave State), সামন্ত রাষ্ট্র (Feudal State), পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Capitalist State) শোষণযন্ত্র হিসাবে কাজ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও দেখা যায় রাষ্ট্র আছে, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Socialist State) আছে। বলা হয় যে, এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শোষণযন্ত্র নয়। ইহা সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছিবার পথে একটি ধাপ মাত্র।

মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা : (১) মার্কসীয় মতবাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সমালোচকগণ বলেন যে, মার্কসীয় মতবাদকে মার্কসবাদিগণ যে শাশ্বত, অভ্রান্ত, চিরন্তন বলিয়া প্রচার করেন তাহা সত্য নয়। কারণ জগতের নিতানূতন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শেরও পরিবর্তন হয়। জগতের পরিবর্তন কখন কিভাবে আসিবে সে সম্বন্ধে সকল পূর্বসিদ্ধান্তই যে ঠিক হইবে এমন কথা বলা যায় না। যেমন, বর্তমানের এ্যাটম শক্তির রাজনীতি জগতের রাজনীতিকে নূতন ধাঁচে গঠন করিয়াছে। শক্তিজোটের আমূল পরিবর্তন করিয়াছে। জগৎ দুই শিবিরে বিভক্ত হইবে বলিয়া মার্কস যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নির্ভুল নয়, কারণ নিরপেক্ষ দেশগুলিও জগতের রাজনীতিতে একটি তৃতীয় শক্তি (third power)। আবার দুই বিপরীত শক্তিই তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনে তৃতীয় শক্তিকে বাঁচাইয়া রাখিবে। জগতে এমন বহু রাষ্ট্র আছে যাহারা বিশ্বের দুই শিবিরের কোন শিবিরেই যোগদান করে নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও একটি তৃতীয় শক্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য, মার্কস সমাজ ব্যবস্থার গতিশীল চরিত্রকে অস্বীকার করেন নাই।

(২) বর্তমানে একশ্রেণীর ধনবিজ্ঞানিগণ মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের মতবাদটির অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন। বর্তমানে ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, "শ্রম" শব্দটি অস্পষ্ট। শ্রম বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। সকল শ্রমকেই এক পর্যায়ে ধরা যায় না। সুতরাং সকল শ্রমের মূল্য এক মাপকাঠিতে নির্ধারণ করা যায় না। অবশ্য সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন শ্রমকে যদি প্রকৃত শ্রম হিসাবে ধরা হয়, তাহা হইলে শ্রমের মূল্য সামগ্রিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু তাহাও কষ্টকর, কারণ অধিকতর সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন হইলেও চাহিদার তীব্রতার উপর শ্রমের মূল্য নির্ভরশীল। অনেক সময় দেখা যায় অধিকতর সামাজিক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও চাহিদা অনুরূপ না থাকায় শ্রমের মূল্য অধিক হয় না।

আবার বলা হয়, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে যোগানের প্রভাবকেও উপেক্ষা করা যায় না। সকল দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যই যে অধিক শ্রম প্রয়োগে উৎপাদিত হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া

বলা যায় না। দুষ্প্রাপ্যতার জন্যও তাহার মূল্য অধিক হইতে পারে এবং শ্রম প্রয়োগের পরিমাণ দ্বারা তাহার মূল্য নির্ধারিত হইবে না। মার্কস্ শ্রম ছাড়া দ্রব্য সরবরাহের অন্যান্য শক্তিগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। প্রতিযোগিতার হ্রাসবৃদ্ধি, উৎপাদনের অনিশ্চয়তা, ঝুঁকির পরিমাণ ও মূলধন সঞ্চয়ের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে। দ্রব্য উৎপাদনে শুধু ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের উপর সামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে না।

(৩) বিরুদ্ধবাদী সমালোচকগণ বলেন, মার্ক্সের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাও ত্রুটিপূর্ণ। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ধারা শুধু অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয় না। সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কস্ শুধু অর্থনৈতিক প্রভাবের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।*

সমাজবিবর্তনে অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়া ধর্ম, ন্যায়নীতি, কলা, সাহিত্য, কৃষ্টি প্রভৃতির প্রভাবও অনস্বীকার্য। পিতা পুত্রকে শুধু ভবিষ্যতে অর্থ প্রাপ্তির আশায়ই স্নেহ করেন না। শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির তাগিদেই মানুষ সর্বদা বিরুদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না। মার্কস্ সমাজ-বিবর্তনে শুধু দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসের দিকটাই দেখিয়াছেন। মানুষ সহযোগিতার মাধ্যমে যে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে এই দিকটাকে মার্কস্ অস্বীকার করিয়াছেন। সংঘর্ষের সময়ও মানুষ দলবদ্ধ হয়। একদলের সভ্যগণ একে অপরের সহযোগী হয়। সহযোগিতার ভিত্তিতে যে দল গঠিত হয় সেই দলই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে পারে। শ্রমিকগণ সহযোগিতার ভিত্তিতেই সংগঠিত হয়। তারপর বণিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual aid—co-existence not co-destruction)। মহাপুরুষের আবির্ভাব, ধর্মসংগঠন ও ভৌগোলিক পরিবেশ মানবজাতির ইতিহাসের ধারাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে।†

(৪) মার্কস্ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ হইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। আজও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয় নাই। তবে যাহা হইয়াছে তাহা হইল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও মার্কসীয় মতাদর্শের ভিত্তিতে চালু হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ফলে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েই নিয়ন্ত্রিত হইয়া এক মিশ্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। অবশ্য মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক আছে।

(৫) সমালোচকগণ এই মন্তব্য করেন যে, মার্কসবাদ পুরাপুরি বাস্তবধর্মী নয় বলিয়া এমন কি স্ট্যালিন পর্যন্ত ইহার বহু রদবদল করিয়া ইহাকে রাশিয়ায় প্রবর্তন করিয়াছেন। অবশ্য, মার্কসবাদের রদবদল যে হইতে পারে তাহা মার্কস্ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মার্কসবাদের ব্যাখ্যা লইয়া আজ আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্টদলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইয়াছে। চীন ও রাশিয়া উভয়ে মার্কসবাদী

*"It exaggerates the influence of the economic factor out of proportion to its true size and significance...it fails to allow for the effect upon society as a whole of factors operating independently of economics."—*Lipson*: *The great issues of Politics.*

† "It is not merely ideas which Marx denies to have any importance in the development of civilization, but men themselves."—*Lloyd.*

বলিয়া নিজেদের প্রচার করে। কিন্তু আজ আদর্শের লড়াইয়ে উভয়েই ব্যাপৃত। "বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণী এক হও" (Workers of all lands unite) মার্কসের এই উদাত্ত আহ্বান সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কদিগের ক্ষমতা রক্ষার লড়াইয়ে বিলীন হইয়া যাইতেছে। রাশিয়ার নায়কদিগকে একের পর এক পরিবর্তন করা হইতেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দিগ্বিজয়ের লালসা, ক্ষমতা দখল, ক্ষমতা রক্ষা, লোভ ও হিংসা যাহা মানুষের সাধারণ চরিত্র তাহা কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট সকলকেই স্পর্শ করে। চীনের পররাজ্য গ্রাসের চেষ্টা, রাশিয়ার সঙ্গে সীমান্ত লইয়া বিবাদ, বিশ্বযুদ্ধের নীতিতে বিশ্বাস, আজ কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদকে জাতীয়তাবাদে পরিণত করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার মিত্রশক্তিবর্গের সঙ্গে জোটবাঁধা, চীনের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র (Theocratic State) পাকিস্তানের সঙ্গে জোটবাঁধা, চীনের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নীতি, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট ঐক্যে ফাটল ধরানো প্রভৃতি স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, মার্কস্ মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হিংসা, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু অর্থনৈতিক দিকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যে রাষ্ট্রনীতি প্রচার করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত নয়। বর্তমানের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি জাতীয়তাবাদেই বেশী বিশ্বাসী।

(৬) মার্কসের মতে সাম্যবাদী সমাজের স্তরে রাষ্ট্র বিলীন হইবে। রাষ্ট্রকে মার্কস্ একটি শোষণযন্ত্র হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই মতটি একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। রাষ্ট্র যদি শোষকশ্রেণীর শোষণযন্ত্র হয় তাহা হইলে শোষণমুক্ত জগতে রাষ্ট্রনামধারী শোষণযন্ত্রের নিশ্চিত বিলুপ্তি ঘটিবে। কিন্তু যে রাষ্ট্র শোষণযন্ত্র নয়, মানবকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান সেই রাষ্ট্রের বিলোপসাধনের কোন কারণই নাই। শোষণমুক্ত সমাজে "সামগ্রীর পরিচালনা" (Administration of things) বলিয়া যে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহার নাম যদি "রাষ্ট্র" দেওয়া যায় বা রাষ্ট্রের মানব কল্যাণধর্মী চরিত্রটি বজায় রাখিয়া রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তন করিয়া সংগঠিত ব্যবস্থাপনা (Organised management) রাখা হয় তবে তাহাও রাষ্ট্রেরই নামান্তর হইবে মাত্র। তাহা হইলে স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, সাম্যবাদী সমাজেও একটি প্রতিষ্ঠান থাকিবে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম রাষ্ট্র দিলে ক্ষতি কি?

(৭) মার্কস্ বলিয়াছিলেন শিল্পপ্রধান দেশেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হইবে। তাঁহার মতে জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডেই ইহা প্রথম সংঘটিত হইবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় কৃষিপ্রধান রাশিয়া ও চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথম সংঘটিত হইয়াছে।

(৮) মার্কস্ বলিয়াছিলেন দরিদ্র শোষিত শ্রেণী ক্রমে দরিদ্রতর হইবে। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়নের ফলে ধনতান্ত্রিক দেশেই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নতি হইয়াছে।

(৯) সমালোচকগণ বলেন যে, মার্কস্ ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রকে অব্যয় বলিতে নারাজ। কিন্তু নীতিশাস্ত্র অব্যয় ও চিরন্তন।

(১০) বলা হয় যে, মার্কস্‌বাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কিন্তু রাশিয়ার উদাহরণ দিয়া দেখানো হয় যে, রাশিয়াতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, সত্যকার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ণস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাশিয়াতে বর্তমানে যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু আছে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থামাত্র।

মূল্যায়ন ঃ মার্কসের রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে উপরে যে সকল সমালোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানেই মানুষের সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা হইয়াছে সেখানে কার্ল মার্কসের বাণী মানুষকে প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং মানুষ তাঁহাকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বলিয়া পূজা করিতেছে।* আজ জগতের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মার্কসবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

সারসংক্ষেপ

(১) আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে কার্ল মার্কস এক অবিস্মরণীয় মনীষী। (২) মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শন বস্তুবাদী। মার্কস মনে করেন ভাব বস্তুর অনুগামী। আর ভাববাদীদের ধারণায় বস্তু ভাবের অনুগামী। (৩) মার্কস বলেন, পৃথিবীর ইতিহাস মূলতঃ শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। (৪) উৎপাদন সম্পর্ক— উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। (৫) সমাজের অধিকারী শ্রেণী উৎপাদন শক্তির মালিক, তাহারা অন্য শ্রেণীকে খাটাইয়া উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। ইহার মধ্য দিয়া শোষক ও শোষিত দুইটি শ্রেণী জন্মলাভ করে। (৬) অধিকারী শ্রেণী শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য পুলিস, সৈন্য ও আইনের দ্বারা পশুশক্তি সম্পন্ন একপ্রকারের সংগঠন সৃষ্টি করে, যাহাকে বলা হয় রাষ্ট্র। (৭) মার্কসের মতে বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবে। (৮) এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধীরে ধীরে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবে। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইবে।

সমালোচনা ঃ (১) মার্কস তাঁহার বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন। (২) রাষ্ট্র বিলুপ্তির পর অন্ততঃ একটি কোন সংস্থা থাকিবেই।

৮ | রাষ্ট্র ও জাতিতত্ত্ব
(State and Theories of the Nation)

জাতি কাহাকে বলে ? (What is meant by Nation) : জাতি শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন বর্ণ (Caste), কুল (Race) এবং জাতীয় জনসমাজের একটি রাষ্ট্রনৈতিক রূপ (Nation) ইত্যাদি। 'বর্ণ' (Caste) অর্থে জাতি শব্দের প্রয়োগের উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রাহ্মণ জাতি, শূদ্র জাতি, বৈশ্য জাতি প্রভৃতি। আবার 'কুল' (Race) অর্থেও জাতি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন, আর্যজাতি, দ্রাবিড় জাতি ইত্যাদি। ইংরেজী নেশন (Nation) শব্দটি *Natio* বা *Natus* এই ল্যাটিন শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জন্ম বা জাতি অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নেশনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল ; "একই পূর্বপুরুষ হইতে জাত জনসমষ্টি"। ইংরেজী "নেশন" শব্দটিকে বাংলায় বুঝাইবার জন্যও জাতি শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। এই জাতি শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহার একটি অর্থবিভ্রাট ঘটিয়াছে। এই অর্থবিভ্রাটের জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিভিন্ন লেখক 'জাতি' শব্দটিকে ব্যবহার না করিয়া ইংরেজী 'নেশন' শব্দটিকেই বাংলায় চালু করিয়াছেন। এই ইংরেজী 'নেশন' শব্দটি বাংলায় চালু হইবার ফলে রাষ্ট্র-নৈতিক আলোচনা ক্ষেত্রে 'জাতি' শব্দের অর্থগত ও ভাবগত সমস্যা অনেকটা অন্তর্হিত হইয়াছে।

বিভিন্ন অর্থে জাতি শব্দের প্রয়োগ, যথা বর্ণ, কুল, নেশন ইত্যাদি।

আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে 'নেশন' (Nation) বুঝাইতে ন্যাশন্যালিটি (Nationality) শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা এই শব্দ দুইটিকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আবার অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই শব্দটি দুইটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করেন। অনেকে এই সংজ্ঞা বিভ্রাটের জন্য 'নেশন' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেন সেই একই অর্থে 'নেশন'-স্টেট (Nation State) শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। এই প্রসঙ্গে মতানৈক্য থাকিলেও জনসমাজ (People), জাতীয় জনসমাজ (Nationality), জাতি (Nation) এবং জাতীয়তাবাদ (Nationalism)— এই শব্দগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ অর্থে প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান আলোচনায় ইংরেজী 'নেশন' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'জাতি' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রতিশব্দের তত্ত্বগত রূপটি বিশ্লেষণ না করিলে জাতি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাইবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতি শব্দের যে একটি বিশেষ অর্থ আছে তাহারই ব্যাখ্যা করা দরকার। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইলে 'জনসমাজ' (People) ও 'জাতীয় জনসমাজ' (Nationality)-এর সংজ্ঞাটি প্রথমে নিরূপণ করিতে হইবে। কারণ, জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলে উহা জাতীয় জনসমাজে রূপান্তরিত হয়। আবার জাতীয় জনসমাজের ক্রমোন্নতির এক বিশেষ স্তরে জাতির উদ্ভব হয়। অতএব জনসমাজ ও জাতীয় জনসমাজ কাহাকে বলে তাহাই প্রথমে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

(ক) জনসমাজ (People): জনসমাজের একটি সংজ্ঞা এইরূপ ভাবে দেওয়া যায়ঃ যদি একই ভূখণ্ডে এমন কিছুসংখ্যক লোক বাস করে যাহাদের ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে, আচার-ব্যবহারে, অধিকারবোধে এবং অভিযোগে একটি ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে তাহাকেই জনসমাজ বলা হয়। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় জনসমাজের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে; যথা,—(১) ভাষাগত ঐক্য, (২) ঐতিহাসিক ঐক্য, (৩) অধিকারবোধের ঐক্য, (৪) ভৌগোলিক সান্নিধ্য, (৫) অভাব-অভিযোগের ঐক্য। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক বন্ধন ব্যতীত তাহার চলে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষকে সমাজবন্ধনে আবদ্ধ করে। জনসমাজের ঐক্যবদ্ধ হইবার পশ্চাতে আর একটি সূত্রের কথাও কেহ কেহ বলেন। তাহা হইল (৬) উদ্ভবগত ঐক্য। সুতরাং দেখা যায় যে, কিছুসংখ্যক লোক এই সমাজবন্ধনের সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বসবাস করিলেই তাহাকে জনসমাজ বলা হয়।

জনসমাজের বৈশিষ্ট্য

(খ) জাতীয় জনসমাজ (Nationality): জাতীয় জনসমাজ হইল জনসমাজের এক উন্নত স্তরবিশেষ। জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলে জনসমাজের উদ্ভব হয়। ইংরেজী Nationality শব্দটির দ্বারা জাতীয় ঐক্যের চেতনা বা জাতীয় ভাবকেও বুঝানো হয়। জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলে তাহারা একই সরকারের অধীনে বাস করিতে চায়। অর্থাৎ তাহারা নিজেদের সরকার গঠন করিতে চায়; অতএব জনসমাজ ও জাতীয় জন-সমাজের মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলে উহা জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয়। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ জাতীয় জনসমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনসমাজ বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

(গ) জাতি (Nation): জাতির জন্ম হয় তখনই যখন জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা আরও গভীরতর হয়। আবার জাতির গভীরতর রাষ্ট্র-নৈতিক চেতনা পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্রে। বার্জেস (Burgess) জাতি সম্বন্ধে একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ "পরস্পর সন্নিহিত কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী এক জনসমাজ যদি একই ভাষা ও সাহিত্য, একই ইতিহাস ও ঐতিহ্য, একই আচার-ব্যবহার, একই ধরনের ন্যায়-অন্যায় ও সুখ-দুঃখের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়" তবে তাহাকে জাতি বলা চলিবে" (A nation is a people "having a common language and literature, a common tradition and history, common customs and a common consciousness of rights and wrongs inhabiting a territory of geographical unity.") লর্ড ব্রাইস এই জাতি ও জাতীয় জনসমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বলেনঃ "জাতীয় জনসমাজ হইল ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য প্রভৃতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এমন একটি জনসমষ্টি যাহা অনুরূপ ভাবে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করে না। জাতি হইল রাষ্ট্র-নৈতিকভাবে সংগঠিত এক জনসমাজ যাহা বহিঃশাসন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে।" জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। ভারতবাসীদের একটি জনসমাজ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। একই ইংরেজ শাসনাধীনে সমগ্র ভারতবাসী শাসিত হইবার ফলে এবং একই ধরনের

জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়

নিপীড়ন ভোগ করার ফলে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে একটি ঐক্যসূত্রে স্থাপিত হয় এবং এই ঐক্যসূত্রের ভিত্তিতে ইহারা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্ন সূত্রে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীকে জাতীয় জনসমাজ বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকালে ভারতীয় জনসমাজেরই এক অংশ মুসলমানগণ সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিয়াছে। এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনকারী মুসলমানগণকে পৃথক জাতীয় জনসমাজ হিসাবে ধরা হয় নাই। কিন্তু পরে মুসলমানগণ যখন তাহাদের সম্প্রদায়গত ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সমগ্র ভারতবাসী হইতে নিজেদেরকে পৃথক মনে করিয়া পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে একটি পৃথক জাতীয় জনসমাজ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই মুসলমানগণ যখন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করিল তখন তাহারা একটি জাতিতে পরিণত হইল। উপরোক্ত এই সংজ্ঞাদ্বয় বিশ্লেষণ করিলে জাতির যে কতকগুলি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

জাতিগঠনের বিভিন্ন উপাদানগুলি (Elements of Nationality) এইরূপ ঃ প্রথমতঃ, মানবসমাজ যখন একই অর্থনৈতিক স্বার্থ-বন্ধনে যুক্ত হয়, একই ভৌগোলিক সান্নিধ্যে আবদ্ধ হয়, একই ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং মানুষ যখন রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ বা কুলগত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় তখনই জাতীয় জনসমাজের জন্ম হয়। এই উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায় যে, রক্তের সম্বন্ধে মানুষ যখন সম্পর্কিত হয় তখন তাহাদের আকৃতিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং অত্যন্ত সাধারণ কারণেই সমগ্র গোষ্ঠীর লোকেরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে আত্মীয় বলিয়া মনে করে। আবার ধর্মগত ঐক্যের জন্য এবং একই উপাসনা পদ্ধতির জন্য পরস্পরকে আরও নিকটে টানিয়া আনে। এই নৈকট্যবোধ আরও গাঢ় হয় ভাষার ঐক্যে। ভাষা ভাবের বাহন। ভাষার সাহায্যে পরস্পর পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করে। ভাষার ঐক্যের জন্য মানুষের রঙ্গ-রসিকতার মধ্যেও একটা গভীর ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। এই ঐক্যবোধ সমগ্র গোষ্ঠীকে এক সূত্রে আবদ্ধ করে। ভাষার ঐক্যের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেও ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ভৌগোলিক সান্নিধ্যও গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এক বন্ধন আনিয়া দেয়। মানুষ একই ভূখণ্ডে বাস করার ফলে একই ধরনের প্রাকৃতিক সুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করে। একই পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া যে সকল শিশু বাড়িয়া উঠে স্বভাবতই তাহাদের মধ্যে একটি গাঢ় ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। আবার ঐ বাসভূমির সহিত জড়াইয়া আছে তাহাদের পিতৃপুরুষগণের অতীত স্মৃতি। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা সবই মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মাতৃভূমির সহিত উহারা মিশিয়া গিয়াছে। একই দেশের জমি হইতে তাহারা সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের আহার্য। দেশের জলমাটি, আলো বাতাস তাহাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত তাহাদের আকৃতিও একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই দেশের প্রতি ভালবাসা তাহাদের স্বভাবজাত। সুতরাং বলা যায়, ভৌগোলিক সান্নিধ্য মানুষকে এক নিবিড় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, আবার দেশগত, কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ঐক্য ছাড়াও অর্থনৈতিক

সুখ-সুবিধা ও অভিযোগের ভিত্তিতেও গোষ্ঠীসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক অসুবিধার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া একই সাথে সংগ্রাম করার জন্য জনসমাজের মধ্যে এক গাঢ় ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের পশ্চাতে এই অর্থনৈতিক ঐক্য এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

চতুর্থতঃ, উপরোক্ত কুলগত, দেশগত, ধর্মগত, ভাষাগত এবং অর্থনীতিগত ঐক্যবোধে যখন জনসমাজ আপ্লুত হয় তখন যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়, সেই একাত্মবোধ হইতে একজাতীয়তার অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আবার এই জাতীয়তার অনুভূতিতে আপ্লুত জাতীয় জনসমাজ যখন নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করিতে চায় এবং তাহা নিজেদের সরকারের মাধ্যমে কার্যকরী করিতে অগ্রসর হয় তখনই জাতির উদ্ভব হয়। এই একাত্মবোধকে কেহ কেহ ভাবগত ঐক্য বলিয়া অভিহিত করেন।

পঞ্চমতঃ, জাতি ও রাষ্ট্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের উদ্ভব হইলেই জাতির সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই মতবাদ সকলে সমর্থন করেন না। প্রথম মহাসমরের পূর্বে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী এক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল কিন্তু তাহারা জাতি ছিল না কারণ তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন ছাড়া অপর কোন বন্ধন ছিল না। আবার, দ্বিতীয় মহাসমরের পর জার্মান ও জাপান সার্বভৌমিকতা হারাইয়া ফেলে। তাহাদের রাষ্ট্র লোপ পায়; কিন্তু, তাহাদের জাতি বিলুপ্ত হয় নাই। অবশ্য ১৯২০ সাল হইতে 'জাতি' ও 'রাষ্ট্র' শব্দদ্বয় সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। 'জাতিসংঘ' ও 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' নাম দুইটি হইতে তাহা বুঝা যায়।

সমালোচনা : উপরে জাতির কতকগুলি উপাদানের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, এই সকল উপাদানগুলিকে জাতিগঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলিয়া ধরা উচিত নহে। বর্তমানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাতিগঠনে কোথাও কুলগত পবিত্রতা (Racial purity) রক্ষিত হয় নাই। কারণ বর্তমানের জাতিগুলির চরিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগুলি বহু কুলের সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। এশিয়ায় ভারতীয় জনগণের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী একই সঙ্গে মিশিয়া বাস করিতেছে। জাপানে শিন্টোমতাবলম্বীদের সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান পাশাপাশি বাস করিতেছে। ধর্মবিশ্বাসে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় ভারতবাসী প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে এক-জাতি গঠন করিয়াছে। জাপানীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা একজাতি গঠন করিয়াছে। আবার একই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীনা ও জাপানী দুইটি পৃথক জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ একটি জাতি গঠন করিয়াছে; যেমন, জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান এবং রোমানুস (Romansch) ভাষাভাষী মানুষ সুইজারল্যাণ্ডে সুইস জাতি গঠন করিয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ যদিও ইংরেজী ভাষাভাষী তথাপি তাহারা একটি স্বতন্ত্র জাতি; তাহারা ইংরেজ নয়।

কুল, ধর্ম, ভাষা, ভৌগোলিক ও অর্থনীতিগত বৈষম্য থাকিলেও একজাতি গঠিত হইতে পারে

এই সকল উদাহরণ হইতে বলা যায় যে, এক ভাষায় কথা বলিলেই এক জাতি হয় না। একই ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিলেও এক জাতি হয় না। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করিয়াও যে এক জাতি গঠিত হইতে পারে

তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায় ; যেমন, পূর্বতন পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান লইয়া গঠিত তৎকালীন পাকিস্তান। অর্থনৈতিক সমস্বার্থের উপর শুল্ক প্রাচীর (Tariff Wall) খাড়া করিলে বা তুলিয়া দিলেও অনেক সময় দেখা যায়—জাতীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয় নাই। অতএব যদি মন্তব্য করা যায় যে, জাতিগঠনের উপাদানগুলি জাতি সংগঠনের পক্ষে অপরিহার্য নহে, তবে মন্তব্যটি অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট হইবে না।

জাতি সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ম্যাক্ আইভার ও মার্কসের ধারণা : (ক) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "আত্মশক্তি" গ্রন্থে বলেন—"স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই।...নেশন ও ন্যাশন্যাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়"।* বর্তমানে বাংলায় ন্যাশন্যালিটি অর্থে জাতীয় জনসমাজ এবং নেশন অর্থে জাতি এই শব্দগুলির প্রয়োগ হইয়া থাকে। কবিগুরু আরও বলেন : "অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ স্বীকার এবং পুনর্বার সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তাহাই 'নেশন'। অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ, একসঙ্গে দুঃখ বহনের বন্ধন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। জাতির গঠন হয় মানুষেরই মতো—সুদীর্ঘ অতীতকালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার ও নিষ্ঠার দ্বারা। নেশন হইল একটি সজীব সত্তা।"

নেশন গঠনে মানুষের মননশক্তি, আত্মশক্তিই বেশী পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। জিমার্নও (Zimmern, A. E.) বলিয়াছেন : "যে জনসমাজের মধ্যে জাতীয় জনসমাজের চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই জাতীয় জনসমাজ" ("If a people feels itself to a nationality, it is a nationality.")। অতীতের স্মৃতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা, অতীতের ধর্ম ও কীর্তি মানুষের মনপ্রকৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করে ; ইহাই নেশন গঠনের উপাদান। সেখানে ভাষার বৈচিত্র্য বড় কথা নয়। দেশপ্রেম একসূত্রে যেখানে বাঁধিয়াছে সহস্র জীবন সেখানে দেশপ্রেমই নেশন গঠনের উপাদান।

(খ) ম্যাক্‌আইভার (Mac Iver), রেঁণা, জিমার্ন প্রমুখ চিন্তাবীর, যাঁহারা জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির জন্য কোন বাস্তব উপাদানের প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করেন, যাঁহাদের কাছে মানসিক প্রবণতাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে ম্যাক্‌আইভার এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "ইহারা কাহারা যে এক সাথে বড় কাজ সম্পন্ন করিয়াছে বলিয়াই নিজেদের জাতি বলিয়া মনে করিতেছে ? এই শর্ত একটি পরিবার, একটি জাহাজের নাবিকগণ বা একদল ষড়যন্ত্রকারীও সম্পাদন করিতে পারে, কিন্তু সেই কারণে তাহারা একটি জাতিতে পরিণত হয় না।"† তিনি এই মত পোষণ করেন যে, জাতীয়তাবোধ (Nationality) হইল সেই সামাজিক বোধ যাহা এক বিশেষ সামাজিক যুগের ঐতিহাসিক পরিবেশের ভিতরে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে অথবা রাষ্ট্রের মাধ্যমে আপন অভিব্যক্তির এখনও অনুসন্ধান করিতেছে। ম্যাক্‌আইভারের মতে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে এবং রাষ্ট্রের নিজস্ব কার্যাবলীর মধ্যেই জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয়।

রেঁণা জিমার্ন প্রভৃতির মতের সমালোচনা ও ম্যাক্‌আইভারের মত

---

* রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড পৃ—৫১৫

† "But just who are they who, having accomplished great things in common feel

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, রেঁণার জাতীয় জনসমাজ সম্বন্ধে ধারণা মূলতঃ ভাবগত ("The idea of nationality is essentially spiritual in character.")। জাতীয় জনসমাজকে তিনি 'প্রাণ' বা 'ভাবগত নীতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ একই কারণে গেটেল জাতীয় জনসমাজকে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সম-অর্থনৈতিক জীবনের বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভাবগত উপলব্ধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) বলেন, মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে জাতিকে শূকরের দল, বা কাকের ঝাঁক বা গোরুর পালের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভাষাগত, কৃষ্টিগত, বংশগত ও স্বার্থগত, যে কোনটির জন্য ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। জাতীয় ভাবসৃষ্টির পশ্চাতে ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু অবদান আছে। এই ঐক্যবোধের জন্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাজাত্যবোধ (Nationalism) জাগ্রত হয়। এই স্বাজাত্যবোধের জন্য তাহারা নিজেদেরকে অপরাপর মানব সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া দেখে। এই পার্থক্যবোধই জাতীয় ভাবের বৈশিষ্ট্য।

(গ) মার্কসবাদী (Marxian) ধারণায় জাতি ও জাতীয়তাবাদ একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিয়াছে। স্তালিন (Stalin) বলেন: জাতি হইল "ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সম-অর্থনৈতিক জীবনের বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত ইতিহাস-বিবর্তিত স্থায়ী সমাজ" ("A nation is a historically evolved, stable community of language, territory, economic life, and psychological make up manifested in a community of culture.")। স্তালিন প্রদত্ত সংজ্ঞাটি ভাববাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করে নাই। ইহা একটি বাস্তবধর্মী সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞায় জাতিকে একটি ইতিহাস-বিবর্তিত স্থায়ী সমাজ হিসাবে ধরা হইয়াছে।

জাতিগঠনের ঐতিহাসিক দিক

ইতিহাসের দিক হইতে জাতিগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, মানবেতিহাসের সব পর্যায়েই জাতির উদ্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ সাম্প্রতিক ঘটনা। অতীতে গ্রীস, রোম ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা নিজেদেরকে জাতি হিসাবে কল্পনা করিত না। সেই যুগের যুগধর্ম ছিল ভিন্ন প্রকারের। সমাজ-ব্যবস্থা ছিল এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির। সেই যুগের সামাজিক চেতনা বর্তমানের জাতীয় ভাবের ন্যায় ছিল না। জাতির অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া নূতন সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপিত হইল। ভাঙ্গিয়া গেল মধ্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থা, ফিউডালী প্রথার সমাজ-শাসন। আর তাহার স্থান দখল করিল ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। সামন্তদিগের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হইল বুর্জোয়াশ্রেণী। এই সংগ্রামের ফলে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন হয়। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের (National State) গোড়াপত্তন হয়। স্পেনে ফার্ডিন্যাণ্ড ইসাবেলার রাজত্বের মধ্য দিয়া, ইংলণ্ডে টিউডর রাজবংশের অধীনে, ফ্রান্সে বুর্বোঁ বংশের শাসনের ভিতর দিয়া জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। সামন্তদিগের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সংগ্রামের পশ্চাতে শুধু অর্থনৈতিক কারণই ছিল না, এই সংগ্রামের পশ্চাতে তাহারাই বিশেষ করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে যাহারা

themselves a nation? The condition may be fulfilled by a family or a ship's crew or a band of conspirators but 'they do not on that account become a nation". —*Mac Iver*.

ভাষাগত, কুলগত, ধর্মগত, ভৌগোলিক সান্নিধ্য ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের ভিতর দিয়া নিজেদেরকে সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করিয়াছে। এইভাবে ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ঐক্যসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন জাতি গঠিত হইয়াছে। স্তালিনের সংজ্ঞাটিকে যান্ত্রিকভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া বলা যায়, স্তালিন-প্রদত্ত জাতির উপাদানগুলির প্রত্যেকটিরই সাধারণ জাতীয় মনোভাব উদ্রেকে কিছু-না-কিছু অবদান রহিয়াছে।

উপসংহারে বলা যায়,—(ক) জাতির উদ্ভব এক আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহার পশ্চাতে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। জাতির উদ্ভব হয় ইতিহাসের ক্রম-বিবর্তনের পথে মানবসমাজের মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া।

(খ) বহু উপাদান—যথা, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, অতীত স্মৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, সামাজিক প্রথা, কুলের সম্বন্ধ, অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন, সমসুখ-দঃখভোগের স্মৃতি, ভৌগোলিক সান্নিধ্য প্রভৃতি জাতীয় চেতনার বিকাশে সাহায্য করে।

(গ) অবশ্য এই উপাদানগুলি যে একযোগে সকলেই সকল জাতির অভ্যুত্থানে সাহায্য করিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; তবে সামাজিক অবস্থার মৌলপরিবর্তন ও বিভিন্ন বাস্তব উপাদানের মিশ্রণ ব্যতীত জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

(ঘ) জাতি ও রাষ্ট্রক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। কারণ, আত্ম-বিকাশের দাবিতে জাতি রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করিতে চায় অথবা রাষ্ট্রক্ষমতা জাতির আয়ত্তে আসিলে রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যে সমাজের পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন করে এবং তাহার প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ সন্ধান করে।

(ঙ) জাতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বলিয়া যে উক্তি করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ 'জাতি' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বতন্ত্রতা বুঝানো হয়। ইংরেজ বলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজকে জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতি হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়।

(চ) একই রাষ্ট্রে একাধিক জাতির বাস অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য, একই রাষ্ট্রে যখন দুইটি জাতি বাস করে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি কর্তৃক সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির নিপীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রুশ সাম্রাজ্য ও অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অত্যাচার-মূলক শাসন হইতে বিভিন্ন জাতি মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। এই সংগ্রামের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে পোলিশ, হাঙ্গেরিয়ান, চেকোশ্লোভাক প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্র (National S ate)। আবার এমন কতকগুলি রাষ্ট্র আছে যেখানে একটি বা দুইটি জাতি কর্তৃক রাষ্ট্র শাসিত হয় কিন্তু অপরাপর সংখ্যালঘু জাতি তাহাদের মৌলিক অধিকারগুলি বজায় রাখিয়া একসঙ্গে বাস করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যাণ্ডের কথা বলা যায়; ইংল্যাণ্ডে ইংরেজ, স্কটিশ, ওয়েলস্ ও আইরিশরা শান্তিতে বাস করিতেছে।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার (Rights of Self-determination) : জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের অর্থ জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার। জাতি মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার ভিতর দিয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৭৭৬ সালে উত্তর আমেরিকার বৃটিশ

উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য সংগ্রাম শুরু করে এবং নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। পূর্বে জার্মানী ছিল দ্বিধাবিভক্ত; পরে ১৮৪১ সালে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে অংশ গ্রহণ করে। ১৮৩০ সালে বেলজিয়াম ওলন্দাজ শাসন অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পোল্যান্ড ও ইতালী স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাবি করিতে আরম্ভ করে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস হইতে। পরে আন্দোলনের জোয়ারের মুখে বৈদেশিক শাসন যখন আর টিকিয়া থাকিতে পারিল না, তখন ইতালী ঐক্যবদ্ধ হইল। এইভাবে ইউরোপে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বহু স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু স্বাধীন ও জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অধিকার ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে এবং স্বীকৃতি দিয়াছে, কিন্তু সকল জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারকে সকল অবস্থায়ই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদিগের মধ্যে এই কারণে কেহ কেহ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বা এক জাতি, এক রাষ্ট্রের যুক্তিসমূহ (One Nation, One State) ঃ (১) প্রত্যেকটি জাতিরই একটি নিজস্ব সত্তা আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ সম্ভবপর হয় তখনই, যখন ঐ জাতির একটি নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র থাকে। অতএব নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজন জাতির নিজস্ব রাষ্ট্রের।

(২) বৈচিত্র্যের মধ্যেই সৌন্দর্যের বাস। স্বতন্ত্র জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের মধ্য দিয়াই এক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। একই ধরনের চাল-চলন, এক-ঘেয়েমিভাব সৃষ্টি করে। বিশ্বের সমগ্র মানুষ যদি হাজার রকমের চালচলন, রীতি-নীতিতে চলে তাহাতে সৌন্দর্যেরই প্রকাশ হইবে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের বিকাশ সমগ্র মানবসভ্যতাকে অধিকতর সম্পদময় করিয়া তোলে।

(৩) বর্তমান যুগ গণতান্ত্রিকতার যুগ। এই যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যই যখন জাতীয় জনসমাজ আত্মবিকাশের দাবিতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া বাঁচিতে চায়, তখন সে দাবিকে উপেক্ষা করা যায় না।

(৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হইলেই এক রাষ্ট্রের সহিত অপরাপর রাষ্ট্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে, একথা ঠিক নহে। কারণ সমাজে যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, তেমনই জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হইলে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না বরং সম্মানই করিবে। স্ব স্ব প্রয়োজনীয়তার জন্য বিরোধ করিবে না বরং সহ-যোগিতার ভিত্তিতেই পাশাপাশি অবস্থান করিবে। এই প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিলের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "যেখানে জাতীয়তাবোধ কিছুটা পরিমাণে শক্তিশালী, সেখানেই জাতীয় জনসমাজের সকল মানুষকে একটি স্বতন্ত্র সরকারের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রাথমিক যুক্তি রহিয়াছে।"

(৫) রাষ্ট্রপতি উইলসন বলিয়াছেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে উপেক্ষা করিলে রাষ্ট্রনেতাগণ অমঙ্গলকেই আহবান করিবেন। তিনি বহু জাতি সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রে

(Poly-national state) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার চিরন্তন সমাধানের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি দিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া চিরতরে দূরীভূত হইবে। ১৯১৯ সালের শান্তি সম্মেলনে (Peace Conference) প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিবার দাবিকে সর্বসম্মতিক্রমে মানিয়া লওয়া হয় এবং এই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য ইউরোপকে নূতন করিয়া গঠনের চেষ্টা করা হয়।

(৬) এই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সমর্থনে প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই মন্তব্য করেন যে, "কোন জনসমাজকে তাহাদের নিজেদের জাতীয় সরকার ব্যতীত অন্য কোন সরকারের শাসনাধীনে থাকিতে বাধ্য করা, আর একটি নারীকে, যে পুরুষ তাহাকে ঘৃণা করে, তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা একই কথা।"

(৭) পরিশেষে বলা যায়, যখনই কোন জাতীয় জনসমাজ নিজের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয় তখনই ইহা নিজের পৃথক সত্তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে।

জাতির এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে অনেকে আবার সমর্থন করেন না। তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া যদি 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' হিসাবে জনসমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের অধীনে আনয়ন করা হয় তবে সুদীর্ঘকালের সুপ্রতিষ্ঠিত সুশৃংখল রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে হয়। এই বিষয়ে ভৌগোলিক অসুবিধার কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়, প্রত্যেকটি জাতীয় জনসমাজ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলে ইংল্যাণ্ডে কমপক্ষে চারিটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে ; যথা,—ইংরেজ স্কটিশ, ওয়েলস, নর্থ আইরিশ। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে গেলে ইউরোপে কমপক্ষে আটটি এবং ভারতবর্ষে বহুরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে।

(২) আবার এইভাবে শত শত রাষ্ট্র সৃষ্টি করিলেও সমস্যার সমাধান হইবে না। কারণ, তখন দেখা যাইবে, একই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে বহু জাতি এমনভাবে মিশিয়া বাস করিতেছে যে, তাহাদিগকে পৃথক করিলে, বহু অর্থনৈতিক, সামাজিক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। আবার এই সকল রাষ্ট্রেও সংখ্যালঘুদের সমস্যা থাকিয়া যাইবে। অবশ্য, কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, লোকসংখ্যা স্থানান্তরিত করিলে সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নয়, কারণ ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, লোকসংখ্যা স্থানান্তরিত করিলে মানুষকে বিরাট দুঃখের সম্মুখীন হইতে হয়।

(৩) আবার এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি অর্থনীতিক্ষেত্রে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। ফলে তাহাদিগকে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য অপর রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে।

(৪) আবার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অর্থ দুর্বল রাষ্ট্র। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বৃহত্তর রাষ্ট্র কর্তৃক যে-কোন সময়ে আক্রান্ত হইতে পারে। লর্ড এ্যাক্টন (Lord Acton) বলেন ঃ

"জাতিতত্ত্ব হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গামী পদক্ষেপ"। ("The theory of Nationality is a retrograde step in history".)। এই প্রসঙ্গে লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার দুইদিকে ধার। একদিকে ইহা যেমন ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রেরণা যোগায়, অন্যদিকে আবার তেমনি বিচ্ছিন্ন হইতেও উন্মাদিত করে ("The right of self-determination is a double edged sword, it is and has been in the past a unifying force but it may be, and has recently become also a disintegrating force"—*Lord Curzon,*)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি একদিকে জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল অপরদিকে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী তুরস্ক এবং রুশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাঙ্গন ধরায়।

(৫) স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে বিভিন্ন জাতি উন্নতি করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি বৃহত্তর রাষ্ট্রের তাঁবেদার হইয়া পড়ে।

(৬) পুনরায় লর্ড এ্যাক্টনের মত উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলিও উন্নত হয়। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্যক, সেই রকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমষ্টির বাস ('The combination of different nations in one State is as necessary condition of civilized life as the combination of men in Society. Inferior races are raised by living political union with races intellectually superior')। এই সংমিশ্রণের ফলে মানবসমাজের একটি অংশের বীর্য, মহত্ত্ব, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অপর একটি অংশে সঞ্চারিত হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রত্যেকটি জাতির জন্য এক একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় না। ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করিয়াছে যে, বহু জাতি একই রাষ্ট্রে শান্তিতে বসবাস করিতে পারে। অবশ্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বসবাসকালে যেন সংখ্যালঘু জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি কতৃক নিপীড়িত না হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি যখন একসঙ্গে বসবাস করিবে, তখন যেন প্রতিটি জাতির আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগদান সম্পর্কে সর্বদা দৃষ্টি রাখা হয়। বর্তমানে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জ গঠিত হইবার পর যদিও প্রতিটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি বিভিন্ন জাতি একত্রে বাস করিলে তাহাদের মধ্যে একত্রে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান প্রত্যেক জাতিকেই সাহায্য করিবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, স্বাধীনতা জাতির অধিকার মাত্র নহে; ইহা অর্জন করিতে ও ইহাকে বজায় রাখিতে যথেষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবিবর বলেন, "আমার মধ্যে হিন্দু-মোসলমান-খ্রীস্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নাই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত। সকলের অন্নই আমার অন্ন।" জাতীয়তাবোধ মানুষের মধ্যে সকল রকমের বিরোধকে ছাপাইয়া নিজগতিতে যে অগ্রসর হয় ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। জাতীয় চেতনার সম্মুখে ম্লান হইয়া যায় হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ, ধনী-নির্ধনের পার্থক্য। প্রাক্‌-স্বাধীনতার যুগে ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা ইহা প্রমাণ করিয়াছে।

আবার ইহাও সত্য যে, বহু জাতি মিলিয়া এক উদ্দেশ্যে যখন আন্দোলন করে তখন বহু জাতিকে পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে ধরা হয় না। কারণ, জাতীয়তা-বোধের অর্থ একাত্মবোধের অনুভূতি। ভারতের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল জাতি যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে, দেশপ্রেমের ভিত্তিতে তখন তাহারা সকলে এক জাতি হিসাবেই নিজেদের ধরিয়া লইত। এইরূপ প্রাক্-স্বাধীনতাকালে বহু জাতি যখন একত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখন জাতির বৈশিষ্ট্য এক প্রকারের, আর স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর জাতির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকারের হয়। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ভিন্ন ভিন্ন জাতি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি পাইয়া বহু জাতি একত্রে তাহাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করিতেছে। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের মাধ্যমে না হইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায়ও হইতে পারে। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, বহু জাতিকে একসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হইলে জাতির কোন্ কোন্ অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হইবে। নিম্নে তাহার আলোচনা করা হইল।

জাতির অধিকারসমূহ (Rights of Nationality) : বহু জাতিকে একসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হইলে জনসমাজের কতকগুলি মৌলিক অধিকারকে স্বীকার করিতে হইবে। নিম্নে এই অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হইল :

(১) **রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Rights) :** বহুজাতিক রাষ্ট্রে (Poly National State) প্রত্যেকটি জাতীয় জনসমাজের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশের সুযোগ নির্দিষ্ট করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) **রাষ্ট্র পরিচালনা করার অধিকার (Rights to take part in Administration) :** রাষ্ট্র-পরিচালনা ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে প্রত্যেকেরই ন্যায্য অংশ পাইবার বিধি-ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই অধিকার রক্ষিত না হইলে নিপীড়নের গ্লানি ঘনীভূত হইয়া উঠিবে এবং জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠিবে।

(৩) **সহ-অবস্থানের অধিকার (Right to co-exist) :** প্রতিটি জাতিকে সহ-অবস্থানের অধিকার দিতে হইবে। জাতিগুলিকে এই অধিকার দিতে হইবে যে, প্রতিটি জাতির ব্যক্তিত্ব যেন রক্ষিত হয়।

(৪) **ভাষার অধিকার (Right to language) :** প্রত্যেক জাতিকেই তাহাদের নিজ নিজ ভাষা ব্যবহারের অধিকার দিতে হইবে। কারণ, মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত সংস্কৃতির স্ফুরণ হয় না। 'এক জাতি এক ভাষা'ই হইল জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখার উপায়। এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে জাতিসত্তার বিলোপের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে জাতির মধ্যে উষ্মা দেখা দেয়।

(৫) **আচার ও প্রথা রক্ষার অধিকার (Right to Retention of local laws) :** জাতির আঞ্চলিক রীতিনীতি ও প্রথাগুলিকেই স্বীকৃতি দিতে হইবে। অবশ্য, এই স্বীকৃতি দিবার কালে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহা যেন রাষ্ট্রের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়।

(৬) **সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ও আইনগত সাম্যের অধিকার (Right to**

political and legal equality) : রাষ্ট্রের মধ্যে বহু জাতি বাস করিলে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ও আইনসঙ্গত অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হইবে। আইনের দরবারে প্রত্যেকের সমান অধিকার দান একান্ত প্রয়োজন। জাতি, কুল, ধর্ম, ভাষা-নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকের ভোটাধিকার এবং গুণাগুণ অনুসারে রাষ্ট্রের চাকুরীতে সাম্যের অধিকার প্রভৃতি প্রদানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই অধিকারগুলি স্বীকৃত হইলে বহু জাতি একসাথে শান্তিতে বসবাস করিতে পারে।

জাতীয়তাবাদ
(Nationalism)

জাতীয়তাবাদ বা স্বাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হইলে জাতীয়তাবাদ যে রূপ ধারণ করে তাহাকে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। জাতির স্বাজাত্যবোধের অনুভূতির সক্রিয় বহিঃপ্রকাশের ফলে কতকগুলি জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র খণ্ডিত হইয়া এক জাতি, এক রাষ্ট্রের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্বাজাত্যবোধের অনুভূতি মানুষকে তাহার অধিকারগুলি সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি সাধন করে। এইভাবে নিপীড়িত জাতিগুলি মুক্ত হইয়া বিশ্বে তাহাদের স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া লয়। স্বাজাত্যবোধ প্রথমে স্বাদেশিকতার (Patriotism) রূপ ধারণ করে। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার নিজ নিজ জাতির লোকদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রদর্শন করে। জাতীয়তাবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, জাতির প্রতিটি মানুষ জাতীয় জীবনের প্রতি নির্বিচারে আনুগত্য স্বীকার করিবে; কারণ জাতির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থের এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। এই কারণে বলা হয় যে, জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও তাহার উন্নতিবিধান প্রতিটি মানুষের পবিত্র দায়িত্ব।

জাতীয়তাবাদ একটা মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত

জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মানুষ এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা অপরিহার্য হয়, তবে ব্যক্তি-সমষ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, সেই জাতির বিকাশের জন্য জাতীয় স্বাধীনতাও অপরিহার্য। জাতীয়তাবাদের মূলনীতি হইতেছে, "নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও।" এই আদর্শের ভিত্তিতে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব সৃষ্টি করিতে পারা যায়। বর্তমান জগৎ হইল পরস্পর-নির্ভরশীল জগৎ। বর্তমান জগতে কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য জাতি বা রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। কি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সকল রাষ্ট্রকেই পরস্পর-নির্ভরশীল হইতে হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "বর্তমান জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছে যে, কোন একটি রাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে" (The world has become so interdependent that an unfettered will of a State may be fatal to the peace of others".—*Laski*)।

জাতীয়বাদের মূল নীতি হইল "নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও"

জাতীয়তাবাদের জনক ইতালীয় দার্শনিক ম্যাট্‌সিনী এই মত পোষণ করিতেন যে, প্রত্যেক জাতির কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা আছে (Mazzini thought, "each nation possessed certain talents which taken together, formed the wealth of the human race".—*Lloyd - Democracy and its Rivals*) । এই কারণে তিনি মানবসমাজকে 'স্বাজাত্যাভিমানী বিভিন্ন জাতির সমবায়' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির একত্রে বাস এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিতালির মধ্য দিয়া যদি জাতিপুঞ্জ স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্যের পথে অগ্রসর হয় তবে মানবসমাজ কল্যাণের পথে ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ যে জাতীয়তাবোধ কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে না, সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলে সেই জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ রাষ্ট্র যে-কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহিত মিতালি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

আবার ইতিহাস একথা প্রমাণ করিয়াছে যে, জাতীয়তাবাদ বহুদেশে এক-নায়কত্বের অবসান করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই প্রকারের জাতীয়তাবাদ বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয়তা-বাদের এই দিকটিকে বলা হয় প্রকৃত জাতীয়তাবাদ (True Nationalism)।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ ঃ জাতীয়তাবাদের আর একটি দিক হইল বিকৃত বা উগ্র জাতীয়তাবাদ (Perverted Nationalism)। এই উগ্র জাতীয়তাবাদই সভ্যতার সংকট (**Nationalism is a menace to civilization**)। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ।" জাতীয়-স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনেক সময় জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বাধে। এই জাতীয়তাবাদের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বজাতীয় সকলকে এক শাসনাধীনে আনয়ন করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাব্যাপী ইহার পরিধি। এই অনিয়ন্ত্রিত জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করিলে দেখা দেয় সভ্যতার সংকট। সভ্যতার সংকট সৃষ্টিকারক হিসাবে জাতীয়তাবাদকে বুঝা যায় ইতিহাসের পট-ভূমিকায়। জাতীয়তাবাদ ও জাতিগঠন শুরু হয় ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ এবং সামন্ততন্ত্রের অবসানের মধ্যে। মধ্যযুগে যখন সামন্তগণ প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন করিত এবং ব্যবসায়ীদিগকে করভারে প্রপীড়িত করিত তখন দেখা দেয় ব্যবসায়ী শ্রেণী ও প্রজাবর্গের মধ্যে বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিল ব্যবসায়ী শ্রেণী। সামন্তযুগের অরাজকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে বর্ধমান বুর্জোয়াশ্রেণী সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামের মধ্যেই জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই জাতীয়তাবাদ প্রথমে সামন্তদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়াদের সহায়তা করে এবং পরে ধনতন্ত্রের বিকাশেও বুর্জোয়ারা এই জাতীয়তাবাদকে তাহাদের কাজে ব্যবহার করে। আবার দেখা যায় ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি প্রবল হইয়া উঠে। মুনাফার লোভে জাতীয় রাষ্ট্রগুলি বিদেশী বাজারের প্রসার, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া মুনাফা অর্জন করার জন্য সাম্রাজ্যবিস্তারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই সকল জাতীয় রাষ্ট্রগুলি (National State) শক্তিমদে মত্ত হইয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, ফলে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে উপনিবেশের মালিকানা লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হইয়া যায়। অধ্যাপক ল্যাস্কির

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে

ভাষায় বলা যায়, যখন কোনও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয় ("As power extends, nationalism becomes transformed into imperialism.")। সাম্রাজ্যবাদই জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করিয়াছে। জাতীয়তাবাদ এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রাস করার প্রেরণা যোগায়। এই প্রেরণা প্রথম রূপ নেয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, তারপর ইহা বিস্তৃতি লাভ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। কবির ভাষায় "বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"। প্রথম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার পর শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করে। এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলি হয় সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ। শুরু হয় সেখানে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক-শাসন ব্যবস্থা। আর এই ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নূতন নূতন যুক্তির জাল বুনিতে শুরু করে। কিপলিং-এর "শ্বেতাঙ্গের বোঝা" (White man's Burden), "নর্ডিক কুলের উৎকর্ষ" (Superiority of the Nordic Race) প্রভৃতি এই ধরনের যুক্তি।

জাতীয়তাবাদের নগ্নরূপ

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংরেজ ভারতবর্ষকে শাসন করার যুক্তি হিসাবে এই অজুহাত দেখাইত যে, ভারতবর্ষ অশিক্ষিত ও বর্বর। তাহাকে শিক্ষিত করিয়া সংঘবদ্ধ করিবার জন্যই ইংরেজ এদেশ শাসন করিতেছে। হিটলার তাহার নিজের জাতিকে অপরাপর জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিত। অতএব অপর জাতিকে শাসন করার অধিকার তাহার আছে—এই অজুহাতেই সে অনেক রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে এবং তাহার শাসন-ব্যবস্থা সেখানে প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয়তাবাদের এই নগ্ন রূপকে লক্ষ্য করিয়া হেজ্ এই উক্তি করেন যে 'আমাদের যুগে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় রাষ্ট্র ও দেশপ্রেমের মিশ্রণ হইতে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছে তাহা মারাত্মক অন্যায় এবং অমঙ্গলের অখণ্ড উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

মানুষ নিজেকে ভালবাসে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে বুঝিতে হইবে ইহা তাহার মানসিক সংকীর্ণতার লক্ষণ। এই সংকীর্ণতা জাতির ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। স্বাজাত্যবোধ বা দেশপ্রেম অন্যায় নহে। তাই বলিয়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষ নিজের দেশকে অপরাপর দেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে কেন? সংকীর্ণমনা জাতি নিজের জাতিকে অপরাপর জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অপর জাতিকে উপেক্ষা করে। আবার ইহাও মনে করে যে, যেহেতু তাহার জাতি শ্রেষ্ঠ সেইহেতু অপরাপর জাতি তাহার জাতির বশ্যতা স্বীকার করিবে।

জাতীয়তাবাদ মানুষকে এই অন্ধ আবেগে উদ্বুদ্ধ করে যে, জাতির সকলকেই একভাবে চলিতে হইবে। এই একভাবে চলিবার দাবি মানুষের সর্বপ্রকারের বৈশিষ্ট্যকে ও মতপার্থক্যকে দমন করে।

জাতীয়তাবাদ মানুষকে অন্ধ করিয়া তোলে। যদি কখনও বলা যায় যে, ইহা জাতীয়তা-বিরোধী তখন মানুষ আর কোন যুক্তিতর্কের অপেক্ষা না করিয়াই ইহাকে দমন করিবার উগ্র উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। জাতীয়তাবাদের এই ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতাকে মানুষ ভয় করে বলিয়া মানুষ তাহাদের সকল পার্থক্য, সকল বৈচিত্র্যকে ঢাকিবার চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদের এই আক্রমণমুখী রূপের শেষ পরিণতি হইল যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবিস্তার, গণতন্ত্রের সমাধি রচনা ও ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান।

জাতীয়তাবাদের বিকল্প
(Alternative to Nationalism)

- জাতীয়তাবাদের এই ভয়াবহ পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কয়েকটি বিকল্প উপায়ের কথা বলা হয়। এই বিকল্প উপায়গুলি হইল, (১) সাম্রাজ্যবাদ, (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, (৩) আঞ্চলিক সংঘ বা জোট, (৪) আন্তর্জাতিকবাদ, (৫) বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ব, (৬) আন্তর্জাতিক আইন ও (৭) সম্মিলিত নিরাপত্তা (Collective Security) এবং (৮) জাতিতে জাতিতে বৃত্তিগত সংঘ (Functional Collaboration) গঠন।

জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে, ভারতে এবং অন্যান্য বহু রাষ্ট্রে বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবার জার্মানীতে সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিতে জাতিতে বিভিন্ন শক্তি-জোট সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নে জাতীয়তাবাদের কতিপয় বিকল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(১) **সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)** : বিকৃত জাতীয়তাবাদ হইতেই সাম্রাজ্যবাদ জন্মলাভ করে। জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপের আলোচনা কালে সাম্রাজ্যবাদের কথা বলা হইয়াছে। উক্ত আলোচনার পুনরুক্তি না করিয়া বলা যায় যে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া শক্তিশালী জাতি তাহার দেশের লোকদিগকে যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরাজিত করিয়া নিজেদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা চালু করে। বিজিত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া, তাহাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেদের ব্যবহারে লাগায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংল্যান্ড, জার্মানী, ইতালী, জাপান বেলজিয়াম, হল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্যগুলি অপরের রাজ্য গ্রাস করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যবাদীরা অপরকে শাসন ও শোষণ করিবার জন্য যুক্তির অবতারণা করে। এই যুক্তিগুলির মধ্যে একটি হইল অপরকে তাহারা শাসন করিতেছে অপরের মঙ্গলের জন্য। দুর্বল জাতিগুলি যেহেতু শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর সেইহেতু সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের শিক্ষিত ও সভ্য করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আর যেহেতু তাহাদের জাতি শ্রেষ্ঠ, সুশিক্ষিত ও সভ্য সেইজন্য অশিক্ষিতদের শিক্ষিত করিবার ভার তাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ হইতেই সাম্রাজ্যবাদ জন্মলাভ করে

সাম্রাজ্যবাদীদের এই যুক্তিগুলি শুধু মানুষকে শাসন ও শোষণ করার অজুহাত বিশেষ। সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে, বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি হয় এবং মানবসভ্যতাকে আরও সংকটময় করিয়া তোলে। বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর সভ্যতার পক্ষে বিপদস্বরূপ। এই কারণে পৃথিবীর সর্বত্র আজ এই ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাতির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ চলিতেছে। বৈচিত্র্যময় জাতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে এক নূতন ধরনের শাসন-ব্যবস্থা। বিভিন্ন কুল, ধর্ম, সংস্কৃতি,

আচার-ব্যবহারের উপর চাপাইয়া দেয় একই ধরনের আইন ও একই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য হইল ইউনিফরমিটি।

উপসংহার : সাম্রাজ্যবাদের বহুবিধ দোষ থাকিলেও ইহা অনেক সময় অনগ্রসর জাতির অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতিসাধন করে। সাম্রাজ্যবাদের শাসনে থাকিয়া বিভিন্ন জাতি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের অন্যান্য দোষগুলিকে সংশোধিত করা যায় যদি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রে একটি বলিষ্ঠ সরকার থাকে আর থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাষ্ট্র ও তাহাদের সরকার। এই রাষ্ট্রগুলির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইলে সাম্রাজ্যবাদের অনেক দোষ তিরোহিত হয়।

(২) **যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federalism) :** জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় বিকল্প হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। প্রথম বিশ্ব মহাসমর ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পর জাতীয় রাষ্ট্রের প্রাচীর ধর্বসিয়া পড়িয়াছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের হাত হইতে স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য ভারতের মানুষ দেশাত্মবোধের প্রেরণায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু আবার ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয়দের মধ্যে মুসলমানগণ তাহাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। এই রাষ্ট্র হইল পাকিস্তান। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বহু ভাষাভাষীকে লইয়া ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল। যদি 'এক ভাষা একজাতি' ধরা হয় তবে ভারতে বহু জাতির রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নেও বহু জাতির রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুগোস্লাভিয়ায়ও ছয়টি জাতির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে— ভাষার ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয়

বলা হয় যে দমন, পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে দেশাত্মবোধের প্রেরণা হইতে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় তাহাকে শক্তিশালী করিবার জন্যই কতিপয় জাতীয় রাষ্ট্রের সম্মেলনে গঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব থাকে। তবে সার্বভৌমত্ব থাকে অখণ্ড। যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আঞ্চলিক সরকারও গঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারও গঠিত হয়। সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রেরও থাকে আবার আঞ্চলিক সরকারেরও সংবিধান থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থাকিয়া প্রত্যেকটি অংগরাষ্ট্রকে কাজ করিতে হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ হইতে যে সাম্রাজ্যবাদ জন্মলাভ করে সেই সাম্রাজ্যবাদের বিষময় ফল হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র ক্ষুদ্রকায় হয়। ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রের বিপদ সর্বত্র। বহিরাক্রমণের দিক হইতে, অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রকে নিরুপায় হইয়া থাকিতে হয়। তাই অনেকগুলি ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্র যদি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তবে এই সকল অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়াতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, শুল্ক প্রভৃতি কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয়কে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে রাখিয়া বাকি সকল ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে ভোগ করিতে দেওয়া হয়। আবার কানাডা প্রভৃতি দেশে আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং বাকি সকল ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকার ভোগ করে।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ম শৃংখলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার জন্য আঞ্চলিক সরকার-সমূহকে কেন্দ্রের উপরই নির্ভর করিতে হয়। আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এককেন্দ্রিক ধাঁচের। অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যাধিকার পাইতে পারে মাত্র। আবার সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে সকল যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত হয় সেই সকল যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যাধিকার থাকে না।

(৩) **আঞ্চলিক শক্তিজোট (Regional Association) ঃ** উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসাবে আঞ্চলিক জোটগুলিকে ধরা যাইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই লক্ষ্য করা যায় যে, কতিপয় রাষ্ট্র নিজেদের সার্বভৌমিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কতকগুলি উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও অনুরূপ ভাবে কতকগুলি শক্তিজোটের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি (The European Economic Community). উত্তর আটলানটিক চুক্তি (The North Atlantic Treaty Organisation), ওয়ারস চুক্তি (Warshaw Pact), শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কে সাধারণ চুক্তি (The General Agreement on Tariffs and Trade) ইত্যাদি। এই সকল চুক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহাদের মধ্যে কতকগুলি চুক্তি করা হইয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আর কতকগুলি চুক্তি করা হইয়াছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে। এই চুক্তিসমূহের উদ্দেশ্য হইল জগতে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা। NATO-র যাহারা সভ্য তাহাদের উপর কেহ আক্রমণ করিলে সভ্যগণ সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। প্রকৃতপক্ষে NATO-র নেতৃত্ব দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আবার ওয়ারশ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রকে কেহ আক্রমণ করিলে সোভিয়েত রাশিয়া সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। এইভাবে এক বিশ্ব, এক পার্লামেণ্ট, এক আইন, এক সরকারের কল্পনা না করিয়া বিশ্বে বিভিন্ন শক্তিজোট সৃষ্টি করিয়া বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহাতে শক্তির ভারসাম্যও রক্ষিত হইবে। উগ্র জাতীয়তাবাদের ভয়ংকর ফলাফলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কতিপয় রাষ্ট্র একত্র হইয়া এইরূপ জোট সৃষ্টি করিয়াছে। পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্র আজ এই জোটের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে।

শক্তিজোট

(৪) **বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন (Universal International Law) ঃ** জাতীয় রাষ্ট্রের বিকল্পরূপে বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক আইনকে ধরা হইয়া থাকে। সামগ্রিক নিরাপত্তা (Collective Security) ব্যবস্থা এবং বিশ্বজনীন অধিকার ঘোষণার (Universal declaration of human rights) এবং আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার (International Court of Justice) মাধ্যমে বিশ্বজনীন আইনকে কার্যকর করা যায়। কিন্তু ফ্রিডম্যানকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, যতদিন পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক আনুগত্য (International loyalties), জাতীয় ভাবের সহিত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির সংগতি সাধন করা যায় ততদিন পর্যন্ত বিশ্বজনীন আইনকে কার্যকর করা যাইবে না। আন্তর্জাতিক আদালত আছে, বিশ্বজনীন মানব অধিকারও ঘোষিত হইয়াছে কিন্তু তাহাকে কার্যকর করা যায় নাই। আবার সম্মিলিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে কিন্তু বিশ্বে আদর্শগত পার্থক্য

থাকিবার ফলে এবং বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিবার ফলে বিশ্বজনীন আইনকে কার্যকর করা সম্ভব হইতেছে না।

(৫) **রাষ্ট্রসমূহের কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা (Functional collaboration among Nations) :** বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করিতে পারিলে বিশ্বে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। সমালোচকগণ বলেন যে, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে কিন্তু তাহাকে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকল্পরূপে ধরা যায় না।

(৬) **আন্তর্জাতিকতাবাদ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ :** উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসাবে আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাই এখানে আর আলোচনা করা হইল না।

উপসংহারে বলা যায়, জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যত সমালোচনাই করা হউক না কেন এবং তাহার বিরুদ্ধে যত বিকল্প ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হউক না কেন এই পৃথিবী হইতে স্বাজাত্যাভিমান যতদিন পর্যন্ত দূরীভূত না হইবে, এবং বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ বিভিন্ন জাতি ত্যাগ না করিবে ততদিন বিশ্বে শান্তি আসিবে না।

রাষ্ট্র ও জাতি

(State and Nation)

অনেকে রাষ্ট্রকেই জাতি বলিয়া আখ্যায়িত করেন। কিন্তু আধুনিক ধারণানুসারে রাষ্ট্র আর জাতি এক নয়। রাষ্ট্রের উপাদান আর জাতির উপাদান এক নয়। রাষ্ট্র সম্বন্ধে গার্ণারের সংজ্ঞাকে স্বীকার করিয়া লইলে দেখা যায় যে, কোন প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপদবাচ্য হইতে হইলে প্রতিষ্ঠানটির সভা হইবে (১) জনগণ, (২) ইহার একটি শাসনযন্ত্র বা সরকার থাকিবে, (৩) ইহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবস্থিত হইবে, (৪) ইহার সার্বভৌমিকতা থাকা চাই, (৫) প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ী হইতে হইবে এবং (৬) অন্যান্য রাষ্ট্রকর্তৃক ইহাকে স্বীকৃত হইতে হইবে। আর বার্জেসের মতে পরস্পর সান্নিহিত কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী এক জনসমাজ যদি একই ভাষা ও সাহিত্য একই ইতিহাস ও ঐতিহ্য, একই আচার-ব্যবহার, একই ধরনের ন্যায়-অন্যায় ও সুখদুঃখের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয় তবে তাহাকে জাতি বলে। লর্ড ব্রাইস বলেন, জাতি হইল রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত এক জনসমাজ—যাহা বহিঃশাসন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। আর রাষ্ট্র হইল বহিঃশাসন মুক্ত জনসমষ্টি—যাহার নিজের সরকার আছে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সে সংগঠিত হইয়াছে। দেশাত্মবোধে আপ্লুত হইয়া রক্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, অর্থনৈতিক বন্ধন, ঐতিহাসিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এমন জনসমষ্টিকে জাতি বলা হয়। ইহার উপাদান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, জনসমষ্টি একই অর্থনৈতিক স্বার্থবন্ধনে যুক্ত

রাষ্ট্র ও জাতির উপাদান এক নয়

হইয়া, ভৌগোলিক সান্নিধ্যে আবদ্ধ হইয়া, একই ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সভ্যতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া একাত্মবোধের সৃষ্টি করে, সেই একাত্মবোধ হইতে একজাতীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং এই অনুভূতিতে আপ্লুত জাতীয় জনসমাজ যখন নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করিতে চায় এবং নিজেদের সরকার গঠন করিতে চায় তখনই জাতির উদ্ভব হয়। ইহা অনেকটা ভাবগত ঐক্য।

আর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকেই সার্বভৌম হইতে হইবে ; কিন্তু প্রত্যেকটি জাতিকে সার্বভৌম হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ভারত একটি রাষ্ট্র। ইহার সার্বভৌমিকতা আছে। এখানে বহু ভাষাভাষী, বহু সংস্কৃতিসম্পন্ন, বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে। অর্থাৎ বহু জাতি এখানে বাস করে। এখানে রাষ্ট্র একটি, কিন্তু জাতি অনেক। আবার প্রথম মহাসমরের পূর্বে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু তাহারা জাতি ছিল না ; কারণ তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন ছাড়া অপর কোন বন্ধন ছিল না। আবার দ্বিতীয় মহাসমরের পর জার্মানী ও জাপান সার্বভৌমিকতা হারাইয়া ফেলে। তাহাদের রাষ্ট্র লোপ পায় ; কিন্তু তাহাদের জাতি বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্র আর জাতি এক নয়। একই রাষ্ট্রে বহুজাতি একত্র হইয়া বাস করিতে পারে, সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঐক্য নাও থাকিতে পারে।

বহুজাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র

আবার একজাতি একরাষ্ট্র গঠিত হইবার দিকে ঝোঁক প্রবলভাবে থাকিলেও দেখা যায় দুই বা ততোধিক জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র হইয়াছে। বহুজাতি বিশিষ্ট রাষ্ট্রের সংখ্যাই জগতে বেশী। বর্তমানে আবার জাতি-গঠনেও কুলগত পবিত্রতা রক্ষিত হয় নাই। ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাপানীরা একজাতি গঠন করিয়াছে। আবার একই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীন ও জাপান দুইটি জাতিগঠন করিয়াছে। একই ইংরেজী ভাষাভাষী মানুষ ইংরেজ ও আমেরিকান দুইটি জাতি গঠন করিয়াছে। এক ধর্ম ও এক ভাষাভাষী হইলেই একটি জাতি হইতে পারে না। আবার বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করিয়াও একটি জাতি হইতে পারে। যেমন দুইটি ভৌগোলিক অঞ্চল, পূর্বতন পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা একজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র গড়িয়াছিল, অবশ্য বর্তমানে তাহারা দুই রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে।

পার্থক্যপূর্ণ উপাদানে গঠিত

অনেকে জাতিসংঘ ও জাতিপুঞ্জের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, জাতিপুঞ্জের অর্থ রাষ্ট্রপুঞ্জ। এখানে জাতিকে রাষ্ট্র হিসাবে ধরা হইয়াছে। অবশ্য যেসকল যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ জাতি-ভিত্তিক ও জাতির স্বাতন্ত্র্যাধিকার ভোগ করে তাহাদেরও স্বতন্ত্রভাবে জাতিপুঞ্জের সভ্যপদ দেওয়া হয়। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি রাষ্ট্র কিন্তু উহার কতিপয় অঙ্গরাজ্যকে অর্থাৎ পৃথকভাবে জাতিকে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা হিসাবে ইহা জাতিকেও সভ্যপদ দেয়, আবার রাষ্ট্রকেও সভ্যপদ দেয়। সুতরাং জাতিপুঞ্জের নাম হইতে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় না যে, জাতি ও রাষ্ট্র সমপর্যায়ভুক্ত।

ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, একটি জাতির একটি রাষ্ট্র থাকিতে পারে, আবার দুইটি জাতির একটি রাষ্ট্র থাকিতে পারে অথবা একটি জাতির দুইটি রাষ্ট্র থাকিতে পারে। সুতরাং একটি রাষ্ট্রকে একটি জাতি বলা যাইতে পারে না বা

একটি জাতিকে একটি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে না। সুইজারল্যান্ড একটি রাষ্ট্র। ইহার মধ্যে বাস করে জার্মান, ফরাসী ও ইতালিয়ান জাতি।

সুতরাং দেখা যায়, এক ভাষা একটি জাতি গঠন করিতে পারে কিন্তু একটি রাষ্ট্রের একাধিক ভাষা থাকিতে পারে। আবার এক ধর্ম এক জাতি গঠন করিতে পারে কিন্তু একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করিতে পারে। এক সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস একটি জাতি গঠন করিতে পারে কিন্তু একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রচলিত থাকিতে পারে। একটি রাষ্ট্রের একই ধরনের ভৌগোলিক সান্নিধ্য নাও থাকিতে পারে কিন্তু একটি জাতির গঠনে একই ভৌগোলিক সান্নিধ্যের প্রয়োজন। জাতির কোন সরকার থাকে না, রাষ্ট্রের সরকার থাকিবেই। জাতি সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা করিবে কিন্তু সরকার যখন গঠন করিবে তখন সে রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

জাতির সহিত রাষ্ট্রের পার্থক্য

এক জাতি অপর জাতি হইতে ভিন্ন হইবে কিন্তু অপর কর্তৃক তাহার স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই অপরাপর রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। জাতিকে সার্বভৌমিকতা অর্জন করিবার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতে হইবে কিন্তু রাষ্ট্রের প্রথম প্রয়োজন সার্বভৌমিকতা। একটি রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্য একটি জাতি চেষ্টা করিতে পারে। তাই বলিয়া একটি জাতিকে রাষ্ট্র বলা যায় না। রাষ্ট্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু জাতি একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্র বাস্তব কিন্তু জাতির গঠন সর্বদাই ভাবগত। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক। জাতির প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। খ্রীস্টানরা সারা বিশ্বে ছড়াইয়া আছে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত সম্পর্কিত হইতে হইবে। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু জাতি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নাও হইতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, জাতি আর রাষ্ট্র এক নয় কিন্তু রাষ্ট্র যদি জাতিভিত্তিক হয় তবে একজাতি এক রাষ্ট্র হইবে এবং তখন জাতি আর রাষ্ট্র সমার্থক হইবে।

ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্র

(Character of Indian Nationality)

ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকের চক্ষে ভারতবর্ষ একটি জাতি নয়। কারণস্বরূপ বলা হয় যে, ভারতে কুলগত, ভাষাগত ও ধর্মগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায় না। আবার আচার-ব্যবহার ও প্রথাসমূহের মধ্যেও ঐক্য নাই। ভারতের প্রধান অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের মধ্যে কোথাও ঐক্য নাই। এই কারণে মুসলমানগণ মনে করে যে, তাহারা হিন্দুগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই মুসলমানগণ তাহাদের একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি করিয়াছিল। বর্তমানের পাকিস্তান এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি ও আন্দোলনের ফল।

পশ্চিমী সমালোচকেরা বিষয়টির কেন্দ্রগামিতার (Centrifugal) দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ না করিয়া কেন্দ্রবহির্মুখিতার (Centripetal) দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন। অবশ্য ইহা সত্য যে ভারতে বহু ভাষার প্রচলন আছে, বহু ধর্ম আসিয়া

এখানে মিলিত হইয়াছে, বহু কুল তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বিরাট আয়তনের দেশে, এই বিরাট ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবহনকারী দেশে বহুবিধ কথ্যভাষা, বহুবিধ আচার-ব্যবহার, বহুবিধ বিধিনিয়ম প্রচলিত থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ইহাও স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, ধর্ম এখানে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ইহা শুধু ভারতে কেন বহু দেশেই এই ধর্ম, প্রথা, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতি বৈপরীত্যের ভাব ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সোভিয়েত রুশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডে বিভিন্ন কুল, ভাষা ও ধর্মাবলম্বী মানুষ একত্রে বসবাস করে। অতএব বলা যায়, যদি এই সকল দেশে এক জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকে, তবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কেন দ্বিমত পোষণ করিব।

ভারতবর্ষে বহু ভাষা ও প্রথা প্রচলিত আছে; তথাপি এখানে এক জাতি গঠিত হইয়াছে

আবার 'জাতি' অর্থে যদি মানসিক ও ভাবগত ঐক্যের উপরই ধারণা পোষণ করা যায় এবং ইহা যদি বাস্তব পার্থক্য অপেক্ষা ভাবগত ঐক্যের উপরই বেশী নির্ভরশীল হয় তবে ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে এই ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান। এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল সাইমন কমিশনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে বহু ভাষা, বহু আচার এবং বহু ধর্ম থাকা সত্ত্বেও এখানে একটি মৌলিক ভাবগত ঐক্য আছে যাহা সকলকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে ("It would be a profound error to allow geographical dimensions or statistics of population or complexities of religion, caste and language to be the little significane of what is called the Indian National Movement".)। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান সকলেরই অবদান রহিয়াছে এই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার পশ্চাতে। হিন্দু ও মুসলমান শত শত বৎসর একই স্থানে বাস করিতেছে। তাহাদের ভাষাগত ঐক্য তাহাদের সাহিত্যের মধ্যে ঐক্য আনিয়া দিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির মধ্যে ইহাদের ঐক্য দেখা যায়। অর্থনৈতিক সমস্বার্থে এই দুই ধর্মাবলম্বী মানুষ আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বর্তমানে যে বিবাদ, দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায় তাহা সাম্প্রতিক। এই বিবাদ ও হানাহানির পশ্চাতে রহিয়াছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ, যাহারা জাতীয়তাবাদের নামে নিজেদের স্বার্থকে পূর্ণ করিয়া লইয়াছে।

আবার 'জাতি' বলিতে শুধু ধর্ম, ভাষা ও কুলের সম্পর্কের কথা ধরিলেই চলিবে না। জাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আদর্শের ঐক্যকে বুঝিতে হইবে। এই ঐতিহাসিক স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তিতে বহু ভাষাভাষী, বহু কুলোদ্ভব মানুষ রুশিয়াতে একই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অধীনে বাস করিতেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইংরেজ রাজত্বকালে সমগ্র ভারতে এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, এক ধরনের আইন, এক ধরনের শাসন-ব্যবস্থা সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে একটা রাজনৈতিক চেতনা আনিয়া দিয়াছে এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে বিরাটভাবে সাহায্য করিয়াছে। আবার, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের নিদর্শন। স্বাধীনতা লাভের পর আজও সেই

ঐক্যবোধ ভারতবর্ষে একটি জাতীয় রাষ্ট্রের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাঙ্গন ধরে নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মিঃ জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব (Two-nations Theory) ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে বর্ণনাতীত দুঃখ ও কষ্ট আনিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অনেক রক্তদানের পর এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই দুঃখকষ্টের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভারতবাসী আরও ঐক্যবদ্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি এবং রাষ্ট্র একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কুল, সাহিত্য, ভাষা, আচার-ব্যবহার, অভাব-অভিযোগ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য প্রভৃতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে জনসমাজ বলা হয়। জনসমাজ জাতীয় জনসমাজে রূপান্তরিত হয় তখনই যখন জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন হয়। আবার রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা গভীরতর হইলে জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। জাতিগঠনের এই সকল উপাদানগুলির অধিকাংশই বাহ্যিক। কিন্তু আবার এই মত পোষণ করা হয় যে, জাতিগঠনে কোন বাহ্যিক উপাদান অপরিহার্য নহে। রেঁণা প্রমুখ চিন্তাবীর জাতীয় জনসমাজকে ভাবগত ধারণা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য, মার্কসের অনুগামীরা জাতিকে কতকগুলি অপরিহার্য উপাদানের সমবায়ে গঠিত জনসমষ্টির এক বিশেষ প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মার্কসের অনুগামীরা ভাববাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী নহে।

প্রত্যেক জনসমাজ নিজেদেরকে এক শাসনাধীনে আনয়ন করিতে চায়। নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ অনুভব করে। ফলে তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয়। স্বাতন্ত্র্যবোধের দরুন তাহারা নিজেদের অন্যান্য সকল মনুষ্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক মনে করে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি দাঁড় করানো যায়। জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার হিসাবে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায় না এবং আত্মঘাতী দূষিত আবহাওয়াও দূর করা যায় না। কিন্তু স্বাজাত্যবোধ বা জাতীয়তাবাদ অনেক সময় উগ্র রূপ ধারণ করে। উগ্র জাতীয়তাবাদ সভ্যতার এক সংকট-বিশেষ। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হইলে পর জাতি অনেক সময় জাতির স্বার্থের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারে। অতএব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হইলেই যুদ্ধের আশংকা দূরীভূত হয় না। আবার জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হইলেও সংখ্যালঘুর সমস্যা অধিকতর গুরুতর আকার ধারণ করে। অবশ্য জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যদি বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ব বোধের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করে তবে এই যুদ্ধের আশংকা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদঃ আবার জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষা প্রথমে দেশপ্রেমের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করিয়া পরে বিকৃত, উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হইতে পারে। উগ্র জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন মিশ্রজাতীয় রাষ্ট্রে ভাঙ্গন ধরায় এবং সাম্রাজ্যবাদেও রূপান্তরিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদঃ উগ্র জাতীয়তাবাদ হইতেই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়। সাম্রাজ্য-

বাদের বহুবিধ দোষ থাকিলেও ইহা পশ্চাৎপদ অনগ্রসর দেশগুলিকে সংগঠিত করিতে এবং রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন করিতে সহায়তা করে।

সাম্রাজ্যবাদ, যুক্তরাষ্ট্র, আঞ্চলিক শক্তি জোট, বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রসমূহের কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতাকেও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

আন্তর্জাতিকতা: বর্তমানে যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির ফলে জাতিতে জাতিতে বিভেদের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছে। আবার বিকৃত জাতীয়তাবাদের হস্তে মানুষ যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষ একদিকে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। লীগ অব্ নেশনস্ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হইয়াছে। বর্তমান জাতিপুঞ্জের বহুবিধ ত্রুটি আছে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

রাষ্ট্র ও জাতি: রাষ্ট্র ও জাতি এক নয়।

ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্র: ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে শত শত ভাষাভাষী মানুষ একত্রে বাস করিয়াও এক স্বাজাত্যবোধের ভিত্তিতে একজাতি গঠন করিয়াছে।

প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: জাতীয়তাবাদ বা স্বাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জাতীয়তাবাদ প্রকাশ পায় জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হইলে জাতীয়তাবাদ যে রূপ ধারণ করে তাহাকে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া আখ্যায়িত করা

হয়। জাতির এই আকাঙ্ক্ষা স্বজাতীয় সকলকে এক শাসনাধীনে আনয়ন করার আকাঙ্ক্ষা হইতে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইতে পারে। জাতীয়তাবাদের দুইটি রূপ আছে। একটি হইল জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং অপরাপর জাতির সহিত সৌহার্দ্যভাব রক্ষা করিয়া চলা, আর অপরটি হইল বিকৃত জাতীয়তাবাদ। বিকৃত জাতীয়তাবাদ যুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তোলে। ফলে দেখা দেয় সভ্যতার সংকট; শিল্পবিপ্লবের পর এক দেশের উদ্বৃত্ত শিল্পজাত দ্রব্যগুলিকে বিদেশের বাজারে বিক্রয় করার জন্য ব্যবসায়ীশ্রেণী বিদেশের রাজ্যগুলিকে দখল করার চেষ্টা করে। আবার শক্তিশালী জাতিগুলি জাতীয় সার্বভৌমিকতার সাহায্যে সংরক্ষণমূলক শুল্ক প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। এই কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি এবং বৃহত্তর জাতিগুলির মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি দেখা যায়।

জাতীয়তাবোধ ভাবপ্রবণতায় পূর্ণ। জাতীয়তাবাদ জাতির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধের প্রকাশ স্বরূপ। জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেমের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্বার্থান্বেষী শ্রেণী দেশপ্রেমের অজুহাতে দেশের সমগ্র জনসমাজকে সংগঠিত করে এবং নিজেদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যকে কায়েম করে। বর্তমান সভ্যতার একটি বিরাট সমস্যা হইল এই উগ্র জাতীয়তাবাদ। বর্তমান সভ্যতার সংকট-সৃষ্টিকারী এই উগ্র জাতীয়তাবাদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববাদ প্রচার করিতে হইবে। পরস্পর-নির্ভরশীল জগতে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিষময় ফল সৃষ্টি করিবে। অতএব বর্তমানের প্রধান কাজ হইল একদিকে যাহাতে বিভিন্ন জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পাইয়া নিজেদেরকে উন্নত করিতে পারে তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আর অপরদিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলে আপনাপন বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইবে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কার্যগুলি একমাত্র সাধন করা যায় আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে। অতএব দেখা যায় বিকৃত ও উগ্র জাতীয়তাবাদ সভ্যতার শত্রু আর প্রকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার প্রহরী।

(১৮০-১৮৪ পৃষ্ঠা)

৮ আন্তর্জাতিকতা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন
(Internationalism and International Organisation)

অতিজাতীয় আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক আদর্শের ইতিহাস (Supernational movements and history of International Ideals) : কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিকল্পরূপে আন্তর্জাতিকতাবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বলা হয় যে উগ্র জাতীয়তাবাদ হইতে উদ্ভূত সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে পরাধীন জাতিগুলি যখন নিষ্পেষিত হইতেছিল এবং ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য শক্তিশালী জাতিগুলি যখন সভ্যতা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে তখনই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বাণী প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা সর্বস্বীকৃত যে, বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত করিয়া মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিয়া এক আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করিতে পারিলেই যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া তিরোহিত হইবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্ম

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আন্তর্জাতিকতাবাদ নূতন নয়। জাতিগঠনের বহু পূর্ব হইতেই মানুষ বিশ্ব সংগঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শান্তিকামী মানুষ চিরকালই বিশ্বঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস চালাইয়াছে। মানুষ এমন একদিনের কল্পনা করিয়াছিল যখন একজাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, মানুষ আর যুদ্ধ করিতে শিখিবে না।*

কালক্রমে জাতি গঠিত হইল। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইয়া গেল। আন্তঃরাষ্ট্রিক যানবাহন ব্যবস্থা চালু হইল। আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল আর অপরদিকে আন্তঃরাষ্ট্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল এবং আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতি সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল।

আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক বিস্তার

আবার নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদিগণ নূতন দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় মত্ত হইয়া উঠিল। সারা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার মতো আন্তর্জাতিক আদর্শ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। রোমক সাম্রাজ্য ও মধ্যযুগের বিশ্ব ঐক্যের কল্পনা এবং দান্তের (Dante) বিশ্ব-সংগঠনের কল্পনা সাম্রাজ্যবাদের আদর্শকেই রূপ দিয়াছিল; সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। মধ্যযুগে পিয়ের দুবুই (Pierre Dubois) ইউরোপের রাজন্যবর্গের সংগঠন, আন্তঃরাষ্ট্র বিবাদ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক সালিশী ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে সুপারিশ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করিবার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলেন।

আন্তর্জাতিক আদর্শের ইতিহাস

---

* Nations shall not lift up sword against nations, neither shall they, learn war any more. *Isaiah ii, 4* :

রেনেসাস যুগে ইরেসমাস বিশ্বশান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এমেরিক ক্রুচে Emeric Cruce) বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এই সংঘই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে।

ইরেসমাস, ক্রুচে, সালী

ফরাসী দার্শনিক সালীর লেখায় ইউরোপে আন্তঃরাষ্ট্র সংগঠনের প্রস্তাব এবং ফরাসীরাজ চতুর্থ হেনরী যে ইউরোপকে ১৫টি শক্তির মধ্যে বণ্টন ও ইহাদের একটি আইন প্রণেতা সার্বভৌম সভার প্রতিষ্ঠার জন্য এক মহান পরিকল্পনা (a great design) করেন, তাহার উল্লেখ আছে।

১৬৯৩ সালে উইলিয়াম পেন আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধ মীমাংসার জন্য রাজন্যবর্গের একটি সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করেন। এই শতাব্দীরই বিখ্যাত আইনবিদ্

গ্রোটিয়াস

গ্রোটিয়াস (Grotius) আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ম-কানুন রচনা করেন বটে, কিন্তু তিনি এই নিয়ম-কানুনকে বলবৎ করিবার জন্য কোন সংগঠনের উল্লেখ করেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৯টি রাষ্ট্র লইয়া একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন আবে সেন্ট পিরে (Abbe Saint Pierre)। পিরেকে সমর্থন

আবে, সেন্ট পিরে, রুশো, বেন্থাম, কান্ত

করেন রুশো ও বেন্থাম (Bentham)। বেন্থাম রচনা করেন আন্তর্জাতিক আইনের নীতি (Principles of International Law)। ইহার পর ইমানুয়েল কান্ত সুসভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে রাষ্ট্রগুলির বহিঃসম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। কিন্তু এই সকল মতবাদ ছিল হয় রাজার প্রভুত্ব বিস্তারের পরিকল্পনাপুষ্ট অথবা আদর্শবাদীদের কল্পনা-প্রসূত।

উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পোন্নতি, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইল। ফলে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হইল। এই শতাব্দীতেই আন্তর্জাতিক আদর্শের বাস্তব প্রয়োগের সন্ধান পাওয়া যায় ইউরোপের কনসার্টের মতো কূটনৈতিক সংগঠনের মধ্যে এবং রাশিয়া, প্রাশিয়া, ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে পবিত্র চুক্তির (The Holy Alliance) মধ্যে। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়নের (The International Postal Union) মতো প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। রাশিয়ার রাজা জারের নেতৃত্বে যে পবিত্র চুক্তি সম্পাদিত হইল তাহার মূল কথা হইল

আন্তর্জাতিক সংগঠন-সমূহ

চুক্তির স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি ন্যায়, শান্তি ও ধর্মের নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে। এই চুক্তির আসল উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির সংরক্ষণ। কিন্তু এই মৈত্রী সমবায় বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। আর ইউরোপের কনসার্টের (The Concert of Europe) সার কথা হইল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও ব্রিটেনের স্ব স্ব স্বার্থ, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। কিন্তু স্বার্থের দ্বন্দ্বাঘাতে এই চুক্তি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর আন্তর্জাতিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় ১৮৯৯ সালে হেগ শহরে অনুষ্ঠিত হেগ সম্মেলনের (The Hague Conference) ঘোষণার মধ্যে। এই সম্মেলনে ২৪টি রাষ্ট্র যোগদান করে। নিরস্ত্রীকরণ এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সভায় স্থায়ী আন্তর্জাতিক সালিশী আদালত (International Court of Arbitra-

tion) প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার প্রয়োজন হইলে সালিশীর জন্য এই আদালতে মামলা আনা হইত।

ইহার পর ১৯০৭ সালে হেগে আবার শান্তিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রমিকদের উন্নতিবিধানকল্পে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে আরও বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মেলন, সভা, প্রস্তাব ও সালিশী প্রভৃতির মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক স্বার্থ স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য সর্বক্ষেত্রে মানিয়া লওয়ায় যখনই আন্তর্জাতিক স্বার্থের সহিত জাতীয় স্বার্থের সংঘর্ষ বাধিয়াছে তখনই যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতেই ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়। এই রাষ্ট্রগুলি উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেয়। শিল্পবিপ্লবের পর কাঁচামাল ও উদ্বৃত্ত সম্পদের জন্য ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগাল প্রভৃতি রাষ্ট্র আফ্রিকা ও এশিয়ায় উপনিবেশ বিস্তার করে। এই সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি করিতে থাকে। আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি দুইটি চুক্তির মাধ্যমে দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার একভাগে রহিল ট্রিপল এ্যালায়েন্স স্বাক্ষরকারী জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালী আর অপর ভাগে রহিল ট্রিপল আঁতাতে স্বাক্ষরকারী ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। ইহার পর সেডানের যুদ্ধ ও বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার বিস্তৃতি ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থাকে যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারী ফার্ডিনাণ্ড একজন সার্বিয়ানের হাতে নিহত হইলে অস্ট্রিয়া ২৮শে জুলাই ১৯১৪ সালে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সার্বিয়ার পক্ষে যোগদান করে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া আর অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করে জার্মানী। ইতালী ও আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের পক্ষেই যোগদান করে। এদিকে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব শুরু হইলে রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ে। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও জার্মানী পরাজিত হয়। ১২ই নভেম্বর ১৯১৮ সালে জার্মানী যুদ্ধ বন্ধ করিয়া চুক্তি সম্পাদন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ: উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ

জাতিসংঘ

(League of Nations)

আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ব সৌভ্রাতের বন্ধনকে দৃঢ় করিয়া অতি-জাতীয়তার স্বপ্নকে সার্থক করিবার প্রথম প্রচেষ্টা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে ১৯১৪ সালে এবং শেষ হয় ১৯১৮ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles, 1919) অনুসারে জাতিসংঘের সনদ মিত্রশক্তিবর্গের নিকট পেশ করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৯ সালের শান্তি বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসন, দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল স্মাটস্, বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি লয়েড জর্জ এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনশো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা পেশ করেন। এই সমস্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতেই

জাতিসংঘের গঠন

জাতিসংঘের সনদ রচিত হয়। এই সনদ ভার্সাই চুক্তির একটি অংশ হিসাবে গণ্য হয়। ১৯২০ সালে ১০ই জানুয়ারী জাতিসংঘ সরকারীভাবে প্রবর্তিত হয়।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ছিল মহান। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য একদিকে যেমন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা গড়িয়া তুলিয়া তাহাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হইয়াছে, আবার অপরদিকে যুদ্ধকে পরিহার করিবার নীতিকে (avoiding war) কার্যকরী করার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনই ছিলেন এই জাতিসংঘের জনক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জাতিসংঘ যুদ্ধকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই। ইহার পর কেলগ ব্রিয়াঁ চুক্তি (Kellogg Bryan Pact) সম্পাদিত হয় ১৯২৮ সালে। এই চুক্তিপত্রে যুদ্ধকে অবৈধ বলিয়া (War is illegal) ঘোষণা করা হয়।

জাতিসংঘের সভ্য হিসাবে যোগদান করে তাহারাই যাহারা জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিল। অবশ্য, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যদিও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করে নাই। প্রথমে ইহার সদস্য ছিল ৪০টি রাষ্ট্র। জাতিসংঘের সভায় (Assembly) ⅔ অংশ ভোটে কোন রাষ্ট্রকে সদস্য পদভুক্ত করা যাইত। প্রথমে জার্মানী, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে সদস্যপদ দেওয়া হয় না। অবশ্য, ১৯৩৪ সালে রাশিয়াকে জাতিসংঘে যোগদান করিতে দেওয়া হয়। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এই সংঘের সদস্য ছিল ৫৫টি রাষ্ট্র। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ৩ জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত। পরবর্তিকালে জার্মানীকেও জাতিসংঘের সদস্য পদ দেওয়া হয়। আবার যে কোন রাষ্ট্র ২ বৎসরের নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিত। অবশ্য, সদস্যপদ ত্যাগের সময় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক দায়িত্বসকল পালন করিয়া লইতে হইত। ইহা ছাড়া কোন রাষ্ট্র যদি জাতিসংঘের সনদ অমান্য করিত তবে অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্র সর্বসম্মতভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে জাতিসংঘ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিত। আর কোন সদস্যরাষ্ট্র যদি জাতিসংঘের সনদের কোন সংশোধনকে স্বীকার না করিয়া লইত তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সদস্যপদ লুপ্ত হইত।

জাতিসংঘের সদস্যপদ

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রেরই সার্বভৌমিকতাকে স্বীকার করা হইত। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রই স্বেচ্ছায় চুক্তিপত্রের শর্তাদি পালন করিত। ইহা কোন অতিজাতীয় রাষ্ট্র ছিল না। ইহার নিজস্ব কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না। ইহার কোন সার্বভৌম ক্ষমতাও ছিল না। কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের শর্তাদি পালন না করিলে তাহাকে জোর করিয়া তাহা পালন করানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। জাতিসংঘের কতকগুলি বিভাগ ছিল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : (১) সভা (Assembly), (২) পরিষদ (Council), (৩) কর্মদপ্তর (Secretariat)।

সভা (Assembly) : জাতিসংঘের সভা গঠিত হইত সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রই তিনজন করিয়া প্রতিনিধি সভায় পাঠাইতে পারিত। কিন্তু কোন বিষয়ে ভোটাভুটির সময় প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে একটি করিয়া ভোট দিতে দেওয়া হইত। এই সভা বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের বিচার-বিবেচনা

করিতে পারিত। কতিপয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের সর্বসম্মত ভোটের প্রয়োজন হইত। নূতন সদস্য গ্রহণ করিতে হইলে সদস্যদের ⅔ অংশের সমর্থন প্রয়োজন হইত। জাতিসংঘের চুক্তিপত্রকে সংশোধন করিতে হইলে সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের প্রয়োজন হইত। কিন্তু ঐ সংশোধন প্রস্তাব পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন হইত। যে সকল সদস্যরাষ্ট্র কোন সংশোধনকে গ্রহণ করিতে রাজী হইত না তাহারা সদস্যপদ হারাইত। সভা পরিষদের কার্যের তদারক করিত এবং জাতিসংঘের বাৎসরিক বাজেট পাস করিত। সভা শান্তিশৃংখলা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার বিচার বিবেচনাও করিত।

পরিষদ (Council) : প্রথমে জাতিসংঘের পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ৯টি। তাহার মধ্যে ৫জন ছিল স্থায়ী সদস্য আর ৪ জন ছিল অস্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্যগণ অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্য হইতে সভা দ্বারা নির্বাচিত হইত। জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ও জার্মানী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী সদস্য হইবার কথা ছিল; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান না করায় তাহার শূন্য স্থানটি ১৯২৬ সালের পর দখল করে জার্মানী। পরবর্তিকালে ইতালী ও জার্মানী পদত্যাগ করে। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে যোগদান করে এবং ১৯৩৯ সালে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন স্থায়ী সদস্য ছিল; ইহা ছাড়া ১১টি অস্থায়ী সদস্য ছিল।

পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী

সভার মতো পরিষদও বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করিতে পারিত। প্রত্যেক সদস্যেরই একটি করিয়া ভোটাধিকার ছিল। কয়েকটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইলে সদস্যগণকে সর্বসম্মত (Unanimity) হইতে হইত। সভা যে সকল বিষয়ে সুপারিশ করিত পরিষদ তাহাদের কার্যকর করিত। পরিষদই আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করিত, নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিত। পরিষদই আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করিত বিবাদ মীমাংসা ব্যর্থ হইলে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে পরিষদ শক্তি প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে পারিত। বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একপক্ষ পরিষদের বিচার-মীমাংসা মানিয়া লইলে সদস্যগণ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইবে না বলিয়া অংগীকার করিতে পারিত।

কর্মদপ্তর (Secretariate) : জাতিসংঘের একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছিল। এই কর্মদপ্তর একজন সম্পাদকের দ্বারা পরিচালিত হইত। তিনি সভার সম্মতি ক্রমে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার দপ্তরে ৬০০ কর্মচারী কাজ করিত। কর্মদপ্তর সভার ও পরিষদের কর্মসূচী প্রণয়ন করিত। জাতিসংঘের সকল দলিলপত্র এই দপ্তরই সংরক্ষণ করিত।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত (Parmanent Court of International Justice) : ১৯৩০ সালে ১৫ জন বিচারক লইয়া একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়। ইহা বিচারযোগ্য যে কোন মামলার বিচার করিতে পারিত। ইহাদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৯ বৎসর। বিচারপতিদের নিয়োগ করিত সভা ও পরিষদ। এই বিচারালয় জাতিসংঘের চুক্তিভঙ্গকারীর বিচার করিতে পারিত এবং চুক্তিভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য বিচার মীমাংসা দিতে পারিত।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত

ইহা ছাড়া শ্রমিকগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা International Labour Organisation) গঠন করা হয়। জাতি-সংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রই এই সংস্থার সদস্য ছিল। ইহা ছাড়া জাতিসংঘের কতক-গুলি সাহায্যকারী সংগঠন (Auxiliary Organisations) ছিল; যেমন, (১) অর্থ-নৈতিক ও মূলধন বিষয়ক সমিতি, (২) যানবাহন ও চলাচল সংক্রান্ত সমিতি, (৩) স্বাস্থ্য সংস্থা প্রভৃতি। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুন্নত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, যানবাহন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উন্নয়নের কাজ করা হইত। ইহা ছাড়া জাতিসংঘের কতকগুলি উপদেষ্টা সমিতিও ছিল; যেমন, (১) নিরস্ত্রীকরণ সমিতি (Disarmament Committee), (২) অ-স্বায়ত্ত শাসিত দেশের শাসনভার গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ক সমিতি (Mandates Committee), (৩) সামাজিক ও মানসিক কর্তব্য সংক্রান্ত সমিতি (Social and Humanitarian Activities Committee)। এই সকল সমিতির পরামর্শ লইয়া জাতিসংঘ ব্যবস্থা গ্রহণ করিত।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা (Failure of the League of Nations): জাতি-সংঘের উদ্দেশ্য ছিল মহান। জাতিসংঘ তাহার সকল উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিতে পারে নাই। কিন্তু জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সহ-যোগিতা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল; আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রভূত উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। ম্যালেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগ যাহাতে মহামারীরূপে দেখা না দিতে পারে তাহার জন্য প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

অবশ্য জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্র-গুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এই বিষয়ে জাতিসংঘ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবিধানের বিভিন্ন শর্তাবলী জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ আক্রমণাত্মক যুদ্ধবিগ্রহের বিরুদ্ধে যুগ্ম-ভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থাও চুক্তিপত্রে করা হইয়াছিল; কিন্তু জাতিসংঘ যুদ্ধকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই। জাতিসংঘ যুদ্ধকে পরিহার করিয়া চলিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতাকে জাতিসংঘ মান্য করিয়া লইয়াছিল। ইহা ছাড়া জাতিসংঘের কোন নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও ছিল না। বিবদমান রাষ্ট্র জাতিসংঘের নির্দেশ মান্য না করিলে তাহাদের জাতিসংঘের নির্দেশ মান্য করানোর মতো কোন অস্ত্র জাতি-সংঘের হাতে ছিল না। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ফ্রান্স শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক পুলিসবাহিনী নিয়োগের প্রস্তাব দিয়াছিল। কিন্তু, মিত্রশক্তিবর্গ এই প্রস্তাব সমর্থন করে নাই। আবার জাতিসংঘের সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই জাতিসংঘে যোগদান করে নাই। ক্রমেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও আস্থার অভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা ছাড়া যুগ্ম নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইউরোপের কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘের অধীনে নিজেদের সৈন্যবাহিনী রাখিবার পক্ষপাতী ছিল না। কোন রাষ্ট্রই প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রের স্বার্থে নিজেদের সৈন্যকে ব্যবহার করিতে দেয় নাই। ভার্সাই সন্ধি (Treaty of Versailles) এবং জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে কোনও আক্রমণের বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে

সাহায্য করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল বটে কিন্তু ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে জাতিসংঘ জাপানের বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। আবার লোকার্নো চুক্তি (Locarno Pact) এবং ১৯২৮ সালে কেলগ-ব্রিঁয়া চুক্তি (Kellog-Briand Pact) অনুসারে জাতিসংঘের বাহিরে জাতিসংঘেরই কতিপয় সদস্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া আন্তর্জাতিক শক্তিজোট সৃষ্টি করে। জাতিসংঘের বাহিরে ফ্রান্স ও ইতালী ক্ষুদ্র জোট (Little Entente) সৃষ্টি করিল। জাতিসংঘের বাহিরে এই চুক্তি জাতিসংঘের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার প্রধান উদ্দেশ্যকে নষ্ট করিয়া দিল। আবার ফ্রান্স আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল। ইউরোপে একাধিক পরস্পর বিরোধী মৈত্রী জোটের সৃষ্টি হয়। নিম্নে জাতিসংঘের পতনের কারণগুলি দেওয়া গেল :

(১) উগ্র জাতীয়তাবাদ জাতিসংঘের পতন অনিবার্য করিয়া তুলিল।

(২) অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান না করায় জাতিসংঘ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) আবার প্রথমে রাজনৈতিক মতদ্বৈধতার জন্য জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রগুলিকে জাতিসংঘে স্থান না দিবার ফলে একদিকে জাতিসংঘ দুর্বল হইয়া পড়ে আর অপরদিকে ইহার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয়।

(৪) জাতিসংঘের স্থায়ী কোন সৈন্যদলও ছিল না। ফলে কোথাও বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইলে জাতিসংঘ বলপ্রয়োগ করিতে পারিত না।

(৫) ইহা ছাড়া জাতিসংঘের পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হইলে প্রস্তাবকে কার্যকর করা যাইত না। অনেক প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই জাতিসংঘ সর্বসম্মত হইতে পারিত না।

(৬) আবার ভার্সাই সন্ধি ছিল আক্রোশ মূলক। ফলে যাহাদের উপর চুক্তির বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভও সৃষ্টি হয়।

(৭) জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে সদস্যরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিগুলি তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতাকে ব্যবহার করিতে পারায় জাতিসংঘের মূল্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

(৮) জাতিসংঘের পরিষদকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী একটি কূটনৈতিক সংগ্রাম ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করিত। ফলে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় মনোনিবেশ করা তাহাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।

এইসকল দুর্বলতার জন্য ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে এবং ১৯৩৫ সালে ইতালি ইথিওপিয়া আক্রমণ করিলে জাতিসংঘ এই আক্রমণ রোধ করিতে পারে নাই। ১৯৫৫ সালে জার্মানী ভার্সাই চুক্তির শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিল তখন জাতিসংঘ জার্মানীকে চুক্তির শর্ত পালনে বাধ্য করিতে পারিল না। ফলে জার্মানী জাতিসংঘের দুর্বলতা বুঝিয়া অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ডকে গ্রাস করিয়া লইল। ১৯40 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাতিসংঘ অতীত স্মৃতিতে পরিণত হইল। ১৯৩৯ সালে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুঙ্কারে ধরণী প্রকম্পিত হইল। এই যুদ্ধে একদিকে ছিল জার্মানী, জাপান ও ইতালী—আর অন্যদিকে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকা ও ইহাদের অন্যান্য

সমর্থক দেশ। জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করিলে রাশিয়াও ইংল্যাণ্ডের সহিত জোটবদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জার্মানী, ইতালী ও জাপান পরাজিত হইল। ১৪ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
(United Nations Organisation)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে উদ্ভব হইয়াছিল জাতিসংঘের আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই ১৯৪১ সালে মিত্রশক্তি পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে গঠন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে লন্ডন ঘোষণায় (London Declaration)। ইহার পর ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার আটলান্টিক মহাসাগরের কোন একস্থানে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া আটলান্টিক সনদ ঘোষণা করেন। এই সনদেও লন্ডন ঘোষণার ন্যায় যুদ্ধোত্তর যুগে নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ইহার পর ১৯৪২ সালে জানুয়ারী মাসে মিত্রশক্তিবর্গ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা (Declaration of the United Nations) প্রকাশ করে। ইহাতে আটলান্টিক সনদকে কার্যকরী করিবার নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসংঘ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় মস্কো ঘোষণায় (Moscow Declaration, 1943)। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমিকতায় স্বীকৃতি দেওয়া হইবে এবং সাম্যের ভিত্তিতে এক বিশ্বসংগঠন সৃষ্টি করা হইবে। ইহার পর ওয়াশিংটন ও ইয়াল্টায় আরও বৈঠক হয় এবং মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা চলে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে জাতিপুঞ্জের সংবিধান গৃহীত হয়। এই বৎসরই জাতিপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১টি। বর্তমানে সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১২২টি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন

জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য (Object of the U. N.)ঃ (ক) জাতিপুঞ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ঃ (১) ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করা ("The people of the United Nations are determined to save succeeding generation from the scourge of war.")।

(২) সম্মিলিতভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) আর গৌণ উদ্দেশ্য হইল ঃ (১) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারা বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা;

(২) মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা;

(৩) জাতিসমূহের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং

(৪) পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দান করা। পরিশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব হইতে যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া দূর করিয়া, সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্য দিয়া পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের আর্থিক,

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিকে নিশ্চিত করিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য।

গঠন (Organisation) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১২২-টিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণতঃ জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যে মিত্রশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদের লইয়াই প্রথমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়। ভারত ইহার অন্যতম মূল সদস্য। পাকিস্তান স্বাধীনতার পর ইহাতে স্বতন্ত্রভাবে যোগদান করিয়াছে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছে। জাতিপুঞ্জের মূলবিভাগ হইল ছয়টি। নিম্নে এই বিভাগগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

(১) সাধারণ সভা (General Assembly) : সাধারণ সভা জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যরাষ্ট্র লইয়া গঠিত। ইহাতে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রই পাঁচজন করিয়া সদস্য সাধারণ সভায় প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রেরই একটি করিয়া ভোটদানের সমানাধিকার আছে। নিয়মিতভাবে সভার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। তবে নিরাপত্তা পরিষদ অথবা অধিকসংখ্যক সদস্যরাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে বিশেষ অধিবেশনও হইতে পারে। সাধারণতঃ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু, (১) সাধারণ সভা যখন নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সভ্যদের নির্বাচন করে; (২) আইন ভঙ্গকারী সদস্য রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জ হইতে বিতাড়নের জন্য সুপারিশ করে; (৩) বাৎসরিক বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী গ্রহণ করে; (৪) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে; (৫) নূতন কোন সদস্যরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ করে; (৬) অনুন্নত দেশগুলির তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং (৭) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে তখন (৮) সভার ⅔ অংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য একজন করিয়া সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ সভার কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায় :

(ক) বিতর্ক ও জনমত গঠন : সাধারণ সভা "বিশ্বের বিতর্কসভা।" সাধারণ সভা সংবিধানে বর্ণিত যে কোন বিষয়ের উপর আলোচনা করিতে পারে। ইহা জাতিপুঞ্জের সকল সংগঠনের কার্যাবলীর আলোচনা করিতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে কোন সদস্যরাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিতে পারে। এই সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নীতির ঘোষণা করিতে পারে।

(খ) শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক কার্য : সদস্যরাষ্ট্র ও সদস্যরাষ্ট্র নয় এমন রাষ্ট্র এবং নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ-বিষয়ক প্রশ্ন সাধারণ সভার বিচার-বিবেচনার জন্য সাধারণ সভার নিকট পেশ করিতে পারে। সাধারণ সভা বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। অবশ্য শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন যদি নিরাপত্তা পরিষদে বিবেচনাধীন থাকে তবে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি ছাড়া সাধারণ সভা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উপর আলোচনা করিতে পারে না। কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক

প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে সাধারণ সভা তাহার উপর আলোচনা করিতে পারে ও প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের ৭ জন সদস্য যদি সম্মতিজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে এইরূপ প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদের আওতা হইতে সাধারণ সভায় সরাইয়া লওয়া হয়। কোরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে নিরাপত্তা পরিষদের আয়ত্তাধীন হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫০ সালের শান্তির জন্য সম্মিলিত হইবার প্রস্তাবের (Uniting for peace Resolution)" মাধ্যমে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের এলাকায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সাধারণতঃ শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদেরই এলাকাধীন। তবে নিরাপত্তা পরিষদের ৭ জন সদস্য সমর্থন জানাইলে বা সভার অধিকাংশ সদস্য দাবি করিলে সাধারণ সভা শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে পারে।

(গ) **আইন সংক্রান্ত কার্য:** সাধারণ সভাকে কোন আইন প্রণয়নী সভা বলা যায় না। ইহা যথার্থই বিশ্বনাগরিক সভা (Town meeting of the world)। ইহা কূটনৈতিকদিগের সম্মেলন মাত্র ("The Assembly is no more a lagislative body than any other conference of diplomats."—*Schuman*)। সাধারণ সভা এমন কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না যাহা বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হইবে। ইহা বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে ও সুপারিশ করিতে পারে মাত্র। সাধারণ সভা ১৯৪৮ সালে একটি আন্তর্জাতিক আইন কমিশন নিযুক্ত করিয়াছে। এই কমিশন বিভিন্ন নিয়মকানুনের খসড়া রচনা করিয়া সাধারণ সভায় পেশ করিবে। সাধারণসভা বিভিন্ন রাষ্ট্রের আচার-আচরণ সম্পর্কে নিয়মাবলী ঘোষণা করিতে পারে মাত্র। সাধারণ সভা জাতিহত্যা সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Convention on Genocide) ঘোষণা করিয়াছে। উদ্বাস্তু সম্পর্কীয় একটি ঘোষণাপত্রও বাহির করিয়াছে।

(ঘ) **তদারকী কাজ:** সাধারণ সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার কার্যের তদারক করিবে। নিরাপত্তা পরিষদ, অভিভাবক পরিষদ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সাধারণ সভার নিকট তাহাদের কার্যের রিপোর্ট পেশ করিতে হয়। অবশ্য, নিরাপত্তা পরিষদের কিছু মর্যাদা আছে। নিরাপত্তা পরিষদ ইচ্ছা করিলে সভার সুপারিশকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। জাতিপুঞ্জের কর্মদপ্তর সভার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অধীন।

(ঙ) **নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ:** নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। কতকগুলি পদ সাধারণ সভা এককভাবে নির্বাচিত করে আর কতকগুলি পদ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা নির্বাচিত করে। যেমন, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদিগকে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদের সদস্যগণকে এবং অভিভাবক পরিষদের সদস্যগণকে সাধারণ সভা এককভাবে নির্বাচিত করে। কিন্তু জাতিপুঞ্জে কোন নূতন সদস্যকে সদস্যপদ দিতে হইলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫ জন সদস্য সহ ৯ জন সদস্যের সমর্থিত সুপারিশ থাকা দরকার এবং সাধারণ সভার ⅔ অংশ সদস্যের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হওয়া দরকার। জাতিপুঞ্জের একজন কর্মসচিবকে নির্বাচন করার সময় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সুপারিশ করা প্রার্থীকে সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে নিযুক্ত হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের

সদস্যগণকে সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে।

(২) **নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)**: বর্তমানে ১৫ জন সদস্য লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়। ইহার পূর্বে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইহার মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১১ জন। বর্তমানে ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য আর ১০ জন অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্য হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাতীয়তাবাদী চীন। আর অস্থায়ী সদস্যগণকে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ ২ বৎসরের জন্য নির্বাচিত করে। অস্থায়ী সদস্যগণ কার্যকাল শেষ হইবার পরই পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারে না। কিছুকাল বাদে আবার নির্বাচিত হইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদই জাতিপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ইহার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত: (ক) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা; (খ) প্রত্যক্ষ ভাবে আন্তঃরাষ্ট্র বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করা; (গ) সালিশী ব্যবস্থার দ্বারা বিবাদ মীমাংসার ব্যবস্থা করা, (ঘ) আলাপ আলোচনার দ্বারা বিবাদ মীমাংসার প্রয়াস, (ঙ) মধ্যস্থতা করিয়া বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করা প্রভৃতি নিরাপত্তা পরিষদের কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষাকল্পে শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে নির্দেশ দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ, সদস্য রাষ্ট্র যে স্থল, জল ও বিমানবাহিনী জাতিপুঞ্জকে প্রদান করে, তাহাদিগকে শান্তি-ভংগকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারে। এই সশস্ত্র বাহিনী নিরাপত্তা পরিষদের সামরিক কর্মচারী-কমিটির (Military Staff Committee) দ্বারা পরিচালিত হয়। জাতিপুঞ্জের কোন সদস্যরাষ্ট্র কোন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত সদস্যরাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক সামরিক জোট গঠন করিতে পারে।

ভিটো (Veto): নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের একটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই বিশেষ ক্ষমতাই হইল ভিটো প্রদান ক্ষমতা। নিরাপত্তা পরিষদের পদ্ধতিগত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হয় ৭ জন সদস্যের সম্মতিজ্ঞাপক ভোট। আর অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ৭ জনের সম্মতিজ্ঞাপক ভোটের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এই ৭ জনের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। অতএব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ প্রভৃতি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্রেরই সম্মতি প্রয়োজন। এই ৫টি রাষ্ট্রের যে কোন একটি রাষ্ট্র অসম্মতিজ্ঞাপক ভোট প্রদান করিলে প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া যাইবে এবং শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহা হইলে কোন শক্তি প্রয়োগ করা চলিবে না। এই অসম্মতিজ্ঞাপক ভোট দ্বারা প্রস্তাব বাতিল করাকে ভিটো বলে।

এই ভিটোর পক্ষে যুক্তি হইল বৃহৎ শক্তিবর্গের একজনের অমতেও কোন গুরুত্ব-পূর্ণ কোন আন্তর্জাতিক পন্থা অবলম্বন করা যাইবে না বলিয়া শান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। আর ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি হইল, যে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হইয়াছে তাহা ভিটোর মতো অসাধারণ ক্ষমতা ৫টি স্থায়ী-সদস্য রাষ্ট্রকে প্রদান করায় সমানাধিকারের নীতি ব্যর্থ হইয়াছে। আর প্রকৃত শান্তিভংগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলেও

শান্তিভংগকারী রাষ্ট্র যদি এই পাঁচটি রাষ্ট্রের কাহারও দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। কারণ ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি রাষ্ট্র ভিটো দিয়া শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবকে বাতিল করিয়া দিতে পারে।

(৩) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) : ১৫ জন বিচারপতিকে লইয়া একটি পৃথক সনদের দ্বারা আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত হয়। এই বিচারালয়ের কার্যকাল ৯ বৎসর। সনদের অন্তর্গত সকল বিষয়ের বিচারই এই বিচারালয়ে হইতে পারে। জাতি-সংঘের অধীনে যে আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার নাম ছিল আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারের চিরস্থায়ী আদালত (Permanent Count of International Justice)। এই উভয় আদালতের কার্যাবলী একই প্রকারের।

আন্তর্জাতিক আদালত

(৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council or ESC) : এই পরিষদ ১৮ জন সভ্য লইয়া গঠিত। প্রত্যেক সভ্যই সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ় করাই ইহার মৌলিক উদ্দেশ্য ; ইহার অন্তর্গত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা রহিয়াছে, যেমন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (ILO), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF), শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), বিশ্বব্যাঙ্ক (IBRD), বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা (WHO), খাদ্য ও কৃষিসংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তিসংস্থা (IAEA) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আবার ইহার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি কমিটীও আছে ; যেমন, মানবীয় অধিকার কমিশন (Commission on Human Rights), ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Europe), এবং এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কশিমন (Economic Commission for Asia and Far East) ইত্যাদি। এই সকল সংস্থা ও কমিশনের বিবরণী আলোচনার জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা হয়। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(ক) আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ (International Labour Organisation : ILO) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সরকার, শিল্পের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের লইয়া ইহার পরিচালন কর্তৃপক্ষ গঠিত হইয়া থাকে। এই সংগঠন আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংগঠন। এই সংগঠনের নীতি স্থির করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন। শ্রমিকদের উন্নতি, বেকারত্ব দূর করিবার ব্যবস্থা, বার্ধক্যে শ্রমিকদিগকে বিশেষ সুবিধাদান, নারী শ্রমিকদিগের স্বার্থসংরক্ষণ প্রভৃতি শ্রমিকসংক্রান্ত কার্যের দায়িত্ব এই সংঘ গ্রহণ করিয়া থাকে।

(খ) আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund : IMF) : সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া এই সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়। ইহার কতিপয় কার্যনির্বাহক অধিকর্তা (Executive Directors) থাকেন। একজন প্রধান পরিচালক অধিকর্তা থাকেন। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে এই তহবিলে নির্দিষ্ট অর্থ বা স্বর্ণ (Quota) প্রদান করিতে হয়। এই তহবিল সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, বিনিময় হারে

স্থায়িত্ব রক্ষা করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার করা এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস (devaluation) নীতি ত্যাগ করিবার মতো অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

(গ) **খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organisation : FAO) :** এই সংস্থার কার্যাবলীর তদারক করিবার জন্য একটি পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদ ২৫ জন্য সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। ইহার একজন প্রধান অধিকর্তা (Director General) আছে। এই সংস্থা পৃথিবীর খাদ্য ও কৃষির উন্নতিকল্পে সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে তথ্যাদি সরবরাহ এবং কলাকৌশলগত সাহায্য দান করে। সদস্যদের সম্মেলনে পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করা হয় এবং সংস্থার কার্যের নীতি নির্ধারিত হয়।

(ঘ) **বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation : WHO) :** বিশ্ব-স্বাস্থ্য সভা একটি পরিষদ নির্বাচিত করিয়া তাহার মাধ্যমে কাজ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নতি, যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত রোগের প্রতিরোধ করা এই সংস্থার কাজ।

(ঙ) **শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation : UNESCO) :** এই সংস্থার কার্য নির্বাহ করিবার জন্য একটি পরিষদ (Executive Board) নির্বাচিত হয়। ইহার একজন প্রধান অধিকর্তা আছে। বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিরক্ষরতা দূর করিয়া বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক উন্নতি করাই এই সংস্থার প্রধান কাজ। সদস্যদিগের সম্মেলনে ইহার কর্মসূচী স্থির করা হয়।

(চ) **আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD) :** এই ব্যাংকের মূলধন আসে সদস্যদিগের নিকট হইতে। সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি পরিচালনা সমিতি (Board of Governors) গঠিত হয়। প্রাত্যহিক কার্য নির্বাহের জন্য কতিপয় কার্যনির্বাহক অধিকর্তা (Executive Directors) আছেন। এই অধিকর্তাগণের সভাপতিকে বলা হয় বিশ্বব্যাংকের সভাপতি (President of the World Bank)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সকল দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহাদের উন্নয়ন করা এবং অনগ্রসর দেশসমূহের উন্নতিতে সাহায্য করাই এই ব্যাংকের কাজ। বিশ্বব্যাংক সদস্য রাষ্ট্রকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন দেশ যে সকল বেসরকারী সূত্র হইতে অর্থ দান করে বিশ্বব্যাংক তাহার জন্য গ্যারান্টি দিয়া থাকে।

(ছ) **আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association : IDA) :** বিশ্বব্যাংকের সকল সদস্যই এই সংঘের সংসদ্য। ইহার পরিচালনার জন্য একটি পরিষদ আছে। অনগ্রসর দেশগুলিকে অর্থসাহায্য দিয়া উন্নয়নে সহায়তা করাই ইহার প্রধান কাজ।

(জ) **আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তিসংস্থা (International Atomic Energy Agency : IAEA) :** ২৩ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালকমণ্ডলী (a Board of Governors) ইহার কার্য নির্বাহ করে। পারমাণবিক শক্তি যাহাতে বিশ্বশান্তি ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হইতে না পারে এবং উহা যাহাতে বিশ্বশান্তি রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয় তাহার জন্য প্রচেষ্টা করাই ইহার কাজ।

(৫) **অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council) :** অনুন্নত দেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন পাইবার মতো করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ১৪ জন সদস্যবিশিষ্ট যে পরিষদ নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাকেই অভিভাবক পরিষদ বলা হয়। এই পরিষদ অনগ্রসর জাতিসমূহের তদারক করে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছি অধীনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি এবং সাধারণ সভাকর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত অছি শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমসংখ্যক সভ্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত হয়।

(৬) **কর্মসংস্থা (Secretariat) :** একজন প্রধান সচিবের অধীনে আটটি বিভাগ লইয়া একটি দপ্তরখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধান সচিব (Secretariat General) নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। বর্তমানে প্রধান সচিব হইলেন ওয়াল্ডহাইম।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা (Achievements and failures of the U. N O.) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতেই জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। বিশ্বে তৃতীয় মহাযুদ্ধের পদক্ষেপকে বন্ধ করাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার বিগত ৩০ বৎসরের কার্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার পরিমাণ উহার সাফল্যকে অনেক পরিমাণে অতিক্রম করিয়াছে। জাতিপুঞ্জ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং জাতিতে জাতিতে পূর্ণ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিবার যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কার্যকর করিতে পারে নাই। ফলে আমরা দেখিতে পাই কোরিয়া, ভিয়েতনাম, আরব, ইজরায়েল, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়ায় অশান্ত অবস্থা বিরাজ করিতেছে। সাম্প্রতিককালে রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল, ইন্দোনেশিয়া জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছিল। নয়া চীন ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, তিব্বতকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের কাশ্মীরের কিছুটা জায়গা আজও পাকিস্তান দখল করিয়া রাখিয়াছে। জাতিতে জাতিতে বিবাদ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অশান্তিপূর্ণ এই অবস্থাকে শান্ত করিবার কোন ক্ষমতাই জাতিপুঞ্জের নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণগুলি নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধকে ধিক্কার (renounce) দিয়াছে বটে কিন্তু অস্বীকার (denounce) করে নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভুটির পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, স্থায়ী পাঁচটি রাষ্ট্রকে ভিটো ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ কালে এই পাঁচটি রাষ্ট্রের যেকোন একটি রাষ্ট্র যদি অসম্মতি জ্ঞাপন করে তবে আর শক্তি প্রয়োগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে না। অর্থাৎ পরিষদের ৯টি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি-প্রস্তাব প্রয়োজন। এই ৯টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্রকে থাকিতে হইবে। ভিটো ও ভোট প্রদানের এই দুর্বল পদ্ধতির জন্য কোন যুধ্যমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। ১৯৪৬ সালে ইরান অভিযোগ করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন অভিযোগ করে যে, গ্রীস ও ইন্দোনেশিয়ায় ইংরেজসৈন্য থাকায় শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন পর পর অনেকগুলি প্রস্তাবের উপর ভিটো প্রয়োগ করে। আবার সুয়েজ সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভিটোর

আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও রুশ প্রয়োজন বোধে ভিটো ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে কোন সক্রিয় কাজই করিতে দিতেছে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়শিয়ার মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছে। কাশ্মীর সমস্যাকে আজ পর্যন্তও সমাধান করা সম্ভবপর হয় নাই। হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইজরায়েল এবং আরবদেশেও লড়াই লাগিয়াই আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই লড়াই বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। ভিয়েতনামে যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছিল তাহাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করিতে পারিতেছিল না।

আবার নয়াচীনকে যতদিন পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের সদস্যভুক্ত করা হয় নাই ততদিন পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের সনদ মান্য করা তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না। ফলে জাতিপুঞ্জের জোয়ালে তাহাকে বাঁধা যায় নাই। বর্তমানে অবশ্য চীন জাতিপুঞ্জের সদস্য।

(২) কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই ব্যস্ত। নয়াচীনের সঙ্গে রাশিয়ার মত-পার্থক্য হেতু কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যেও আজ ঐক্য নাই।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের দেশগুলির নেতা হিসাবেও আজ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুরাপুরি ধরা যায় না। বর্তমানে এককভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। তাহাকে আজ এশিয়া ও আফ্রিকার সদস্য রাষ্ট্রগুলির সমর্থন সংগ্রহ করিতে হয়। আবার চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহিত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিবাদ লাগিয়াই আছে। আজ পৃথিবী শুধু দুই-শিবিরে বিভক্ত নয়। আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুই-শিবিরের নেতৃত্ব শর্তহীনভাবে দিতে পারে না। নয়া চীন আজ পৃথিবীর তৃতীয় শক্তিরূপে জাগ্রত হইতেছে। পরমাণুশক্তির সেও মালিক। সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী দেশগুলির সহিত সহ-অবস্থানের (Theory of Co-existence) নীতিতে বিশ্বাসী। আর নয়া চীন, এই নীতিতে বিশ্বাসী নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না বলিয়াই সে বিশ্বাস করে।

তৃতীয় বিশ্বসমর কেহই চায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নও চায় না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চায় না। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ চলিতেছে ("The tension which developed between Soviet Union and western powers in post-war period came to be known as the cold war."—*G. C. Smith.*)। পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলির সমর্থক দেশগুলির সহিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থক দেশগুলির যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরোক্ষভাবে অথবা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে। জাতিপুঞ্জ এই যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, কারণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আজ পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সংগ্রামস্থলে পরিণত হইয়াছে। এই দুই কর্ণধার যদি খণ্ডযুদ্ধে বা স্নায়ুযুদ্ধে সমর্থন জানায় তখন জাতিপুঞ্জ নিষ্ক্রিয় হইতে বাধ্য।

(৩) কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, শান্তিভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাতিপুঞ্জের নিজস্ব শক্তি নাই। জাতিপুঞ্জের হাতে প্রভূত সামরিক বল থাকিলে পৃথিবীর যেখানেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে সেখানেই বল-প্রয়োগের মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ শান্তিভঙ্গকারীকে দমন করিতে পারিত।

(৪) জাতীয় সার্বভৌমিকতার উপর জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না, তবে সদস্যপদও স্বেচ্ছায় ছিন্ন করা যাইত। জাতিপুঞ্জের সদস্যপদও স্বেচ্ছায় ছিন্ন করা যায়। ইন্দোনেশিয়া জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছে। এমনি যদি কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের বাহিরে থাকিয়া যায় তাহা হইলে জাতিসংঘের আর এক শিবির গড়িয়া উঠিবে। জাতিপুঞ্জকে সার্থক করিতে হইলে সকল রাষ্ট্রকেই জাতিপুঞ্জের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে হইবে, তাহার আইনের পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৫) ইহা ছাড়া জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোন আয় নাই। সদস্যগণের অর্থ-সাহায্যের উপর তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে।

(৬) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিবার ফলে জাতিপুঞ্জের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইহারা বাধ্য নহে।

উপসংহারে বলা যায়, জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নয়। কারণ স্নায়ুযুদ্ধের ফল পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই ভোগ করিতে হয়। বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা ইহা বেশী ক্ষতিকর, কারণ বিশ্বযুদ্ধ বেশীদিন স্থায়ী হয় না, পক্ষান্তরে স্নায়ুযুদ্ধ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়। স্নায়ুযুদ্ধের ফলে প্রত্যেকটি দেশেরই উন্নতি ব্যাহত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্নায়ুযুদ্ধ বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে হইলে স্নায়ুযুদ্ধের প্রয়োজন আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রকৃতপক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে নেতৃত্ব দিয়া থাকে। অতএব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া দূর করা সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিকতাবাদ

(Internationalism)

প্রশ্ন উঠে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প কি? উত্তর হইল বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত হইয়া মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিয়া এক আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করিতে পারিলেই যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া তিরোহিত হইবে। অতীতে মানুষ আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে বড় বেশী চিন্তা করে নাই।

আন্তর্জাতিকতাবোধ একটি মানসিক অনুভূতি। এই মানসিক অনুভূতি বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ববোধে মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, আবার সকল মানুষের বিচিত্র অবদানে সমৃদ্ধ বিশ্ব সভ্যতার রসানুভূতিতে সঞ্জীবিত মানুষ আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করে। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির কামনা হইল সুখী জীবন। এই সুখী জীবনকে গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় তখনই, যখন পৃথিবীর প্রতিটি জাতি তাহাদের বিকাশের জন্য সর্ববিধ

আন্তর্জাতিকতাবাদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

সুযোগ পাইবে। পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিবে না বরং ভালবাসিবে। কবিগুরুর ভাষায় "দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।" এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলেই বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। উগ্র জাতীয়তাবাদের আতঙ্কময় পরিবেশকে বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর পরস্পরের স্বাধীনতাকে সম্মান করিয়া, সহযোগিতার ভিত্তিতে যখন বসবাস করিতে পারিবে, তখনই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বিশ্বশান্তিকে রক্ষা করিবার প্রহরী হিসাবে কাজ করিবে আন্তর্জাতিক সংগঠন। আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমেই স্বজাতিপ্রেম ও আন্তর্জাতিক মানবতাবোধ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিবে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার দিকে প্রণোদিত করে

বিকৃত জাতীয়তাবাদের হস্তে মানুষ যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষ একদিকে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, আর অপরদিকে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি

প্রথম মহাসমরে বহু জাতি প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই মহাসমরের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হইতে জাতিসংঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জাতিসংঘের মাধ্যমে যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার আশা করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই। আবার জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বসমর আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বসমর শেষ হইয়াছে। মানুষের উন্নতি করিবার ইচ্ছা, বাঁচিবার ইচ্ছা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা তাহাকে আবার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার দিকে প্রেরণা যোগাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পর তাই পুনরায় মানুষ "জাতিসংঘ" (United Nations) প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল সকল জাতির উন্নয়ন করা এবং যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই জাতিসংঘের বহুবিধ ত্রুটি আছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বর্তমানে যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির ফলে জাতিতে জাতিতে বিভেদের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছে। বিশ্ব-বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ভয়ে মানব সভ্যতা আজ এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে; অতএব অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণ পরাধীনতার মধ্যবর্তী শব্দ আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে" ("We have to find middle terms between complete dependence and complete independence."—*Laski*)। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। নেহরু বলিয়াছিলেন: শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিকল্প হইতেছে সম্মিলিত বিনষ্টি ("The alternative to peaceful co-existence is co-destruction".—*Nehru*)।

বর্তমানে বিশ্বরাজনীতিতে আবার নূতন ধরনের সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। ফ্রিডম্যানের মতে রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টাই বর্তমান আন্তর্জাতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের মূল কারণ ("The pursuit of political or economic power has been the main dynamo of international movements and conflicts"—*Friedmann*)। আবার আদর্শের সহিত জাতীয় রাষ্ট্রের সংগ্রামও এই যুগের বৈশিষ্ট্য। জার্মানীর নাৎসীবাদ, ইতালির

ফ্যাসীবাদ ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল। জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে। আবার অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের স্পৃহা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কারণ (The quest for economic power is the main source of international conflicts.—*Friedmann*)। বর্তমানে ইরাক, ইরান ও সৌদি আরবের অনাবিষ্কৃত তৈলখনি আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পারস্য উপসাগরের ও ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের তৈল সম্পদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সোভিয়েত রাশিয়া ইরানের উপর যেমন চাপ সৃষ্টি করিতেছে তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। ফলে আবার তৃতীয় বিশ্বসমরের আশংকা করা যাইতেছে ("The control of oil resources in the Mediterranean area and Parsian Gulf might conceivably decide another war.")।

অর্থনৈতিক কারণে বিভেদ সৃষ্ট হইতেছে

আন্তর্জাতিকতাবাদের ধ্বংসকারী সংঘর্ষের কারণ যেমন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ তেমনি আদর্শবাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্বকে ধ্বংস করিতে সক্ষম। ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম (Christianity) উদার ও জ্ঞানদীপ্ত মানবতা (Liberal and enlightened humanitarianism) এবং শ্রেণীহীন সমাজবাদ (Classless socialist society)—প্রভৃতি আদর্শ সারা বিশ্বে প্রচারিত হইতেছে। যুদ্ধ বাধিলে এই সকল আদর্শের জন্যই বাধিবে। এই আদর্শসমূহ প্রচার করে যে, সকল বিশ্ববাসী যদি ইহার একটি আদর্শ গ্রহণ করে তবে আর যুদ্ধ হইবে না। কিন্তু বিশ্ববাসীকে একটি আদর্শ গ্রহণ করাইতে হইলেই যুদ্ধের প্রয়োজন হইতে পারে।

আদর্শের সহিত আদর্শের সংগ্রাম

কার্ল মার্কস্ শতবর্ষ পূর্বে বিশ্বের সকল মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ (Workers of all lands unite) হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। বাস্তবধর্মী চিন্তাবীর হিসাবে তিনি জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসাবে অর্থনৈতিক সমস্বার্থের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানান। সকল দেশেই ধনিক শ্রেণী শোষণের উপর ভিত্তি করিয়া বাঁচিয়া আছে। ফলে সকল দেশেই এক শ্রেণীর মানুষ শোষিত হইতেছে। এই সকল দেশের শোষিত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হইয়া আন্দোলন করিলে জাতীয়তাবাদকে বুর্জোয়াশ্রেণী অপর দেশকে আক্রমণ করার কাজে লাগাইতে পারিবে না।

উপসংহারে বলা যায়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া হইতে মানুষ আজও অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। আজ আবার মানুষ জাতীয়তাবাদের বিকাশ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ, আঞ্চলিক শক্তিজোট, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, বিশ্বজনীন আইন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতেছে। কিন্তু শক্তিজোট শক্তিজোটের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার সমস্যায় বিব্রত; যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হইয়া জাতীয়ভাবের ধ্বংস করিতে চায়, তাহাও পরস্পরাবরোধী যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার আন্তর্জাতিক আইন যে সামগ্রিক নিরাপত্তার মাধ্যমে বিশ্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠার কল্পনা করে তাহাও ত্রুটিপূর্ণ। সর্বোপরি রাষ্ট্রসমূহের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে

যে সহযোগিতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা শুধু সম্ভব তখনই যখন বিশ্বের সকল মানুষ সকল জাতিভেদ ভুলিয়া স্বার্থত্যাগের ব্রত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিবে, কিন্তু সে-দিন অনেক দূরে।

উপসংহারে বলা যায় যে, নিজের দেশের সব কিছুকেই গ্রহণ বা বর্জন এই উভয় মতবাদই অমঙ্গল সূচিত করে। নিজের দেশের যাহা ভালো ও শ্রেষ্ঠ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আবার, অপর দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। সকল দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বমানবের বেদীতে নৈবেদ্য হিসাবে দান করা সঙ্গত এবং এই নৈবেদ্যের উপর সকলেরই সমান ভাগ। এইভাবে শ্রেষ্ঠত্বের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইবে। এই সভ্যতা জাতীয়তাবাদের আতঙ্ক হইতে মানুষকে রক্ষা করিবে এবং বিশ্বশান্তিকে সুদৃঢ় করিবে।

পরিশেষে বলা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুরাশি লইয়া যেমন মহাসাগরের সৈকতভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে তেমনি আকাশ যতই ভাঙিয়া পড়ুক না কেন বিশ্ব মানবপ্রেমিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। এক পৃথিবীর স্বপ্ন সার্থক হইবেই। মানব সমাজে শান্তি, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সারসংক্ষেপ

আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ নূতন নয়। সুদূর অতীত কাল হইতেই মানুষ বিশ্বসৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গঠিত নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কালক্রমে আন্তর্জাতিক আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গেল। একদিকে গঠিত হইল পবিত্র শ্রেণীর মতো কূটনৈতিক সংগঠন আর অপর দিকে গঠিত হইল আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়নের মতো প্রতিষ্ঠান। গ্রোসিয়াস, পেন, বেন্থাম, রুশো প্রমুখ আন্তর্জাতিকতার মতবাদের প্রচারক।

জাতিসংঘ অতিজাতীয়তার স্বপ্নকে বাস্তব করিবার প্রথম প্রচেষ্টা; কিন্তু জাতিসংঘের বিভিন্ন দোষের জন্য ইহার পতন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ আবার অতিজাতীয়তার স্বপ্নকে বাস্তব করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনেকগুলি বিভাগ আছে। যেমন, (১) সাধারণ সভা, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) আন্তর্জাতিক বিচারালয়, (৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৫) অভিভাবক পরিষদ। জাতিপুঞ্জ যদিও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ইহার বিভিন্ন দোষ ত্রুটির জন্য ইহা সফলকাম হইতে পারিতেছে না।

৯ | রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা
(Sovereignty of the State)

সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সামাজিক সংগঠন হইতে পৃথক করিয়া এক স্বতন্ত্র পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। সার্বভৌমকতা হইল রাষ্ট্রের একটি বিশেষ ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এবং রাষ্ট্র-প্রণীত আইনকে বলবৎ করে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের সম্বন্ধ, আন্তঃরাষ্ট্র সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রান্তর্গত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ এবং নাগরিকের সহিত নাগরিকের সম্বন্ধকে বোঝা যায় না। এই কারণেই সম্ভবতঃ গেটেল বলিয়াছেন, "সার্বভৌমিকতার ধারণাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। ইহা সমগ্র আইন ও সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের মূলে অবস্থিত।"* প্রথমে সার্বভৌমিকতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা

সার্বভৌমিকতার স্বরূপ (Nature of Sovereignty)ঃ রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকারের বহুসংখ্যক মানুষ লইয়া গঠিত হয়। এই বিভিন্ন প্রকারের মানুষের চরিত্রও বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। এই সকল মানুষের ইচ্ছা ও স্বার্থের মধ্যে বৈপরীত্যও লক্ষ্য করা যায়। আবার মানুষের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত সমাজকে দুর্বল করিয়া দেয়। অতএব সমাজের স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা ও দ্বন্দ্ব-মীমাংসার জন্য একটি সর্বস্বীকৃত শক্তি বা ক্ষমতা থাকার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। রাষ্ট্র হইল এই শক্তির আধার। রাষ্ট্রের এই শক্তি বা ক্ষমতাকেই বলা হয় সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এবং এই আইনের সাহায্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের এই আইন বাধ্যতামূলক। এই আইনকে অমান্য করিলে রাষ্ট্র শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করে। তাহা হইলে দেখা যায়, রাষ্ট্রের শাস্তি দিবারও ক্ষমতা আছে। সুতরাং রাষ্ট্রের এই শক্তি হইল চূড়ান্ত শক্তি, যাহা সর্বাপেক্ষা বলবান ও সকলকে স্বীয় নির্দেশ মানিতে বাধ্য করে। অতএব বলা হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনগত। রাষ্ট্রও আইন অনুসারে সংগঠিত জনসমাজ। বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "এই আইন অনুসারে সংগঠিত জনসমাজের মধ্যে উদ্ভূত সমগ্র আইনগত দ্বন্দ্বের আইনসঙ্গত মীমাংসার জন্য একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা অবশ্যই থাকিবে।"† রাষ্ট্রেরই একমাত্র এই চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে এবং এই চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই বলা হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা।

সার্বভৌমিকতা হইল দ্বন্দ্ব-মীমাংসার জন্য সর্বস্বীকৃত শক্তি

রাষ্ট্রের আইনগত চূড়ান্ত ক্ষমতাই হইল সার্বভৌমিকতা

আবার, রাষ্ট্রের এই চূড়ান্ত চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতাকে শক্তির

---

*"The concept of Sovereignty is the basis of modern political science. It underlies the validity of all laws and determines all international relation."
—*R. G. Gettell*.

† "There must exist in the State, as a legal association a power of final legal adjustment of all legal issues which arise in its ambit."—*Barker*.

একচেটিয়াত্ব (Monopoly of Power) বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। এই শক্তি আবার একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়। কারণ, শক্তি বিভক্ত হইলে উহা দুর্বল হইয়া পড়ে। বিভক্ত শক্তির নির্দেশকে পালন করিতে বাধ্য করা কঠিন। ফলে সমাজে অরাজকতা দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকে এবং সামাজিক স্থিরতা (Stability), সামাজিক শান্তি ও ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরায় এবং রাষ্ট্র-চরিত্র বহু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শক্তির একচেটিয়াত্ব (Monopoly of power)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সকলে আবার এই শক্তির যুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন না। কারণ, শক্তিই সব নয়। শক্তির দ্বারা মানুষের মন জয় করা যায় না। শক্তি-প্রয়োগের ভয়ে মানুষ যে রাষ্ট্রের নির্দেশকে পালন করিবে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অতএব শক্তি-প্রয়োগের দ্বারা বশ করা সম্ভব হইলেও শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত কিভাবে বশ করানো যায় রাষ্ট্রকে তাহার সন্ধান করিতে হইবে রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে মানুষ তাহার নির্দেশ স্বেচ্ছায় মানিয়া লয়। অতএব জনতার পক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিয়া লওয়ার অভ্যাস সৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে সাহায্য করিতে হইবে। তবেই রাষ্ট্রের নির্দেশপালন দীর্ঘস্থায়ী হইবে। অবশ্য শক্তির প্রয়োগ যে করা চলিবে না, তাহা নহে। শক্তি-প্রয়োগের প্রশ্ন উঠিবে শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক অবাধ্য লোকের ক্ষেত্রে, যাহারা সমাজে দুষ্ট ক্ষতের মতো বাঁচিবার চেষ্টা করে। অতএব শক্তি প্রয়োগের পূর্বে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমাজজীবনে সর্বদা শক্তি-প্রয়োগ করিতে থাকিলে সমাজজীবনে এক শক্তি পরীক্ষাস্থলে পরিণত হইবে এবং সমাজের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িবে।

শক্তি-প্রয়োগের সহিত স্বেচ্ছায় মানিয়া লওয়ার অভ্যাস-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

আবার, রাষ্ট্রের নির্দেশকে স্বেচ্ছায় মানিয়া লইবার অভ্যাস কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। মানুষ না বুঝিয়া কোন জিনিসকেই গ্রহণ করিতে চায় না। রাষ্ট্রের নির্দেশের ক্ষেত্রেও মানুষ তাহাকে যুক্তি দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। মানুষ জানিতে চায় যে, রাষ্ট্রের নির্দেশ ন্যায়সঙ্গত কিনা। সে জানিতে চায় যে, এই নির্দেশ বিধিবদ্ধ কিনা। অতএব দেখা যায়, রাষ্ট্রের নির্দেশকে স্বেচ্ছায় মান্য করিবার পশ্চাতে রহিয়াছে বিভিন্ন যুক্তি। মানুষ যদি যুক্তি দিয়া বুঝে যে, রাষ্ট্রের নির্দেশ আইনসিদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়সিদ্ধ তবেই সে তাহা মান্য করিবে। অতএব রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা হইল এমন ক্ষমতা, যে ক্ষমতা লোকে আইনসিদ্ধ, বিধিসিদ্ধ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্বেচ্ছায় মান্য করে।

সার্বভৌমিকতা আইনসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ ও বিধিবদ্ধ হইলেই লোক স্বেচ্ছায় মান্য করে

আবার প্রশ্ন উঠে, আইনকে কার্যকরী করিবার জন্যই যদি রাষ্ট্রের জবরদস্তি ন্যায্য হয়, তবে আইন কি রাষ্ট্রের উপরে? কিন্তু সার্বভৌমিকতা সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এই সর্বোচ্চ ক্ষমতার উপরে আর কোন ক্ষমতা থাকিতে পারে না। সুতরাং আইন সার্বভৌমিকতার ঊর্ধ্বে হইতে পারে না। আবার রাষ্ট্রই তো আইন প্রণয়ন করে। অতএব এই আইনকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকরী করার অর্থ, রাষ্ট্র তাহার নিজের ইচ্ছাকেই বলপ্রয়োগের সাহায্যে কার্যকরী করিতেছে। অতএব আইন রাষ্ট্রের জবরদস্তির ন্যায্যতা প্রমাণ করিতে পারে না। ম্যাক্ আইভারের মতে রাষ্ট্রপ্রণীত কতকগুলি নিয়মকানুনকেই আইন বলা হয় না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষের জীবনধারা প্রচলনের নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছে। নানা শ্রেণীর স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে

আইন ও রাষ্ট্রসম্বন্ধে ম্যাক্ আইভারের ধারণা

জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা, রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে? ম্যাক্ আইভারের মতে রাষ্ট্র আইন-প্রণেতা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আইনসম্মত অভিভাবক।* রাষ্ট্র আইনের সংস্কার করিতে পারে কিন্তু তাহাকে বদলাইতে পারে না। ম্যাক্ আইভারের মতে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হইল আইনের অনুশাসন বজায় রাখা। অর্থাৎ ইহা নিজেই আইনের আয়ত্তাধীন এবং আইনগত যে মূল্যবোধ ইহা বজায় রাখিতে চায়, তাহার দ্বারা নিজেই আবদ্ধ।†

কোন সম্রাটের লুণ্ঠন, বা রাষ্ট্রের জনগণের উপর কর চাপানো, কাহাকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা, কাহাকেও কারারুদ্ধ করা রাষ্ট্রের পক্ষে কোন অন্যায় নয়, কারণ রাষ্ট্র এইগুলি করে আইনের বলে। তবে আইন কি? আর বে-আইন-ই বা কি? সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের আলোচনা কালে এই প্রসঙ্গটি বুঝিতে হইবে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার প্রকাশ হিসাবে যে আইন প্রণীত হইল তাহা যদি দুর্নীতি-মূলক হয়, তবে তাহা পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। কারণ, রাষ্ট্রের এই আইন প্রণয়ন-কারীদের বদলানো যায়। আবার সমাজ-বিপ্লবের দ্বারাও সরকারকে গদীচ্যুত করা যায়। রুশ বিপ্লব ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনে পূর্বেকার আইন প্রণয়নকর্তা যথাক্রমে জার সরকার ও ইংরেজ সরকারকে গদিচ্যুত করিয়াছে। অতএব বর্তমানে দেখা যায়, এককালে যাহা সার্বভৌমিকতার প্রকাশ হিসাবে আইন ছিল, বর্তমানে তাহা আর নাই। অতএব রাষ্ট্র-প্রণীত আইন পরিবর্তিত হয়, সার্বভৌমি-কতার ব্যবহারকারী সরকারেরও পরিবর্তন হয়। কিন্তু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষের জীবনধারা প্রচলনের যে নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই আইন। ইহার পরিবর্তন হয় না। ইহার সংস্কার হয় মাত্র। আর শুধু যে বিভিন্ন সংঘ, ব্যক্তিবর্গ, দল এবং শ্রেণী লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে তাহাদের আপেক্ষিক শক্তি-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

আবার রাষ্ট্রকে শুধু আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেই চলিবে না। বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে তাহাকে সর্বতোভাবে মুক্ত হইতে হইবে। বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশে আবদ্ধ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে না। এই ধরনের রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রও বলা চলে না। অতএব রাষ্ট্রকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে একদিকে আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে, আর অপরদিকে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে; যথা—(ক) আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং (খ) স্বাধীনতা। আভ্যন্তরীণ সার্ব-ভৌমিকতার অর্থ হইল: রাষ্ট্র ইহার অন্তর্গত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আদেশ দিয়া থাকে কিন্তু কাহারও নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করে না।** অবশ্য ইহা বলা হয় যে, রাষ্ট্রের এলাকাধীন ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিজেরাই নিজেদের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া থাকে। রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে যদিও

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক
(১) আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতা
(২) স্বাধীনতা

* "At any moment the State is more the official guardian than the maker of the Law'.'—*Mac Iver, The Modern State.*

† "Its chief task is to uphold the rule of law and this implies that it is itself also the subject of law that it is bound in the system of legal values it maintains."—*Mac Iver, The Modern State.*

** "The State is internally supreme over the area that it controls. It issues orders to all men and associations within that area; it receives orders from none of them"

হস্তক্ষেপ করে না, তথাপি ইহা বলিলে ভুল করা হইবে যে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় না। কারণ, রাষ্ট্র ইহাদের কার্যক্ষেত্রের উপর হস্তক্ষেপ করে না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে করিতে পারে। রাষ্ট্রের এলাকাধীন মানুষ ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র যে কোন সময়ে তাহার আদেশ মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাহার আদেশ মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। ইহাই হইল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (Internal Sovereignty)।

আবার বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে মুক্ত অবস্থার অর্থ রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা (External Sovereignty)। রাষ্ট্রের এই বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ হইল বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার ক্ষমতা; বৈদেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতা। অনেকে আবার এই ক্ষমতার অর্থ এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, ইহা দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অপরাপর রাষ্ট্রে ব্যবহৃত হওয়াকে বোঝানো হয়। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অপরাপর রাষ্ট্রে ব্যবহৃত হইলে যে রাষ্ট্রে উহা ব্যবহৃত হয়, সে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা থাকে না। এই জন্য বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে অনেকে শুধু স্বাধীনতা ও বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থাটিকে বুঝিয়া থাকেন। গেটেল এই মত পোষণ করেন যে, বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা কথাটি ব্যবহার না করিয়া স্বাধীনতা (Independence) কথাটি ব্যবহার করা বিধেয়। তিনি আরও বলেন: "বস্তুত বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় সেই সকল অধিকারের সমষ্টি যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ব্যবহারে নিজের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা প্রকাশিত করে"।* এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের যে একটি আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে তাহা অপরাপর রাষ্ট্রকে জ্ঞাত করানোকেই বলে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতাকে স্বাধীনতা শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করা হয়

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতা ও বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে মুক্ত অবস্থাটিকে বুঝাইবার জন্য আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা শীর্ষক যে শব্দ দুইটি ব্যবহার করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ তত্ত্বগত। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার কোন মূল্য নাই। এই প্রসঙ্গে যুক্তি দেখানো হয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রকৃত সার্বভৌম রাষ্ট্র হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রুশিয়া। এই দুইটি রাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর রাষ্ট্র সকল কমবেশী ইহাদের উপর নির্ভরশীল বা ইহাদের আজ্ঞাবাহক। কিন্তু আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে অধিকাংশ রাষ্ট্রই স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি যদি অপর কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লয় তবে তাহা স্বেচ্ছাকৃত। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণের কথা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই উঠিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণকে সভ্য রাষ্ট্রসমূহ স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সুতরাং ইহা মন্তব্য করা হয় যে, স্বেচ্ছা-স্বীকৃত নিয়ন্ত্রণ সার্বভৌমিকতার বিলুপ্তি ঘটায় না। আবার ইহাও বলা হয় যে, আইনগতভাবে যদি অপরাপর

স্বেচ্ছা-স্বীকৃত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতা হারায় না

* "What is called external sovereignty is in reality the totality of rights by which internal sovereignty manifests itself in its dealings with foreign States."

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়ন্ত্রণ করিলেও সার্বভৌমিকতার বিলুপ্তি ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যতঃ বহু রাষ্ট্রের নীতি ও কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, আইনতঃ নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার তাহার নাই বলিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের এই নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অপরাপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার বিলুপ্তি ঘটে না।

রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষ সার্বভৌমিকতাকে স্বীকার করে বলিয়াই ইহার অস্তিত্ব রহিয়াছে

আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। দেশের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয় তখনই যখন দেশের মানুষ তাহার চূড়ান্ত ক্ষমতাকে স্বীকার করে। আর এই ক্ষমতাকে স্বীকার করে বলিয়াই তাহার ক্ষমতা আছে। আর যদি এই ক্ষমতাকে লোকে স্বীকার না করিত বা মান্য না করিত, তবে তাহার এই অস্বীকৃত ক্ষমতাকে ক্ষমতা বলিয়াই ধরা হইত না। বাংলায় একটি কথা আছে: "গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল"। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে যদি কেহ না মানে, তবে সে সার্বভৌমিকতার কোন অর্থই হয় না। অতএব সার্বভৌমিকতা নির্ভর করে স্বীকৃতির উপর।

সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের বিকাশ (Development of the Theory of Sovereignty): ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় নাই। ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, মধ্যযুগ পর্যন্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। ফলে সার্বভৌমিকতার তত্ত্বেরও বিকাশ হয় নাই। অবশ্য সার্বভৌমিকতার স্বরূপ প্রাচীন লেখকগণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না।

(১) প্রাচীন ও মধ্যযুগে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা

প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হইত বটে, কিন্তু ন্যায়নীতি (Justice) এবং প্রথাগত আইনকে রাষ্ট্রের নির্দেশের উপরে স্থান দেওয়া হইত। মধ্যযুগে ছিল সামন্ত প্রথা। এই যুগে সারা পশ্চিম ইউরোপ এক খ্রীষ্টীয় সভ্যতার সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন স্তরের লোকের বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল। নিয়ন্ত্রণের অধিকারও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিভক্ত ছিল। রোমান ক্যাথলিক চার্চ (Roman Catholic Church), পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire), রাজ্য (Kingdom), সামান্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারী (Feudal Landlords), মুক্ত শহর (Free States), গিল্ড (Guilds) প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণাধিকার বিভক্ত ছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণী ও সংঘ প্রভৃতির বিভিন্ন অধিকার ও কর্তৃত্বের ভারসাম্যের মধ্য দিয়াই সমাজ-জীবন পরিচালিত হইত। এই প্রসঙ্গে কোকারের (Coker) মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: মধ্যযুগে, "রাষ্ট্রের জন্য কোন অনুভূতি ছিল না; কেন্দ্রীয় ক্ষমতার উপর কোন সাধারণ ও একই ধরনের বশ্যতা ছিল না; কোন সর্বময় ক্ষমতাশালী সার্বভৌমিকতা ছিল না; রাষ্ট্রীয় আইনের সমান চাপ অনুভূত হইত না; আনুষ্ঠানিক আইনসিদ্ধ নিয়মকানুনের মাধ্যমে সংগঠনের ধারণাগত ভিত্তি ছিল না. যাহা ছিল তাহা রাষ্ট্রের নহে, চার্চের এলাকাভুক্ত।*

There was then 'no feeling for the State; no common and uniform dependence on a central power; no omnicompetent sovereignty; no equal pressure of civil law; no abstract basis of association in formal and legal rules or at any rate, so far as anything of the sort was present, it was a matter only for the church and in no wise for the State *Coker—Recent Political Thought.*

মধ্যযুগে ছিল সামন্ত প্রথা। এই সামন্ত যুগে সামন্তগণ শুধু রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিত। আর সাধারণ লোকেরা আনুগত্য প্রদর্শন করিত সামন্তদিগের প্রতি। এইভাবে আনুগত্য প্রদর্শন দুইভাগে বিভক্ত হওয়ায় সার্বভৌম ক্ষমতাও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই যুগেই লক্ষ্য করা যায়, রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে বিরোধিতা। এই বিরোধিতার ফলে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন-স্বীকৃত হয় নাই।

আবার সে যুগে মানুষের আস্থা ছিল স্বাভাবিক আইনের (Natural law) উপর। মনুষ্যপ্রণীত আইনের প্রতি সাধারণ লোকের কোন বিশ্বাস ছিল না। ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথে অনেক বাধা ছিল। বস্তুতঃ রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও আনুগত্য সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা বিকাশ লাভ করে নাই।

(২) সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব সম্বন্ধে সামন্ততান্ত্রিক যুগের ধারণা

মধ্যযুগের শেষের দিকে নূতন রাষ্ট্রশক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে। পোপ ও সম্রাটের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং সামন্ত প্রথা, মুক্তনগরী ও গিল্ডগুলির বিলোপ লক্ষ্য করা যায়। রাজা রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী হন। এই সময় সামন্তবর্গের হস্ত হইতে ভূমি রাজার হস্তে চলিয়া যায় এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্বের ভূমিগত প্রাধান্য আরম্ভ হয় অর্থাৎ ভূমিগত সার্বভৌমিকতার সূত্রপাত হয়। অপরদিকে লুথারের (Martin Luther) ভূমিসংস্কারের আন্দোলনের ফলে পোপের প্রাধান্য খর্ব হয় এবং পোপের বিরুদ্ধে লুথারের প্রচারের ফলে নৃপতিদিগের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। লুথারের মতে রাজাই সার্বভৌম ও সংঘের উচিত তাঁহাকে মান্য করা এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা। অবশ্য, পরে আবার যখন পোপ ও নৃপতিদিগের মধ্যে বিরোধ বাধে এবং পোপের প্রাধান্য পুনরায় স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে নৃপতিগণ লুথারের নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পোপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ফরাসী দার্শনিক বোদাঁ সার্বভৌমিকতার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা লইয়া উপস্থিত হন। এই সংগ্রামের মধ্য হইতে জাতীয় রাষ্ট্রের (National State) উদ্ভব হয়। এই জাতীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা (Sovereignty)। এই সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা হইল নৃপতিগণের মধ্যে। কিন্তু ইহাকে রাষ্ট্রেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হইল, রাজার নহে।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব 'রাষ্ট্রগুরু-সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী—অধ্যাপক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন এই মন্তব্য করেন : "ইউরোপে মধ্যযুগের শেষের দিকে যখন উৎপাদনের শক্তিগুলি তদানীন্তন সামাজিক সম্পর্কের (ফিউডাল সমাজ-সম্পর্ক) নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাহাদের সৃজনশীল শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিবার জন্য সুযোগ সন্ধান করিতেছিল, তখন ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক দাবি ও চার্চের ধর্মের নামে অধিকার রক্ষার মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময় রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত মানুষের স্বার্থকে কায়েম করার জন্য চার্চের ক্লার্জিদিগের সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে এক তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়। এই তত্ত্বই সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব নামে পরিচিত। ইউরোপের রেনেসার অব্যবহিত পরেই এই তত্ত্ব বিকশিত হইতে থাকে।"*

* When towards the close of the Middle Ages in Europe the forces of production sought opportunities for the full utilisation of their creative energy against the restrictions of the then existing social relations a conflict arose between the secular claims of society and the spiritual pretensions of the church. A theory was deve-

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বোডাঁ তাঁহার 'De Republica' গ্রন্থে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের প্রথম ব্যাখ্যা করেন। কারণ, তিনিই প্রথম রাষ্ট্রের জনসাধারণের উপর চরম ক্ষমতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন। এই চরম ক্ষমতার নাম দেওয়া হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা। তিনি বলেন যে, এই ক্ষমতা কোনরূপে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে (The supreme power of the State over citizens and subjects unrestrained by law)। রাষ্ট্রের এই চরম ক্ষমতাকে অবিভাজ্য, চিরন্তন ও অপ্রতিহত বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য, বোডাঁ ঈশ্বরের ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন নাই। বোডাঁ যে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা বর্তমানে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বোডাঁ বিশেষ আলোচনা করেন নাই।

(৩) বোডাঁর সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা।

বোডাঁর এই আরব্ধ কার্য সম্পাদন করিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচ আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ গ্রোটিয়াস (Grotious)। গ্রোটিয়াসের মতে সকল রাষ্ট্রই সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে রাষ্ট্রকে মুক্ত হইতে হইবে। এই বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত অবস্থাটিকে সার্বভৌমিকতার একটি দিক হিসাবে ধরা হয়। গ্রোটিয়াসের এই মতবাদের ফলে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় পুরাপুরি সার্বভৌম হইয়া উঠিল। গ্রোটিয়াস বলেন: সার্বভৌমিক হইল সেই ব্যক্তি যাহার হস্তে চরম রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, যাহার কার্যকলাপ অপর কাহারও আজ্ঞাধীন নহে; যাহার ইচ্ছা কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।*

(৪) গ্রোটিয়াসের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা

বোডাঁ ও গ্রোটিয়াসের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণাকে আরও বিকশিত করেন হবস্ (Hobbes)। হবস তাঁহার লেভায়াথান (Leviathan) গ্রন্থে এক সামাজিক চুক্তির কল্পনা করেন এবং তিনি রাষ্ট্রের এক চরম ক্ষমতাকে স্বীকার করেন। ব্লাকস্টোনের ভাষায় সার্বভৌমিকতা হইল চরম, অপ্রতিরোধ্য, শর্তহীন, সীমাহীন কর্তৃত্ব ("The supreme, irresistible, absolute and uncontrolled authority.)।

(৫) সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে হবস্ ও ব্লাক্স্টোনের ধারণা।

হবসের পর রুশোর (Rousseau) হস্তে সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব আরও বিকশিত হয়। রুশো বলিলেন, সার্বভৌমিকতা রাজার নহে, ইহা জনগণের†। রুশোর মতে জনগণের এই সার্বভৌমিকতা চরম এবং অনিয়ন্ত্রিত। রুশোর এই মত হইতেই জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের উদ্ভব হয়। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণার বিকাশে বেন্থামেরও (Bentham) অবদান কম নহে।

loped then to advance the cause of the politically organised laity against the privileges of the clergy. This theory came to be known as sovereignty of the State. The concept of sovereigncy was developed in the wake of the European Renaissance—*Dr. Dhirendra nath Sen—Raj to Swaraj.*

* The supreme political power vested in him whose acts are not subject to any other and whose will cannot be over-ridden."—*Grotious.*

† রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে সামাজিকচুক্তি মতবাদ দ্রষ্টব্য।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রচার করেন অস্টিন (Austin)। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বস্তুতঃ পরিপূর্ণ ও আইনসঙ্গত রূপ বিশ্লেষিত হয় অস্টিনের হস্তে। অস্টিনের মতবাদকে আবার সময় পরম্পরাগত মতবাদ (Traditional বা classical) বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। অস্টিনের মতবাদের সারকথা হইল রাষ্ট্র বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং রাষ্ট্রাভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চরম ও অনিয়ন্ত্রিত।

(৬) অস্টিনের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা

উপরে যে সকল চিন্তাবীরের মতবাদের কথা বলা হইয়াছে তাহার সারসংক্ষেপ হইল : রাষ্ট্র এক বিশেষ প্রয়োজনীয় সামাজিক সংগঠন ; এই রাষ্ট্রে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বাধীনে সমস্বার্থের ও বিরোধী স্বার্থের মনুষ একসঙ্গে বসবাস করে। রাষ্ট্রই একমাত্র আইন প্রণয়ন করার অধিকারী। আইনগত ভাবে রাষ্ট্রের স্থান সর্বোচ্চে।

আবার জেলিনেকের ভাষায় সার্বভৌমিকতার রূপটি এইরূপ : "রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যাহার গুণে নিজের ইচ্ছা ব্যতিরেকে ইহার উপর কোন প্রকার বন্ধন আরোপিত হইতে পারে না। নিজে ছাড়া অপর কোন শক্তি ইহাকে সীমিত করিতে পারে না।" বার্জেসের মতে সার্বভৌমিকতা হইল "প্রজাপুঞ্জ ও তাহাদের সকল সংগঠনের উপর আদি, অবিমিশ্র সীমাহীন ক্ষমতা, নির্দেশ দান করিবার ও তাহা মান্য করিতে বাধ্য করিবার স্বতোৎসারিত ও স্বাধীন ক্ষমতা" ('Original absolute, unlimited power over the individual subject and over all associations of subjects, the underived and independent power to command and compel obedience")।

বর্তমানে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। এই মতবাদগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক মতবাদ ও বহুত্ববাদ (**Internationalism** ও **Pluralism**) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক মতবাদে বিশ্বাসিগণ রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী নহেন। তাঁহাদের মতে ইহা বিশ্বশান্তির পরিপন্থী। আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ এই মত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বহুত্ববাদিগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্র সংঘমূলক। প্রত্যেক সংঘই স্ব স্ব এলাকায় সার্বভৌম। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার আজ্ঞাকে ইঁহারা আইন বলিয়া স্বীকার করেন না এবং সার্বভৌমিকতা ইঁহাদিগের ধারণায় অবিভাজ্যও নয়। অবশ্য, বর্তমানে কোকোর, ফলেট, ডুগো প্রমুখ দার্শনিকদিগের হস্তে বহুত্ববাদ সমধিক সমালোচিত হইয়াছে। এইভাবে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে যে ধারণা ষোড়শ শতাব্দীতে বোর্ডাার হস্তে প্রথম রূপ গ্রহণ করে পরে উহা সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগো, গ্রোটিয়াস, টমাস হবস এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশো এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ অস্টিন এবং বিংশ শতাব্দীতে ল্যাস্কি প্রভৃতি দার্শনিকের হস্তে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৭) আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ ও বহুত্ববাদিগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য (Charcteristics of Sovereignty) : উপরে সার্বভৌমিকতা এবং তাহার প্রকৃতি সম্পর্কে যে সকল মতামত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে সার্বভৌমিকতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। নিম্নে এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া গেল :

প্রথমতঃ, চরমতা (Absoluteness) ঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ রাষ্ট্রের চরম বা চূড়ান্ত ক্ষমতা। রাষ্ট্রের এই চরম ক্ষমতা অসীম। রাষ্ট্রের মধ্যে আইনানুমোদিত আর অন্য কোন ক্ষমতা নাই যাহা সার্বভৌমিকতার ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সকল বিষয়ের সর্বোচ্চ মীমাংসক হইল সার্বভৌমিকতা। কিন্তু সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহা আইনসঙ্গতভাবে সীমাবদ্ধ না হইলেও ইহা নৈতিক সূত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে হেনরি মেইন এই মত পোষণ করেন যে, নৈতিক প্রভাব প্রতিনিয়তই সার্বভৌম শক্তিকে সীমিত করে। ব্লুণ্টস্‌লি বলেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা যেহেতু অপরাপর রাষ্ট্রের অধিকারকে স্বীকার করে সেইহেতু বাহ্যিক দিক দিয়া ইহা অপরাপর রাষ্ট্রের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। আবার আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া ইহার নিজস্ব প্রকৃতিও ব্যক্তিসমূহের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। তিনি ইহাও বলেন যে, রাষ্ট্র ঈশ্বরের চিরন্তন বিধানকে উপেক্ষা করিতে পারে না, ফলে ঈশ্বরের চিরন্তন বিধানের নিকট চিরদিনই দায়িত্বশীল থাকিবে। আবার ইতিহাসের ঘটনাকেও রাষ্ট্র উপেক্ষা করিতে পারে না। তাই ঐতিহাসিক ঘটনার কাছেও রাষ্ট্র দায়িত্বশীল থাকিবে।

সার্বভৌমিকতা
নৈতিক সূত্রের
দ্বারা সমাবদ্ধ

অবশ্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনগত, নীতিগত নহে। ঈশ্বরের বিধান ও নৈতিক সূত্রের দ্বারা ইহা সীমাবদ্ধ হউক বা না হউক, ইহা আইন দ্বারা যে সীমাবদ্ধ তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। বার্কারের মতে "সার্বভৌমিকতা নিজস্ব প্রকৃতি ও কার্যপদ্ধতি দ্বারা সীমাবদ্ধ।"*

সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি এই কথাই বলে যে, সার্বভৌমিকতা হইল চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্ত ব্যাপারেই নিজেকে প্রকাশিত করে। রাষ্ট্রের বহু সমস্যার ক্ষেত্রে, বহু দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তাহার এই চূড়ান্ত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইল ইহা সকল দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, সকল সমস্যার ক্ষেত্রে সর্বদাই ইহার চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। এই চূড়ান্ত ক্ষমতা যেহেতু সকল বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে না সেইহেতু ইহা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিবার পূর্বে যে সমস্যার সমাধান হইয়া যায়, সেই সকল সমস্যার ক্ষেত্রে ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সকল স্তরে হস্তক্ষেপ করে না বলিয়াই ইহার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ বলা উচিত নয়, কারণ রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে সকল স্তরে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

চূড়ান্ত ক্ষমতা
আছে বলিয়াই
ইহা সর্বদা ব্যবহৃত
হয় না

আবার আইনের গণ্ডীর বাহিরে অন্যান্য বিষয়ের সহিত সার্বভৌমিকতার কোন সংস্রব নাই। এই প্রসঙ্গে বার্কার বলেন ঃ "আইনসঙ্গত ভাবে আইনসম্মত প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার আইনানুমোদিত ক্ষমতা হইল সার্বভৌমিকতা"† ; অতএব সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা বলা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে। সার্বভৌমিকতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

---

* "Sovereignty is limited...by its own nature and its own mode of action." —*Barker*.

† "It is a legal power of settling finally legal questions in a legal way."—*Barker*

দ্বিতীয়তঃ, সর্বজনীনতা (Universality)। সর্বজনীনতা সার্বভৌমিকতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও সার্বভৌমিকতার সীমাহীনতা বুঝানো হয়। ইহার অর্থ হইল রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তিই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিক শক্তির অধীন। অবশ্য, প্রশ্ন উঠে, রাষ্ট্রের মধ্যে যে সকল বৈদেশিক দূতেরা বাস করে তাহারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার অধীন নয়। আবার এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যদিও আইনতঃ এই সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রের অধীন নহে, কিন্তু রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে ও প্রয়োজনবোধে ইহাদিগকে অপসারিত করিতে পারে।

সর্বজনীনতাও আইনের গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ

আবার এই সর্বজনীনতা রাষ্ট্রের আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনবলেই রাষ্ট্রান্তর্গত সকল মানুষ রাষ্ট্রের অধীন। এই আইনের সীমা লঙ্ঘন করিয়া রাষ্ট্র কাহারও উপর তাহার অবাধ ইচ্ছাকে চাপাইয়া দিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, স্থায়িত্ব (Permanence)। সার্বভৌমিকতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল স্থায়িত্ব (permanence)। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম শক্তি ব্যবহার করে সরকার। কিন্তু সরকার স্থায়ী নহে। কিন্তু এই ব্যবহারকারীর পরিবর্তনের ফলে

সার্বভৌমিকতা চিরন্তন নহে

সার্বভৌমিকতার স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না। কারণ স্থায়ী সার্বভৌমিকতাকে বিভিন্ন সরকারই ব্যবহার করিতে পারে। সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যতদিন পর্যন্ত থাকিবে সার্বভৌমিকতাও ততদিন পর্যন্ত থাকিবে। অবশ্য, রাষ্ট্র লুপ্ত হইলে বা বৈদেশিকদের করতলগত হইলে বা রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত হইলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাও আর থাকে না।

চতুর্থতঃ, অবিভাজ্যতা (Indivisibility)। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। রাষ্ট্র বিভক্ত হইলেও সার্বভৌমিকতা বিভক্ত হয় না। তখন বিভক্ত রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র ভাগে সার্বভৌমিকতা সম্পূর্ণ থাকে।

আইনানুসারে ঐক্যবদ্ধ জনসমাজই হইল রাষ্ট্র। আবার এই জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই চূড়ান্ত

সার্বভৌমিকতা বিভক্ত হইলে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়ে

ক্ষমতাকে যদি বিভক্ত করা হয়, তবে জনসমাজও ঐক্যবদ্ধ হইবে না। সার্বভৌমিকতার বিভক্তীকরণের অর্থ সার্বভৌমিকতার বিলোপ সাধন করা। প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিচারের জন্য একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে। কিন্তু বহু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিলে চূড়ান্ত বিচারের ক্ষমতা কাহারও হস্তে থাকিতে পারে না। আবার কতকগুলি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা বিভক্ত হইতে পারে না। কারণ চূড়ান্ত ক্ষমতার অর্থ শেষ কথাটি বলিবার ক্ষমতা। এই শেষ কথাটি বলিবার ক্ষমতা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের থাকিতে পারে।

অবশ্য দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এবং একই সরকারের বিভিন্ন অংশ সার্বভৌম শক্তি ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু একটি কথা এখানে স্মরণ করা দরকার যে, শাসন-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সম্মতিক্রমে যদি সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাগ করা হয়, তবে ইহাকে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভক্তীকরণ বলা চলে না। ইহা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রয়োগক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতার বণ্টনমাত্র।

সার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতা সম্পর্কে বর্তমানে তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বহু পরিমাণে বিভক্ত হইয়াছে। আবার সোভিয়েত রুশিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায়ও সার্বভৌমিকতা বিভাজ্য হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

পঞ্চমতঃ, অহস্তান্তরযোগ্যতা (Intransferability or inalienability)। সার্বভৌমিকতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত করা যায় না। মানুষ যেমন তাহার প্রাণকে হস্তান্তরিত করিয়া বাঁচিতে পারে না, রাষ্ট্রও তেমনি তাহার সার্বভৌমিকতা হস্তান্তর করিয়া বাঁচিতে পারে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা হস্তান্তর করার অর্থ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। সার্বভৌমিকতা ব্যতীত রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারত যখন ইংরেজের অধীনে ছিল তখন তাহার সার্বভৌমিকতা ইংরেজের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ভারত তখন তাহার রাষ্ট্রিক বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ইংরেজের উপনিবেশে পরিণত হইল। অবশ্য, ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারীর পরিবর্তন হইলে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকারের পরিবর্তে যদি অপর কোন দলের সরকার গঠিত হয় তবে সার্বভৌমিকতার ব্যবহারকারীর পরিবর্তন হইবে, কিন্তু সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত হইবে না। ইহার অর্থ সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত। রাষ্ট্র তাহার সার্বভৌমিকতা লইয়া ঠিকই অবস্থান করিতেছে। শুধু শাসনভার একদল লোকের হাত হইতে অপরদল লোকের হাতে হস্তান্তরিত হয় বা সার্বভৌমিকতার ব্যবহার একদল লোকের পরিবর্তে অপরদল করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা সার্বভৌমিকতার হস্তান্তর বুঝায় না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সার্বভৌমিকতার হস্তান্তর লইয়া অনেক আলোচনা হয়। রাজতন্ত্রের সমর্থক হব্স্ প্রমুখ চিন্তাবীর এই মত পোষণ করেন যে, প্রথমে সার্বভৌমিকতা জনগণের হস্তেই ছিল, কিন্তু পরে উহা রাজার হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে এবং সার্বভৌমিকতাকে রাজার হস্ত হইতে কোনমতেই জনগণের হস্তে পুনর্হস্তান্তর করা যায় না। আবার জনগণের প্রাধান্যের যাঁহারা সমর্থক তাঁহারা এই মত প্রকাশ করিতে শুরু করেন যে, জনগণ একবার রাজাকে সার্বভৌমিকতা ব্যবহার করিবার জন্য অস্থায়িভাবে সার্বভৌমিকতা অর্পণ করিয়াছিল কিন্তু তাই বলিয়া চিরকালের জন্য জনসাধারণ রাজাকে ইহা ব্যবহার করিতে দেয় নাই। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক গার্ণার বলেন: "এই বিতর্কের মূল্য যাহাই হউক না কেন, বর্তমানে আইনবিদ্গণ ইহাই প্রচার করেন যে, সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরযোগ্য নহে।"

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা হস্তান্তর করার অর্থ রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করা।

পরিশেষে উইলোবির (Willoughby) মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা গেল। তিনি বলেন: "একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুইটি ইচ্ছা, দুই-ই চূড়ান্ত যে হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের চরম ইচ্ছা খণ্ডিত হইতে না পারিলেও, ঐ ইচ্ছা একাধিক আইন-প্রণয়নকারী সভা হইতে প্রকাশিত হইতে পারে এবং

তাহার আজ্ঞাকে কার্যকরী করিবার ভারও বহুতর কর্ম-সম্পাদনী বিভাগের উপর ন্যস্ত হইতে পারে।*

প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে যাহা হয় তাহা হইল শাসন-ব্যবস্থার বিভাজন। শাসন-ক্ষমতা বিভাজনের সহিত সার্বভৌমিকতা খণ্ডনের প্রশ্নকে জড়াইয়া দেখা উচিত নহে। জেলিনেকও একস্থানে বলিয়াছেন যে, আসলে যাহা ভাগ করা হয় তাহা হইল সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয় ও পদ্ধতি। রুশো ও ক্যালহুণ অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ (Different forms of Sovereignty): রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করিয়াছেন। আবার সার্বভৌমিকতার অবস্থান সম্বন্ধেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ফলে বর্তমানে 'সার্বভৌমিকতা' বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেহ কেহ আবার সার্বভৌমিকতার এই বিভিন্ন রূপকে সার্বভৌমিকতার এক একটি ধরন বলিয়া মনে করেন। নিম্নে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত সার্বভৌমিকতার আলোচনা করা গেল:

(১) নামসর্বস্ব বা উপাধিসূচক সার্বভৌমিকতা (Titular Sovereignty): নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় এমন সার্বভৌমিকতা যাহা নামেই শুধু সার্বভৌম কিন্তু কার্যতঃ ইহা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নহে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ইংলণ্ডের রাণী নামসর্বস্ব সার্বভৌমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ইংল্যাণ্ডের রাণীকে সার্বভৌম বলিয়াই অভিহিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নামেমাত্র সার্বভৌম। কারণ তিনি রাজত্ব করেন বটে, কিন্তু শাসন করেন না। ইংল্যাণ্ডে শাসন করে পার্লামেণ্টের নিকটে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিমণ্ডলীই প্রকৃত সার্বভৌমিকতাকে ব্যবহার করে। আবার সার্বভৌমিকতা আইনগত এবং আইনের চক্ষে পার্লামেণ্ট সার্বভৌম। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকৃত ক্ষমতা যাঁহার বা যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদিগকে সার্বভৌম না বলিয়া অপর একজনকে সার্বভৌম হিসাবে দাঁড় করানো হইয়াছে। সকল শাসনকার্য তাঁহার নামে হয়। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী তিনি নন। নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতার ইহাই বিশেষত্ব।

ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী নামসর্বস্ব সার্বভৌম

(২) আইনসম্মত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা (Legal and political Sovereignty): সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনসম্মত। আইনজীবীর চক্ষে সার্বভৌমিকতার যে রূপ তাহাই আইনসম্মত সার্বভৌমিকতা। এককথায় বলা যায়, আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতাই আইনসম্মত সার্বভৌমিকতা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে আইনসম্মত সার্বভৌমিকতার অবস্থান হইল সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টিতে যিনি বা যাঁহারা রাষ্ট্রের চরমতম আজ্ঞাকে আইনরূপে ঘোষণা করিতে

---

* "That there cannot be in the same being two wills, each supreme is obvious. But thought the sovereign will of the State may not be divided, it may find expression through several mouthpieces, and the execution of the commands may be delegated to a variety of governmental organs."—*Willoughby*.

সক্ষম। এই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা হইবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা কোন নৈতিক সূত্র ধর্মীয় বাধা-নিষেধ এবং জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। আইনজীবী ও বিচারকগণ শুধু এই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাকেই মান্য করেন। আদালতে অন্য কোন আইনকে সাধারণতঃ মান্য করা হয় না। অতএব যে সার্বভৌমিকতা আইনসঙ্গত নহে তাহা আইনের দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন। এই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন অস্টিন (Austin)। তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা-সহ পার্লামেণ্টের মধ্যে সার্বভৌমিকতার সন্ধান খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। রাজা-সহ পার্লামেণ্টেই ইংল্যাণ্ডে চরম আইন প্রণয়নের অধিকারী।

আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা

আবার রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং এই ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার দায়িত্ব কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর আইনসঙ্গতভাবে অর্পিত থাকিতে হইবে। অন্যথায় পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছার সংঘাতে আইন লুপ্ত হইবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে আইনেরও একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায় যে, সার্বভৌমের আজ্ঞাকেই বলে আইন (Law is the command of the Sovereignty)।

আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার চরম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা শুধু একটি আইনের অবাস্তব কল্পনা মাত্র। এই ক্ষমতা ব্যক্ত হয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে। আবার যে ব্যক্তিবর্গের উপর এই চরম, অপ্রতিহত ক্ষমতাকে ব্যক্ত করার দায়িত্ব অর্পিত হয় তিনি বা তাঁহারাও যদৃচ্ছা এই সার্বভৌমিকতার ব্যবহার করিতে পারেন না। অতএব আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার পশ্চাতে যে আর এক প্রকারের সার্বভৌমিকতা রহিয়াছে তাহার সন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। ডাইসি বলেন: "আইনবিদ্ যাহাকে সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করেন তাহার পশ্চাতে আরও একটি সার্বভৌম আছে যাহাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকে নিশ্চিতভাবে প্রণতি জানাইতে হয়।"*

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব

ডাঃ গার্ণারও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়া বলেন, "আইনসঙ্গত সার্বভৌমের পশ্চাতে আরও এক শক্তি দণ্ডায়মান, যাহাকে আইন স্বীকার করে না, যাহা অসংগঠিত আইনসিদ্ধ অনুজ্ঞার আকৃতিতে রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম, তথাপি সে শক্তির নির্দেশের সম্মুখে প্রকৃতপক্ষে আইনসঙ্গত সার্বভৌমকে মাথা নত করিতে হয়, যাহার ইচ্ছা রাষ্ট্রে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকিবে।†

ডাইসির ভাষায়: "সেই জনসমষ্টিই হইল রাষ্ট্রনীতিগত সার্বভৌম, যাহার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নাগরিকগণ মান্য করিয়া চলে।**

* "Behind the sovereign which the lawyer recognises, there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow."—*Dicey*.

† "Behind the legal sovereign is another power, legally unknown, unrecognised, and incapable of expressing the will of the State in the form of legal command, yet withhold a power to whose mandates the legal sovereign will in practice bow and whose will must ultimately prevail in the State." —*Garner*.

** "That body is politically sovereign the will which is ultimately obeyed by the citizens of the State"—*Dicey*.

এই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝা যায় ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ হইতে। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের আইনসঙ্গত ক্ষমতা অসীম। ডাইসির মতে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট শিশুকে বয়ঃপ্রাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, মৃত ব্যক্তিকে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারে, অবৈধ সন্তানকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে; আবার উপযুক্ত মনে করিলে কোন মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারে। এই পার্লামেণ্টের আইনকে অমান্য করার বা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করার অধিকার কাহারও নাই। কিন্তু পার্লামেণ্টের এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ পার্লামেণ্ট আবার নির্বাচকমণ্ডলীকে অসন্তুষ্ট করিতে পারে না। নির্বাচনের পূর্বে প্রত্যেক নির্বাচন-প্রার্থীকেই নিজ নিজ কেন্দ্রের নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট প্রতিশ্রুতি পত্র পেশ করিতে হয়। পার্লামেণ্টের সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার পর তাহাকে সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করিতে হয়। কারণ, একবার যদি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তবে পরবর্তী নির্বাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলী তাহাকে আর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করিবে না। অন্ততঃ ভবিষ্যতে নির্বাচিত না হইবার ভয়েও পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিগণ এমন আইন প্রণয়ন করিবেন না যাহা নির্বাচকমণ্ডলীর অসন্তোষের কারণ হইবে। অতএব আইনসঙ্গত সার্বভৌমকে এই নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট মাথা নত করিতে হয়। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে এই নির্বাচকমণ্ডলীই রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিক। এই রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়। এই কারণেই, ইংল্যাণ্ডে রাজা-সহ পার্লামেণ্ট যে-কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না যাহা নাগরিককে পরস্পরের সর্বস্ব অপহরণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে।

পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বাস্তবে সীমাবদ্ধ

আবার রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সকলে একমত পোষণ করেন না। কেহ কেহ জনমতকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলিয়া আখ্যায়িত করেন। আবার কেহ কেহ নির্বাচকগণের মতকেই রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলিয়া গ্রহণ করেন। আবার অনেক সময় ইহাকে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনের প্রভাব বলিয়া ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে জনমতগঠনকারী বিভিন্ন প্রভাব এবং নির্বাচকগণকে সংযুক্তভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সার্বভৌম প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। তথাপি ইহার ইচ্ছানুসারেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় কারণ নির্বাচকমণ্ডলী আশা করিবে, দাবি করিবে যে ভোটের মাধ্যমে তাহাদের যে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে, যে প্রতিশ্রুতির জন্য তাহার প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছে, তাহাই পার্লামেণ্টের সদস্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইবে। এই শক্তির নিকট আইন প্রণেতা পার্লামেণ্টের সদস্যগণ প্রণতি জানায়। অধ্যাপক রিচি, গেটেল প্রভৃতির ধারণায় আইনসঙ্গত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণই সুশাসনের প্রধান সমস্যা।*

রাষ্ট্রনৈতিক ও আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার সম্পর্ক

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে কেহ কেহ রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা ও আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা—এই দুইভাগে সার্বভৌমিকতাকে বিভক্ত করেন; কিন্তু, বিষয়টিকে

* "This problem of good government is largely the problem of the proper relation between the legal and ultimate political sovereignty."

তাঁহারা ভুলভাবে আলোচনা করেন। কারণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা একটিই। তাহার প্রকাশের মাধ্যম দ্বিবিধ হইতে পারে।

আবার প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে যাঁহারা নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহারাই যেহেতু আইন প্রণয়ন করেন, সেইজন্য আইনসঙ্গত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধনের কোন সমস্যাই নাই। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বিশেষ কোথাও প্রবর্তিত নাই। ফলে সার্বভৌমিকতার এই দুইটি প্রকাশের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সমস্যা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য, সার্বভৌমিকতার এই দুইটি রূপের মধ্যে সংঘাত বাধিলে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাই জয়লাভ করিবে। কারণ, আদালত শুধু আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাকেই স্বীকার করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ সার্বভৌম-প্রণীত আইনেরও বিরোধিতা করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। ল্যাস্কি বলেন: "আইনকে মান্য করাই মানুষের সাধারণ অভ্যাস, কিন্তু ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, মানুষ প্রাণ দিয়াও আইনের বিরোধিতা করিয়াছে।* সামাজিক প্রথাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া এবং জনসাধারণের দাবিকে অস্বীকার করিয়া জনমতের বিরুদ্ধে যখন আইন প্রণীত হয় তখন বিপ্লবও সংঘটিত হইতে পারে। এই বিপ্লবের ফলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ আইনসঙ্গত সার্বভৌম-রূপে গণ্য হয় তাহার ক্ষমতার অবসান হইতে পারে। তাই আইনসঙ্গত সার্বভৌমকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য অতিশয় সীমাবদ্ধ

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা একটিই এবং উহা আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা। কিন্তু এই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা এককভাবে, যদৃচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। সাধারণের ইচ্ছার (General will) প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাকে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার পশ্চাতে সতর্ক দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে জনমত ও সাধারণের ইচ্ছা। সার্বভৌমিকতার এই রাষ্ট্রনৈতিক দিককে সার্বভৌমিকতা না বলিয়া একটি বিশেষ প্রভাব হিসাবেও ধরা যাইতে পারে। এই প্রভাব বিভিন্ন দিক হইতে আসিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিত্তবানদের চাপ (Pressure Group), সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির চাপ (Pressure of the Communist Party), গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের দাবি ও আন্দোলন অনেক সময় আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাকে বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করে। এইজন্য রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে একটি পৃথক সার্বভৌমিকতা হিসাবে না ধরিয়া ইহাকে সার্বভৌমিকতার একটি দ্বিবিধ প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে সার্বভৌমিকতার একটি দ্বিবিধ প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা উচিত

(২) আইনসিদ্ধ ও বাস্তব সার্বভৌমিকতা (*De Jure and De Facto Sovereignty*): রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আইনসিদ্ধ ও বাস্তব সার্ব-

* "Obedience is the normal habit of mankind, but marginal cases continually recur in history when decision to disobey is painfully taken and passionately defended."—*Laski, State in Theory and Practice.*

ভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। আইনসিদ্ধ সার্বভৌমিকতা হইল আইন-সঙ্গত সার্বভৌমিকতা। আইনই এই সার্বভৌমিকতার ভিত্তি। আইনসিদ্ধ সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য হইল ইহা আইনসঙ্গতভাবে আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা। আইনানুসারে এই সার্বভৌমিকতার প্রতিই লোকের আনুগত্য স্বীকার করিবার কথা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, বৈদেশিকদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া স্বদেশের আইনসিদ্ধ সার্বভৌমকে অন্যদেশে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আইন-সঙ্গত ভাবে ইঁহাদের নির্দেশই বাধ্যতামূলক হইবার কথা. কিন্তু বাস্তবপক্ষে দেশ শাসন করিতেছে অপরে এবং তাহাদের নির্দেশই বাধ্যতামূলকভাবে চালু হইতেছে। এরূপক্ষেত্রে বৈদেশিকদের আইন কার্যকরী হয় বলিয়া এবং তাহাদের প্রতি জনসাধারণ আনুগত্য স্বীকার করে বলিয়া তাহাদিগকেই বাস্তব সার্বভৌম (*De Facto*) বলিয়া অভ্যায়িত করা হয়।

আবার অন্তর্বিপ্লবের ফলে জনসাধারণ পূর্বেকার ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি, যাঁহারা আইনসিদ্ধ সার্বভৌমিকতাকে ব্যবহার করিতেন তাঁহারা বা তাঁহাদের আদেশকে মান্য নাও করিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি পদচ্যুত না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বা তাঁহারাই আইন-সঙ্গত সার্বভৌম। কিন্তু অন্তর্বিপ্লবের সময় জন-সাধারণ প্রকৃতপক্ষে এই আইনসঙ্গত ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আদেশ পালন না করিয়া বিপ্লবী সরকারের আদেশও পালন করিতে পারে। এই সময়ে এই বিপ্লবী সরকারই প্রকৃতপক্ষে বাস্তব সার্বভৌম।

যুদ্ধ ও অন্তর্বিপ্লবের সময় এই বাস্তব ও আইনসিদ্ধ সার্বভৌমিকতা প্রকাশিত হয়

চীনের উদাহরণ হইতে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাইশেককেই আইনসিদ্ধ সার্বভৌম হিসাবে গণ্য করিত, যদিও চীনের কম্যুনিস্ট সরকার চিয়াং কাইশেককে চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে ও জাতিপুঞ্জের নিকট চীনের আইনসঙ্গত সার্বভৌম ছিল চিয়াং কাইশেকের সরকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীন শাসিত হইতেছে মাও সে তুং-এর কম্যুনিস্টদের দ্বারা। ফলে এই কম্যুনিস্ট সরকারকে বাস্তব সার্বভৌম হিসাবে ধরা যায়। বর্তমানে অবশ্য, কম্যুনিস্ট চীনও আইনসিদ্ধ সার্বভৌম।

আবার বাস্তব সার্বভৌমিক যদি বেশীদিন ক্ষমতার আসনে আসীন থাকে তবে জনসম্মতির ভিত্তিতে উহা পরে আইনসিদ্ধ সার্বভৌম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যেমন বিপ্লবী সরকার সামরিক ও শাসনগত শক্তির দ্বারা প্রথমে জনসাধারণের বশ্যতা আদায় করিয়া পরে ধীরে ধীরে অধিবাসীদের স্বাভাবিক বশ্যতা ও তাহাদের সম্মতি লাভ করিয়া আইনসঙ্গত সার্বভৌম হিসাবে অভিহিত হইতে পারে। চীনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বিপ্লবের গোড়ার দিকে হয় তো কম্যুনিস্ট সরকার বাস্তব সার্বভৌম ছিল কিন্তু আইনসঙ্গত সার্বভৌম ছিল না। কিন্তু এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে জনসাধারণের সাধারণ সম্মতি পাইয়া আইনসঙ্গত সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। বহু বৈদেশিক রাষ্ট্রও এই কম্যুনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতি দান করিয়া আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইতে সহায়তা করিয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিপুঞ্জও চীনকে শেষপর্যন্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

বাস্তব সার্বভৌমিকতা জনসম্মতি লাভ করিয়া আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতায় পরিণত হইতে পারে

আবার বাস্তব সার্বভৌমিক অনেক সময় জনসমর্থন প্রমাণ করিবার জন্য নির্বাচন

বা অন্য কোন আইনসিদ্ধ পদ্ধতির মারফত তাহার শাসন-ব্যবস্থাকে আইনের মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া যথাযোগ্য স্বীকৃতি আদায় করে। কারণ শাসনব্যবস্থার মূলকে দৃঢ় করিতে হইলে প্রয়োজন আইনসিদ্ধ হওয়া এবং জনসাধারণের সম্মতি লাভ করা। এই প্রসঙ্গে লর্ড ব্রাইস বলেন: "যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ আইনসঙ্গতভাবেই হউক আর আইন-বিরুদ্ধভাবেই হউক নিজের বা নিজেদের চূড়ান্ত ইচ্ছা কার্যকর করিতে পারেন, তিনি বা তাঁহারা হইলেন বাস্তব সার্বভৌম।"

উপসংহারে বলা যায় যে, সার্বভৌমিকতার বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নিরূপণকালে সাময়িকভাবে সার্বভৌমিকতার ব্যবহারকারীকে সার্বভৌম বলিয়া আখ্যায়িত করা সমীচীন নহে। অন্তর্বিপ্লব বা বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে সার্বভৌমিকতার ব্যবহার বিভিন্ন শক্তি করিয়া থাকিলেও, সার্বভৌমিকতা হইল আইনগত। আইনসঙ্গতভাবে যখন সে শক্তি স্বীকৃত হইবে তখনই সে সার্বভৌম। সরকারের রদবদলের মাধ্যমে সার্বভৌমিকতার ব্যবহারকারীদিগের পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু উহা একক ও আইনানুমোদিত। বাস্তব সার্বভৌমিকতা আইনসঙ্গত নয়। অতএব ইহাকে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞাভুক্ত করা সমীচীন নহে। অবশ্য, এই বাস্তব সার্বভৌমিকতা পরে আইনানুমোদিত হইতে পারে। কিন্তু যখন উহা আইনানুমোদিত হইবে তখনই উহা সার্বভৌম, অন্য সময় নহে। তাই বাস্তব সার্বভৌমিকতাকে পরে আইনসিদ্ধ হইতে হয় নির্বাচনের মাধ্যমে।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে গেটেলের ধারণা

সর্বশেষে গেটেলের উক্তিটি এখানে উল্লেখ করা গেল: "আইনসঙ্গত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ না করিয়া আইনানুমোদিত ও বাস্তব সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত"।* গেটেল আবার এই মত পোষণ করেন যে, "আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাই একমাত্র সার্বভৌমিকতা, কারণ, বাস্তব সার্বভৌমিকতা সার্বভৌমিকতা বলিয়া স্বীকৃত হয় না, যতক্ষণ না উহা আইনসিদ্ধ হয়। বে-আইনী সার্বভৌমিকতা সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা বিরুদ্ধ।"† বাস্তব সার্বভৌমিকতা হইল সার্বভৌমিকতার আইনসিদ্ধ হইবার পূর্বেকার একটি স্তর বিশেষ। এই পূর্বেকার স্তরকে সার্বভৌমিকতা না বলিয়া ইহাকে একটি বিপ্লবী সরকার হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯১৭ সালের রুশদের বিপ্লবী সরকার, চীনের অন্তর্বিপ্লবী সরকার, মিশরের সামরিক কর্তৃপক্ষের বিপ্লবী সরকার, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলির বিদ্রোহী সরকার, মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অধিকারকালের সরকার, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সরকার। আবার বিপ্লবের সময় যে সরকার গঠিত হয়, সে সরকার যে পরাজিত হইবে না, এমন কথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অতএব বিপ্লবী সরকারকে কোন প্রকার সার্বভৌমিকতার বিশেষণ দেওয়া সমীচীন নহে।

* "While the terms "defacto and de jure" are usually applied to sovereignty, it would be more strictly scientific if they were applied to Government."
—*R. G. Gettel.*

† "The *de jure* sovereignty alone is sovereign in this sense and the so-called *de facto* sovereignty does not become sovereignty until it becomes *de jure*. An unlawful sovereignty is a contradiction in terms."—*R. G. Gettel.*

(৪) **জাতীয় সার্বভৌমিকতা (National Sovereignty)** : জাতীয় সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে ফরাসী চিন্তাধারায়। বেলজিয়াম, চিলি ও ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রে ঘোষিত হয় যে, জাতিই হইল সর্বপ্রকার সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে মানুষের অধিকারের ঘোষণায় (Declaration of the Rights of man) বলা হয় যে, "জাতিই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস।" এই ঘোষণা হইতে দুইটি বিষয় পরিষ্কার হয়, যথা—(১) রাজার অবাধ ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়; ২) 'জাতিসত্তা' বলিতে যে বিমূর্ত ধারণা বুঝায় তাহাই সার্বভৌমিকতার আবাসস্থল।

জাতীয় সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা

বলা হইয়াছে যে, সমগ্র দেশের জনসমষ্টির মধ্যে সার্বভৌমিকতা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতে পারে না। এই তত্ত্বের দ্বারা জাতীয় ঐক্যের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয় এবং জাতীয়তার প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়। অবশ্য, সমালোচকগণ বলেন যে, জাতীয়তাবোধ একটি কল্পনা। বিমূর্ত কল্পনার মধ্যে সার্বভৌমিকতা কখনও বাসা বাঁধিতে পারে না, কল্পনা আইন প্রণয়ন করিতেও পারে না। অতএব এই তত্ত্ব মৌলিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে না।

(৫) **জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty)** : জনগণের সার্বভৌমিকতার অর্থ হইল চরম, অপ্রতিহত ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। রাষ্ট্রের সব-কিছুর অধিকারী হইল জনসমষ্টি। এই জনগণই যে প্রকৃত সকল ক্ষমতার অধিকারী তাহা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই রাজতন্ত্রের বিরোধী ইউরোপের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ প্রচার করিতে শুরু করেন। প্রাচীন রোমেও এই ধারণা বর্তমান ছিল। জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণার আধুনিক রূপ প্রকাশ পায় চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের ফলে। জনগণের সার্বভৌমিকতার সমর্থকগণের যুক্তি হইল প্রথমে সার্বভৌমিকতা জনগণেরই ছিল এবং এই সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া ইহা রাজার হস্তে হস্তান্তরিত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার লেখক জেফারসন (Jefferson) ও রুশোর কণ্ঠে তূর্যধ্বনির ন্যায় ধ্বনিত হইল : সমষ্টিগত ইচ্ছার (General will) আহ্বান। সাধারণ মানুষের চুক্তির মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। রাষ্ট্রের এই চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া যায় "সমষ্টিগত ইচ্ছার" মধ্যে এবং জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়াই এই ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী জনগণ

রুশোর এই বাণী দেশ হইতে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ফরাসীদেশ ও আমেরিকায় যে দুইটি বিপ্লব সংগঠিত হয় তাহাদের তত্ত্বগত যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করিল জনগণের সার্বভৌমিকতার আদর্শ। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় (Declaration of Independence) লেখা হইল : "মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলি শাসিতদের সম্মতি হইতেই তাহাদের ন্যায্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।" ১৭৯২ সালে ফরাসী আইনসভা ঘোষণা করিল : "এমন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের শাসন নিশ্চিত হয়।" সেই ঘোষণার কাল হইতে আজ পর্যন্ত লর্ড ব্রাইসের ভাষায় এই তত্ত্ব হইল : গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র ("The basis and watchword of

democracy")। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। যেমন, জনতার ইচ্ছা বুঝা যাইবে কেমন করিয়া? তাহাদের ইচ্ছা প্রকাশের পদ্ধতিই বা কি এবং সকলের একমত হওয়া কি সম্ভব? এই প্রশ্নগুলির উত্তরদান প্রসঙ্গে ডঃ গার্ণার বলেন: "যে দেশে মোটামুটি সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রচলিত আছে; যেখানে বেশীসংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী আইনসিদ্ধ পদ্ধতিতে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করে ও তাহার প্রাধান্য নিশ্চিত করে সেখানেই জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা কার্যকরী হইল বুঝিতে হইবে।*

সমালোচনা: লর্ড ব্রাইস এই মন্তব্য করেন যে, জনগণের সার্বভৌমিকতা যে গণতন্ত্রের ভিত্তি তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জনগণের সার্বভৌমিকতা কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ফলে ইহাকে মতবাদের রূপ দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। ডঃ গার্ণার এই মন্তব্য করেন যে, বিভিন্ন লেখক 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' বিভিন্নভাবে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করায় ধারণার বিশেষ অস্পষ্টতা ও অনির্দিষ্টতারও সৃষ্টি হইয়াছে। আবার যাঁহারা বলেন সার্বভৌমিকতা জনগণের, তাঁহারা 'জনগণ' বলিতে কি বুঝেন, তাহা অধিকাংশ সময় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না।

জনগণের সার্বভৌমিকতার অর্থ অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট

জনগণ বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রাধীন সমগ্র অনির্দিষ্ট জনসাধারণ। এই অনির্দিষ্ট জনসাধারণের মতামতও অসংগঠিত। ফলে এই জনমত সার্বভৌম শক্তি ব্যবহার করিতে পারে না। জনমতকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলা যাইতে পারে কিন্তু ইহাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার মর্যাদা দেওয়া যায় না।

জনমত আর আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা এক নহে

জনগণের বিপ্লবের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং বিপ্লবের দ্বারা সরকারের পরিবর্তনের ক্ষমতাকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার সমপর্যায়ে ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে কখনও আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা বলা যায় না। কারণ, বিপ্লব কখনই আইনসঙ্গত নহে, কিন্তু সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণাই আইনগত!

আবার জনগণের মধ্যে যে অংশ ভোটাধিকার পায় তাহাদিগকেই শুধু সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা হয়। এই ভোটাধিকারিগণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে তাহাদের ইচ্ছাকে আইনের রূপদান করিয়া চূড়ান্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই ভোটাধিকারীকে সার্বভৌম বলিয়া ধরিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ভোটাধিকারিগণের ক্ষমতাও জনগণের সার্বভৌমিকতা নহে। কারণ, সমগ্র দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকও হয়তো

*"The sovereignty of the people, therefore, can mean nothing more than the power of the majority of the electorate, in a country where a system of approximate universal suffrage previals, acting through leagally established channels, to express their will and to make it prevail."—*Garner*.

ভোটাধিকার পায় না। ফলে ভোটাধিকারিগণ সমগ্র দেশের জনমতের অভিব্যক্তি দান করিতে পারে না। আবার দলপ্রথা থাকার ফলে সকল ভোটাধিকারীর নির্বাচিত প্রতিনিধিই আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে না। আইন প্রণয়নে সংখ্যালঘিষ্ঠদের মতামত আর গ্রহণযোগ্য নয় বলিলেই চলে। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিগণই আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে। অতএব এই সংখ্যাগরিষ্ঠদলের প্রতিনিধিদের নির্বাচকমণ্ডলীকেই সার্বভৌম শক্তির আধার বলা যাইতে পারে। গেটেল এই মত পোষণ করেন যে, এই শ্রেণীর নির্বাচকগণ জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। অতএব সার্বভৌমিকতা যদি জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হয় তবে তাহাকে আংশিক সার্বভৌমিকতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ সার্বভৌমিকতা কোনপ্রকারেই বলা যাইতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভোটাধিকারীর ক্ষমতা ও জনগণের সার্বভৌমিকতা নহে বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন

উপসংহারে বলা যায়, "জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণাটি বিশেষ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হইলেও ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। জনগণের মতামতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন শাসনযন্ত্রই শাসনকার্য চালাইতে পারে না। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হইল জনমত। তাই জনগণের মতামতকে ব্যক্ত করার সকল সুবিধা বর্তমানের গণতান্ত্রিক সরকার দিয়া থাকে। আবার জনমত যাহাতে শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হয়। জনসাধারণের ইচ্ছাকে রূপ দিবার জন্য গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থাগুলির দ্বারা জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। গিলক্রাইস্ট বলেন: "জনগণের সার্বভৌমিকতা বলিতে এই নিয়ন্ত্রণকেই বুঝানো হয়" ("The phrase 'popular control' better indicates the idea underlying 'popular sovereignty". — *Gilchrist*)। এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাগুলিই জনগণের সার্বভৌমিকতার ব্যবহারিক রূপ। আবার লিখিত শাসনতন্ত্র, ব্যাপক ভোটাধিকার, স্বায়ত্তশাসন, পার্লামেন্টের নিকট সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি স্বীকৃত হওয়ায় গণতন্ত্র এক বাস্তব রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং জনগণের সার্বভৌমিকতার ব্যবহারও অনেক পরিমাণে সম্ভবপর হইয়াছে। বর্তমান পৃথিবীতে গণতন্ত্রের বিজয় ঘোষিত হওয়ায় জনগণের সার্বভৌমিকতা এক বিরাট শক্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

ভোটাধিকারিগণের ক্ষমতাকে যদিও সার্বভৌমিকতার পর্যায়ভুক্ত করা হয় না, তথাপি ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে

(৬) রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ব্যক্তিগত না স্থানগত (State sovereignty personal or territorial): রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা। এখানে একটি প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে এই ক্ষমতা স্থান নির্বিচারে ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য না ব্যক্তি নির্বিচারে নির্দিষ্ট ভূভাগের উপর প্রযোজ্য? এক্ষণে সার্বভৌমিকতা যদি ব্যক্তিবাচক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত নাগরিক ও বিদেশে অবস্থিত নাগরিকের উপর সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। আবার সার্বভৌম ক্ষমতাকে যদি স্থানবাচক (territorial) বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিক ও বিদেশীর উপর

তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পাবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির উপরই রাষ্ট্র তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তাহার সীমানা অতিক্রম করিয়া অপর রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নষ্ট হয়। কিন্তু এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নির্দিষ্ট ভূভাগে সীমাবদ্ধ থাকিলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, কোন দেশের রাষ্ট্রদূত যখন অন্য দেশে বাস করেন তখন উক্ত রাষ্ট্রদূতের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রযোজ্য হয় না। রাষ্ট্রদূত তাঁহার স্বদেশের সার্বভৌমিকতার অধীন। সাময়িকভাবে ভিন্ন দেশে বাস করিলেও, তিনি অপর দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন নহেন।

রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ

বর্তমানে ব্যক্তিবাচক সার্বভৌমিকতাও অচল হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে ইংল্যাণ্ডের একজন নাগরিক চীনে বাস করিলে, তাহার চীনে অবস্থান করার কালে কোন অপরাধের বিচার হইত ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে এবং ইংলণ্ডের বিচারকের দ্বারা। এইভাবে ইংল্যাণ্ডের আইন ইংল্যাণ্ডের বাহিরে ভিন্ন রাষ্ট্র চীনদেশে কার্যকরী করা হইত। বর্তমানে এই ভৌম-অধিকার-বহির্ভূত ক্ষমতার (**Extra territorial jurisdiction**) অবসান করা হইয়াছে। অবশ্য বর্তমানেও দেখা যায়, রক্তের সম্বন্ধে সম্পর্কিতের অধিকার (**Jus Sanguinis**) বলে এক রাষ্ট্র অপর দেশে জাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজ নাগরিক বলিয়া দাবি করে। এই দাবি সার্বভৌম ক্ষমতায় ব্যক্তি-বাচক সংজ্ঞার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে।

ব্যক্তিবাচক সার্বভৌমিকতা বর্তমানে সীমিত হইয়াছে

(৭) **রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা (External Sovereignty) :** রাষ্ট্রের বহিঃস্থ সার্বভৌমিকতার অর্থ আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র স্বাধীন। অর্থাৎ অপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা কর্তৃক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা নিয়ন্ত্রিত হইবে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার অর্থ আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা। ইহা আবার রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমিকতা যদি অপর কোন দেশের সার্বভৌমিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র তাহার চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে গেটেল প্রমুখ লেখক এই মত পোষণ করেন যে, সার্বভৌমিকতা মূলতঃ আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা। আর বহিঃস্থ সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রের স্বাধীনতারূপে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সার্বভৌমিকতাকে আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা এবং বহিঃস্থ সার্বভৌমিকতাকে স্বাধীনতা বলিয়া গ্রহণ করিলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতার অর্থ স্বাধীনতা

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদ (Austinian Theory of Sovereignty) : সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে বহু লেখক আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল লেখকের মধ্যে ইংরেজ আইনজ্ঞ দার্শনিক অস্টিন (John Austin) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অস্টিন ছিলেন আইনবিদ্। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল আইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী। ১৮৩২ সালে অস্টিনের আইনশাস্ত্রের উপর বক্তৃতা (Lectures on Jurisprudence) নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেই

অস্টিন তাঁহার আইন ও সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে নিজস্ব মত প্রকাশ করেন। অস্টিন তাঁহার সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ পরিস্ফুটনে হবস্ (Hobbes) ও হিতবাদী বেন্থাম (Jeremy Benthem) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অস্টিন বেন্থামকে অনুসরণ করিয়া আইন ও প্রথার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছিলেন। অস্টিন এই মত পোষণ করিতেন যে, আইন হইল সার্বভৌমের আজ্ঞা বিশেষ (Law is the command of the Sovereign)। আইনের সহিত নৈতিক সূত্রের কোন সংস্রব নাই। রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম শক্তির ক্ষমতাই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত। আইনকে অধস্তনের প্রতি ঊর্ধ্বতনের আজ্ঞা হিসাবে বর্ণনা করিয়া তিনি একটিমাত্র উৎসের নির্দেশ দিয়াছেন। আইন সম্বন্ধে অস্টিনের এই ধারণা হইতেই তাঁহার সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটন হয়। অস্টিন সার্বভৌমিকতার ধারণা এইভাবে নিরূপণ করিলেন : "যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কোন বিশেষ সমাজের অভ্যস্ত আনুগত্য লাভ করিতে থাকেন, অথচ সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি সমপর্যায়ভুক্ত অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করেন, তবে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি উক্ত সমাজের সার্বভৌম এবং উক্ত সার্বভৌম-সম্বলিত সমাজ একটি স্বাধীন ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ।"*

আইন হইল সার্বভৌমের আজ্ঞাবিশেষ

অস্টিনের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে সার্বভৌমিকতার যে সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য :

(ক) এই সার্বভৌম হইল সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। ইহা হইল কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ। ইহা জনসাধারণের মতো অনির্দিষ্ট বা সাধারণ ইচ্ছার (general will) মতো নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) নহে।

(খ) ইহা প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা ব্যক্তি-সমষ্টির উপর ন্যস্ত থাকে। ফলে এই সার্বভৌম শক্তির নির্দিষ্ট অধিকারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

(গ) ইহার অধিকারীকে অস্টিন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ কাহারও আনুগত্য স্বীকার করে না এবং ইঁহার বা ইঁহাদের ইচ্ছা কোন-কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। অতএব সার্বভৌম ক্ষমতাকে চূড়ান্ত, চরম ও অসীমরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

(ঘ) ইহা নির্ধারিতরূপে সংগঠিত, যথারূপে নির্দিষ্ট ও আইন দ্বারা স্বীকৃত।

(ঙ) সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য। চরম ও অসীম বলিয়া ইহা সর্বপরিব্যাপ্ত। রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও বিষয়ের উপর ইহার অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকারকে বিভক্ত করা যায় না। ইহাকে বিভক্ত করিলে ইহা আর সর্বপরিব্যাপ্ত থাকিবে না।

(চ) জনগণের স্বভাবই ইহার মানদণ্ড। ইহার অর্থ সার্বভৌম শক্তির প্রতি

* "If a determinate human superior, not in a habit of obedience to like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society and the society including the determinate superior is a society political and independent."—*John Austin.*

জনসাধারণ স্বভাবতঃই আনুগত্য স্বীকার করিবে। এই আনুগত্যের দ্বারাই সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হইবে।

(ছ) আইনের ভাষায় রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার একমাত্র অধিকার আছে এই সার্বভৌমের।

(জ) ইহাকে সর্বপ্রকার অধিকারের উৎস হিসাবে ধরা হয়। রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিগণ যে সকল অধিকার ভোগ করে তাহা সার্বভৌমই প্রদান করে।

(ঝ) ইহার আজ্ঞাকে সকলকেই পালন করিতে হইবে। যাহারা পালন করিবে না তাহারা শাস্তিভোগ করিতে বাধ্য।

অধ্যাপক ল্যাস্কি অস্টিনের সার্বভৌমিকতাকে নিম্নলিখিত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার তাৎপর্য নিরূপণ করিয়াছেন ঃ

প্রথমতঃ, অস্টিনের মতানুসারে রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে এক সংগঠিত সংস্থা (a legal order)। এই সংস্থার মধ্যে নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব সমগ্র ক্ষমতার উৎস হিসাবে কার্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমিকতা অসীম ও অপ্রতিহত। অতএব রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অযৌক্তিকভাবে, অন্যায়ভাবে ও অনৈতিকভাবে যদৃচ্ছা কাজ করিতে পারে। রাষ্ট্রের এই কার্যকে কোন আইনানুমোদিতভাবে বাধা দেওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ, সার্বভৌমিকতার আদেশকেই আইন বলা হয়। এই সার্বভৌমিকতার আদেশ পালন করা বাধ্যতামূলক। এই আদেশ পালন না করিলে সার্বভৌমিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

সমালোচনা ঃ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের ধারণা সম্পূর্ণ আইনগত। আইনের দিক ছাড়া, ইতিহাসের দিক হইতে, নৈতিক দিক হইতে, সামাজিক প্রথার দিক হইতে অস্টিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে সমালোচনা করা হইয়াছে। এই সমালোচকদিগের মধ্যে স্যার হেনরী মেইন (Maine), সিজউইক (Sidgwick), ক্লার্ক প্রভৃতির নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই সকল সমালোচকের সমালোচনা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

প্রথমতঃ, হেনরী মেইন এই মন্তব্য করেন যে, সার্বভৌমিকতার অবস্থান কোন নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের মধ্যে নির্দেশ করা যায় না। এইরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌমের উদাহরণ খুব বিরল। আইনানুসারে হয়তো কোন রাজা সমাজজীবনের যে কোন নিয়ম পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে পারিতেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ কোন নিয়ম পদ্ধতির পরিবর্তন কোন রাজা করিতে চাহেন নাই। অবশ্য, ইহা করিতে পারিলে তাঁহাকে অস্টিনের কল্পনা অনুসারে সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা যাইত। অস্টিনের মতে ইংলণ্ডের রাজা (বা রাণী) সহ পার্লামেণ্টের মধ্যে এইরূপ সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু ল্যাস্কি অস্টিনের এই উদাহরণকে স্বীকার করিয়া লইতে রাজী নন। ল্যাস্কি এই ধারণা পোষণ করেন যে, আইনের দিক দিয়া কোন বাধা না থাকিলেও কার্যতঃ কোন পার্লামেণ্ট পরস্পরকে হত্যা করিবার, পরস্পরের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার, ভোটাধিকার কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করিতে

অস্টিনের সার্বভৌমিকতা ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত নয়

পারে না। হেনরী মেইনের যুক্তি হইল সমাজজীবনে এরূপ অসংখ্য প্রভাব কার্য করে যাহা সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকে সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ করে। অস্টিন এই সামাজিক প্রভাবগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন।

ইহা গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে

দ্বিতীয়তঃ, অস্টিনের মতবাদ গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। তিনি আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রের স্বৈর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গণ-সার্বভৌমকে অস্বীকার করিয়াছেন। এই কারণে অস্টিনের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা লইয়া আইনবিদ্‌গণ সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তির নিকট ইহার মূল্য খুব কমই।

তৃতীয়তঃ, স্যার হেনরী মেইনের মতে আইন সম্বন্ধে অস্টিনের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। অস্টিনের মতে সার্বভৌমের আদেশই আইন। কিন্তু বহু প্রথাগত আইন (Customary laws) আছে, যেগুলি কোন সার্বভৌমের আদেশ নহে। আবার অস্টিন যে প্রকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কথা বলিয়াছেন, পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ ছিলেন সেই প্রকার নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সার্বভৌম। কিন্তু রণজিৎ সিংহ কখনও বিভিন্ন প্রথাগত আইন অমান্য করেন নাই বা প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করেন নাই। অবশ্য, হেনরী মেইনের এই সমালোচনার উত্তরে অস্টিন বলেন: "সার্বভৌম যাহা অনুমোদন করেন, তাহাই তাঁহার আদেশ" ("What the Sovereign permits he commands"—*Austin*)। ইহার অর্থ হইল, প্রথাগত আইনগুলি চলিতে দিবার অনুমতি দিয়া তিনি এইগুলিকে আইনে পরিণত হইবার আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু অস্টিনের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে সার্বভৌমের যাইবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই তিনি অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অর্থাৎ, যেখানে কিছু পরিবর্তন করার ক্ষমতা নাই, সেখানে তাহা অনুমোদন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "আইনকে শুধু আদেশ বলিয়া অভিহিত করিলে শালীনতার সীমারেখা অবধি পেঁছাইতে হয়।"* প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বহু প্রথাগত আইন থাকে যাহা রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই বিলোপ সাধন করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন অস্টিন এই প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়, তিনি এইগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি এইগুলিকে সার্বভৌমের অনুমতি-পত্র প্রাপ্ত হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই অনুমতি সার্বভৌম সমাজের চাপে দিতে বাধ্য হইয়াছেন না স্ব-ইচ্ছায় দিয়াছেন তাহার উল্লেখ তিনি করিতে পারেন নাই।

প্রথাগত আইনকে সার্বভৌম উপেক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই অনুমোদন করিয়া থাকে

চতুর্থতঃ, অস্টিন বলপ্রয়োগকে নিয়ম-শৃঙ্খলার পূর্ববর্তী বলিয়া কল্পনা করিয়া ভুল করিয়াছেন। প্রাক্-অস্টিন যুগে বলপ্রয়োগের পূর্বে নিয়মশৃঙ্খলার স্থান নির্ণয় করা হইত। সমালোচকগণের মতে অস্টিনের ধারণা হইল বলপ্রয়োগের দ্বারা নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। আধুনিক কালের ধারণা হইল আইন শাস্তির ভয়ে মান্য করা হয় না। আইন জনসাধারণ মান্য করে অভ্যাসবশতঃ।

প্রথমে শক্তি পরে নিয়মশৃঙ্খলার কল্পনা ভুল

*'To think......of law as simply a command is... to strain definition to the verge of decency.—*Laski*.

পঞ্চমতঃ, সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধেও অস্টিনের ধারণা ছিল ভুল। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এমন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যিনি বা যাঁহাদের মধ্যে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতা এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সার্বভৌমের সন্ধান পাওয়া যায় না

ষষ্ঠতঃ, অস্টিনের মতবাদ সমালোচনা করেন বহুত্ববাদিগণ (**Pluralists**)। বহুত্ববাদীদের মতানুসারে অস্টিনের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বে, সার্বভৌমকে স্বেচ্ছাচারী হিসাবে দাঁড় করানো হইয়াছে, এবং রাষ্ট্র কখনই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না, রাষ্ট্রের ভিতর বিভিন্ন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছু-না-কিছু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অধ্যাপক বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "রাষ্ট্রের সহিত বর্তমানে আর মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই রাষ্ট্র ও সঙ্ঘের মধ্যে" ("No longer we write Man *vs.* the State, we write Group *vs.* the State."—*Barker*)।

রাষ্ট্র চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নয়

সপ্তমতঃ, পরিশেষে ডঃ গার্ণারের মতটি উল্লেখ করা গেল। ডঃ গার্ণার বলেন যে, অস্টিন আইনগত সার্বভৌমিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন; কিন্তু সাধারণ আইনের পশ্চাতে যে সকল শক্তি ও প্রভাব কাজ করে, তাহা তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। "লোকে প্রথমতঃ মনে করে অস্টিনের মতবাদ স্বতঃসিদ্ধ, ইহার পর লোকে জানিতে পারে এই মতবাদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে এবং সর্বশেষে লোকে তাঁহার সমগ্র বিশ্লেষণটিকেই হাস্যাস্পদ এবং কল্পনাত্মক মনে করে। আইনের পশ্চাতে শ্রেণীস্বার্থের প্রভাব, দলীয় স্বার্থের প্রভাব প্রভৃতিকে অস্টিন উপেক্ষা করিয়া তাঁহার তত্ত্বটিকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন"।

আইনের পশ্চাতে সামাজিক প্রভাবকে অস্বীকার করা হইয়াছে

বর্তমানে, অস্টিনের ধারণার সমর্থনে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হেনরী মেইন, মেইটল্যাণ্ড, সিজউইক, ক্লার্ক, ল্যাস্কি প্রমুখ লেখকগণ অস্টিনকে এই বলিয়া ভুল বুঝিয়াছেন যে, অস্টিন সার্বভৌমিকতা ও পাশবিক বলকে এক ও অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কোকার (Coker) এই মন্তব্য করেন যে, অস্টিনের মতবাদে কোথাও এইরূপ অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না। অধ্যাপক ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসনের মতানুসারে অস্টিন ঐশ্বরিক আইনকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি নৈতিক আইনেও বিশ্বাসী ছিলেন। আবার তিনি সরকারের যথেচ্ছাচার ও সার্বভৌম শক্তিকে এক করিয়া দেখেন নাই। সরকার আর রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি এক নহে। তথাপি তাঁহার সমালোচকেরা ধরিয়া লইয়াছেন যে, অস্টিন চূড়ান্ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন। অস্টিনের সমর্থনে আর একটি যুক্তি হইল, জনগণের স্বভাবগত আনুগত্যই যখন সার্বভৌমিকতার লক্ষণ তখন সাধারণের সম্মতিই ইহার ভিত্তি। এই সাধারণের সম্মতি কখনও থাকিতে পারে না যদি সার্বভৌমিকতা পাশবিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অস্টিনের মতের সমর্থনে যুক্তি

উপসংহারে বলা যায়, অস্টিনের 'সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব'টি আইনগত সার্বভৌমিক-তার ব্যাখ্যা হিসাবে অত্যন্ত স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত। অস্টিন এই আইনগত সার্ব-ভৌমকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম হইতে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি এই তত্ত্বের

একটি বিশেষ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য, অস্টিনের মতবাদ কতকগুলি পূর্ব ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণাগুলি মানিয়া লওয়া হইলে অস্টিনের মতবাদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার মতবাদ অসম্পূর্ণতা দোষে (inadequacy) দুষ্ট।

সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব (Theory of limited Sovereignty): সার্বভৌমিকতার অর্থ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা (absolute power)। রাষ্ট্রের এই চরম ক্ষমতা অসীম। রাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত আর অন্য কোন ক্ষমতা নাই যাহা সার্বভৌমিকতার ঊর্ধ্বে। কিন্তু সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহার কারণগুলি নিচে দেওয়া হইল:

প্রথমতঃ, ব্লুন্টস্‌লি বলেন, "রাষ্ট্র বাহিরের দিক হইতে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিজস্ব চরিত্র সাধারণ সদস্যদের অধিকারের দ্বারা সীমিত।"* ব্লুন্টস্‌লের এই মতটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতা সীমিত।**

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র যে শাসনতন্ত্র রচনা করে, সেই শাসনতন্ত্রের দ্বারা নিজেই সীমাবদ্ধ হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাও এই শাসনতন্ত্রের দ্বারা সীমিত হয়।

তৃতীয়তঃ, আবার প্রজাসাধারণের নির্দিষ্ট অধিকার দ্বারা সার্বভৌমিকত্ব সীমিত হয়। অবশ্য প্রজাসাধারণের এই অধিকার রাষ্ট্রই দেয়। স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজ সমাজের অন্তর্গত মানুষের অধিকারকে মানিয়া লয় আর রাষ্ট্র এই অধিকারকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। অতএব দেখা যায়, সামাজিক চেতনা হইতে যে অধিকারের দাবি উত্থাপিত হয়, সেই অধিকারের উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না। আবার সার্বভৌম যে অধিকারকে সামাজিক চাপে মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, তাহাকে আইনগত বাধা বলা চলে না। তাই অনেক সময় দেখা যায় সার্বভৌম সামাজিক চেতনার বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ আইন স্থাপন করে না। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ল্যাস্কি বলেন যে, প্রতি যুগের মানুষের নিকটই সরকারের আইন প্রণয়নের তথাকথিত অসীম ক্ষমতার সীমারেখা সুপরিচিত।

চতুর্থতঃ, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহা আইনসংগতভাবে সীমাবদ্ধ না হইলেও ইহা নৈতিক সূত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে হেনরী মেইন এই মত পোষণ করেন যে, নৈতিক প্রভাব প্রতিনিয়তই সার্বভৌম-শক্তিকে সীমিত করে। ব্লুন্টস্‌লির মতে রাষ্ট্র ঈশ্বরের বিধানকে উপেক্ষা করিতে পারে না, ফলে ঈশ্বরের চিরন্তন বিধানের নিকট চিরদিনই দায়িত্বশীল থাকিবে।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্র ইতিহাসের ঘটনাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। তাই ঐতিহাসিক ঘটনার কাছেও দায়িত্বশীল থাকিবে।

ষষ্ঠতঃ, বার্কারের মতে সার্বভৌমিকতা নিজস্ব প্রকৃতি ও কার্যপদ্ধতি দ্বারা সীমাবদ্ধ ("Sovereignty is limited...by its own **nature** and its own

---

*"......it is limited externally by the rights of other states and internally by its own nature and by the rights of its individual members."—*Bluntschli*

**"The state is limited within, it is also limited without."

mode of action.")। সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি এই কথাই বলে যে, সার্বভৌমিকতা হইল চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্ত ব্যাপারেই নিজেকে প্রকাশিত করে। রাষ্ট্রের বহু সমস্যার ক্ষেত্রে, বহু দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তাহার এই চূড়ান্ত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইল ইহা সকল দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, সকল সমস্যার ক্ষেত্রে সর্বদাই ইহার চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। এই চূড়ান্ত ক্ষমতা যেহেতু সকল বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে না সেই হেতু ইহা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিবার পূর্বে যে সমস্যার সমাধান হইয়া যায়, সেই সকল সমস্যার ক্ষেত্রে ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে বলিয়াই ইহা সর্বদা ব্যবহৃত হয় না

সপ্তমতঃ, আবার আইনের গণ্ডীর বাহিরে অন্যান্য বিষয়ের সহিত সার্বভৌমিকতার কোন সংস্রব নাই। এই প্রসঙ্গে বার্কার বলেন, "আইনসম্মতভাবে আইনসম্মত প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার আইনানুমোদিত ক্ষমতা হইল সার্বভৌমিকতা" ("it is a legal power of settling finally legal questions in a legal way.")। অতএব সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রের চরম-ক্ষমতা বলা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে।

সমালোচনা ঃ অনেক মনে করেন যে, (১) শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমিত হয় না। কারণ শাসনতন্ত্র যে প্রণয়ন করে এবং যে তাহার সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে, সে প্রয়োজনবোধে তাহার পরিবর্তনও করিতে পারে। অতএব শাসনতন্ত্র যখনই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে সীমিত করিতে যাইবে তখনই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া লইবে।

(২) আবার আন্তর্জাতিক আইনও সার্বভৌমিকতাকে সীমিত করিতে পারে না বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রকে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ইহাও বলা হইয়াছে, যদি কখনও রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় কোন নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করিয়া লয় তবে তাহার দ্বারা সার্বভৌমিকতাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না। রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক আইন তথা আন্তর্জাতিক প্রথাগুলিকে মানিয়া লইয়াছে। ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্র ইহাকে অস্বীকারও করিতে পারে। অনেক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের বিধিনিষেধকে অস্বীকার করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক আইনের বাধা

কিন্তু, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন একটি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে স্বীকার করা যায় না। আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমকে স্বীকার না করিলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হইবে। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে যেমন যে-কোন ব্যক্তির ইচ্ছাই চূড়ান্ত নয়, তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে যে রাষ্ট্রগোষ্ঠী, সেখানেও একটি রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করার অর্থ বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পর্কের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। আবার পারস্পরিক সম্মানের ও অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত যে আন্তঃরাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। কারণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতার প্রকৃতিই হইল পারস্পরিক অধিকারের স্বীকৃতি দান। এই স্বেচ্ছাস্বীকৃত নিয়ন্ত্রণকে নিয়ন্ত্রণ বলা যায় না।

পারস্পরিক সম্মানের চুক্তি

উপসংহারে বলা যায়, সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য হয়তো রাষ্ট্র জনমতবিরোধী অথবা নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্যকলাপগুলিকে পরিহার করিয়া চলে, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্রের সব-কিছুই করিবার ক্ষমতা আছে। পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সাধারণতঃ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিলেও আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলক-ভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা স্থির করিয়া দেয় না। অবশ্য, অনেক সময় রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে পারে না, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা নাই।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি বিভাজ্য? (Theory of Divided Sovereignty): রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ যদিও সার্বভৌমত্বকে খণ্ডিত অবস্থায় দেখিতে চাহেন না, তথাপি আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্তরের আংশিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে এই আংশিক সার্বভৌম কতকগুলি রাষ্ট্রের বিবরণ দেওয়া গেল ঃ

প্রথমতঃ, আশ্রিত রাজ্য (Protectorate): অনেক সময় দেখা যায় দুর্বল রাজ্য আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে কোন বলিষ্ঠ রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই আশ্রয় গ্রহণকারী রাষ্ট্রকে বলা হয় আশ্রিত রাজ্য। এই সকল আশ্রিত রাজ্যের সমর বিভাগ, কর আদায় বিভাগ ও বিচার বিভাগের উপর আশ্রয় দানকারী রাষ্ট্রের ক্ষমতাই বজায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মোনাকো (Monaco) ফ্রান্সের সহিত এইরূপ সম্পর্কে সম্পর্কিত।

দ্বিতীয়তঃ, অনুগত রাজ্য (Vassal State): এই প্রকারের রাজ্য অপর কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের (Suzerain State) অনুগত থাকে। এই ধরনের রাজ্যগুলিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র যে সকল অধিকার দিয়া থাকে তাহাই ভোগ করে। অবশ্য, অনেক সময় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আংশিক বা সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ইহাদের থাকে। কিন্তু আন্তর্রাষ্ট্র সম্পর্কের ব্যাপারে সার্বভৌম রাষ্ট্র সম্পূর্ণ অধিকার ভোগ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি তুর্ক সাম্রাজ্যের অনুগত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হইত অবশ্য, পরে তুর্ক সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে এই সকল রাজ্য স্বাধীন ও সার্বভৌম বলিয়া ঘোষিত হয়।

তৃতীয়তঃ, অছি-ব্যবস্থাধীন বা আজ্ঞাধীন রাজ্য (Mandated Territory or Trust Territory): এই ধরনের রাজ্যকে অপর কোন রাষ্ট্রের শাসনাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিগত তুর্ক সাম্রাজ্যের অংশ প্যালেস্টাইন, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলকে লীগ অব নেশনস্‌-এর (League of Nations) তরফ হইতে বৃটেনের শাসনাধীনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ধরনের রাজ্যগুলিকে আধা-সার্বভৌম হিসাবে ধরা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও কোন কোন রাজ্যকে ঐরূপ বৃহৎ রাষ্ট্রের অছি (Trustee) নিযুক্ত করিয়া তাহাদের তদারকিতে রাখা হয়।

চতুর্থতঃ, দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা (Dual Administration): এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় একটি রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যুগপৎ দুইটি রাষ্ট্র দ্বারা মিলিতভাবে পরিচালিত হয়। সুদান দেশের শাসনকার্য যুগপৎ ইজিপ্ট ও গ্রেট বৃটেন কর্তৃক পরিচালিত হইত। এই ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্র।

পঞ্চমতঃ, নিরপেক্ষীকৃত রাষ্ট্র (Neutralised State) ঃ এই ধরনের রাষ্ট্রের উদাহরণ হইল সুইজারল্যাণ্ড। এই ধরনের রাষ্ট্র নিজেকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্রের চাপে অনেক সময় চুক্তির মাধ্যমে নিজেকে "নিরপেক্ষ" (Neutral) বলিয়া ঘোষণা করে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর নিরপেক্ষীকৃত রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, যখন কোন রাষ্ট্র নিজেকে নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করে তখন উহাকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়, আর যখন শক্তিশালী রাষ্ট্রের চাপে কোন রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হইতে বাধ্য হয় তখন উহাকে নিরপেক্ষীকৃত রাষ্ট্র বলা হয়। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে এ ধরনের রাষ্ট্র কখনও প্রবৃত্ত হইবে না। এই ধরনের রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। কারণ, শক্তিশালী রাষ্ট্রের চাপে ইহার নিজস্ব বক্তব্যটি পর্যন্ত বলিবার ক্ষমতা নাই।

ষষ্ঠতঃ, **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা** (Federal Union) ঃ পরিশেষে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এই সার্বভৌমিকতার বিভাজ্যতা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। নিম্নে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতার স্থান নির্ণয় করা হইল।

সার্বভৌমিকতার অবস্থিতি ও যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা (Location of Sovereignty and Sovereignty in a Federation) ঃ সার্বভৌমিকতা হইল একটি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। ইহা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা কোথায় অবস্থান করে তাহা নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। এই সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনগণ এই ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে না। ফলে জনগণে এই ক্ষমতার অবস্থিতি হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক গেটেল রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত আইনসভা সমষ্টির উপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়াছেন। আইনসভা সমষ্টির অর্থ হইল দেশের কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় আইনসভাসমূহ। আবার শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগও আইন প্রণয়ন করে। অনেক দেশে ভোটদাতাগণ গণভোট, গণ-নির্দেশাধিকার প্রভৃতি উপায়গুলি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। অতএব দেখা যায়, সার্বভৌমিকতা অবস্থান করে দেশের সকল আইনসভা, বিচার-বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং জনসাধারণের মধ্যে, কিন্তু এই বিশ্লেষণ ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, আইনসভা, শাসনবিভাগ প্রভৃতি শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মাত্র। শাসনযন্ত্র সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইতে পারে না, কারণ, রাষ্ট্রই একমাত্র ইহার অধিকারী। শাসনযন্ত্র রাষ্ট্রের একটি উপাদান মাত্র।

তৃতীয়তঃ, **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের স্থান (Sovereignty in a Federation)** নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায় "যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব" ("discovery of sovereignty in a Federal State is...an impossible adventure".)। সার্বভৌমিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল অবিভাজ্যতা। সার্বভৌমিকতার এই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়া লইলে যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা অত্যন্তই জটিল। কারণ যুক্তরাষ্ট্র হইল বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে পর এই সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বজায় না থাকিলেও এই সকল

যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা সার্বভৌমিকতার বিভাজ্যতা

রাষ্ট্রের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা সমগ্র দেশের সরকার ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। অতএব শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণে, কোন সরকারের ক্ষমতাই অপ্রতিহত, চরম ও চূড়ান্ত নহে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ বিশেষ প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলির আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা সীমিত। এই শাসনতন্ত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া যদি আইনসভাগুলি আইন প্রণয়ন করে তবে উক্ত আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইবে। অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাগুলিকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার আবাসস্থল

আবার বলা হয় যে, রাষ্ট্রের মধ্যে যে কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন ও তাহার সংশোধন করার অধিকারী সেই কর্তৃপক্ষকেই প্রকৃত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলা হয়। গ্রেট বৃটেনের রাজা-সহ পার্লামেণ্ট হইল এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাগুলি এককভাবে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করার অধিকারী নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ায় হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের নিয়ম লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত হওয়ার ফলে উভয় সরকারই শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অতএব কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা বিভাজ্য। কিন্তু এই মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা ভাগ হয়, কিন্তু রাষ্ট্র থাকে একটিমাত্র এবং সার্বভৌম ক্ষমতা এই রাষ্ট্রেরই। অতএব অবিভাজ্যভাবে একক রাষ্ট্রই ইহার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা বণ্টিত হয়, সার্বভৌমিকতা বণ্টিত হয় না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ১৪-১৮ (খ) ধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সার্বভৌমিকতা কেন্দ্র ও ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির মধ্যে যেন বণ্টিত হইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভাজ্য সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী। ইউনিয়নগুলির কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাদের নিজস্ব ফৌজ রাখারও অধিকার আছে এবং বৈদেশিকদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব কেহ কেহ বলেন যে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিভাজ্য। কিন্তু এই মতকেও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। কারণ, কেন্দ্রের হস্তেও বহুবিধ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। বাস্তবে কেন্দ্রকেই ইউনিয়নগুলি অনুসরণ করে। আবার কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিয়নের প্রতিনিধিবর্গের দ্বরাই গঠিত হয়। সর্বোপরি একটি দলই (কমুনিস্ট) সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে এবং শাসন করিতেছে। প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা ইহারই হস্তে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানই সার্বভৌম

আবার অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই সার্বভৌম। কিন্তু এই মত অস্টিনের সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, কারণ, সংবিধান হইল ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে দলিল, ব্যবহারকারীদিগকে এখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান চরম হইলেও ইহা পরিবর্তনীয়। সংবিধানকে সার্বভৌম হিসাবে গণ্য না করিয়া ইহার পরিবর্তনের ক্ষমতাকে সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা উচিত।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদ বনাম বহুত্ববাদ

(Monistic *vs.* Pluralistic Conception Of Sovereignty)

রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বোডাঁ, হবস্, বেন্থাম ও অস্টিনের দ্বারা পরিস্ফুটিত সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে পরম্পরাগত (Tra-ditional) বা আইনসম্মত মতবাদকে বলা হয় একত্ববাদ (Monism)।

একত্ববাদের সারসংক্ষেপ ঃ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা যদিও নূতন নহে তথাপি বলা যায় সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের জন্ম হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয়, মধ্যযুগ পর্যন্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। মধ্যযুগে ছিল সামন্তপ্রথা। তখন জনসাধারণ ছিল সামন্তদিগের অনুগত। আর সামন্তগণ ছিল রাজার অনুগত। এইভাবে আনুগত্য বিভক্ত হওয়ায় রাষ্ট্র কর্তৃত্বও ছিল বিভক্ত। অতএব চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এককভাবে কাহারও ছিল না। মধ্যযুগের শেষে সামন্তগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে রাজাই রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সামন্তপ্রথার সঙ্গে আবার জড়াইয়া ছিল রাজতন্ত্র ও খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরস্পর বিরোধী শ্রেষ্ঠত্বের দাবি। পরিশেষে রাষ্ট্রের উপর কতৃত্ব লইয়া পোপ ও রাজার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষের সময় নৃপতিগণের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে তাহাদের সপক্ষে যে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক বোডাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল দার্শনিকগণ রাজার হস্তে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সমর্পণ করিবার পক্ষে প্রচার শুরু করিলেন। পোপের কর্তৃত্ব হইতে রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকারে মুক্ত করাই ছিল এই প্রচারের উদ্দেশ্য। এই প্রচারের ফলে পোপের কর্তৃত্বমুক্ত জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা।

একত্ববাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

এই সার্বভৌমিকতা হইল অবাধ, অসীম, অখণ্ড, অপ্রতিহত চূড়ান্ত রাষ্ট্রের এক বিশেষ ক্ষমতা। এই সার্বভৌমিকতা আইনগত এবং অবিভাজ্য। এই ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র তাহার ভূখণ্ডের অন্তর্গত সকল ব্যক্তি ও সংঘের উপর অপ্রতিহত কর্তৃত্বের অধিকারী। রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আইনানুমোদিত অন্য কোন সংস্থা নাই। রাষ্ট্রের আজ্ঞাই চরম এবং চূড়ান্ত। সার্বভৌমিকের আজ্ঞাই আইন। আবার এই আইন যদি কোন রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তি অমান্য করে তবে রাষ্ট্র এই আইন অমান্যকারী ব্যক্তিকে দৈহিক শাস্তিও দিতে পারে। একত্ববাদিগণের মতে সমাজে বহু সংঘ আছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রই একমাত্র বলপ্রয়োগের অধিকারী। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল ব্যক্তি ও সংগঠন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তাহাদের অধিকার, অস্তিত্ব ও ক্ষমতা। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতার একচেটিয়াত্বই হইল সার্বভৌমিকতার একত্ববাদ।

একত্ববাদের বৈশিষ্ট্য

একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদের যুক্তি ও বহুত্ববাদের বর্ণনা (Pluralistic criticism to the Monistic conception of Sovereignty and Pluralism)

(ক) বহুত্ববাদের সারসংক্ষেপ ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অসীম অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার

অধিকারী বলিয়া মতবাদ প্রচার করেন। এই ক্ষমতার আওতার মধ্যে সকল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইতে লাগিল। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল সংঘগুলির সংঘ-স্বাতন্ত্র্যও লুপ্ত হইতে বসিল। একত্ববাদিগণের প্রচারের ফলে নাগরিকের স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জৈব মতবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, বেন্থামের হিতবাদ এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের মতবাদের প্রচারের ফলে রাষ্ট্র প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং রাষ্ট্রের হাতে সমাজের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। যুদ্ধের সময়ে এবং শান্তির সময়েও রাষ্ট্র নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করে।

বহুত্ববাদের ঐতিহাসিক দিক

এই সময়ে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক, সর্বময় অপ্রতিহত ও চরম ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইহাই মতবাদের জগতে বহুত্ববাদের রূপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ একত্ববাদের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রান্তর্গত বিভিন্ন সংঘের নিজস্ব সত্তাকে সমর্থন করিয়া যে মতবাদ প্রচারিত হয় তাহাকেই বলে বহুত্ববাদ। এই বহুত্ববাদের প্রচারক হইলেন, গিয়ার্কে (Gierke), ফিগিস্ (Figgis), লিন্ডসে (Lindsy), মেইট্ল্যান্ড (Maitland), ডুগো (Duguit), ক্র্যাব্ (Krabbe), ল্যাস্কি (Laski), কোল (Cole), হবসন্ (Hobson), বার্কার (Barker) ও ম্যাক্‌আইভার (MacIver) প্রভৃতি প্রখ্যাত দার্শনিকগণ। এই দার্শনিকগণের যুক্তিগুলি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(খ) একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদের যুক্তি ঃ (১) বহুত্ববাদিগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষ সামাজিক জীব। এই সামাজিক মানুষের জীবন বহুমুখী। জীবনের পূর্ণবিকাশ একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই হইতে পারে না। তাই মানুষ বিভিন্ন সংঘ সৃষ্টি করিয়াছে। পরিবার, ধর্মসংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি মানুষেরই সৃষ্টি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির আবার প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য আছে এবং প্রত্যেকেই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। অবশ্য বহুত্ববাদিগণ অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নাই। রাষ্ট্র যেমন মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিকাশে সহায়তা করে, সেইরূপ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিকের বিকাশে সহায়তা করে। তাই মানুষ শুধু রাষ্ট্রের প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করে না, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করে। কারণ, সে শুধু রাষ্ট্রনৈতিক জীবন লইয়াই বাঁচিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে গিয়ার্কে ও মেইট্ল্যান্ডের মতবাদ উল্লেখ-যোগ্য। এই দুই চিন্তাবীরের মতে সামাজিক সংঘগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়। এই সামাজিক সংঘগুলি নিজস্ব সত্তার অধিকারী। ফিগিস্ খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংঘের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার বিশেষভাবে সমর্থন করেন। তাঁহার মতে সমাজে রাষ্ট্র ছাড়াও বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে। তাই রাষ্ট্র এক ও অবিসংবাদী সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইতে পারে না। রাষ্ট্র হইল সমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী মাত্র। অতএব সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজে অহেতুক হস্তক্ষেপ করার

জীবনের পূর্ণ-বিকাশের জন্য সামাজিক সংঘগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে

অধিকার রাষ্ট্রের নাই। বিশেষ করিয়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্র্যকে রাষ্ট্রের স্বীকার করিতেই হয়।

(২) বহুত্ববাদিগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে, একত্ববাদ যে রাষ্ট্র ও সমাজকে একরূপ অভিন্ন বলিয়া এবং সমাজকে 'অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সংগঠন' ('association of unassociated individuals'') বলিয়া মনে করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। সমাজ অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সংগঠন নহে। বস্তুতঃ সমাজ হইল রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে গঠিত। এই সকল সংঘের মধ্যেই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। আবার অতিশয় যুক্তিসঙ্গত কারণেই বহুত্ববাদিগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্র কোন অসাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় এবং বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ইহাকে কোন অসাধারণত্ব দান করে না। রাষ্ট্র যেমন আইন-অমান্যকারীকে দৈহিক শাস্তি দিতে পারে তেমনি অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানও সামাজিক শাস্তি দিতে পারে। খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে পোপ খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠান (church) হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। এই শাস্তিও রাষ্ট্রের দৈহিক শাস্তির তুলনায় কম পীড়াদায়ক হয় না।

রাষ্ট্রের দৈহিক শাস্তি আর নৈতিক বা ধর্মীয় শাস্তির মধ্যে তুলনা

(৩) বহুত্ববাদিগণ এই মত পোষণ করেন যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার একটি সীমা আছে। আর ক্ষমতার এই সীমা সেই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রের কার্যাবলীর প্রকৃত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবনের নিয়ন্ত্রণ করে বটে, কিন্তু মানুষের অন্তর্জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাষ্ট্রের নাই। রাষ্ট্র একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। ইহা মানুষের অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্ আইভার বলেন যে, একখানি কুঠার একটি পেন্সিল কাটিবার পক্ষে যেমন অনুপযোগী অস্ত্র, ঠিক রাষ্ট্রও মানুষের অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উন্নয়নে তেমনি অনুপযোগী অস্ত্র। অতএব দেখা যায়, রাষ্ট্র তাহার কার্যাবলীর গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহার সার্বভৌমিকতা অবাধ, অসীম নয়। এই প্রসঙ্গে একত্ববাদিগণের ধারণা যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার ফরাসী দার্শনিক ডুগো বলেন যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনের গণ্ডীর বাহিরে রাষ্ট্রের কোন ক্ষমতা নাই। এইভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমিত করিয়া সংঘ-স্বাতন্ত্র্যের পথ প্রশস্ত করেন। ক্র্যাব্ এই মত পোষণ করিতেন যে, রাষ্ট্র আইনের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। অতএব আইনই সার্বভৌম, রাষ্ট্র নহে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ

(৪) অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন : "রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা হইল অন্যতম "আইনের কল্পনা এবং শূন্যগর্ভ" ধারণা ("The doctrine of Sovereignty is a legal fiction and a barren concept.")। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে সমাজে এমন অনেক কাজ আছে যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেমন সার্বভৌম তেমনি অপরাপর সামাজিক সংঘগুলিও তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। সমাজ সংঘমূলক, আর তাহার কর্তৃত্বও সংঘমূলক। অতএব সমাজের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের একচেটিয়া হইতে পারে না। রাষ্ট্র সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র।

রাষ্ট্র সকল সামাজিক কাজ করিতে পারে না

(৫) **কোল ও হবহাউস বহুত্ববাদকে সমর্থন করিয়া বহুত্ববাদের মাধ্যমে সংঘ-মূলক সমাজতন্ত্রবাদের (Guild Socialism) প্রচার করেন।** কোলের মতে রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। অতএব মানুষই ইহার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। মানুষ প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রকে কর্তৃত্বের আসন হইতে নীচে নামাইয়া আনিতে পারে। ফলেট সংঘগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রনৈতিক কার্য সম্পাদনের পক্ষ সমর্থন করেন। ম্যাক্‌আইভারের মতে রাষ্ট্র সত্যই একটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহা অসাধারণ প্রতিষ্ঠান নহে।

রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান, মানুষ ইহার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে

(৬) **বার্কার বলেন যে,** রাষ্ট্রকে প্রধানতঃ "এমন একটি সংগঠন হিসাবে দেখি না যে সংগঠনে সাধারণ মানুষ যৌথ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়াছে। রাষ্ট্র হইল ব্যক্তি সাধারণের এমন সংগঠন যেখানে তাহারা ইতিমধ্যেই আরও অগ্রসর ও আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘবদ্ধ হইয়াছে।" বর্তমানে নাগরিক ব্যক্তিমাত্র নহে, সে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি। পূর্বে বলা হইত যে, ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা অখণ্ড। শুধু যে সকল কার্যের মধ্যে অপরের স্বার্থ জড়াইয়া যাইত সে সকল ব্যাপারেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকিতে পারে। বর্তমানে অনুরূপভাবে বলা যায়, দল, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠানকে এক একটি সংস্থা ধরিয়া তাহাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকারকে সীমিত করিয়া এক গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থ যখন অপর দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থের সহিত জড়াইয়া পড়িবে তখনই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে। অর্থাৎ পূর্বে যে ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্রের (Man versus the State) ক্ষেত্র সম্বন্ধে বলা হইত বর্তমানে অনুরূপভাবে গোষ্ঠী বনাম রাষ্ট্রের (Group versus the State) ক্ষেত্রকে ধরা সঙ্গত। ব্যক্তি-স্বাধীনতা যেমন অপরিহার্য তেমনি গোষ্ঠী-স্বাধীনতাও অপরিহার্য। কিন্তু রাষ্ট্রের অবাধ, অপ্রতিহত সার্বভৌমিকতার আওতায় এই গোষ্ঠী-স্বাধীনতা বজায় থাকে না।

গোষ্ঠীর স্বাধীনতা অপরিহার্য

আবার বর্তমানে শ্রমিকসংঘ, মালিকসংঘ, বণিকসংঘ ইত্যাদি নিজেরা পৃথক পরিচালনা ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন রচনা করিয়া কার্যব্যবস্থা চালনা করে। আবার নিজেদের দাবি-দাওয়া আন্দোলন করিয়া সরকারের নিকট হইতে আদায় করে। অতএব এই সংঘগুলিরও চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। সুতরাং দেখা যায়, রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে চাপ সৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে সমাজের সংঘগুলির। অতএব সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী সংঘের ক্ষমতাকেও স্বীকার করা বিধেয়।

(৭) বহুত্ববাদিগণের মতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা আইন দ্বারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধিকার দ্বারা যেমন সীমাবদ্ধ, বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্রের ক্ষমতা তেমনি অন্য রাষ্ট্রের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা যদি অপ্রতিহত হয় তবে যেমন রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তি ও সংঘের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়, ঠিক তেমনি বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হইলেও বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবে। কারণ তাহা হইলে শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিবে। এই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার অবাধ প্রয়োগ হইলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। বিশ্বের বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ এই কথাই প্রমাণ

করিয়াছে। অতএব যে সকল কার্যাবলী আন্তর্জাতিক শান্তি ও সভ্যতা বিরোধী সেই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় নহে। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার হস্তে সমর্পণ করা বিধেয়। আর প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই আন্তর্জাতিক আইনকে বাধ্যতামূলক করিয়া পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। অন্যথায় মানব সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এইভাবে বহুত্ববাদিগণ প্রমাণ করেন যে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় সার্বভৌমিকতাই সীমিত। বর্তমান যুগ হইল আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগ। বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার অধিকারী নহে। সকল রাষ্ট্রেরই বাহ্যিক চরম ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। আবার বলা হয়, বর্তমান জগৎ হইল বিশ্বজনীন সম্প্রদায়। সকল দেশের মানুষকে একটি বিশ্বপরিবারের সভ্য হিসাবে কল্পনা করা হয়। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার কল্পনা প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী। আবার বর্তমান যুগে মানুষ আন্তর্জাতিক আইনকে জাতীয় আইনের মতোই বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাইতেছে। এইভাবে সার্বভৌম ক্ষমতাও অভ্যন্তর ও বাহিরের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ (The State is limited within and without.)। এইজন্যই ল্যাস্কি বলিয়াছেন: "সার্বভৌমিকতার সম্পূর্ণ ধারণাটিই বিসর্জন দিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ ঘটিবে"।*

বর্তমানে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা উভয়েই সীমাবদ্ধ

(৮) আবার বহুত্ববাদীদের ধারণার সহিত সম্পর্কিত আর একটি ধারণা হইল, রাষ্ট্র আইনের উৎস নহে অতএব রাষ্ট্র আইনের ঊর্ধ্বে নহে। বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহাদের মতে সমাজের সংহতিই আইনের ভিত্তি। সমাজসৃষ্টির অনেক পরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সমাজ-জীবনের প্রথম হইতেই মানুষ কতকগুলি সামাজিক বিধি-নিয়মকে মানিয়া লইয়াছে। এই বিধি-নিয়মগুলিই আইন। এই সামাজিক বিধি-নিয়মগুলি রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী। অতএব রাষ্ট্রও অন্যতম সামাজিক সংঘ হিসাবে এই বিধি নিয়মের কর্তৃত্বাধীন। অতএব সার্বভৌমের ক্ষমতাকে আইন বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

সার্বভৌমের আজ্ঞাই আইন নহে

(৯) বহুত্ববাদিগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা ব্যবহারিক জীবনের সরকার কর্তৃকই কার্যকরী হয়। কিন্তু সরকার গঠিত হয় সাধারণ লোককে লইয়া। মানুষ দোষে গুণে গঠিত। অতএব এই সাধারণ মানুষের হাতে চরম অপ্রতিহত ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে আহ্বান করা। আবার ইহাতে চরম স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

(১০) বহুত্ববাদিগণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: "বিবেকের অনুশাসন মানাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য" ("Our first

---

*"It would be of lasting benefit to political science if the whole concept of sovereignty were surrendered" —*Laski*.

duty is to be true to our conscience".)। অতএব রাষ্ট্রের নির্দেশ মান্য করিবার সীমা স্থির করে মানুষের বিবেক। বিবেক যতখানি মান্য করিতে বলিবে ততখানিই মান্য করা হয়। অতএব রাষ্ট্রের চূড়ান্ত আনুগত্য দাবি করিবার ক্ষমতা নাই।

বিবেকের অনুশাসন দ্বারা সার্বভৌমিকতার সীমা নির্দিষ্ট হয়

বহুত্ববাদিগণের মতে "রাষ্ট্রযন্ত্র জটিল, ধীরগতিসম্পন্ন ও অপচয়পূর্ণ।" অতএব অতিশয় ন্যায্যভাবেই বহুত্ববাদিগণ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে সমাজের অকল্যাণ হইবে। তাঁহাদের মতে সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতাকে সমগ্র সামাজিক সংঘের মধ্যে বণ্টন করা উচিত। বার্কার এই মন্তব্য করেন, "অপর কোন প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতবাদ অপেক্ষা শুষ্ক ও মূল্যহীন হইয়া উঠে নাই।"* লিণ্ড্সে এই মন্তব্য করেন যে, ঘটনার দিকে তাকাইলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব ভাঙিয়া পড়িয়াছে।† বহুত্ববাদিগণের ধারণায় আইন-সম্মত সার্বভৌমিকতার মতবাদ একটি কুসংস্কার বিশেষ ("The theory of Sovereign State is a venerable superstition."

(১১) এমিল ডুর্কহাইম এই মন্তব্য করেন যে বর্তমানে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন অতিশয় জটিল। রাষ্ট্র নিখুঁতভাবে এই জটিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং কর্মিগোষ্ঠীগুলিকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ভার অর্পণ করা সঙ্গত। তিনি এই মত পোষণ করেন যে, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সামাজিক স্বার্থের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের রূপদান করা কঠিন।

কর্মিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব

সমালোচনা ঃ উপরে যে একত্ববাদ এবং একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদের যুক্তিগুলি দেখানো হইয়াছে, সেই বহুত্ববাদী যুক্তিগুলির পক্ষে ও বিপক্ষে বর্তমানে কতকগুলি সমালোচনা হইয়াছে। এই সমালোচনাগুলি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(১) বহুত্ববাদিগণের মতে সমাজের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যদি কর্তৃত্বের অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় তবে সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবর্তমানে তাহাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রশমিত করিবার আর কেহ নাই। বহুত্ববাদিগণের যুক্তি হইল, প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, বহুত্ববাদিগণ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ বিচারকের মর্যাদা দিয়া সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে রাষ্ট্রের নির্দেশ অবশ্য পালনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ভূমিকায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি

(২) বহুত্ববাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল এই যে, এই মতবাদ সমাজের অন্যান্য সংঘগুলির কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া এই সংঘগুলির উপযোগিতা

*"No political common place has become more arid and unfruitful than the doctrine of Sovereign State".—*Barkar.*

†"If we look at the facts, it is clear enough that the theory of the Sovereign State has broken down".—*Lindsy.*

প্রমাণিত করিয়াছেন। বহুত্ববাদিগণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অহেতুক হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র যদি হস্তক্ষেপ করে, তবে অবশ্য তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। অতএব দেখা যায়, বহুত্ববাদিগণ আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার সামান্য পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নাই।

(৩) আবার, বহুত্ববাদিগণ একত্ববাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি অন্যায্য আক্রমণ করিয়াছেন। একত্ববাদ দাবি করে না যে, সামাজিক নীতি ও যুক্তির দিক হইতে রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা আছে। আবার রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা চলিবে না বলিয়াও একত্ববাদিগণ দাবি করেন না। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের কোন সীমা একত্ববাদিগণ নির্দিষ্ট করিয়া দেন না। কোকার একত্ববাদ সম্বন্ধে বলেন : "আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং যে ধরনের বাধানিষেধ অপরের উপর প্রয়োগ করিবার জন্য রাষ্ট্রের জন্ম, অনুরূপ বাধানিষেধ ইহার উপর আরোপিত হইতে পারে না। একত্ববাদী রাষ্ট্রকে দায়িত্বহীন বলিয়া আখ্যায়িত করেন না। একত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্র অপর কোন কর্তৃত্বের অধীন থাকিতে পারে না। সংক্ষেপে বলা যায় যে, কোন ভূখণ্ডে আইন প্রণয়নের জন্য সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের স্থান স্থানীয় সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে"।*

একত্ববাদের সমর্থনে কোকারের যুক্তি

(৪) একত্ববাদিগণের মতে বহুত্ববাদিগণ নৈতিক ও আইনসঙ্গত ধারণার মধ্যে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। একত্ববাদীদের মতানুসারে সার্বভৌমিকতা আইনগত। ইহার সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু বহুত্ববাদিগণ যে সংঘ-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার দাবি করেন তাহা নৈতিক অধিকার মাত্র। ইহাকে আইনসঙ্গত অধিকার বলা চলে না। বহুত্ববাদিগণ এই নৈতিক অধিকারকে আইনসঙ্গত অধিকারের পদবাচ্য করিয়া নৈতিক ও আইনসঙ্গত ধারণার মধ্যে স্পষ্টভাবে কোন পার্থক্যের সীমারেখার নির্দেশ করেন না। অবশ্য বলা যায় যে আইন যদি নীতিভিত্তিক না হয় তবে উহাকে কেহই মান্য করিবে না। আইনের মধ্যেই নৈতিক ধারণা লুক্কায়িত আছে। অতএব নৈতিক অধিকারকে আইনসঙ্গত অধিকার হইতে বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা নীতি বহির্ভূত আইনসঙ্গত অধিকার, যাহাকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই কারণেই বহুত্ববাদিগণ নৈতিক ও আইনসঙ্গত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই।

নৈতিক ও আইনসঙ্গত ধারণার মধ্যে পার্থক্য করা হয় নাই

(৫) একত্ববাদের সমর্থকগণের মতে বহুত্ববাদিগণ সার্বভৌমিকতা ও ব্যক্তির আনুগত্যকে বিভক্ত করিয়া বিশৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্যবাদের পথপ্রদর্শকের কার্য করিতেছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে বহুত্ববাদ রাষ্ট্র সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধারণার পুনরুক্তি ছাড়া আর কিছু নহে।

* The monist holds that the state exists to exact and supply law and that the state cannot itself be subjected to limitation of the same character as those which it itself is established to formulate and supply. He does not represent the state as irresponsible, he does maintain that it cannot be responsible to any authority of like character to itself. In brief, state, as an organisation for law within any given territory, is superior to all other social group within such territory."—*Coker.*

কিন্তু একত্ববাদের এই অভিযোগ সত্য নহে, কারণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে বহুত্ববাদিগণ অস্বীকার করেন না। মেইট্‌ল্যান্ড রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠনের উপরে স্থান দিয়াছেন। ডুর্ক হাইম অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণের এবং তত্ত্বাবধানের ভার রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করিয়া রাষ্ট্রের গুরুত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। আবার, তিনি অন্যান্য সংগঠনকে রাষ্ট্রের অধীনে চলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। পল বঁকুর রাষ্ট্রকে জাতীয় ঐক্য ও সাধারণ স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ডঃ ফিগস বলিয়াছেন : রাষ্ট্র হইল "সকল সংগঠনের সংগঠন" (Society of societies)। বার্কারের মতে রাষ্ট্র সমাজের বিভিন্ন সম্পর্কের শেষ মীমাংসার ভার গ্রহণ করে। এই সম্পর্কগুলি হইল সমাজের অন্যান্য সংগঠনগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সকলের সম্পর্ক। অধ্যাপক ল্যাস্কি রাষ্ট্রের হস্তে প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষপাতী। অতএব দেখা যায় বহুত্ববাদীরা নৈরাজ্যবাদকে সমর্থন করেন না।

(৬) বহুত্ববাদের আর একটি ত্রুটি হইল এই যে, বহুত্ববাদ রাষ্ট্রকে একটি শ্রেণীসম্বন্ধের প্রকাশ হিসাবে গণনা করে না। বস্তুতঃ, সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা যাহাদের হস্তে থাকে রাষ্ট্র তাহাদের ইচ্ছাতেই তাহাদের স্বার্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়। অতএব ইহারাই সর্বময়, চূড়ান্ত এবং অপ্রতিহত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ব্যবহারকারী। বহুত্ববাদ এই দিকটিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু সংঘস্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

উপসংহার : বহুত্ববাদের জন্ম হয় সেই যুগে যে-যুগে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও বিশেষ স্বার্থের মধ্যে ব্যক্তির আনুগত্য লইয়া সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কর্তৃত্ব লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়েই বহুত্ববাদের জন্ম হয়। সংঘস্বাতন্ত্র্যের দাবিই বহুত্ববাদের প্রধানতম দাবি। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্র সংঘস্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে স্বীকার করিয়া লওয়ায় বহুত্ববাদ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

বর্তমানে বহুত্ববাদিগণ আইনসম্মত চূড়ান্ত ক্ষমতাধিকারীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কারণ যদি কোন শ্রমিকসংঘকে কর্তৃত্বের অংশীদার করিতে হয় তবে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আবার দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যাহাতে কোন সংঘ অপর সংঘের উপর জুলুম না করে ; যেমন, উৎপাদক-সংঘ যেন ক্রেতাসংঘের উপর জুলুম না করে ; অতএব স্বার্থের স্বন্দ্ব-মীমাংসার জন্য, কেন্দ্রীয় সংযোগ ও তত্ত্বাবধানের জন্য এক আইনগত কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার উপায় নাই।

আবার এই কর্তৃত্বের স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে, সংঘগুলির স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইবে। বস্তুতঃ বহুত্ববাদ একত্ববাদের ত্রুটিগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ও সংঘস্বাতন্ত্র্যের উপযোগিতার আলোচনা করিয়া উভয়ের ক্ষমতাকে একটি সীমা নির্দেশ করার চেষ্টা করে মাত্র।

একত্ববাদ বনাম বহুত্ববাদ

একত্ববাদ	বহুত্ববাদ
(১) একত্ববাদের সমর্থক হইলেন বোড্যাঁ, হব্‌স্‌, বেন্থাম ও অস্টিন প্রমুখ দার্শনিকগণ।	(১) বহুত্ববাদের প্রচারক হইলেন গিয়ার্কে, মেইট্‌ল্যান্ড, ফিগস, ডুগো, ক্র্যাব্‌, ল্যাস্কি, কোল, হবসন, লিন্ডসে, বার্কার, ম্যাক্‌ আইভার, ফলেট প্রভৃতি দার্শনিকগণ।

(২) একত্ববাদ অনুসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অপ্রতিহত, সর্বব্যাপক, অসীম ও চূড়ান্ত।	(২) রাষ্ট্রের কোন অপ্রতিহত, সর্বব্যাপক, অসীম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিতে পারে না।
(৩) ইহা অবিভাজ্য।	(৩) রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য নহে।
(৪) ইহা একমাত্র রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চরম।	(৪) ইহা একমাত্র রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নহে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম।
(৫) ইহা আইনগত। রাষ্ট্রের আইনগত অধিকারী একটিই থাকিতে পারে।	(৫) সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আইন-সম্মত মতবাদ সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও বিপজ্জনক মতবাদ। ল্যাস্কি বলেন: সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আইনসম্মত মতবাদকে রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের উপযোগী করিয়া তোলা অসম্ভব।
(৬) রাষ্ট্রই একমাত্র বলপ্রয়োগের অধিকারী। রাষ্ট্রের আইন বাধ্যতা-মূলক। এই আইন অমান্য করিলে রাষ্ট্র দৈহিক শাস্তি দিতে পারে।	(৬) পাশবিক বলগুলিই একমাত্র বল নহে; সামাজিক, নৈতিক ও মানবিক বলও বল। রাষ্ট্র যদি পাশবিক বল ব্যবহার করিতে পারে তবে সমাজও নৈতিক বল প্রয়োগ করিতে পারে এবং উহা কম কঠোর নহে।
(৭) রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তি ও সংঘগুলি রাষ্ট্রের অনুমত্যানুসারে অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকে একত্ব-বাদিগণ স্বীকার করেন না;	(৭) রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্ভর করে স্বীকৃতির উপর। সমাজ কর্তৃক অস্বীকৃত ক্ষমতা ক্ষমতাই নহে।

সারসংক্ষেপ

সার্বভৌমিকতার স্বরূপ: সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সর্বোচ্চ ক্ষমতা। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ যে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল ও সংগঠনের উপর ইহার নির্দেশ প্রযোজ্য ও বাধ্যতামূলক। সার্বভৌমিকের আজ্ঞা বাধ্যতামূলক। আইন অমান্যকারীকে দৈহিক শাস্তি দেবার ক্ষমতাও ইহার আছে। রাষ্ট্রে শান্তি বজায় রাখিতে ও তাহার স্থিরতা ও স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে এই একচেটিয়া ক্ষমতা বিশেষ প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের পক্ষে সার্বভৌমিকতার অর্থ আইনগত ক্ষমতা। ইহা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করণের ক্ষমতা। সংক্ষেপে বলা যায়, ইহা রাষ্ট্রের আইনগত চূড়ান্ত, অপ্রতিহত এবং অবিভাজ্য ক্ষমতা। অনেকে বলেন যে, সার্বভৌমিকতা আইনগত বলিয়াই সার্বভৌমিকের নির্দেশের নৈতিক প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। আবার কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, সার্বভৌমিকতাই আইনের উৎস। অতএব আইন সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হইতে পারে না।

সার্বভৌমিকতা ক্ষমতার একচেটিয়াত্ব বটে ; কিন্তু জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এই ক্ষমতাকে স্বীকার না করিলে এবং মান্য না করিলে এই শক্তি অর্থহীন। অতএব কেহ কেহ বলেন সার্বভৌমিকতার মূল্য নির্ভর করে স্বীকৃতির উপর।

সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের বিকাশ : ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইউরোপে সার্ব-ভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটন হয়। মধ্যযুগের শেষে রাষ্ট্রশক্তি নূতন রূপ পরিগ্রহ করে এবং ধীরে ধীরে তাহার প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। তত্ত্ব পরে আসিয়া বাস্তব অবস্থাকে ধারণাতে রূপ দান করে। বোডাঁ, হবস্, রুশো, বেন্থাম, অস্টিন প্রভৃতি চিন্তাবীর সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেন। ইহাঁদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের মধ্য দিয়াই বিকাশ লাভ করে সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব। মধ্য যুগে যে জাতীয় রাষ্ট্রের (National State) জন্ম হয়, সেই জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে সার্বভৌমিকতাকে গণ্য করা হয়।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক : (১) আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা ; ইহা হইল রাষ্ট্রাভ্যন্তরে চূড়ান্ত আদেশ দিবার ক্ষমতা। (২) বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা, ইহার অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য : (১) চরমতা, (২) সর্বজনীনতা, (৩) স্থায়িত্ব, (৪) অবিভাজ্যতা, (৫) হস্তান্তরযোগ্যহীনতা।

সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ : (১) নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা—ইহা হইল মর্যাদাসূচক উপাধি ; যেমন, রাজা, রাণী (ইংল্যাণ্ডের রাণী) ইত্যাদি।

(২) আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্বে বলা হইয়াছে। এই সার্বভৌমিকতা হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইন হইল সার্বভৌমের আজ্ঞা। ইহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে অর্পণ করা হয়। আইনবিদের চক্ষে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাই একমাত্র সার্বভৌমিকতা।

(৩) রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্লীন শক্তি হিসাবে কাজ করিয়া থাকে এবং আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ; রাষ্ট্রের নির্বাচকমণ্ডলীকে ইহার উদাহরণস্বরূপ ধরা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা আর আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা হইল একই সার্বভৌমিকতার দ্বিবিধ প্রকাশ। ইহার দ্বারা সার্বভৌকিতাকে খণ্ডন করা বোঝানো হয় না।

(৪) জাতীয় সার্বভৌমিকতা শব্দের অর্থ জাতীয়তার প্রাধান্য। অবশ্য, এই শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত অস্পষ্ট।

(৫) জনতার সার্বভৌমিকতার অর্থ হইল জনগণই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। রুশোর সমষ্টিগত ইচ্ছার তত্ত্ব ও বিপ্লবের অধিকারের দাবি এই সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(৬) বাস্তব সার্বভৌমিকতার অর্থ প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত ক্ষমতার ব্যবহার।

(৭) আইনসিদ্ধ সার্বভৌমিকতার অর্থ এই ক্ষমতা ব্যবহার করার আইনসঙ্গত অধিকার। যুদ্ধের সময় বিদেশী শত্রুসৈন্যের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে বিদেশী সৈনিকদের হাতে। কিন্তু আইনসিদ্ধ সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইল আদি রাষ্ট্র।

(৮) বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

অস্টিনের ধারণা : "যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কোন বিশেষ সমাজের অত্যন্ত আনুগত্য লাভ করিতে থাকেন অথচ সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সমপর্যায়ভুক্ত অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে, তবে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি উক্ত সমাজের সার্বভৌম এবং উক্ত সার্বভৌম সম্বলিত সমাজ একটি স্বাধীন ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ হিসাবে গণ্য হইবে।"

অস্টিনের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চরম অপ্রতিহত এবং শাশ্বত ক্ষমতা। ইহা নির্দিষ্ট ব্যক্তি-সংসদের মধ্যে অবস্থিত। এই সার্বভৌমের আদেশই হইল আইন।

সমালোচনা : অস্টিনের এই সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে অনেক সমালোচক সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, অস্টিনের সার্বভৌমিকতা আইনগত। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই সার্বভৌমিকতা জনগণের স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে বলিয়া ইহা গণতন্ত্রের বিরোধী।

তৃতীয়তঃ, সার্বভৌমিকতার আদেশকে আইন বলা যায় না। কারণ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে বহু প্রথাগত আইন আছে। এই প্রথাগত আইনগুলি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের নির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। অস্টিন এই প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, অস্টিন এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, মানুষ বলপ্রয়োগের ভয়েই আইনকে মান্য করে, কিন্তু আইন যদি নীতিবিরুদ্ধ হয় তবে মানুষ এই আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যিনি বা যাঁহারা সার্বভৌমিকতার অধিকারী।

ষষ্ঠতঃ, সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য ও অনিয়ন্ত্রিত নহে। বহুত্ববাদিগণের ধারণায় ইহা সমাজের বিভিন্ন সংঘের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহা বিভাজ্য। আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ মনে করেন যে ইহা আন্তর্জাতিক আইনেও রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অস্টিনের মতবাদের বিরুদ্ধে এই সমালোচনা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। কারণ, অস্টিন পাশবিক বলকে কখনই সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হিসাবে ধরেন নাই। অস্টিনের সার্বভৌমিকতা যদি শুধু আইনসম্মত দৃষ্টিকোণ হইতে ধরা হয় তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনায় অনেক সহায়তা করিবে।

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় অস্টিন নির্দিষ্ট সার্বভৌমিকতাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার নির্ণয় সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মত পোষণ করেন। অনেকের মতে যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য থাকে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র একটিই রাষ্ট্র। যদিও এখানে

সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তথাপি সার্বভৌম ক্ষমতার একাকিত্ব এখানেও লক্ষ্য করা যায়। কেহ কেহ বলেন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা সংবিধানের মধ্যেই নিহিত।

বহুত্ববাদ: সার্বভৌমিকতার একত্ববাদের বিরুদ্ধ মতবাদকেই বলে বহুত্ববাদ। বহুত্ববাদিগণের মতে রাষ্ট্র সংঘমূলক এবং সংঘমূলক বলিয়াই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রতিটি 'সংঘ স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম'। এই সকল সংঘের এলাকার মধ্যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ চলে না। আবার বহুত্ববাদিগণের মতে সার্বভৌমের আজ্ঞাকে আইন বলা চলে না এবং রাষ্ট্র আইনের উৎস নহে এবং আইনের ঊর্ধ্বেও নহে।

সমালোচনা: বহুত্ববাদিগণ রাষ্ট্রের শক্তির একচেটিয়াত্বের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সমালোচনা করিয়াছেন। বহুত্ববাদিগণ ক্ষমতা বণ্টনের পক্ষপাতী এবং বর্তমান যুগের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে সংঘসমূহের অবদানকে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই স্বীকৃতি দিয়াছেন। কিন্তু বহুত্ববাদিগণ নৈতিক ও আইনসঙ্গত ধারার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন না। আবার সমাজে এক চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন। রাষ্ট্র যে শ্রেণী সম্বন্ধ মূর্ত প্রকাশ এবং দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ভূমিকায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাহাও বহুত্ববাদিগণ স্বীকার করেন না। ফলে ইহা বিশৃঙ্খলাকেই আহ্বান করে। কোকার প্রমুখ চিন্তাবীর এই বহুত্ববাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন।

একত্ববাদ বনাম বহুত্ববাদ: একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ। একত্ববাদ অনুসারে সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের চরম, অসীম, অবিভাজ্য আইনগত ক্ষমতা আর বহুত্ববাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কোন অসীম ও চরম ক্ষমতা নাই। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য নয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। ইহা আইনসঙ্গত নহে।

১। বহুত্ববাদের মতে রাষ্ট্রের মতো বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও প্রয়োজন আছে। সামাজিক সংঘগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম।

২। রাষ্ট্র যেমন দৈহিক শাস্তি দিতে পারে, সামাজিক সংঘগুলিও নৈতিক ও ধর্মীয় শাস্তি দিতে পারে।

৩। রাষ্ট্র মানুষের অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। রাষ্ট্র তাহার কার্যাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহার সার্বভৌমিকতা অবাধ নয়।

৪। রাষ্ট্র সকল সামাজিক কাজ করিতে পারে না।

১০

আইন
(Law)

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Law) : আইনকে নিয়মকানুন বা বিধি বলিয়াও আখ্যায়িত করা হয়। বিধি বা নিয়ম কানুন আবার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজজীবনে মানুষের বাহ্যিক আচরণ (external behaviour) নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে কতকগুলি রীতিনীতি (customs), চিরাচরিত প্রথা ও বিধিনিষেধ আছে তাহাকে বলে সামাজিক আইন (Social Laws)। সমাজের চাপে মানুষ এই বিধিগুলিকে মানা করিয়া চলে।

আবার প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ দেখা যায় তাহাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক বিধি (Scientific Laws)। বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্রগুলি —যেমন, রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতেও কার্যকারণের সম্পর্ক বুঝাইতে আইন শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

নীতিশাস্ত্রেও আইন শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সংঘজীবন যাপন করিবার জন্য মানুষকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্নের সহিত জড়িত যে নৈতিক বিধিগুলি মানিয়া চলিতে হয় তাহাকে বলে নৈতিক বিধি বা আইন (Moral Laws)। এই নৈতিক বিধি মানুষের সকল উদ্দেশ্য ও বিবেক সম্বন্ধে আলোচনা করে।

পরিশেষে মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাষ্ট্র যে সকল নিয়মকানুন প্রণয়ন করে বা রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত যে সকল নিয়মকানুন থাকে তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় বিধি (Political Laws or Positive Laws) বলা হয়। এই গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য আইন এই পর্যায়ভুক্ত।

উপরে যে সকল আইনের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম বা প্রাকৃতিক বিধি দেশকালাতীত, অব্যয় ও অপরিবর্তনশীল। আর সামাজিক বিধি নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। মানুষের সমাজজীবন গতিশীল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে বিভিন্নকালে মানুষের জীবন বিভিন্ন ধরনের হইয়াছে। সুতরাং মানবসমাজের নিয়মকানুনও বৈচিত্র্যময়। সদাপরিবর্তনশীল মানবজীবনের সহিত তাল রক্ষা করিয়া এই নিয়মকানুনগুলিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। লক্ষ্য করা গিয়াছে

আইনের প্রকৃতি

যে, মানবজীবন একটা কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য তাহাকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

আইনের প্রকৃতিই হইল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করা। সামাজিক আইন সমাজ-জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে। নৈতিক

আইনের পক্ষেও এই একই কথা খাটে। মানুষের ভালোমন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া মানুষের বিবেক যাহাতে মানুষকে সুপথে চালিত করিতে পারে, তাহার জন্যই নৈতিক বিধি বা আইন প্রচলিত হয়। বিশ্ব-ব্যবস্থাও নিয়মাধীন।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা হয় একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পৌঁছিবার জন্য। রাষ্ট্র এই আইনকে বলপ্রয়োগের দ্বারা মান্য করিতে বাধ্য করে। অপরাপর ক্ষেত্রে আইনকে মান্য করা বা না করা নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছা এবং সামাজিক চাপের উপর। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্ আইভার বলেন: "রাষ্ট্রীয় আইন মান্য না করিলে সার্বভৌম শক্তি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদান করিতে পারে...(কিন্তু) সভ্যসমাজে রাষ্ট্রীয় আইন ছাড়া অন্য কোন বিধি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বলবৎ করা হয় না" *

রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যজীবনের যে অংশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত সেই অংশ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের যে বিধান তাহাকে লইয়াই রাষ্ট্রীয় আইনের কারবার। আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যায়, রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের যে সকল বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের সহিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাই আইনের বিষয়বস্তু। মানুষের আত্মিক জীবনের সহিত আইনের সম্বন্ধ শুধু সেখানে যেখানে এই আত্মিক জীবনের বাহ্যিক প্রকাশ হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্র

আইনকে বলা হইয়াছে রাষ্ট্রিক জীবনের ধারক। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয় যে, আইন রাষ্ট্রান্তর্গত একজন মানুষের সহিত অন্য একজন মানুষের যোগসূত্র স্থাপন করে; আবার রাষ্ট্রের বাহ্যিক ঐক্য আইনই রক্ষা করে। আইন না থাকিলে রাষ্ট্র এক অরাজকতার রাজ্যে পরিণত হইত। আইন মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষা করে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করে। আইন ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদিগের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া, তাহাদের জীবনকে সুপথে পরিচালিত করা এবং তাহাদের উদ্দেশ্য লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রভৃতি কাজ আইনই করিয়া থাকে এবং করিতে পারে।

আইন ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনা করা হয় না

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, আইনের সঙ্গে মানুষের সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। কারণ মানুষের সুখদুঃখ আত্মগত (Subjective), তবে আইনের সহিত মানুষের সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও পরোক্ষ সম্বন্ধ আছে। কারণ রাষ্ট্র আইন দ্বারা মানুষের সুখলাভের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। আবার এই অনুকূল পরিবেশের জন্যই মানুষ সুখী হইতে পারে।

আবার আইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আইনের প্রকৃতির আর একটি দিকের ইঙ্গিত দেয়। আইন রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমাজের জড় উপাদান অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি এবং বস্তুনিরপেক্ষ অর্থাৎ ধর্ম ও নীতি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। আইনে সমাজের সমসাময়িক সকল উপাদানই প্রতিফলিত হয়। এইদিক হইতে বিচার করিলে আইন সমাজ-জীবনের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। রাষ্ট্রিক কাঠামোই আইনের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। সেইজন্য দেখা যায়, ধনতান্ত্রিক,

---

* The last resort of enforcement lies behind law."—"The law of the State alone in a demarcated and advanced society, is coercive".—*Mac Iver*.

গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও একনায়কত্বের দেশে আইন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ আইনের সংজ্ঞা দিয়াছেন। অস্টিনের বিশ্লেষণী সংজ্ঞা অনুসারে আইন হইল "নিম্নতনের প্রতি ঊর্ধ্বতন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষের আদেশ"।* হল্যান্ড বলেন: "মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রযুক্ত সাধারণ নিয়মই আইন।"† হেনরী মেইন অবশ্য এই সংজ্ঞা দ্বয়ের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক-গণ বলেন, শুধু সার্বভৌমের আজ্ঞাতেই আইন সৃষ্ট হয় না। আইন সৃষ্টির পশ্চাতে সাধারণের সম্মতি থাকা প্রয়োজন এবং বহু প্রচলিত প্রথা হইতেও আইন সৃষ্ট হয়। সার্বভৌম এই প্রচলিত প্রথাগুলিকে মানিয়া লইয়া ইহাদিগকে আইনে রূপ দিতে বাধ্য হন। সর্বোপরি আইনের পশ্চাতে জনতার সম্মতি থাকা প্রয়োজন। জনগণ যে আইনকে মান্য করিতে চাহিবে না তাহাকে আইন বলা উচিত নয়। জনমতের ইচ্ছাই আইনে রূপ পায়। অবশ্য যখন পর্যন্ত রাষ্ট্র জনমতকে এবং প্রচলিত প্রথাকে আইন রূপে স্বীকার করিয়া না লয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাদিগকে আইনের পদবাচ্য করা যায় না।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আইনের সংজ্ঞা

উপরিউক্ত আলোচনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন আইনের একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলেন: আইন হইল মানুষের স্থায়ী চিন্তা ও আচার-ব্যবহারের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র বিধিবদ্ধ করে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থন থাকে, "Law is that portion of the established thought and habit which has found a distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the Government".)। বার্কার প্রমুখের মতে আইনকে শুধু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কর্তৃক স্বীকৃত হইলেই হইবে না, ইহার নৈতিক মূল্যও থাকা চাই ("Ideally law ought to have both validity and value"—*Barker*)। অর্থাৎ আইনকে এমন হইতে হইবে যাহার নৈতিক মূল্য আছে (value) এবং যাহা রাষ্ট্র কর্তৃত্ব কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত (validity) হয়।

বিভিন্ন মতবাদ অনুসারে আইনের সংজ্ঞা

(Different Theories of Law)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আইনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। বিশ্লেষণমূলক, ঐতিহাসিক, সমাজ-বিজ্ঞানমূলক, দার্শনিক এবং মার্কসীয় ধারণানুসারে আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। এই সকল ধারণা বা মতবাদসমূহ বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিলেও ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে আইন সম্বন্ধে কোন একটি মাত্র সংজ্ঞার নির্দেশ না পাওয়ায় কতকটা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নে পাঁচটি দৃষ্টিকোণ হইতে আইনের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করা হইল।

* "Law is the command of the Political Superior."—*Austin.*

† A Law is a general rule of external action enforced by the Sovereign Political authority.—*Holland.*

(ক) বিশ্লেষণ-মূলক ধারণা (Analytical Concept) : এই মতবাদ অনুসারে "আইন হইল নিম্নতনের প্রতি সার্বভৌমের আদেশ" (Law is the command of the Sovereign)। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় আইনের ভিত্তি হইল কতকগুলি বিষয় সম্পাদন করার এবং কতকগুলি বিষয় সম্পাদন হইতে বিরত থাকার জন্য সার্বভৌমের আদেশ। এই মতবাদ অনুসারে সার্বভৌমকে আইনের উৎস, ধারক ও বাহক হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, আইন এক নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হয় এবং আইনকে বলবৎ করিবার জন্য প্রয়োজন হয় এক সার্বভৌম শক্তি। এই মতবাদের প্রচারক হইলেন অস্টিন, মেকিয়াভেলি এবং হল্যান্ড প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

(খ) বিশ্লেষণী বনাম ঐতিহাসিক ধারণা (Historical *vs.* Analytical Concept) : অস্টিনের মতবাদের সমালোচনা করিয়া ঐতিহাসিক হেনরী মেইন বলেন যে, আইনকে সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যেক দেশেই আইনসঙ্গত সার্বভৌম রচিত আইন ছাড়া বিভিন্ন প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। অতএব সার্বভৌমের নির্দেশকেই আইনের একমাত্র উৎস হিসাবে ধরা উচিত নহে। আবার আইন কোন স্থিতিশীল শক্তি নহে, ইহা নানাবিধ সামাজিক শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে আইন ঐতিহাসিক বিবর্তনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত প্যাটরসন বলেন যে ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী অতীতের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি আইনকে অতীতের সমগ্র প্রভাবের ফল বলিয়া অভিহিত করেন। এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে, আইন কোন প্রণেতার দ্বারা একদিনে প্রণীত হয় নাই। ইহা অতীতের প্রথা, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি ও জনসাধারণের সম্মতি প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ধীরে ধীরে সৃষ্ট হইয়াছে। এক কথায় ইহা ইতিহাসের ফল। এই মতবাদের সমর্থক হইলেন হেনরী মেইন, স্যাভিগনী, মেইটল্যান্ড ও পোলক প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তি।

এই মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে এবং অস্টিনের বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর-দান প্রসঙ্গে অস্টিনের অনুগামীরা বলেন যে, প্রথা আপনা হইতেই আইনে পরিণত হয় না। আইনে পরিণত হইবার জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। অবশ্য, ইহা সত্য যে, বহুদিন পর্যন্ত প্রথাগত আইনই একমাত্র আইন ছিল। আবার বর্তমানেও সার্বভৌম তাঁহার খেয়াল খুশিমত আইন প্রণয়ন করিতে পারেন না। তাঁহাকেও জনসাধারণের চাপ এবং নৈতিক বিধিসমূহের কথা চিন্তা করিতে হয়। সম্পূর্ণভাবে জনমত-বিরোধী কোন আইন কার্যকরী হয় না। ঐতিহাসিকদের এই যুক্তি স্বীকার করিয়াও বলা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন প্রথা রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দ্বারা অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রথা বা নৈতিক বিধিই রাষ্ট্রীয় আইন বলিয়া গৃহীত হয় না। আবার দেখা যায়, সমাজে এমন কতকগুলি প্রথা বা নৈতিক বিধি আছে যাহা স্পষ্ট নয় এবং জনমত দ্বারা সমর্থিতও নয়। সমাজের প্রথা বা নৈতিক বিধিগুলির মধ্যে যেগুলি জনমত দ্বারা সমর্থিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য রাষ্ট্র সেইগুলিকে আইনে পরিণত করে। ইহাকে বলে আইন প্রণয়ন (Law making)।

উপরোক্ত সমালোচনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরবর্তিকালে অস্টিনের সমর্থকগণ আইনের সংজ্ঞার কিছু রদবদল করেন। এই রদবদলের পর আইনের

সংজ্ঞাটি এইরূপ দাঁড়াইল ঃ সমাজে মানুষের প্রচলিত চিন্তাধারা ও অভ্যাসের যে অংশ নির্দিষ্ট নিয়মের আকারে সমাজকর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যে বিধিগুলি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী শক্তি ও প্রভাব দ্বারা বলবৎ করা হয় তাহাই আইন। এই প্রসঙ্গে অন্যতম বিশ্লেষণ-পন্থী হল্যান্ডের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। হল্যান্ড বলেন ঃ "সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই হইল আইন" ("A law is a general rule of external action enforced by sovereign political authority")। তাহা হইলে দেখা যায়, অস্টিনের অনুগামীরা অস্টিনের সংজ্ঞাকে দুইদিক হইতে সংশোধন করিয়াছেন; যথা—(ক) আইনকে শুধু সার্বভৌমের আজ্ঞা বলিয়া ইঁহারা স্বীকার করেন নাই; সমাজের প্রথা, আচার-ব্যবহার, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতিও আইন সৃষ্টি করে; (খ) আইনের স্রষ্টা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নয়; এই কর্তৃপক্ষ শুধু আইন বলবৎ করে। এই কর্তৃপক্ষও আইনের আওতার মধ্যে।

বর্তমানে বলা হয় যে, আইন জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে আইন ব্যক্তির ও সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা করে না—সেই আইন লোকে মান্যও করিতে চাহে না। সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে আইনকে বলবৎ করিতে পারে না। আবার ইহাও বলা হয় যে, জনগণের সম্মতির উপরই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণই দিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, আইন যদি জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয় তাহা হইলে আইনকে বলবৎ করিতে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় উড্রো উইলসনের সংজ্ঞায়। তিনি বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় আইন ব্যক্তি নির্বিচারে প্রযোজ্য হয়। রাষ্ট্রান্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তিই আইন মানিতে বাধ্য। আইন মানুষের চিন্তাধারার দর্পণস্বরূপ। আবার মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইন পরিবর্তিত হয়। আইনকে আবার একটি শক্তিও বলা হয়। আইনের অবর্তমানে সমাজে অরাজকতা দেখা দেয়। আবার সমাজের সকল লোকই যে সৎ ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সমাজে যাহারা সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে নিযুক্ত তাহাদিগের উপর শক্তি প্রয়োগ করিয়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং তাহাদিগকে আইন মান্য করিতে বাধ্য করা হয়। সমষ্টিগত স্বার্থের জন্যই শক্তি প্রয়োগ করা হয় উইলসন বলেন, "আইন হইল মানুষের স্থায়ী আচার ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন রহিয়াছে।*

সমালোচনা ঃ (১) বিশ্লেষণ-মূলক মতবাদ যেমন ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তন প্রভৃতি যে সকল আইনের উৎস আছে, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া শুধু সার্বভৌমের আদেশকেই আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছে তেমনি ঐতিহাসিক মতবাদও আইনের পশ্চাতে যে সার্বভৌম শক্তি সক্রিয় রহিয়াছে যাহার ফলে আইনানুবর্তিতা কার্যকরী হয়, তাহার কোন ইঙ্গিত দেয় নাই। ফলে বিশ্লেষণমূলক মতবাদ এবং ঐতিহাসিক মতবাদ এককভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

---

* Law is that portion of established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government".—*Woodrow Wilson.*

(২) আবার সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক প্রভৃতি সমাজ-ব্যবস্থায় আইন যে শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ তাহা উভয় মতবাদই অস্বীকার করিয়াছে। সমাজ-তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক মতবাদ সংকীর্ণ। আর বিশ্লেষণ-মূলক ধারণা অগ্রাহ্য করিয়াছে আইনের পশ্চাতে দণ্ডায়মান জনসম্মতিকে। ইহা শুধু শক্তির উপরই জোর দিয়াছে।

(৩) উভয় মতবাদই আইনের মতবাদের দার্শনিকদিগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। আইনের মধ্যে যে আদর্শবাদিতার প্রেরণা ও প্রভাব রহিয়াছে এবং এই আদর্শবাদিতা যে সমাজকে উচ্চতম নীতিবোধের দিকে পরিচালিত করিতেছে তাহার সন্ধান এই সকল মতবাদ দেয় না, আইন লইয়াই ইহাদের কারবার।

(৪) বিশ্লেষণ-মূলক মতবাদ আইনকে স্থিতিশীল বলিয়া মনে করে। কিন্তু গতিশীল সমাজে স্থিতিশীল আইন কখনও বাস্তবধর্মী হইতে পারে না। অবশ্য এইদিক হইতে বিচার করিলে ঐতিহাসিক মতবাদ অনেকটা বাস্তবধর্মী।

উপসংহারে বলা যায়, বিশৃংখল সমাজকে সুশৃংখল করিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে আইনকে বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করিয়া বিশ্লেষণ-মূলক মতবাদ যেমন সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছে, ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক মতবাদ সামাজিক অবস্থার চির-পরিবর্তনশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও মতবাদকে বিজ্ঞানসম্মত করিয়াছে।

(গ) **আইনের সমাজ-বিজ্ঞানমূলক ধারণা (Sociological Concept)**: এই মতবাদ অনুসারে আইন সমাজ দেহ হইতে উদ্ভূত এবং ইহা সমাজ বিবর্তনের ফল। এই মতবাদ এক সমাজমনের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া আইনকে সমাজমনের প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করে। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আইন গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়া নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। সমাজ-বিবর্তনের প্রতি যুগেই রাষ্ট্র সমাজের কতকগুলি স্বার্থ, যাহা জনসাধারণ ন্যায্য বলিয়া মনে করে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। সমাজমনের এই যে ন্যায্য চাহিদা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়, তাহাই আইন। ডুগো, ক্র্যাব্ প্রভৃতি এই মতবাদকে সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐতিহাসিক মতবাদের মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক মতবাদ অসম্পূর্ণ। সুতরাং মতবাদের পরিপূর্ণতার জন্য সমাজমনের সন্ধান করিতে হইবে এবং সমাজমনের অভিব্যক্তি যে আইনে হইয়া থাকে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত আইন সমাজ-দেহ হইতেই উদ্ভূত।

আইন সমাজদেহ হইতে উদ্ভূত

সমালোচনা: সমাজমনের কল্পনা বিতর্কমূলক। কেহ কেহ এই মতবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই মতবাদ বিশ্লেষণমূলক মতবাদের সকল যুক্তিকে অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জগতের নিয়মাবলী সার্বভৌম শক্তিই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়োগ করে। অতএব এই মতবাদ ভ্রমাত্মক। অবশ্য ইহা সত্য যে, সমাজমন যাহাকে ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করে তাহাকে আইনের রূপে স্বীকৃতি দিতেই হয়, অন্যথায় সমাজে বিশৃংখলা দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকে।

(ঘ) **আইনের দার্শনিক মতবাদ (Philosophical Concept) :** দার্শনিকদিগের মতানুসারে আইন হইল আদর্শের প্রকাশ। আইনের স্বরূপ বস্তু-নিরপেক্ষ ; আবার দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বশতঃ আইনের প্রকৃতি ও সংজ্ঞার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন দার্শনিকদিগের মতামত দেওয়া গেল :

(১) গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল আইনকে সামাজিক প্রজ্ঞা বা যুক্তি-নির্ভর বুদ্ধির (Reason) প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সামাজিক প্রজ্ঞা আবার সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের (highest good) পথ উন্মুক্ত করে।

(২) গ্রীসের স্টোইক সম্প্রদায় আইনের এক প্রাকৃতিক রূপ প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে প্রাকৃতিক বিধানই আইন (Natural Law)। এই স্টোইক সম্প্রদায় মনে করিতেন যে, বিশ্ববিধান কতকগুলি সত্য ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ন্যায়নীতিগুলি অব্যয় ও অক্ষয়। ইহারা বাস্তব রাষ্ট্রীয় আইনের ঊর্ধ্বে। ইহারা বস্তু-নিরপেক্ষ এবং মানুষের বিবেক বিবেচনা শক্তির দ্বারা ইহাদের প্রয়োগ করা হয়। মানুষকে বলা হইয়াছে প্রজ্ঞাশীল জীব। সে বিচার ক্ষমতার দ্বারা প্রাকৃতিক বিধানের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে এবং প্রাকৃতিক আইনের মানদণ্ডে বাস্তব আইনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক বিধান-বাদকে সমর্থন করেন রোমক স্টোইকগণ, মধ্যযুগীয় চিন্তাবীরগণ এবং ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকগণ। এই সকল দার্শনিকদের মতানুসারে বাস্তব আইন যত বেশী প্রাকৃতিক আইনের অনুবর্তী হইবে, তত বেশী গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৩) অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশো আইনকে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনিও এই মত পোষণ করেন যে, সত্যদৃষ্টিতে আইন বস্তুগ্রাহ্য নয়। আইন হইল সমষ্টিগত ইচ্ছাপ্রসূত নিয়মকানুন। রুশোর মতবাদ সম্বন্ধে পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

(৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের মতে রাষ্ট্রের আইন হইল প্রজ্ঞা ও সর্বোচ্চ নীতির প্রতীক।

(ঙ) **মার্কসীয় মতবাদ (Marxian Theory of Law) :** বস্তুবাদী দার্শনিক-দিগের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রে ধনোৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়ত পরিবর্তন হয়। এই পরি-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। প্রত্যেক যুগেই একটি বিশেষ অধিকারী শ্রেণী ধনোৎপাদনের উৎসগুলি অধিকার করে। পশুপালনের যুগে পশুর মালিকগণ, সামন্তযুগে জমিদারগণ এবং শিল্পযুগে শিল্পপতিগণ ধনবলে বলীয়ান হইয়া সমাজের উপর আধিপত্য করে। বিভিন্ন যুগে এই সকল শ্রেণী নিজেদের স্বার্থানুকূল্যে আইন প্রণয়ন করে এবং পুলিশ ও সৈন্য সামন্তের সহায়তায় আইনকে বলবৎ করে। সুতরাং আইন হইল অধিকারী শ্রেণীর স্বার্থবাহী নিয়মকানুন। আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যায় আইন হইল শ্রেণীস্বার্থের যান্ত্রিক প্রকাশ। ল্যাস্কি বলেন : "যাহারা অর্থনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী, রাষ্ট্র তাহাদের অভাবকে প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের আইন হইল একটি মুখোশ যাহার আবরণের পশ্চাতে থাকিয়া ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের সুবিধা ভোগ করে"।*

*"The State expresses the wants of those who dominate the economic system. The legal order is a mask behind which a dominant economic interest secures the benefits of political authority."—*Laski*.

সমালোচনা ঃ ভাববাদী দার্শনিকদিগের আইনের ব্যাখ্যা কল্পনা-ভিত্তিক। ইহা বাস্তবধর্মী নয় বলিয়া ইহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু ইহা আইনের আদর্শের সন্ধান দেয়। আইনপ্রণেতাগণ যদি আদর্শের কথা চিন্তা না করিয়া আইনের পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে তবে সমাজ আদর্শহীন পথে পরিচালিত হইবে। অতএব আইনকে শুধু বাস্তবধর্মী হইলেই চলিবে না।

আবার কেহ কেহ আইনকে সর্বোচ্চ নীতির প্রকাশ হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা এই যুক্তি দাঁড় করান যে, যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন তাঁহারা নিজেদের বিবেকদ্বারা পরিচালিত হন এবং যাহা নীতিবিগর্হিত এবং নীতিভ্রষ্ট তাহাকে কেহই মান্য করিতে চায় না; অতএব নৈতিক ভিত্তির উপরই আইন প্রতিষ্ঠিত।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আইনের যে সকল সংজ্ঞা পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ ঃ (১) আইন হইল সার্বভৌমের আজ্ঞা মাত্র, (২) আইন ইতিহাসের ফল, (৩) আইন সমাজ বিবর্তনের ফল, (৪) আইন আদর্শের প্রকাশ, (৫) আইন শ্রেণী-স্বার্থের রাষ্ট্রিক অভিব্যক্তি, (৬) আইন সর্বোচ্চ নীতির অভিব্যক্তি।

আইনের উৎস
(Sources of Law)

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বীকার করিতে দোষ নাই যে আইনের পশ্চাতে যে শক্তি ও স্বীকৃতি প্রয়োজন তাহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিই দিয়া থাকেন; কিন্তু আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আইন যে সকল উপাদানে গঠিত তাহার উৎস শুধু সার্বভৌমের আদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাহার উৎস সার্বভৌমকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সমাজদেহে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে আইনের বিভিন্ন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। হল্যান্ড নিম্নলিখিতগুলিকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন ঃ

(১) প্রথা (Custom) ঃ প্রথা হইল অধিকাংশ ব্যক্তি দ্বারা দীর্ঘকাল পালিত আচার-ব্যবহার। এই আচার-ব্যবহার (ক) প্রথমে পরিবারে বা গোষ্ঠীর মধ্যেই উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। পরে এই আচার-ব্যবহারগুলির মধ্যে যে সকল আচার-ব্যবহার (খ) সমসাময়িক ধর্ম ও নীতির সহিত সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে এবং (গ) সমাজের অধিকাংশ মানুষের দ্বারা স্বীকৃত হয় সেইগুলিই আইনের মর্যাদা লাভ করে।

আবার এই আচার-ব্যবহারগুলি যখন আইনের মর্যাদা লাভ করিল তখন মানুষ ধর্মের বা শাস্তির ভয়ে বা উপযোগিতার জন্য বা অনুকরণ করিবার জন্য তাহা সকলেই মান্য করিত। প্রথাই আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস। প্রাচীনকালে আইন ছিল প্রথামূলক। প্রাচীনকালে সমাজও রাষ্ট্র প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। অবশ্য, প্রথার উদ্ভব কখন হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না, তথাপি ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রাচীনকালে প্রথা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। বর্তমানকালে প্রথার প্রভুত্ব লক্ষ্য করা না গেলেও ভারতের হিন্দু ও মুসলমান আইন এবং ব্রিটেনের প্রথাগত আইন

(Common Law) এই কথাই প্রমাণ করে যে, প্রথাসকল আইনের পর্যায়ে উন্নীত হইতেছে এবং আইনের মর্যাদা পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্‌আইভারের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: 'আইনের বিপুলকায় গ্রন্থে রাষ্ট্র এখানে ওখানে দুই-একটা আঁচড় কাটিতে পারে কিন্তু, মানুষ যেমন তাহার শরীরকে নূতন করিয়া গঠন করিতে পারে না, রাষ্ট্রও তেমনি আইনকে কখনও নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না"।* প্রচলিত প্রথাকে ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্র তাহার রাষ্ট্রিক আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। প্রথা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। এমন কি রাষ্ট্রের উৎপত্তির অনেক পূর্ব হইতেই প্রথাগুলি চলিয়া আসিতে থাকে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর রাষ্ট্র তাহাদিগকে শুধু স্বীকৃতি দেয় মাত্র।

ম্যাক্ আইভারের মত

(২) ধর্ম (Religion): প্রথার মতোই ধর্মীয় অনুশাসনগুলি আইন-সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। আদিম ও প্রাচীন সমাজের বিধি নিষেধ ধর্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীনকালের এই সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি ছিল নেতিবাচক অর্থাৎ ইহা করিও না, উহা করিও না, তাহা হইলে দেবতা অসন্তুষ্ট হইবে। এই অনুশাসনগুলি সমাজজীবনকে নানাভাবে সুসংবদ্ধ করিয়া সমষ্টিগত জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দিয়াছে।

প্রাচীনকালে প্রথা ছিল আইন আর আইন ছিল ধর্ম। অর্থাৎ, আইন ও ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে ইহা রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করিয়া তাহার নির্দেশকেই আইনরূপে মান্য করিতে শিক্ষা দিয়াছে। আর পরোক্ষভাবে ইহা প্রথাকে সমর্থন করিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি উইলসন দেখাইয়াছেন যে, প্রথম যুগের রোমক আইন কতকগুলি ধর্মীয় অনুশাসন ব্যতীত আর কিছু নহে। হিন্দু ও মুসলমান আইন লক্ষ্য করিলেও বুঝা যাইবে যে, ধর্মই আইনের উৎস।

(৩) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Judicial decision): সমাজজীবনে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা আদিমকালে প্রথা ও ধর্মের অনুশাসনের দ্বারাই হইত। কিন্তু, কালক্রমে সমাজজীবন যখন জটিলতর হইল তখন প্রথা ও ধর্মের অনুশাসনের সঙ্গে বিচার-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। প্রথমে রাজা বা দলপতির উপরই বিচারের ভার ন্যস্ত করা হইত। রাজা বা দলপতি বিচারকালে যখন প্রথা ও ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে বিভিন্ন বিচার্য সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইতেন না তখন তিনি বা তাঁহারা নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতেন। এই প্রসঙ্গে গেটেলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য; তিনি বলেন: "আইন-প্রণেতা হিসাবে রাষ্ট্রের জন্ম হয় নাই, রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল প্রথার ব্যাখ্যাকর্তা ও প্রয়োগকারী হিসাবে"। জটিলতর সমাজ-ব্যবস্থায় রাজা বা দলপতির বিচার-মীমাংসাও আইনের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমানকালেও দেখা যায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচার-মীমাংসা আইনের মর্যাদা লাভ করে।

এখন প্রশ্ন হইল বিচার-মীমাংসাকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় কেন? উত্তরে

* 'In the great book of law, the State merely writes new sentences here and there and scratches out an old one...the State can no more reconstitute at any time the law as a whole than a man can remake his body."

বলা যায়, (ক) আইন হইল স্থিতিশীল আর সমাজ হইল গতিশীল। গতিশীল সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হইলে স্থিতিশীল আইনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ স্থিতিশীল আইনকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিবর্তন করিয়া বিচার-মীমাংসা দিয়া থাকেন। পরে এই বিচার-মীমাংসাই এক স্বতন্ত্র আইনে পরিণত হয়। (খ) দ্বিতীয় কারণ হইল, সকল অবস্থা পূর্ব হইতেই কল্পনা করিয়া কোন লিখিত আইনই ভবিষ্যতের সকল মোকদ্দমার ঘটনাবলী সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারে না। নিত্য নূতন ঘটনা ও পরিস্থিতি যখন আদালতের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় তখন বিচারপতিগণ ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আইনের সহিত সঙ্গতি-সম্পন্ন ন্যায্য ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া নূতন নীতির প্রবর্তন করেন। এই বিচারের রায়গুলিই আইনের উৎস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি মার্শাল, ভারতবর্ষে বার্ণস্, পীকক্ ও দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি বিচারপতিগণ বিচার মীমাংসার মাধ্যমে বহু আইন সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব বিচারপতিগণের রায় আইনের অপর আর একটি উৎস।

গতিশীল সমাজের সঙ্গে চলিতে হইলে আইনের সংশোধন প্রয়োজন

(৪) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific Discussion): অভিজ্ঞ আইনবিদ্‌গণ তাঁহাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক সময় নূতন আইন-সৃষ্টিতে এবং প্রচলিত আইনের সংশোধন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করেন। এই আইনবিদ্‌দিগের ব্যাখ্যা ও প্রস্তাব অনেক দেশেই গৃহীত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে রাসবিহারী ঘোষের বন্ধকী সম্পত্তি-সম্পর্কিত পুস্তক এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীধন-সম্পর্কিত পুস্তক বিচার-মীমাংসার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতে এই দুইখানি পুস্তক আইনের উৎস হিসাবে যথেষ্ট স্বীকৃতি পাইয়াছে।

(৫) ন্যায়নীতি (Equity): পূর্বেই বলা হইয়াছে আইন স্থিতিশীল, আর সমাজ গতিশীল। গতিশীল সমাজ-জীবনের সহিত তাল রাখিয়া স্থিতিশীল আইন চলিতে অসমর্থ, তাই আইনকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। আইনের এই অসম্পূর্ণতার জন্য বিচারপতিগণ অনেক সময় নিজেদের ন্যায় ও বিবেকবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করেন। বিচারকার্য যাহাতে ন্যায়ধর্ম অনুসারে পরিচালিত হয় সেইজন্য বিচারকগণ ন্যায়নীতি অনুসরণ করেন। এই ন্যায়নীতি শুধু প্রজ্ঞা বা যুক্তিসঙ্গত নয়, শাশ্বতও বটে। সুতরাং ইহাকে রাষ্ট্রের সমসাময়িক আইনের ঊর্ধ্বে বলা যাইতে পারে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। রোমক আইন যখন গতিশীল সমাজ-জীবনের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ হইল তখন রোমান প্রেটারগণ (বিচারপতি) প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Law) যাহা অব্যয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচার-মীমাংসা দিতেন। ব্রিটেনেও এই শাশ্বত নীতি (Equity) প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই ন্যায়নীতিকে আইনের একটি উৎস বলা যাইতে পারে।

বিচার-মীমাংসা ও ন্যায়নীতি উভয় ক্ষেত্রেই বিচারপতিগণ তাঁহাদের প্রজ্ঞার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিচার-মীমাংসার সহিত ন্যায়নীতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করিয়া প্রচলিত আইনের সহিত সুসঙ্গত নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন। আর ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রচলিত আইন যে সকল বিচার্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব সেই সকল

ক্ষেত্রে ন্যায়নীতিকে প্রয়োগ করা হয়। অতএব বিচার-মীমাংসা আর ন্যায়নীতি এক নয়। এই প্রসঙ্গে হেনরী মেইন বলেন যে, আইনকে সমাজের ন্যায়বোধের সহিত সম্পর্কিত রাখিতে হইলে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে সর্বদা আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থাকেই বলে ন্যায়বিচার। এই ন্যায়বিচারের ফলে যে আইন প্রণীত হয় তাহাও বিচারপতিগণের দ্বারা প্রণীত আইনের একটি অংশ হিসাবে ধরা হয়।

ন্যায়নীতি ও বিচার মীমাংসার মধ্যে পার্থক্য

(৬) আইন প্রণয়ন (Legislation): আধুনিক কালে আইন পরিষদকেই আইনের প্রধান উৎস হিসাবে ধরা হয়। ওপেনহিম (Oppenheim) ও হল প্রমুখ আইনবিদ্‌গণ জনমতকেই আইনের প্রধান উৎস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আইন পরিষদের নির্বাচিত সভ্যগণ যে আইন প্রণয়ন করেন তাহা জনমতেরই অভিব্যক্তি।

উপসংহারে উড্রো উইলসনের মন্তব্যটি উল্লেখ করা গেল: তিনি বলেন যে, প্রথা আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস হইলেও ধর্মপ্রথাগুলির সহিত অঙ্গাঙ্গি-ভাবে মিশিয়া আইন প্রস্তুত করিতে সহায়তা করিয়াছে। অতএব প্রথা ও ধর্মের অবদানের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য নাই। তারপর সমাজ-বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে যখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল তখন আইনসভার দ্বারা আইনের সংশোধন ও আইন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণয়ন করা হইলেও আইনের মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়। বিচারপতিগণের বিচার-নিষ্পত্তির দ্বারা এই ফাঁক বন্ধ করা হয়। আবার ইহারই সহিত এবং একই সময়ে ন্যায়নীতির সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রথা ও ধর্মের পরবর্তী উৎস হইল বিচারকের মীমাংসা এবং ন্যায়বিচার। আবার আইন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাও আইন প্রণয়নে অনেক সহায়তা করিয়াছে। অবশ্য আইন প্রণয়ন ও আইন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে আইনের উৎস হিসাবে ধরা হইয়াছে তখনই যখন শাসনপদ্ধতি অনেকটা উন্নত হইয়াছে।

আইনের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Law)

আইনের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি ভেদে আইনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। হল্যান্ড 'সম্বন্ধ'-নীতির ভিত্তিতে আইনের শ্রেণীবিভাগ করিবার পক্ষপাতী। সম্বন্ধনীতির অর্থ আইন কি কি সম্বন্ধে সমন্বয় সাধান করিতেছে তার অনুসন্ধান করা। হল্যান্ডের মতে আইন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা,—(১) জাতীয় আইন (Municipal Law) এবং আন্তর্জাতিক আইন (International Law)। জাতীয় আইনকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(১) সরকারী আইন (Public Law) এবং (২) ব্যক্তিগত আইন (Private Law)। জাতীয় আইন হইল রাষ্ট্রাভ্যন্তরে সার্বভৌম কর্তৃক প্রবর্তিত সকল আইন। এই আইন অপরাপর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয় না। সরকারী আইন রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

হল্যান্ডের অনুকরণকারীদের মতে শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law), শাসন সংক্রান্ত আইন (Administrative Law) এবং ফৌজদারী আইন (Criminal Law) সরকারী আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়। হল্যান্ডের মতে আইনের যে অংশটিকে

সরকারী আইন বলা হয় তাহার শ্রেণীবিভাগ এখনও পাকাপাকিভাবে স্বীকৃত হয় নাই।

ম্যাক্ আইভার আবার আইনের একটি নূতন শ্রেণীবিভাগের নির্দেশ করিয়াছেন। ম্যাক্ আইভার রাষ্ট্রনৈতিক আইনকে প্রথমতঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এই দুই ভাগে ভাগ করেন। তারপর জাতীয় আইনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেন যথা,—(১) শাসনতান্ত্রিক আইন ও (২) মামুলী আইন (Ordinary Law)। তিনি মামুলী আইনকে সরকারী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক—এই দুইভাগে ভাগ করেন। তিনি সরকারী আইনকে আবার শাসন-সংক্রান্ত ও সাধারণ আইনে (General Law) বিভক্ত করেন। ম্যাক্ আইভারের এই শ্রেণীবিভাগকে অনেকে সমর্থন করেন না; কারণ, তিনি শাসনতান্ত্রিক আইনকে সরকারী আইন বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারের শাসন-ব্যবস্থার নির্দেশ দেয় এবং ইহা জনগণের রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক আইনকে সরকারী আইনের অন্তর্ভুক্ত করা বিধেয়। আবার ম্যাক্আইভার শাসন-সংক্রান্ত আইনকে সরকারী আইনের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইনকে কেন করেন নাই তাহার কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারেন নাই। মামুলী আইন ও সাধারণ আইন বলিয়া তিনি যে দুইটি শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট। অন্যান্য আইনবিদের ন্যায় তিনি আন্তর্জাতিক আইনের কোন শ্রেণীবিভাগ করেন নাই। এই সকল কারণে ম্যাক্ আইভারের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়।

আইনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে হল্যান্ড ও ম্যাক্ আইভারের আলোচনার ভিত্তিতে এবং যে সকল ত্রুটি উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া আইনের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুকে ব্যাপক অর্থে ধরিয়া লইয়া নিম্নলিখিত ভাবে একটি শ্রেণীবিভাগ করা হইল:

রাষ্ট্রনৈতিক আইন (Law)

- জাতীয়
  - সরকারী
    - শাসনতান্ত্রিক
    - শাসন-সংক্রান্ত
    - ফৌজদারী
  - বে-সরকারী (ব্যক্তিকেন্দ্রিক)
- আন্তর্জাতিক
  - ব্যক্তিকেন্দ্রিক
  - সরকারী
    - শান্তি
    - যুদ্ধ
    - নিরপেক্ষতা
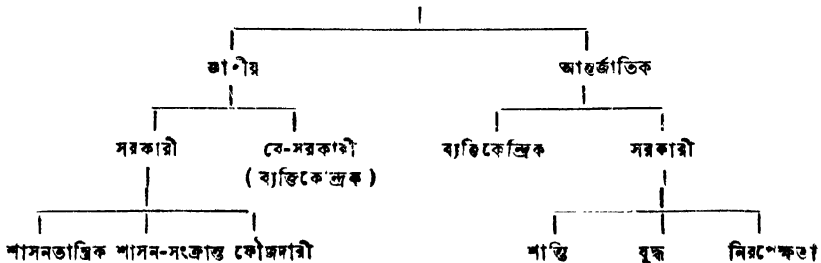
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রাভ্যন্তরে সার্বভৌম কর্তৃক প্রবর্তিত সকল আইনকে বলে জাতীয় আইন। আর এক জাতি বা রাষ্ট্রের সহিত অন্য জাতি বা রাষ্ট্রের ব্যবহার-সম্পর্কিত নিয়মকানুনকে বলে আন্তর্জাতিক আইন। এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনকে একত্রে বলে রাষ্ট্রনৈতিক আইন।

জাতীয় আইন (State National or Municipal Law): জাতীয় আইন প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম শক্তির দ্বারা। ইহা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জীবনের নিয়ামক। আন্তর্জাতিক আইনবিদগণ ইহাকে মিউনিসিপ্যাল আইন

(Municipal Law) বলিয়া অভিহিত করেন। বলা বাহুল্য যে, ইহার দ্বারা পৌর শাসনকে বোঝানো হয় না। ইহা রাষ্ট্রিক অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হল্যাণ্ডের সংজ্ঞানুসারে এই আইন হইল "সার্বভৌম কর্তৃক প্রবর্তিত মানুষের বাহ্যিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণমূলক সাধারণ নিয়ম।"

সরকারী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইন (Public & Private Law) : জাতীয় আইনকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—(ক) সরকারী আইন, (খ) বে-সরকারী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইন। সরকারী আইন হইল সেই আইন, যাহার বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের কোন অংশ। আর বে-সরকারী আইনের বিষয়বস্তু হইল ব্যক্তি। এই আইন অনুসারে বিরোধ উপস্থিত হইলে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পক্ষভুক্ত হয় না। রাষ্ট্র বিচারকের (arbiter) অংশ গ্রহণ করে। ইহা ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্যের নির্দেশ দান করে। সরকারী আইনকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ; যথা,—শাসনতান্ত্রিক আইন, (২) শাসন-সংক্রান্ত আইন এবং (৩) ফৌজদারী আইন।

শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) : শাসনতান্ত্রিক আইন হইল রাষ্ট্রের মৌলিক গঠন ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধীয় আইন। শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্র ও সরকারের সহিত নাগরিকদের সম্পর্কের নির্দেশ দেয়। এই আইন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে বলিয়া অনেক দেশে এই আইনকে মৌলিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ অর্থাৎ বিধানমণ্ডলী এবং বিচার-বিভাগের গঠন-প্রণালী, ক্ষমতা ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করে। অপরাপর আইনের তুলনায় শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধনের পদ্ধতি কঠিনতর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ হইতেই ইহা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়।

শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administartive Law) : রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বহু খুঁটিনাটি আইন প্রণীত হয় ; এই আইনগুলিকে বলে শাসন-সংক্রান্ত আইন। উদাহরণস্বরূপ পুলিশ বিভাগ, আয়কর বিভাগ প্রভৃতির খুঁটিনাটি আইনগুলিকে ধরা যাইতে পারে।

ফ্রান্সে শাসন-সংক্রান্ত আইন আর একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। *Droit Administratiff* বলিয়া পরিচিত ফ্রান্সে যে শাসন-সংক্রান্ত আইন আছে তাহা সরকার কর্তৃক আইনভঙ্গের জন্য বিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই আইনকে শাসন-বিভাগীয় আদালত (Administrative Tribunal) বলিয়া পরিচিত একটি আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। সরকারী কর্মচারী ব্যতিরেকে কেহই এই আদালতে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে না।

ফৌজদারী আইন (Criminal Law) : রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হইল রাষ্ট্রে আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা। ফৌজদারী আইন অপরাধের সংজ্ঞা ও বিচার-পদ্ধতির নির্দেশ দিয়া থাকে। এই আইনবলে রাষ্ট্রে আইন-শৃংখলা ও নাগরিকদিগের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

আন্তর্জাতিক আইন, ইহার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
(International Law—Its Definition and Nature)

পরস্পর নির্ভরশীল জগতে ব্যক্তির মতোই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্কে আসিতে হয়। ফলে সভ্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কতকগুলি নিয়মকানুন গড়িয়া উঠে। এই নিয়মকানুনগুলিকেই বলে আন্তর্জাতিক আইন। লরেন্সের ভাষায় আন্তর্জাতিক আইন হইল সেই সমস্ত বিধিনিয়ম যাহা সভ্য-রাষ্ট্রগুলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকারী এবং এই অধিকারকে রক্ষা করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি ও অধিকার ভঙ্গ করিলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। ইহার ক্ষেত্র বিস্তৃত। রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে ইহার পার্থক্য হইল, রাষ্ট্রীয় আইনের মতো আইনকে বলবৎ করিবার মতো কোন চূড়ান্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সার্বভৌম শক্তি ইহার নাই। কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইহাকে সকল রাষ্ট্রই মান্য করে।

আন্তর্জাতিক আইন গ্রোটিয়াসের সময় হইতে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক পরামর্শ-সভার সিদ্ধান্ত ও খ্যাতনামা আইনবিদ্ পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করিয়া বর্তমানে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আন্তঃরাষ্ট্র-সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতকগুলি সৌজন্যবিধি (Rules of Courtesy) প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট চুক্তি না থাকিলেও আশ্রয়-গ্রহণকারী দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রে প্রেরণ, কূটনৈতিক প্রথাসমূহ পালন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রথার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রথা ছাড়াও আন্তর্জাতিক শাসন-সংক্রান্ত আইন (International Administrative Law) নামে খ্যাত একপ্রকার আইন প্রচলিত আছে। এই আইন দ্বারা বিভিন্ন দেশের যাতায়াত, চিঠিপত্র, আদান-প্রদান প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়; যথা,—(১) ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন (Private International Law), (২) সরকারী আন্তর্জাতিক আইন (Public International Law)। সরকারী আন্তর্জাতিক আইনকে আবার তিনভাগে ভাগ করিয়া দেখানো হয়; যথা—(১) শান্তিকালীন আইন (Law of Peace), (২) যুদ্ধ আইন (Law of War), এবং (৩) নিরপেক্ষতা আইন (Law of Neutrality)।

(১) ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন : ব্যক্তিগত আইন অনুসারে কোন ব্যক্তির অধিকার লইয়া দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে তাহার বিচার হইয়া থাকে। বিবাহবিচ্ছেদ, অবৈধ সন্তানের অধিকার সম্পর্কিত আইন ও ডোমিসিল প্রভৃতি আইন ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকারী আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তিগত অধিকারের সহিত সম্পর্কিত নয়। ইহা আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের নির্দেশক। শান্তিকালীন আইন আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তির সময়ে দূত-বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, কূটনৈতিক পরামর্শাদি-সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়।

(২) সরকারী আন্তর্জাতিক আইন : এই পর্যায়ের আইনের মধ্যে পড়ে শান্তি

আইন, যুদ্ধ আইন, নিরপেক্ষতা আইন। (১) শান্তি আইন শান্তিকালীন আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের নিয়মকানুন নির্ধারণ করে। (২) যুদ্ধ আইন যুদ্ধের সময় যে-সকল নিয়ম পালন করা হয়, যথা—যুদ্ধের সময় নিরস্ত্র শহরের উপর বোমা নিক্ষেপ নিষিদ্ধকরণ আইন, দমদম বুলেট নিষিদ্ধকরণ আইন, বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ আইন প্রভৃতি আলোচনা করে।

(৩) **নিরপেক্ষতা আইন :** এই আইন হইল যুধ্যমান জাতিগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নীতি-সম্পর্কিত বিধি।

সমালোচনা : (১) আন্তর্জাতিক আইনের সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইনকে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা দিতে চান না। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক আদালত দ্বারা ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন প্রযুক্ত হয় না, উহা জাতীয় আদালত দ্বারাই শুধু প্রযুক্ত হয়। কিন্তু উহা ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক হইলেও যেহেতু উহা দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিককে লইয়া কারবার করে সেইজন্য উহাকে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা দিলে অন্যায় হইবে না।

(২) আবার সরকারী আন্তর্জাতিক আইনকে তিনভাগে ভাগ করার বিপক্ষেও যুক্তি দেখানো হয়। বলা হয় যে, নিরপেক্ষতার প্রশ্ন শুধু যুদ্ধের সময়ই উদ্ভূত হয়। অতএব উহাকে যুদ্ধের আইনের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যুদ্ধ-আইনের বিরুদ্ধে আবার এই যুক্তি দেখানো হয় যে, যুদ্ধের আবার আইন কি? যুদ্ধের অর্থই হইল নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গ করা। কিন্তু যুদ্ধেরও একটি বিধি আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে যুদ্ধ ঘোষণার (herald) একটি রীতি পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও আন্তর্জাতিক বিধি আছে যাহা সাধারণতঃ যুদ্ধের সময়ও লঙ্ঘিত হয় না বা হইলে যুদ্ধশেষে তাহার জন্য শাস্তি পাইতে হয়।

উপসংহারে বলা যায়, বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগ। এই যুগে আন্তর্জাতিক বিধি এত আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে যে, একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষ প্রয়োজন।

সমালোচনা : আন্তর্জাতিক আইন কি আইন (Is International Law a Law) : রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা দিতে চান না। হল্যাণ্ড, হব্‌স্ এবং অস্টিন প্রমুখ পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দিতে চান না। নিম্নে এই সকল পণ্ডিতগণের যুক্তি উপস্থিত করা হইল :

বিপক্ষে যুক্তি : (১) বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যানুসারে আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের পদবাচ্য করা যায় না। কারণ, এই ব্যাখ্যানুসারে আইন সার্বভৌমের আদেশ মাত্র, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন কোন আদেশ নয়। আবার ইহা বলবৎ করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট শক্তিও নাই।

(২) রাষ্ট্রীয় আইনভঙ্গ করিলে আইনানুসারে প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের কোন শাস্তি বিধান হইতে পারে না; কারণ শাস্তি দিবার মতো কোন সার্বভৌম শক্তি নাই।

(৩) আন্তর্জাতিক আইনকে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করে। ইহার

কোন বিশ্বজনীন মতৈক্য নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে মতৈক্য থাকিবেই। এই মতৈক্য নাই বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা যায় না।

(৪) আন্তর্জাতিক আইন সাধারণতঃ যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন। যুদ্ধ বাধিলে এই আইন প্রায়শঃ ভঙ্গ করা হয়। অতএব সাধারণতঃ যে আইনকে সকলে মান্য করে না, তাহা আইনের পদবাচ্য হইতে পারে না।

(৫) ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইনকে আন্তর্জাতিক আইন বলা চলে না; কারণ ইহা আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত হয় না। ইহা জাতীয় আদালত দ্বারাই শুধু প্রযুক্ত হয়।

(৬) অস্টিন প্রমুখ আইনবিদ্ আন্তর্জাতিক আইনকে আন্তর্জাতিক নীতি-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। লর্ড সলসবেরি বলেন : যে অর্থে আইন শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই অর্থে আন্তর্জাতিক আইনের কোন অস্তিত্ব নাই" ("International Law has not any existence in the sense in which the term law is usually used."—*Salsbury*)।

(৭) সমালোচকগণ বলেন যে, নিরপেক্ষতার আইন বলিয়া কিছু নাই, কারণ যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতার প্রশ্ন উঠে। অতএব ইহাকে যুদ্ধ আইনের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আবার যুদ্ধ আইন (Laws of war) সম্বন্ধে বলা হয় যে, যুদ্ধের আবার আইন কি? যুদ্ধের অর্থ হইল নিয়ম শৃংখলা ভঙ্গ করা। কিন্তু যুদ্ধেরও একটি বিধি আছে। যুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধ ঘোষণার রীতি পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

(৮) কেহ কেহ নিছক সৌজন্য, সুবিধা দান ও অনুগ্রহের (courtesy, concession and grace) ভিত্তিতে ইহাকে আইন বলিয়া আখ্যায়িত করিতে চান। কিন্তু হল্যাণ্ড প্রমুখ আইনবিদ্ ব্যবহারিক শাস্ত্রের মৌলিক বিচারে আন্তর্জাতিক আইনকে আইনরূপে গ্রহণ করিতে চান না;

আবার হেনরি মেইন, স্যাভিগণি প্রমুখ আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিয়া গণ্য করেন। নিম্নে তাঁহাদের যুক্তিগুলিকে উপস্থিত করা হইল :

সপক্ষে যুক্তি : (১) রাষ্ট্রীয় আইনের মতো আন্তর্জাতিক আইনও কতকগুলি প্রথা, রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব আইনের উৎসের দিক হইতে বিচার করিলে আন্তর্জাতিক আইনকেও আইনের মর্যাদা দেওয়া যায়।

(২) আবার রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইন মান্য করে না—এই অজুহাতে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন পদবাচ্য না করার কোন কারণ নাই। কারণ রাষ্ট্রীয় আইনও অনেকে মান্য করে না। রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করিলেও যদি তাহাকে আইন বলা যায় তবে আন্তর্জাতিক আইনকে ভঙ্গ করিলেও তাহাকে আইন বলা যাইবে না কেন?

(৩) আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী কখনো স্বীকার করে না যে সে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তৎপর। অতএব আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করা হয় বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনকে আইন পদবাচ্য না করিবার কোন কারণ নাই।

(৪) আন্তর্জাতিক সার্বভৌম বলিয়া কিছু নাই বলিয়া আন্তর্জাতিক সার্বভৌমের কোন আজ্ঞা থাকিতে পারে না। এই যুক্তিতে বলা হয় যে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত। আইনকে সর্বদাই কোন নির্দিষ্ট আদেশের রূপ গ্রহণ করিতে হয় না। আন্তর্জাতিক আইনও সম্মতির ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। গেটেল এই যুক্তি উপস্থিত করেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের যে ত্রুটি তাহা যে কোন প্রকার আইনের প্রথম পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। অতএব রাষ্ট্রীয় আইন আইন পদবাচ্য হইলে আন্তর্জাতিক আইনও আইন পদবাচ্য হইবে। আন্তর্জাতিক আইনকেও বলবৎ করিবার জন্য বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার পুলিশবাহিনী, আদালত, স্বস্তি পরিষদ ও সাধারণ সভা প্রভৃতি লইয়া এক শক্তি হিসাবেই কাজ করিতেছে।

উপসংহারে বলা যায়, উপরোক্ত মতদ্বয়ের মিলন ঘটানো সম্ভবপর নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন ধীরে ধীরে আইনের মর্যাদা লাভ করিতেছে (Law is in the making)। কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, আন্তর্জাতিক আইন নৈতিক বিধি ও প্রকৃত আইনের মধ্যবর্তী স্থান দখল করিয়াছে। আবার হল্যান্ডের ধারণায় আন্তর্জাতিক আইন একদিকে নৈতিক বিধির সমষ্টিও নয় আর অপরদিকে ইহা প্রকৃত আইনও নয়। সুতরাং ইহা হইল বিধি-শাস্ত্রের অবলুপ্তির বিন্দু বা বিলয়স্থান (Vanishing point of jurisprudence); বিধিবিধান যেখানে শেষ, সেখানে ইহার আরম্ভ।

আন্তর্জাতিক আইন গঠিত হইবার পক্ষে কতকগুলি অসুবিধা আসিয়া দাঁড়ায়। যেমন, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধকে মান্য নাও করিতে পারে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমের ইচ্ছাই যদি আইন হয় তবে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমের উপর আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলক হইবে না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শক্তি সাম্যের লড়াই আন্তর্জাতিক আইনকে সর্বগ্রাহ্য করিতে দিতেছে না। আবার চীন যতদিন জাতিপুঞ্জের বাহিরে ছিল জাতিপুঞ্জ যে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করিয়াছে তাহা নয়াচীনের পক্ষে পালনীয় ছিল না। তাই দেখা যায় সর্বদেশগ্রাহ্য, সকল সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক পালনীয় এমন কোন আইন নাই যাহাকে আন্তর্জাতিক আইন বলা যাইতে পারে। অবশ্য, কতকগুলি আন্তর্জাতিক প্রথা, নিয়ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি আছে যাহা প্রত্যেক রাষ্ট্রই বাহ্যিক সম্পর্কের ব্যাপারে মান্য করিয়া চলে। এই প্রথা ও রীতিনীতিগুলিকেই আন্তর্জাতিক আইনের রূপ লইতে দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক আইনের পথে প্রতিবন্ধকতা

স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) : প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করার সময় মানুষ যে সকল আইন মান্য করিয়া চলিত তাহাদিগকে চুক্তিবাদিগণ প্রাকৃতিক আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই আইন সার্বভৌমের আজ্ঞা মাত্র নহে, ইহা প্রচলিত আচার-ব্যবহারও নহে, ইহা ঐশ্বরিক অনুজ্ঞা অথবা সামাজিক প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ন্যায়ের মৌলিক নীতি ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অনুমোদন ছাড়াই আইনরূপে সমাজে প্রচলিত হয়। অতএব ইহাকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে বলা যাইতে পারে। আবার ইহা রাষ্ট্রের পূর্বতনও বটে। গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টট্ল ও প্লেটো প্রাকৃতিক আইনের নজির দেখাইয়া তাঁহাদের

মতবাদের সমর্থনে যুক্তি দেখাইয়াছেন। এ্যারিস্টটল মনুষ্য-প্রণীত আইন ও প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ দেন। তিনি বিশেষ আইন (Particular Law) এবং বিশ্বজনীন আইন (Uuiversal Law) এই দুইভাগে আইনকে বিভক্ত করিয়া শেষোক্ত আইনকে স্বাভাবিক আইন বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তাঁহার মতে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় বোধ রহিয়াছে এই আইন তাহারই প্রকাশ। গ্রীসের স্টোইক দার্শনিক জেনোর (*Zeno*) ধারণায় সাম্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিধানে যে কতকগুলি শাশ্বত নীতি নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে মানুষ প্রজ্ঞার সাহায্যে উপলব্ধি করে। এই শাশ্বত নীতিগুলিই প্রাকৃতিক আইন। সিসেরো ও সেনেকা প্রভৃতি রোমক দার্শনিকগণ স্বাভাবিক আইনকে সহজাত, চিরন্তন, অপৌরুষেয় ও অবাধ বলিয়া মনে করিতেন। রোমক বিধিশাস্ত্রেও (Roman jurisprudence) এই আইনের সন্ধান পাওয়া যায়। রোমকগণ এই আইনের ভিত্তিতে তাহাদের আন্তর্জাতিক আইন (*Jus gentium*) প্রণয়ন করেন। বর্তমানে ইহাই আন্তর্জাতিক আইন। রোমক আইনশাস্ত্র পৌর আইনের (*Jus civile*) সঙ্গে প্রাকৃতিক আইনকেও (*Jus naturale*) স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই আইন যদিও রোমান বিচারালয়ে প্রযুক্ত হয় নাই কিন্তু বিচারপতিগণ এই আইন দ্বারা যথেষ্টভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগে খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ প্রাকৃতিক বিধানকে ঐশ্বরিক আইন (Law of God) বলিয়া আখ্যায়িত করেন। আবার ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদীরাও (Secular rationalist) যুক্তির ভিত্তিতে স্বাভাবিক আইনকে মানিতে বলেন। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রাকৃতিক বিধানের অপ্রতিহত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বোডাঁ, হবস্, লক্ ও রুশো প্রাকৃতিক বিধানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বার্কারের মতে নির্দিষ্ট আইন উভয়ই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমাজে হাজির হইয়াছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক আইনকে কেহ বিশ্বাস না করিলেও কতক-গুলি অব্যয়, অপরিবর্তনীয় ন্যায়নীতির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় এবং কেহ কেহ এইগুলিকে রাষ্ট্রিক বলপ্রয়োগে বলবৎ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্রের এইগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করার প্রয়োজন নাই, কারণ এইগুলি স্বতঃপ্রকাশিত।

বিশেষ আইন ও বিশ্বজনীন আইন

সমালোচনা : সমালোচকগণের মতে স্বাভাবিক আইনকে বলবৎ করার কোন উপায় নাই। তাঁহারা বলেন যে, যখনই স্বাভাবিক আইনের সহিত নির্দিষ্ট আইনের সংঘর্ষ হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে যে, নির্দিষ্ট আইনকে বলবৎ করা হইয়াছে। সমালোচকগণের এই যুক্তিকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না, কারণ বিপ্লবের সময় ইহার বিপরীতও ঘটিতে দেখা গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবের স্বতঃপ্রকাশিত অনুশাসনগুলিকে ধরা যাইতে পারে। বার্কার কিন্তু এই যুক্তিকে স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, যে আইন শুধু বিপ্লবের মাধ্যমে কার্যকর হয় তাহাকে প্রকৃত আইন বলা যায় না। স্বাভাবিক আইনকে চিরন্তনও বলা যায় না, কারণ চিরন্তন বলিয়া কিছু নাই। সমাজ নিজেই যখন গতিশীল তখন সমাজদেহ হইতে উদ্ভূত যে-কোন আইনই গতিশীল হইতে বাধ্য। আবার বলা হয় ইহা কল্পনামাত্র। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহা কার্যকরী হয় নাই বলিয়া ইহা যে কোনদিনও কার্যকরী হইবে না, এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

ইহা চিরন্তন নয়, ইহা কল্পনামাত্র

আইন কি সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ
(Is Law the Expression of the General Will)

রুশো পূর্ণ-ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংঘবদ্ধ জীবনের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কাম্য সামাজিক জীবনে সামাজিক কার্যাবলী জনসাধারণের ইচ্ছামতো সম্পাদিত হয় এবং এই কার্যাবলীর উদ্দেশ্য সমাজ-কল্যাণকর হয়। প্রত্যেক নাগরিক আইনের রূপদানে অংশ গ্রহণ করিবে।

রুশোর মতে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশই আইন

ব্যক্তি বা শ্রেণীর ইচ্ছাতেই আইন প্রণীত হইবে না। সাধারণের ইচ্ছাতেই (general will) আইন প্রণীত হইবে। এই সাধারণের ইচ্ছা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা নয়, ইহা সকলের ইচ্ছার যোগফল নয়, অর্থাৎ A+B+C+D এর ইচ্ছা নয়, ইহা আপস নিষ্পত্তি বা রফা নয়, ইহা সকলের ইচ্ছার সর্বনিম্ন গুণিতকও নয়, ইহা হইল প্রত্যেকের সর্বাধিক কল্যাণকামী শুভ ইচ্ছার সমন্বয়। ইহা সাধারণ স্বার্থকে বজায় রাখার ইচ্ছা। ইহা মানুষেরই সৃষ্ট (Self-imposed law)। আইন এই সমষ্টিগত ইচ্ছারই প্রকাশ। রুশো স্বাধীনতা বলিতে রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতাকে বুঝেন নাই, তিনি রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ("By 'liberty' Rousseau means not freedom from political control but freedom for political control, feedom to determine course of legislation."—*Mabbott*)। রুশোর মতে আইন প্রণয়নে সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে।

আবার সাধারণতঃ দেখা যায় আইন প্রণয়নে সকলে একমত পোষণ করেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতেই আইন প্রণীত হয়। রুশোর মতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে যদি সমাজবিরোধী বা অকল্যাণকর আইন প্রণীত হয় তবে তাহাকে সমষ্টিগত ইচ্ছাপ্রসূত আইন বলা চলিবে না। যে আইন অপ্রকৃত ইচ্ছাপ্রসূত তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠের হউক আর সংখ্যালঘিষ্ঠেরই হউক তাহা সমষ্টিগত ইচ্ছাপ্রসূত আইন নয়, কারণ সমষ্টিগত ইচ্ছাপ্রসূত আইন হইল সকলেরই প্রকৃত ইচ্ছার (Real will) সমন্বয়ে প্রণীত আইন। ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠেরও হইতে পারে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠেরও হইতে পারে। ইহা সকলের কল্যাণের অনুগামী।

এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কি বলেন, আইনকে যদি সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে ধরা হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে সমষ্টিগত ইচ্ছা সর্বদাই কার্য করিতেছে এবং রাষ্ট্র চিরন্তন গণভোট (Permanent referendum) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি আইনের পশ্চাতেই জনমতের সমর্থন থাকিবে। নিম্নে আলোচ্য মতবাদের সমালোচনা দেওয়া গেল।

সমালোচনা: প্রথমতঃ, চিরন্তন গণভোট দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র অর্থাৎ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দেশে জনসাধারণ তাহাদের ইচ্ছাকে সোজাসুজি ব্যক্ত করিতে পারে। রাষ্ট্রের আইনও গণভোটের মাধ্যমে হয় বলিয়া আইনকে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্রের পক্ষেই একমাত্র এই উপায়ে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। সুতরাং ইহা বর্তমানের শাসনব্যবস্থায় অচল।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানকালে সার্বভৌম সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ সম্বন্ধে ধারণা

করিতে হয় প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে বার্কারের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আইন প্রণয়ন ও অনুমোদন করে। সুতরাং আইনকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ বলা যাইতে পারে। কিন্তু, ইহা সর্ব-সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ কখনই হইতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ইহাতে কখনও প্রকাশিত হয় না। সমালোচকগণ আরও বলেন যে, রুশোর এই মতবাদের অনুসরণ করিয়া আদর্শবাদ, ন্যায় ও গণতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রে স্বৈরাচারিতা প্রতিষ্ঠা করে।

তৃতীয়তঃ, রুশো সাধারণের ইচ্ছা বলিতে সাধারণের স্বার্থের অনুপন্থী ইচ্ছাকেই কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় আইন প্রণীত হয় সমাজের অধিকারী শ্রেণীর স্বার্থসাধনের জন্য। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কির বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "আইন হইল মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলি নিয়মকানুন যাহা সমাজের প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করে এবং প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা বলবৎ করা হয়" ("Law is those rules of behaviour which secure the purposes of the society's class structure and will be, if neeceessary enforced by the coercive power of the State")। কিন্তু রুশো যে আইনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শুধু শ্রেণীহীন, দ্বন্দ্বহীন সাম্যের সমাজেই প্রণীত হইতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, আদর্শবাদের ভিত্তিতে আইনকে সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু, বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে আইনকে সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা যায় না। অবশ্য, সমষ্টিগত ইচ্ছার অর্থ যদি জনমত হয় তাহা হইলে জনমতের বিরোধী কোন আইনকেই জবরদস্তি চাপাইয়া দেওয়া যায় না। আইন জনমতের পরিপন্থী হইলে জনগণ তাহা মান্য করিতে চায় না। তাই একনায়কত্বের দেশেও জনমতকে দিয়া আইনকে স্বীকার করাইয়া লইবার প্রচেষ্টা হয়। পরিশেষে ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়ঃ "আইনগত সার্বভৌম প্রণীত আইন লোকে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মান্য করিয়া লইলেও ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে জনসাধারণ বহু দুঃখ বরণ করিয়া, এমন কি প্রাণ দিয়াও আইনের বিরোধিতা করিয়াছে।"

লোকে আইন মান্য করে কেন?

(Why people obey Law? Sanctiou behind Law)

এখানে দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহার একটি প্রশ্ন হইল (ক) আইন মান্য করা হয় কেন? আর অপর প্রশ্নটি হইল (খ) আইন মান্য করা হইবে কেন? নিম্নে প্রশ্ন দুইটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইল:

(ক) আইন মান্য করা হয় কেন? (১) সাধারণতঃ মানুষ স্বভাবিক আইনকে মান্য করে কারণ স্বভাবিক আইনকে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বলিয়া কল্পনা করা হয়

অথবা সামাজিক প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ন্যায়ের মৌলিক নীতি বলিয়া ইহা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াই সমাজে আইনরূপে প্রচলিত হয়। স্বাভাবিক আইনকে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উর্ধ্বতন ও পূর্বতন বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বাভাবিক আইন রাষ্ট্র কর্তৃত্ব কর্তৃক গৃহীত ও প্রযুক্ত না হয় ততক্ষণ ইহাকে বলবৎ করা যায় না। স্বাভাবিক আইন তাই স্বাভাবিকভাবেই পালিত হয়। নৈতিক আইন সম্বন্ধেও এই একই কথা।

(১) স্বাভাবিক আইন ও নৈতিক আইন রাষ্ট্র কর্তৃত্বের অপেক্ষা না রাখিয়াই পালিত হয়

(২) আইনের পশ্চাতে সমর্থন (Sanction behind Law) বা আইন মান্য হইবার কারণ সম্বন্ধে হবস, বেন্থাম ও অস্টিনের মত হইল, কিছু লোক আইন মান্য করে অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর কিছু লোক আইন মান্য করে শাস্তির ভয়ে। আদর্শবাদীদের ধারণানুসারে আইনকে মানুষ তখনই মান্য করে যখন সে তাহার উপযোগিতা উপলব্ধি করে। রুশো বলেন : দার্শনিকভাবে দেখিতে গেলে আইন সমাজ-মঙ্গলের প্রতীক (Common good)। সমাজ-মঙ্গল আবার সম্মিলিত শুভ ইচ্ছারই প্রকাশ মাত্র। অতএব মানুষ সমাজ-মঙ্গল তথা নিজের মঙ্গলের জন্যই আইন মান্য করে। আইন মান্য না করিলে সমাজে যে অরাজকতা দেখা দিবে তাহাতে সকলেরই অমঙ্গল হইবে। হেনরি মেইন বলেন যে, মানুষ আইন মান্য করে দ্বন্দ্বের ভয়ে এবং উপযোগিতার উপলব্ধি করিয়া। যে আইনের উপযোগিতা নাই কেহই তাহাকে মান্য করিতে চায় না।

(২) হবস্, বেন্থাম ও অস্টিনের মতে অরাজকতার ও শাস্তির ভয়ে লোকে আইন মান্য করে

(৩) লর্ড ব্রাইস প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মতে নিম্নলিখিত কারণসমূহ হইল আইনের প্রতি আনুগত্যের কারণ :

(১) নির্লিপ্ততা (Indolence) : ইহার অর্থ জনসাধারণ সাধারণতঃ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে চাহে না তাই আইন প্রণয়ন ও ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা না করিয়াই তাহাকে মান্য করে।

(২) শ্রদ্ধাভক্তি (Reverence) : রাষ্ট্রনেতাগণ অর্থাৎ যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিবশতঃ জনসাধারণ আইন মান্য করে।

(৩) সহানুভূতি (Sympathy) : দেশের অধিকাংশ লোক যদি কোন আইনকে মান্য করে তাহা হইলে অপরাপর সকলেই তাহাদের আচরণের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য আইনকে মান্য করিয়া চলে।

(৪) দণ্ডভয় (Fear) : সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত মানুষকে দিয়া আইন মান্য করানোর জন্য সার্বভৌম শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এই শাস্তির (punishment) ভয়েও লোকে আইন মান্য করে। কিন্তু শুধু বলপ্রয়োগের দ্বারাই বা শাস্তির ভয় দেখাইয়া এবং ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া আইনকে সর্বদা মান্য করানো যায় না। যে আইন জনমতবিরোধী সেই আইনকে কেহ মান্য করিতে চায় না। এই প্রসঙ্গে গ্রীণ বলেন : "জনগণের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি, পাশবিক বল নহে" ("Will, not force, is the basis of the State.")।

(৫) **উপযোগিতার উপলব্ধি (Reason)**ঃ স্যার হেনরী মেইনের মতে মানুষ দণ্ডের ভয় এবং উপযোগিতার উপলব্ধি, উভয় কারণেই আইন মান্য করে। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ দিন দিনই আইনকে মান্য করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে।

(৬) **অনুকরণপ্রিয়তা (Imitation)**ঃ ব্রাইসের মতে মানুষ অনুকরণপ্রিয়। অনেকেই যদি আইন মান্য করে তবে তাহার অনুকরণে সকলেই উহা মান্য করে।

আইন মান্য করা উচিত কেন? (Why should Law be obeyed?)ঃ প্রথমতঃ, নাগরিকগণ আইন মান্য করে কারণ ইহা মান্য করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আছে। আইন প্রণয়ন করে বৈধ অধিকার সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ। অতএব আইন মান্য না করিলে বৈধ অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ অমান্যকারীকে শাস্তি দিতে পারে। অতএব এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্র যদি অন্যায় আইন প্রণয়ন করে তাহা হইলেও কি আমাদের আইন মান্য করিতে হইবে? এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কি বলেন যে, আইন কার্যকর হয় বলিয়াই আইনকে মান্য করিবার কোন দায় নাই, প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের জন্য ইহা কি করে তাহার উপরই ইহাকে মান্য করা-না-করা নির্ভর করে। আবার নাগরিকগণই একমাত্র আইনের এই কার্য বিচার করিতে পারে ("Law has no claim to obedience merely because it is effective. Its claim to obedience depends upon what it does to the lives of individual citizens. Of this they alone can judge."—*H. J.. Laski*)।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ধ্যান-ধারণাকে সার্থক করে আইন, তাই আইন মান্য করা কর্তব্য। আদর্শবাদিগণ বলেন যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতাকে কার্যকর করে। রাষ্ট্রই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে ও উহাকে সংরক্ষণ করে। সুতরাং রাষ্ট্র যখন মানুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করে তখন সেই আইনকে মান্য করিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রত্যেকেরই রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের আদর্শ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক নাগরিককে সমান ভাবে গ্রহণ করা। রাষ্ট্রকে তাহার এই আদর্শ কার্যকর করিতে হইলে আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের বাহ্যিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যক্তির শক্তিকে বিকশিত করিতে সহায়তা করে ("The state secures and guarantees"···"the external conditions necessary for the greatest possible development of the capacities of personality. These secured and guaranteed conditions are called by the name of rights".—*Barker.*) ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র যেহেতু আইন প্রণয়ন করে সেইহেতু আইন মান্য করা উচিত।

আইন ও নৈতিক বিধি

(Law and Morality)

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত। আইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। রাষ্ট্রের ইচ্ছা আইনের মধ্যেই প্রকাশিত হয় এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আইনের মাধ্যমেই কার্যকরী হয়। আইন সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার নৈতিক বিশ্বাস নৈতিক আইনের রূপে

সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনের সহিত নৈতিক আইনের সম্পর্ক অতিশয় গভীর। এইজন্য প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকেরা ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মেকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনীতিকে নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করিলেন। তারপরে হব্স্, লক্ ও রুশো প্রভৃতি দার্শনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে রূপ দান করেন। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করায় রাষ্ট্রনৈতিক আইন ও নৈতিক আইনের মধ্যে গভীর পার্থক্যের নির্দেশ করা হয়। এই পার্থক্যগুলি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রনৈতিক আইন শুধু মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। আর নৈতিক আইন মানুষের সমগ্র জীবনকে—তাহার চিন্তা, অনুভূতি, কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ও বাস্তব কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চিত্তশুদ্ধিই নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বিশ্বাস করা হয় যে, চিত্ত শুদ্ধ হইলেই মানুষ চিন্তায় ও আচরণে উন্নত হইবে। ফলে সমাজজীবনও মঙ্গলময় হইবে। এক কথায় নৈতিক বিধি মানুষের বাহ্যিক ও মনের চিন্তা উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। অতএব, রাষ্ট্রনৈতিক আইনের ক্ষেত্র হইতে নৈতিক আইনের ক্ষেত্র ব্যাপকতর।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক আইন বলপ্রয়োগে বলবৎ করা হয়; কিন্তু নৈতিক আইন বিবেকদংশনে ও লোকনিন্দার ভয়ে কার্যকরী হয়। নৈতিক অপরাধ যেমন রাষ্ট্রকর্তৃক দণ্ডনীয় নয় তেমনি আবার নৈতিক অপরাধকে নীতিশাস্ত্র কখনই সমর্থন করে না। কিন্তু নৈতিক অপরাধ দ্বারা যতক্ষণ না কাহারও ক্ষতি হয় ততক্ষণ ইহা আইনের এক্তিয়ার-বহির্ভূত।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইনগুলি সুস্পষ্ট এবং ব্যক্তি-নির্বিচারে সকল সময়ে প্রযোজ্য। কিন্তু নৈতিক নিয়মগুলি সুস্পষ্ট নয় এবং সকল সময়ে প্রযোজ্যও নয়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে এইগুলি সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহকে সুনীতি বলিয়া গণ্য করা হইত, কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশের ধারণাই ইহার বিপরীত।

চতুর্থতঃ, নীতিশাস্ত্রের নীতি ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করে এবং ইহা ন্যায়-ভিত্তিক। আর রাষ্ট্রের নীতি ন্যায়-অন্যায়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না; ইহা রাষ্ট্রের সুবিধার দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয়ের ক্ষেত্রও বিভিন্ন। অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি অপরাধগুলি রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা দণ্ডনীয় নয়। আবার রাত্রিকালে বাতি না জ্বালিয়া মোটর-গাড়ী চালানো নৈতিক-অপরাধ নয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, জনস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে রাষ্ট্র অনেক সময় নীতি বিগর্হিত আইনও প্রণয়ন করে ("The safety of the State is its first law and to realise this end it must be above morality.")। কিন্তু এই মতবাদকে সকলে স্বীকার করেন না। ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রেরও স্বাধীনতা, অধিকার ও অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র সাময়িকভাবে নীতিবিজ্ঞান বিরোধী আইন প্রবর্তন করিতে পারে এই যুক্তিতে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক হইল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইলে

আইন সাময়িকভাবে নীতিবিগর্হিত হইলেও পরিশেষে নীতিসম্মত হয়

ব্যক্তি-স্বাধীনতাও বিপন্ন হইবে। এই কারণে বৈদেশিকদের দ্বারা রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে বা অন্তর্বিপ্লব দেখা দিলে রাষ্ট্রকে অনেক সময় নীতিবিজ্ঞানবিরোধী আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কলেজকে আস্তাবলে পরিণত করিবার মতো নীতি-বিরোধী আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিতে দিবার অর্থ স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ন্যায় নীতিকে বলি দেওয়া।

কিন্তু আইন ও নৈতিক বিধানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। উভয়ের ভিত্তি জনমত; আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ, বাল্যবিবাহ নিরোধ, সতীদাহ প্রথা নিবারণী আইন যেমন ধীরে ধীরে জনমতকে পরিবর্তন করিয়া মানুষের নৈতিক জ্ঞানের সংস্কার সাধন করিয়াছে, তেমনি আবার রাষ্ট্রের আইন ও আদর্শ নীতিভিত্তিক না হইলে রাষ্ট্রের ধ্বংসকে অনিবার্য করিয়া তোলে।

আইন, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব, জনমত ও অধিকার
(Law, Authority, Public Opinion and Rights)

আইন ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব: রাষ্ট্রকর্তৃত্ব বলিতে বুঝায় তাঁহাদের কর্তৃত্ব যাঁহাদের হস্তে রাষ্ট্রের শাসনভার রহিয়াছে। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের আইনবিভাগ অর্থাৎ বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ আইন প্রণয়ন করেন। আবার এই বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণের মধ্য হইতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় তাঁহারা রাষ্ট্র শাসন করেন। অতএব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আইনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও রহিয়াছে শাসকদের হস্তে। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিচার বিভাগের বিচারপতিগণও বিচার-মীমাংসার মাধ্যমে আইনের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া আইনের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। আবার রাষ্ট্রকে যদি শ্রেণীস্বার্থের যন্ত্র হিসাবে ধরা হয় তাহা হইলে সমাজের যে অধিকারী শ্রেণীর হস্তে শাসনভার অর্পিত থাকে তাহাদের স্বার্থানুকূল্যে আইনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং দেখা যায় আইন আর রাষ্ট্রকর্তৃত্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

(১) আইনের উপর রাষ্ট্রকর্তৃত্ব

আইনের উপর জনমতের প্রভাব: বর্তমানে ইহা প্রায় সর্বস্বীকৃত যে, জনমতকে উপেক্ষা করিয়া কেহই রাষ্ট্রকর্তৃত্ব বজায় রাখিতে পারে না বা আইনকে বলবৎ করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ জনমত উপেক্ষা করিয়া আইন প্রণয়ন করিলে তাঁহাদের পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। ফলে পরোক্ষভাবে জনমত দ্বারাই আইন নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিয়া জনমত সংগ্রহ করিয়া আইনকে জনমতের সঙ্গে সুসমঞ্জস করা হয়। সরকারী গেজেটে খসড়া আইনকে প্রকাশিত করিয়া জনগণের মতামত সংগ্রহ করিতেও দেখা যায়। জনমতকে উপেক্ষা করিয়া আইন প্রণীত হইলে লোকে আইনকে মান্য করিতে চায় না। এমনকি অন্তর্বিপ্লবও সংঘটিত হয়। কিন্তু আবার ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অনেক সময় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং ইহার অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য জনমতকে উপেক্ষা করিয়াই আইন প্রণয়ন করা হয়।

(২) আইনের উপর জনমতের প্রভাব

সাধারণত: যুদ্ধকালীন আইনগুলি এই প্রকৃতির হইয়া থাকে। অবশ্য শান্তির সময়েও কখনও কখনও এই প্রকৃতির আইন প্রণীত হইয়া থাকে।

আইন ও অধিকার ঃ আইনকে অধিকারের উৎস বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। আইন জনগণের অধিকারের সংজ্ঞা ও সীমা নির্দেশ করে। বর্তমানে নাগরিক কি কি অধিকার পাইবে তাহা আইনই স্থির করিয়া দেয়। আবার অধিকার ভঙ্গ হইলে আইনই তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রকর্তৃত্ব যেহেতু আইনকে বলবৎ করে সেইহেতু বলা যায় আইন শুধু অধিকারের উৎস নহে ; আইনের উপরই অধিকার নির্ভরশীল। অধ্যাপক ল্যাস্কি অবশ্য আর একটি নূতন মত পোষণ করেন। তাহা হইল, "সংক্ষেপে রাষ্ট্র অধিকারগুলি সৃষ্টি করে না ; রাষ্ট্র শুধু অধিকারগুলির স্বীকৃতি দেয়। কোন এক সময়ে রাষ্ট্র যে সকল অধিকারগুলি স্বীকার করে তাহার দ্বারাই রাষ্ট্রচরিত্র স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।"* মার্কসবাদিগণ মনে করেন আইন ও অধিকার উভয়ই শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ। এই ধারণানুসারে শাসকশ্রেণী তাঁহাদের শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে আইন প্রণয়ন করেন এবং শ্রেণীস্বার্থ অনুসারে অধিকারের স্বীকৃতি দিয়া থাকেন। আবার ভাববাদী দার্শনিকেরা বলেন যে, সমাজের সর্বোচ্চ নীতি ও স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে আইন ও অধিকারের উপর।

(৩) আইন ও অধিকার

পরিশেষে বলা যায়, আইন অধিকার স্বীকার করে। আবার আইনস্বীকৃত অধিকারকে আইনই বলবৎ করে। আইন বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকার সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পথনির্দেশ দেয় এবং যাহাতে নাগরিকদিগের মধ্যে সংঘর্ষ না বাধে তাহার ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য হইল মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি আছে তাহার বিকাশের পথ সুগম করিয়া তোলা। মানুষের অধিকার-গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আইন রাষ্ট্রের এই আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করে এবং সমাজকে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে।

উপসংহার ঃ রাষ্ট্রকর্তৃত্ব, জনমত ও অধিকার ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে অধিকার ও আইন। আবার জনমতের উপর যদি রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও আইন প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে অচিরেই রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই জনমত আবার জনগণের অধিকারের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জনমতই জনগণের অধিকার আদায় করে এবং জনমতই জনগণের অধিকারকে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মাধ্যমে বলবৎ করে। জনগণের অধিকার যদি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে জনমত বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অতএব রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ভর করে উপরোক্ত এই তিনটি বিষয়ের উপর।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যবস্থার মতো মনুষ্যসমাজও নিয়মাধীন। মানবসমাজ যেমন গতিশীল, আইনকেও তেমনি গতিশীল হইতে হয়। নীতিসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীকে বলে নৈতিক আইন। রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীকে বলে আইন। আইনের অর্থ নিয়ন্ত্রণ।

*"The State, briefly dces not create, but recognises rights, and its character will be apparent from the rights that of any given period, receive recognition."

আইন মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের নির্দেশ দিয়া রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের অভীষ্ট-লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রশক্তি আইনকে বলবৎ করে।

আইনের সংজ্ঞা : বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। (১) বিশ্লেষণীপন্থীরা বলেন সার্বভৌমের আদেশ। (২) ঐতিহাসিকগণ বলেন আইন ইতিহাসের ফল। (৩) সমাজবিজ্ঞানিগণ বলেন আইন সমাজদেহ হইতে উদ্ভূত ও সমাজ-বিবর্তনের ফল। (৪) দার্শনিকগণ বলেন আইন আদর্শের প্রকাশ। (৫) মার্কসীয় ধারণায় আইন শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ। (৬) হেগেলের মতে আইন সর্বোচ্চ নীতির প্রতীক।

আইনের উৎস : আইনের উৎস হিসাবে গৃহীত হইয়াছে, (১) প্রথা, (২) ধর্ম, (৩) বিচার-মীমাংসা, (৪) বৈজ্ঞানিক আলোচনা, (৫) ন্যায়নীতি ও (৬) আইন প্রণয়ন।

আইনের প্রকারভেদ : রাষ্ট্রনৈতিক আইনকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে : যথা,—জাতীয় আইন, সরকারী আইন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইন, শাসনতান্ত্রিক আইন, শাসনসংক্রান্ত আইন ও ফৌজদারী আইন, আন্তর্জাতিক আইন (সরকারী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক)।

স্বাভাবিক আইন হইল সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক।

রুশো প্রমুখ অনেকে আইনকে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু বর্তমানে বিরাট রাষ্ট্রে—সমষ্টিগত ইচ্ছা প্রকাশের যে সকল পদ্ধতি আছে তাহার বিচারে আইনকে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা যায় না।

আন্তর্জাতিক সার্বভৌম বলিয়া কিছু নাই। তাই আন্তর্জাতিক আইনকে অনেকে আইনের মর্যাদা দিতে চান না। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন আইনের মর্যাদালাভ করিবার দিকে দিন দিনই অগ্রসর হইতেছে।

আইনের সহিত রাষ্ট্রকর্তৃত্ব, জনমত ও অধিকার বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

লোকে আইন মান্য করে কেন ? লোকে আইন মান্য করে—(১) নির্লিপ্ততা, (২) শ্রদ্ধাভক্তি, (৩) সহানুভূতি, (৪) দণ্ডভয়, (৫) উপযোগিতার উপলব্ধি হেতু।

১১

নাগরিকতা
(Citizenship)

নাগরিকতার সংজ্ঞা (Definition of Citizenship) : 'নাগরিক' বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় নগরবাসী বা শহরের বাসিন্দা। কলিকাতা, বোম্বাই ও তামিলনাড়ু শহরে যাহারা বাস করে তাহাদের এই সকল শহরের নাগরিক বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাগরিক শব্দের একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাগরিক শব্দের অর্থ—"রাষ্ট্রসংস্থার সদস্য"। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত নাগরিক শব্দটির প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করিতে হইলে প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকদের মতামত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন; কারণ গ্রীক্‌দিগের নগর-রাষ্ট্রের আলোচনায় এই 'নাগরিক' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছিল। 'নাগরিক' শব্দটি সেই উত্তরাধিকার আজ পর্যন্ত বহন করিতেছে। প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে যাহাদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা ও বিশ্রামের জন্য প্রচুর সময় ছিল তাহাদিগকেই নাগরিক বলিয়া অভিহিত করা হইত। সমাজের অবশিষ্টাংশ মানুষ, ক্রীতদাস প্রভৃতিকে নাগরিক বলা হইত না। কারণ এই সকল পরনির্ভরশীল অধিবাসীদের সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত না।

নাগরিকের সংজ্ঞা

বর্তমানে নাগরিকের এই ধারণার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে বিশাল রাষ্ট্রে যাহারা স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাহারাই নাগরিক। বর্তমানে নাগরিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আবার বর্তমান রাষ্ট্র নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিয়ভাবে কোন কর্তব্যপালনের দাবি করে না বটে, কিন্তু নাগরিককে রাষ্ট্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতিতে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকিতে হয়। নাগরিকের যে প্রতিভা ও বুদ্ধি আছে তাহা সর্বসাধারণের কল্যাণে নিয়োগ করা, সমাজের সামগ্রিক উন্নতির মাধ্যমে নিজের জীবনকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করা বিধেয় বলিয়া মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কির উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : নাগরিকতার অর্থ হইল "সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির দ্বারা মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ।"* নাগরিকতার অর্থ হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণের সমাবেশ। আবার শুধু এই গুণের সমাবেশ হইলেই চলিবে না, সেই গুণী ব্যক্তিকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য তাহার গুণাবলীকে প্রয়োগ করিতে হইবে।

নাগরিকতার সংজ্ঞা

বর্তমান রাষ্ট্রেও দেখা যায় রাষ্ট্রের সমগ্র অধিবাসীই নাগরিকের মর্যাদা লাভ করে না। বর্তমানে রাষ্ট্রের অধিবাসীকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা,—(১) নাগরিক, (২) অসম্পূর্ণ নাগরিক এবং (৩) বিদেশী।

(১) নাগরিক (Citizen) : নাগরিকের সংজ্ঞা পূর্বেই আলোচিত হওয়ায়

---

*Citizenship is the contribution of one's instructed judgment to public good.
—*Laski*

অর্জনের দুইটি পদ্ধতি আছে ঃ যথা—(১) জন্মসূত্র এবং (২) **অনুমোদন।** জন্মসূত্রে অনুসারে নাগরিকতা অর্জনের আবার দুইটি পদ্ধতি আছে ঃ (ক) জন্মনীতি (*jus sanguinis*) এবং (খ) জন্মস্থাননীতি (*jus soli or loci*)।

(১) জন্মসূত্র ঃ (ক) **জন্মনীতি** অনুসারে শিশু যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে তাহার পিতার নাগরিকত্ব পাইবে আর (খ) **জন্মস্থাননীতি** অনুসারে শিশু যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিবে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাইবে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে পিতা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয় আর তাহার সন্তান যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণও করে তাহা হইলে উক্ত সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারিকত্ব পাইবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পিতা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয় এবং তাহার সন্তান যদি ইংল্যাণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে উক্ত সন্তান ইংল্যাণ্ডের নাগরিকত্বও পাইতে পারে। জন্মনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রাধান্যের (personal supremacy) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ নাগরিকের সন্তান যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাহার উপর রাষ্ট্রের প্রাধান্য থাকিবে। আর জন্মস্থাননীতির ক্ষেত্রে ভূমিগত প্রাধান্য আরোপ করা হয়। অর্থাৎ, রাষ্ট্রাভ্যন্তরস্থ সকল ব্যক্তির উপরই এমনকি বিদেশীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহার উপরও রাষ্ট্রের প্রাধান্য বর্তাইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদি কেহ কোন রাষ্ট্রের পতাকাবাহী জাহাজে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সে উক্ত জাহাজের অধিকারী রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে। আবার জন্মস্থাননীতি অনুসারে বিদেশী দূতগণের সন্তানকেও নাগরিকত্ব দান করা হয়।

সমালোচনা ঃ জন্মনীতির ত্রুটি হইল, সর্বক্ষেত্রে পিতার জাতীয়তা প্রমাণ করা যায় না এবং শুধু জন্মনীতির উপরে নির্ভর করিয়া নাগরিকত্ব ঠিক করা যায় না। আর জন্মস্থাননীতির ত্রুটি স্পষ্ট হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের নীতি হইতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ভ্রাম্যমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের তিনটি সন্তান যদি তিনটি দেশে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে পিতা হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক আর সন্তানেরা হইবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। আবার ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দুইটি নীতিই অনুসরণ করা হয়, ফলে এক দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। কোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের সন্তান যদি ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত সন্তান জন্মনীতি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইবে আর জন্মস্থাননীতি অনুসারে ইংল্যাণ্ডের নাগরিক হইবে। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ফলে সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নাগরিকত্ব স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে।

(২) অনুমোদন ঃ অনুমোদন শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত হয় ; যথা—(ক) ব্যাপক অর্থে এবং (খ) সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে অনুমোদন বলিতে বুঝায় বৈধতা (legitimation), বিবাহ, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান, স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করা, সরকারী চাকুরি প্রভৃতি উপায়ে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা, আর সংকীর্ণ অর্থে ইহার দ্বারা বুঝায় রাষ্ট্রনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষ কাহাকেও আনুষ্ঠানিক ভাবে যে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডে 'অনুমোদন' কথাটি এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে অনুমোদনের জন্য আবেদন করিতে হয় না। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষ আবেদন করিতে হয় ; এই শর্তগুলি হইল ঃ

(১) স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত (*Lex domicili*) ; অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময় বসবাস করিতে হইবে ; (২) চিরকাল বসবাস করিবার অঙ্গীকার ও কার্যের মাধ্যমে ইচ্ছা প্রমাণ করিতে হইবে ; (৩) ভারত ও ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সচ্চরিত্র হইতে হইবে ; (৪) ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা, ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত ১৪টি ভাষার মধ্যে যে-কোন একটিতে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। অনুমোদনের দ্বারা নাগরিকতা অর্জন পূর্ণ (perfect) বা অসম্পূর্ণ (imperfect) হইতে পারে। পূর্ণ নাগরিক কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে। আর অসম্পূর্ণ নাগরিক তাহা করে না। এতদ্ব্যতীত সমষ্টিগত অনুমোদন (group naturalisation) অর্থাৎ ভারত, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন দেশের অধিবাসীদের একযোগে নাগরিকতা প্রদান করার নীতিও উল্লিখিত দেশগুলিতে প্রচলিত আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সকল অনুমোদিত নাগরিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার অনেক দেশে ভোগ করিতে পারে না। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই জাতীয় অনুমোদিত নাগরিক রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদে আসীন হইতে পারে না।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকতা প্রাপ্তির উপর নিয়ন্ত্রণ ধার্য করার ফলে জাতিবিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক বিরোধ দেখা দিয়াছে। পরিশেষে বলা যায় এই বিদ্বেষ যতই ঘনীভূত হইবে ততই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবে।

নাগরিকতা বর্জনের পদ্ধতি ঃ সাধারণতঃ নাগরিকতার বর্জন বলিতে বুঝায় নাগরিকতার পরিবর্তন। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না। সে যদি অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তবে তাহাকে স্বরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিবর্তন করিতে হইবে। (২) বিদেশীর সহিত বিবাহিত স্ত্রীলোক তাহার স্বরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। (৩) আবার অনেক সময় অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন না করিলেও নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হয় ; যেমন সৈন্যদল হইতে পলায়ন, বিদেশী রাষ্ট্রপ্রদত্ত উপাধিগ্রহণ, স্বরাষ্ট্র হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকা প্রভৃতি কারণেও নাগরিকতার বিলোপ হইতে পারে। পূর্বে নাগরিকতার পরিবর্তন সম্ভব ছিল না, কারণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ছিল অপরিবর্তনীয়। বর্তমানে এই আনুগত্য পরিবর্তনীয় বলিয়া ধারণা প্রচলিত থাকায় নাগরিকতা অর্জন ও বর্জনের নীতি অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রচলিত আছে।

সুনাগরিকতা (Good Citizenship) : বর্তমান যুগ গণতান্ত্রিকতার যুগ। গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল সমাজকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সার্থক করিয়া তোলা। আবার গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব নাগরিকদের উপর ন্যস্ত থাকে বলিয়া নাগরিকদিগের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের কল্যাণ-অকল্যাণ। সুতরাং রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নাগরিকদিগকে কতকগুলি গুণের অধিকারী হইতে হইবে। নাগরিকদিগের মধ্যে যাহারা কতকগুলি গুণের অধিকারী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাহাদিগকে 'সুনাগরিক' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এখন প্রশ্ন হইল এই গুণগুলি কি কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন লর্ড ব্রাইস। তিনি তিনটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, —(ক) বিচারবুদ্ধি, (খ) সংযম, (গ) বিবেকবুদ্ধি। লর্ড ব্রাইস যে তিনটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে বার্ণস আরও দুইটি গুণের সংযোগ করেন। তাহা হইল (ঘ) সমাজপ্রেমিকতা এবং (ঙ) স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি। শ্রীনিবাস

সুনাগরিকতার সংজ্ঞা

শাস্ত্রীর মতে প্রত্যেক নাগরিককে ন্যায়-অন্যায় ও সত্যাসত্য উপলব্ধি করিবার মতো যোগ্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে।

বর্তমান সমাজ সমস্যাসংকুল ও জটিল। এই সমাজে নাগরিক যাহাতে ভুলপথে চালিত না হয় তাহার জন্য তাহাকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হইবে। আত্ম-সংযমী হইয়া তাহাকে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমষ্টিগত কল্যাণে ব্রতী হইতে হইবে। বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সহিষ্ণুতার সহিত নিজ কর্তব্য পালন করিতে হইবে। নাগরিককে যেমন নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে, তেমনি আবার তাহাকে কর্তব্যের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। এইভাবে স্বাধীনচেতা ও স্বদেশপ্রেমিক নাগরিক তাহার কর্তব্য পালন করিলে দেশ ও জাতির কল্যাণ হইবে। কিন্তু নাগরিক অনেক সময় ইচ্ছা থাকিলেও তাহার কর্তব্যপালন করিতে পারে না। অর্থাৎ সুনাগরিকতার পথে অনেক বাধা আছে। এই বাধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক (Hindrances to good Citizenship) : বিভিন্নপ্রকার বাধাবিঘ্ন সুনাগরিকতার পথে আসিয়া দাঁড়ায়। এই বাধাবিঘ্নগুলিকে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করা হয়, যথা—(১) নির্লিপ্ততা, (২) ব্যক্তিগত স্বার্থ-পরতা, (৩) দলীয় মনোভাব এবং (৪) অজ্ঞতা।

(১) নির্লিপ্ততা (Indolence) : নির্লিপ্ততার অর্থ উদাসীনতা ও উৎসাহ-হীনতা। সর্বসাধারণের কাজ বিশেষভাবে কাহারও কাজ নয়—এই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নাগরিক যদি নিজের কর্তব্যটুকু পর্যন্ত না করে তবে সকলের কল্যাণই ব্যাহত হইবে। সে যদি ভুলিয়া যায় যে, সকলের মধ্যে সেও একজন, সকলের মঙ্গল হইলে তাহারও মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে নিজেরও অকল্যাণ হইবে। নির্লিপ্ততার জন্যই অনেক নাগরিক এমন কি নির্বাচনের সময় ভোটদানে বিরত থাকে এবং নিজের বক্তব্যটুকু পর্যন্ত সে সজোরে প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না। কিন্তু সমাজবন্ধনের প্রাথমিক প্রয়োজন হইল সহযোগিতা। একে অপরকে সাহায্য করিবে ইহা আশা করা অন্যায় নয়। সমাজের ভিত্তিই হইল সহযোগিতা। নির্লিপ্ততা মানুষকে স্বার্থপর করিয়া তোলে। নাগরিকদিগের নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, (১) বৃহদায়তন রাষ্ট্র, (২) বিভিন্ন দিকে আকর্ষণের সৃষ্টি এবং (৩) জীবনসংগ্রামের তীব্রতা মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করিয়া তুলিয়াছে।

(২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private Interest) : এই প্রসঙ্গে কবিবর রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : "মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম হইল সমাজধর্ম, লোভ রিপু তাহার প্রধান হন্তারক।" ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ মানুষকে সমাজবিরোধী কার্যে প্ররোচিত করে। ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া নাগরিক অনেক সময় উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে হইলে বলিতে হয় যে, নাগরিকের উচিত অপরের ক্ষতি না করিয়া নিজের উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করা। আবার তাহার ভুলিলে চলিবে না যে, অপরকে সাহায্য করিলে পরোক্ষভাবে নিজেরও উপকার হয়। কারণ সমষ্টির উন্নতি হইলে তাহারও উন্নতি হইবে।

(৩) দলীয় মনোবৃত্তি (Party Spirit) : গণতন্ত্রের মূলে ভিত্তি হইল দলীয় প্রথা। দলপ্রথার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা প্রসারলাভ করে, জনমত গঠিত হয় এবং নাগরিক স্বাধীনভাবে তাহার প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে এবং

স্বৈরাচারিতার পথরোধ করে। কিন্তু এই দলপ্রথাই আবার সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে বলিয়া দলভুক্ত নাগরিক দলের মঙ্গল কামনাই করে, সমাজের নহে। অবশ্য, দলপ্রথা যদি সামগ্রিক কল্যাণকামী হয় তবে নাগরিককে সুপথে চালিত করিবে।

(৪) ইহা ছাড়া অজ্ঞতা, সংবাদপত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এবং নির্বাচনপদ্ধতিও নাগরিককে বিপথে চালিত করে। অধ্যাপক ল্যাস্কি ও লর্ড ব্রাইস সংবাদপত্রকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া এবং সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য চালাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। মানুষের অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে নাগরিক অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের অকল্যাণ নিজেই ডাকিয়া আনিতে পারে। অনেক সময় নির্বাচন-পদ্ধতির ত্রুটির জন্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থহানি হইয়া থাকে। রাষ্ট্রকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অন্যথায় সামগ্রিক কল্যাণসাধন সম্ভবপর নয়।

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক দূরীকরণের পন্থা Measures to remove the hindrances of good citizenship) : উপরোল্লিখিত সমালোচনায় সুনাগরিকতার পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নিম্নলিখিত প্রতিবিধানের পরামর্শ দিয়াছেন :

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান : অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে নাগরিকের নির্লিপ্ততা দূর করা যাইতে পারে। তাঁহারা এই পরামর্শ দেন যে বাধ্যতামূলক ভোটদানের আইন প্রণয়ন করিলে ভোটদাতাগণ ভোটদান হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না। ভোটদান হইতে বিরত থাকার অর্থ নির্বাচনের ফলাফলকে জনমতের প্রকাশ বলিয়া ধরা যাইবে না। অবশ্য প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার না হইলে, মানুষ যদি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন না করে, তাহা হইলে শুধু শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না।

আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কার্যে উৎসাহিত করার জন্য গণভোট (Referendum) গণউদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত করা যায় আবার অপরদিকে নাগরিককে সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করা যায়। অবশ্য, ল্যাস্কি প্রমুখ চিন্তাবীর এই ধরনের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ বর্তমান বৃহদায়তন রাষ্ট্রে এই ধরনের পদ্ধতি অচল। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব লইয়াও বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থানুসারে নির্বাচনের পর দেখা যায় কোন দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। ফলে সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করিতে হয়। ইহা স্বভাবতঃই ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল হইয়া থাকে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলিই যথেষ্ট নয়। মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে কোন পদ্ধতিই কার্যকরী হইবে না। এই কারণে অনেকে নৈতিক প্রতিবিধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আবার জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত না হইলে এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে, কোন্ প্রতিবিধানই কার্যকরী হইবে না।

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য : পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মধ্যে যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয়। আর রাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশ জনগণকে অসম্পূর্ণ নাগরিক ও বিদেশী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

পূর্বে নাগরিকতা অর্জন ও বর্জনের কোন প্রচলন ছিল না। বর্তমানে কতকগুলি নিয়মানুসারে নাগরিকতা অর্জন ও বর্জন হইয়া থাকে। নাগরিকতা অর্জনের উপায়ঃ (১) জন্মসূত্র, (২) অনুমোদন। বর্জনের পদ্ধতিঃ (১) অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব, (২) বিবাহ, (৩) রাষ্ট্রীয় শাস্তির মাধ্যমে নাগরিকত্ব লোপ পায়। গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে সুনাগরিকের প্রয়োজন। সুনাগরিকতার পথে অনেক বাধা আছে, যথা,—(১) নির্লিপ্ততা (২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, (৩) দলীয় মনোভাব, (৪) অজ্ঞতা। ইহার প্রতিবিধানেরও কতকগুলি ব্যবস্থা বর্তমানে গৃহীত হইয়াছে

১২ | অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্য
(Rights, Liberty and Equality)

অধিকার

অধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ (Definition and Nature of Rights) : অধিকার বলিতে বুঝায় কোন কিছুর উপর স্বত্ব বা দাবি। আবার কোন স্বত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহা সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। অধিকারের ধারণা সমাজগত। মানুষ সমাজে বাস করে তাই অধিকারের প্রশ্ন উঠে। সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির কোন অধিকার থাকিতে পারে না ; কারণ সমাজের বাহিরে তাহার অধিকারের স্বীকৃতি দিবার মতো কোন লোক বা রাষ্ট্র নাই। এই কারণে জনশূন্য দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশোর কোন অধিকার ছিল না। এই প্রসঙ্গে গ্রীণকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, সমাজের সভ্য হিসাবেই মানুষ তাহার অধিকার লাভ করে। আবার গতিশীল সমাজ তাহার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারকেও বিস্তৃত করে। রাষ্ট্রই সমাজের পক্ষে আইনের মাধ্যমে এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অতএব অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত দাবি ছাড়া আর কিছু নয় ; আর ইহার জন্ম হয় সমাজে। সমাজে একের যাহার উপর অধিকার অপরে তাহার উপর যদি হস্তক্ষেপ না করে, তবেই অধিকার জন্মায়। একজনের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারের অর্থ হইল অপরের তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার নাই। এইভাবে একের অধিকার অপরের অধিকারকে সীমিত করে। এইরূপ অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এবং রাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়।

অধিকার হইল একটি সামাজিক ধারণা

অধিকার সম্বন্ধে আইনগত ধারণা। অধিকারের অর্থ

অধিকার সম্বন্ধে ল্যাস্কির ধারণা : উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইল অধিকার সম্বন্ধে আইনগত ধারণা। কিন্তু, রাষ্ট্র-দর্শন অধিকারের আইনগত ধারণা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, ইহা অধিকারের ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য-অনৌচিত্যেরও বিচার বিশ্লেষণ করে। রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে কি কি অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত তাহার আলোচনাও হইয়া থাকে। অধিকার প্রাক্-রাষ্ট্রিক। ল্যাস্কি বলেন : "অধিকার রাষ্ট্রের অগ্রবর্তী এই অর্থে যে, উহা স্বীকৃত হউক আর না হউক, উহার উপরই রাষ্ট্রের বৈধতা নির্ভর করে"।* ল্যাস্কি বলিতে চান যে, রাষ্ট্রের স্বীকৃতির দ্বারাই অধিকারের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র অধিকার সৃষ্টি করিতে পারে না। রাষ্ট্র কি ধরনের এবং কি পরিমাণে অধিকার স্বীকার করে তার দ্বারা রাষ্ট্রের চরিত্র ঠিক হয়। ল্যাস্কি বলেন : রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত অধিকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়" ("A State is known by the right it maintains".)। রাষ্ট্রের

---

* Rights, therefore, are prior to the State in the sense that, recognised or not, they are that from which its validity derives—*Laski* : *Grammar of Politics.*

অধিকারের স্বীকৃতির দ্বারা নাগরিকগণের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্র যে পরিমাণ অধিকার রক্ষা করিবে সেই অনুপাতেই রাষ্ট্র নাগরিকদিগের নিকট আনুগত্য দাবি করিতে পারে। অতএব রাষ্ট্র অধিকার সৃষ্টি করিতে পারে না, স্বীকার করে মাত্র। রাষ্ট্র যে পরিমাণ অধিকার স্বীকার করিবে তার উপরই রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ভর করিবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে (Indian Constitution) বেকার ভাতার দাবি স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি এই অধিকারের দাবির কোন যৌক্তিকতা নাই? রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলেই যে কোন অধিকারের দাবির নৈতিক ভিত্তি থাকিবে না এমন কথা বলা যায় না। এমন অনেক অধিকার আছে যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। জনগণ সেই অধিকারের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যায়। হয়ত পরে তাহা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়। তাই পূর্বের অস্বীকৃত অধিকারকেও ভিত্তিহীন বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের অবস্থাটি ল্যাস্কি এইভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন: "রাষ্ট্র কতকগুলি স্বীকৃত অধিকার ও কতকগুলি অস্বীকৃত অধিকারের মাঝে দাঁড়াইয়া আছে"। *

অধিকার রাষ্ট্রস্বীকৃত দাবি

আবার বলা হয় যে, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। সে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহকে বিকশিত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করিতে হইলে কতকগুলি সামাজিক অবস্থা (Social condition) বর্তমান থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। রাষ্ট্রদর্শনে এই অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক অবস্থাগুলিকে অধিকার বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায় 'অধিকার হইল এমন কতকগুলি সমাজ জীবনের অবস্থা যাহাদের ছাড়া সাধারণভাবে মানুষ তাহার সম্পূর্ণ উন্নতিবিধান করিতে পারে নাই" † রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে তখনই যখন মানুষের আত্মোপলব্ধিতে রাষ্ট্র সাহায্য করিবে। তাই রাষ্ট্রকে কতকগুলি অধিকারের স্বীকৃতি দিয়া এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যে পরিবেশের সহায়তায় মানুষ আত্মোপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

আত্মোপলব্ধির জন্য সামাজিক অবস্থার নাম অধিকার

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তাই অধিকারকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দিতে হইবে। সমাজে কোন একজনের আত্মোপলব্ধির জন্য অধিকার অপর একজনের আত্মোপলব্ধির অধিকারে যেন বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অধিকারগুলিকে নির্বাচিত করিয়া স্বীকৃতি দিতে হইবে। ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য বাঁচিবার অধিকারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একজনের বাঁচিবার অধিকারের অর্থ অপরকে হত্যা করার ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকার নয়। একজনের সম্পত্তি রক্ষার অধিকার তাহাকে ব্যক্তিত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করিবে। অবশ্য, অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন যে, ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার দিবার পূর্বে দেখিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি সমাজকে কিছু দেয় কিনা। অর্থাৎ সমাজকে কিছু দিবার পুরস্কার হইল সম্পত্তি। অন্যথায় প্রুধোঁর ভাষায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুন্ঠনবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। ল্যাস্কি

অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ

* "Any given State is set between rights that have been recognised and rights which demand recognition."—*Laski*: *Grammar of Politics.*

† Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best.—*Laski.*

বলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি আত্মোপলব্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে তবে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। আবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের অর্থ এই নয় যে, একজন অপর একজনকে যাহা খুশি তাহাই বলিয়া অপরের সুনাম নষ্ট করিবে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, অপরের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ভোগ করা যাইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজ জীবনকে সত্য ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য অপরিহার্য কতকগুলি সুযোগ, যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহাকেই অধিকার বলা হয়।

অধিকার সম্বন্ধে গ্রীণের ধারণা: রাষ্ট্রদর্শনে যাহাকে সামাজিক অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাকে ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সুযোগ-সুবিধা বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধার অর্থ সমষ্টিগত কল্যাণের সুযোগ সুবিধা। তাহা হইলে দেখা যায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক "অবস্থাকেই" অধিকার বলিয়া অভিহিত করা যায়। গ্রীণের ভাষায় বলা যায়, "সমষ্টিগত নৈতিক শুভচেতনা ব্যতীত অধিকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না" ("Without a society conscious of common moral interests, there can be no rights.")। সামাজিক জীব হিসাবে কোন ব্যক্তি যদি শুধু তাহার নিজের সুখ-সুবিধার কথা স্বার্থপরের ন্যায় চিন্তা করে তবে সে সমাজ জীবন যাপন করিতে পারিবে না। তাহাকে অপরের অধিকারও স্বীকার করিতে হইবে, অপরের সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবিতে হইবে। পরস্পর পরস্পরের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেই সমাজে অধিকারের অস্তিত্ব সম্ভব হয়। অন্যথায় প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাইবার জন্য ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা হইলে সেই ক্ষমতা হইবে পাশবিক ক্ষমতার সমতুল্য। হবস্ এই ক্ষমতার নাম দিয়াছেন, "আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা।" এই ক্ষমতা যে সমাজে বলবৎ থাকে সে সমাজ অসভ্যের সমাজ। এইরূপে সমাজে অধিকারের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির যদি অনুরূপ ক্ষমতা থাকে এবং একে অপরের ক্ষমতাকে যদি স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলে সমাজ জীবন সম্ভবপর।

গ্রীণের ধারণা

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অধিকারকে পূর্ণ হইতে হইলে দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে: (ক) একটি হইল প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থাৎ সমষ্টির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে; আর (খ) দ্বিতীয়টি হইল অধিকারকে আইনানুমোদিত হইতে হইবে। বার্কার আবার আধা-অধিকারের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে যে-সকল অধিকার এই দুইটি শর্তের কিছুটা পূরণ করিবে তাহাদিগকে আধা-অধিকার (Quasi Rights) বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত শর্ত দুইটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে অধিকার শুধু আইনানুমোদিত হইলেই চলিবে না। যেমন ক্রীতদাস পোষণের অধিকার যদি আইনানুমোদিতও হয় তাহা হইলেও ইহা যেহেতু সমষ্টিগত কল্যাণের পরিপন্থী সেইহেতু ক্রীতদাস পোষণের অধিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে অধিকারের পর্যায়ভুক্ত

হয় না। সুতরাং অধিকারকে একদিকে যেমন আইনানুমোদিত হইতে হইবে, আবার অপরদিকে সমষ্টিগত কল্যাণকামী হইতে হইবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় হব্‌স্‌ যে "ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতাকে" অধিকার বলিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত। কারণ, ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতাহীন ব্যক্তি তাহা হইলে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। শুধু শক্তিমানই তাহা হইলে অধিকার ভোগ করিবে। কিন্তু প্রকৃত ও পূর্ণ অধিকার দুর্বল ব্যক্তিও ভোগ করিতে পারে। কারণ, রাষ্ট্র যদি দুর্বল ও সবল নির্বিশেষে সকলের অধিকার ভোগ করিবার সমান সুযোগ সৃষ্টি করিয়া সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের সমাধান করে তবেই অধিকার সার্থক হয়। আদর্শ রাষ্ট্র সকলের জন্যই অধিকারের স্বীকৃতি দিবে এবং তাহা সংরক্ষণ করিবে। আদর্শ রাষ্ট্র আদর্শ অধিকারকে স্বীকৃতি দিবে।

সমালোচনা

আবার অধিকার ও স্বাধীনতা শব্দ দুইটি প্রায় সমার্থক। কারণ, অধিকার হইল আত্মোপলব্ধির সুযোগ আর স্বাধীনতা হইল আত্মোপলব্ধির অনুকূল পরিবেশ। আবার অধিকারের অর্থ হইল অপরের হস্তক্ষেপ নিরোধ আর স্বাধীনতার অর্থও অপরের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্তি। বস্তুতঃ স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় অধিকার দ্বারা। এই কারণে বলা হয়, অধিকারের অস্তিত্বের মধ্যেই স্বাধীনতার জন্ম হয় ("Liberty is the product of rights.")।

স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদ
(Theory of the Natural Rights)

রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, মানুষ কতকগুলি অধিকারকে সঙ্গে লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সুখী হইবার অধিকার হইল এই প্রকৃতির অধিকার। মানুষ এই অধিকারগুলিকে ত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারে না। চামড়া যেমন মানুষের দেহের অংশ ও এঞ্জিন যেমন চলার অংশ তেমনি এই অধিকারগুলিও তাহার স্বভাবের অংশ*। অতএব ইহা অপরিত্যাজ্য, সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন তাহার দেহের সঙ্গে সংলগ্ন তেমনি এই অধিকারগুলিও মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই অধিকারগুলিকেই বলে স্বাভাবিক অধিকার।

স্বাভাবিক অধিকারের সংজ্ঞা

স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা নূতন নহে। অবশ্য, প্রাচীন গ্রীক্‌ দার্শনিকদের সময় হইতে এ ধারণা চলিয়া আসিলেও চুক্তিবাদীদের, বিশেষ করিয়া লক্‌ ও রুশোর হস্তে ইহা বিশেষ ভাবে বিকাশ লাভ করে। এই প্রসঙ্গে চুক্তিবাদীদের বক্তব্য, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকার ছিল তাহাই প্রাকৃতিক অধিকার।

* "They are as much a part of his nature as the colour of his skin and the power of locomotion".

অবশ্য, হব্‌সের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকার ছিল তাহা শ্রেষ্ঠতর শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বার্থসাধনের জন্যই ইহা ব্যবহৃত হইত। ইহা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার অবাধ ক্ষমতাকে হব্‌স্‌ প্রাকৃতিক অধিকার বলিয়াছেন।

হব্‌সের মত

লক্‌ ও রুশো : লক্‌ ও রুশো স্বাভাবিক অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। লক্‌ বলেন যে, আদিম মানুষ স্বাভাবিক অধিকারের কিছুটা সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশ নিজের হস্তে রক্ষা করিবার জন্যই চুক্তি সম্পাদন করে। ফলে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরও কিছুটা স্বাভাবিক অধিকার মানুষের হাতে থাকিয়া যায়। রুশোর মতে স্বাভাবিক অধিকার সমষ্টিগত ইচ্ছার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলিয়া সমষ্টিগত ইচ্ছায় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং সংরক্ষিত হইবে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ফ্রান্সের স্বাধীনতার ঘোষণা দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত ঘোষণা স্বীকার করিয়াছে যে, মানুষ কতিপয়-অপরিত্যাজ্য অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে ("endowed by their creator with certain inalenable rights.") আর দ্বিতীয়োক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সকল মানুষই স্বাধীন ও সমানাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে; রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে সংরক্ষণ করা। এই অধিকারগুলির মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার অধিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।* আবার ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, এই স্বাভাবিক অধিকারের দাবিতে বুর্জোয়া-শ্রেণী সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে এবং অভিজাত শ্রেণী ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে বুর্জোয়াদের এই প্রচেষ্টাকে প্রগতিশীল বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পরবর্তিকালে দেখা যায়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও তাহার সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের তুলনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

চুক্তিবাদীদের ধারণায় স্বাভাবিক অধিকার : লক্‌ ও রুশোর মত

গ্রীণ (T. H. Green) বলেন, মানুষের নৈতিক প্রাকৃতিক উপলব্ধির জন্য যে সকল অধিকার প্রয়োজন সেই অধিকারগুলিকে স্বাভাবিক অধিকার বলা হয়। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলিকে রক্ষা করে এবং মানুষের নৈতিক সত্তার উপলব্ধির পথে যে বাধাগুলি আছে তাহা দূর করিবার জন্য যে সকল উপায় গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করে।

গ্রীণের মত

বর্তমান ধারণা : বর্তমানে স্বাভাবিক অধিকারকে আর চিরন্তন, অবাধ অপরিত্যাজ্য বলিয়া কল্পনা করা হয় না। বর্তমানের ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে গিডিংসের উক্তির মধ্যে। গিডিংস্‌ বলেন : স্বাভাবিক অধিকার হইল, "সামাজিক

---

*"Man...hath by nature a power...to preserve his property that is, his life, liberty and estate."—*Locke* : Two Treatises on Civil Government.

সম্বন্ধের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা নির্বাচিত সমাজের প্রয়োজনীয় অধিকার।"*

সমালোচনা: স্বাভাবিক অধিকারের ধারণার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, সমালোচকগণের মতে সহজাত, চিরন্তন, অবাধ অধিকার বলিয়া কিছু নাই। কারণ মানুষ যে সকল অধিকার ভোগ করে তাহা সমাজদেহ হইতেই উদ্ভূত হয়। আবার এই সমাজ গতিশীল। সুতরাং অধিকারও গতিশীল হইতে বাধ্য। অর্থাৎ গতিশীল সমাজে স্থিতিশীল ও চিরন্তন অধিকার বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক সময়ে ক্রীতদাসকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে সংরক্ষণের অধিকার ছিল স্বাভাবিক অধিকার; কিন্তু বর্তমানে তাহা আর অধিকারের পর্যায়ভুক্ত হয় না। এই কারণে কেহ কেহ অধিকারকে **সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, "স্বাভাবিক (natural) শব্দটির কোন সর্বাবাদিসম্মত সংজ্ঞা না থাকায় কোন্ অধিকারগুলি স্বাভাবিক অধিকার আর কোন্ অধিকারগুলি স্বাভাবিক অধিকার নয় তাহা নির্ধারণ করা কষ্টকর।

তৃতীয়তঃ, সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তাগণ প্রাক্-রাষ্ট্র যুগে মানুষের অধিকারগুলিকে স্বাভাবিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাক্-রাষ্ট্র যুগের অধিকার অবাধ ছিল, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল অনিয়ন্ত্রিত এবং উহা ছিল স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। মানুষ জন্ম হইতে কতকগুলি অধিকার লইয়া আসে। এই অধিকারগুলিকে স্বাভাবিক অধিকার না বলিয়া এইগুলিকে শক্তিসম্ভূত ক্ষমতা বলা উচিত। এই শক্তিসম্ভূত ক্ষমতাগুলিকেই পরে সমাজ অধিকারে রূপান্তরিত করিয়া লয়।

চতুর্থতঃ, বেন্থাম (Bentham) প্রমুখ হিতাবাদিগণ (utilitarian) এই মন্তব্য করেন যে, সমাজে নিরপেক্ষ কোন অধিকার থাকিতে পারে না। অধিকার সমাজ স্বীকৃত দাবি। যে অধিকারের দ্বারা বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সামগ্রিক কল্যাণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যক্তির কল্যাণসাধন সম্ভবপর হয় তাহাই স্বাভাবিক অধিকার। হিতবাদিগণ সর্বাধিক মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। সমাজ স্বীকৃত অধিকারগুলি সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের উদ্দেশ্যের জন্যই স্থিরীকৃত হয়।

পঞ্চমতঃ, হল্যাণ্ডের (Holland) মতানুসারে অধিকার রাষ্ট্রের আইন দ্বারা সৃষ্ট অথবা স্বীকৃত। রাষ্ট্র অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় বলিয়াই নাগরিকগণ স্বীকৃত অধিকারের সহায়তায় একে অপরের কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। তাই রাষ্ট্র সমর্থিত ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতাকে বলা হয় অধিকার।

অধিকার একটি সমাজগত ও রাষ্ট্রগত ধারণা। তাই প্রাক্-রাষ্ট্রীয় অবস্থায় অধিকার বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের বাহিরেও অধিকারকে চিন্তা করা যায় না। রবিনসন ক্রুশোর অধিকার বলিয়া কিছু ছিল না।

---

*"Natural rights are socially necessary forms of right, enforced by natural selection in the sphere of social relations."—*Giddings*

উপসংহারে বলা যায়, যদি কোন অধিকারকে স্বাভাবিক বলিতে হয় তাহা হইলে মানুষের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির উপযোগী সামাজিক অবস্থাসমূহকেই স্বাভাবিক অধিকার বলা উচিত। যে অধিকার ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধনে ব্যবহৃত হয় তাহাই তো স্বাভাবিক। এই অধিকার আইনসঙ্গত কি আইনসঙ্গত নয়—, সে প্রশ্ন অবান্তর। ইহা যদি আদর্শের মানদণ্ডে পরীক্ষিত হইয়া সামগ্রিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয় তবেই ইহা স্বাভাবিক অধিকারের পদবাচ্য হইবে।

নৈতিক ও আইনসম্মত অধিকার
(Moral and Legal Rights)

পূর্ববর্তী আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন দাবিই অধিকারের মর্যাদা লাভ করে না। কিন্তু নৈতিক দাবির পশ্চাতে কোন রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন না থাকিলেও ইহাকে অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। নৈতিক অধিকার হইল সমাজের ন্যায়বোধ ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবি। ইহা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া অনেকে ইহাকে স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেন।

নৈতিক অধিকারের সংজ্ঞা

নৈতিক অধিকারের একটি উদাহরণ হইল পুত্রের নিকট হইতে পিতার সদ্ব্যবহার পাইবার দাবি। রাষ্ট্রের আইন পিতার উপর পুত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিতে পারে; কিন্তু জোর করিয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সদ্ব্যবহার আদায় করিতে পারে না। একমাত্র বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই পুত্র পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। এই কারণে নৈতিক অধিকারকে অধিকারের বিচারে পূর্ণ অধিকারের মর্যাদা দেওয়া যায় না। অবশ্য, আদর্শ রাষ্ট্র নৈতিক অধিকার কার্যকরী করিবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া উহাকে প্রকৃত অধিকারের মর্যাদা দান করিবে। নৈতিক অধিকার সমাজকল্যাণের অনুপন্থী। আইনসঙ্গত অধিকারকেও সমাজকল্যাণের অনুপন্থী হইতে হইবে। যদি কখনও দেখা যায় যে, শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী কতকগুলি অধিকারকে অনুমোদন করিয়া লইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত অধিকারগুলিকে পূর্ণ অধিকার বলা যাইতে পারে না। কারণ, পূর্ণ অধিকার সমাজকল্যাণকর হইবে। সুতরাং আইনসঙ্গত অধিকারকে পূর্ণ অধিকারের মর্যাদা লাভ করিতে হইলে তাহাকে নৈতিক অধিকারের অঙ্গীভূত হইতে হইবে; কারণ নৈতিক অধিকার সমাজ-কল্যাণকর।

সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার
(Civil, Political and Economic Rights)

(ক) সামাজিক অধিকার বা নাগরিক অধিকার (Civil Rights) : সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষের এমন কতকগুলি অধিকারের প্রয়োজন যেগুলি ছাড়া মানুষের সামাজিক জীবন ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই অধিকারগুলির সাহায্যে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া সমাজের কল্যাণব্রতী কর্মে নিজেকে সক্রিয় করিয়া তোলে। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দিয়া এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে অনুকূল যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহাকেই

বলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা (Civil Liberty)। গেটেলের মতে রাষ্ট্র নাগরিকদিগের জন্য যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে এবং রক্ষা করে তাহাদিগকে পৌর স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে।"* সামাজিক অধিকারগুলি হইল ব্যক্তির জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি। দেশ-কালভেদে সামাজিক অধিকারগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল মৌলিক। নিম্নে মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির আলোচনা করা হইল ঃ

(১) জীবনের অধিকার (Right to Life) ঃ জীবনের অধিকার হইল মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার। অর্থাৎ একজন অপর একজনকে যদৃচ্ছা হত্যা করিতে না পারার অধিকার। এই অধিকার মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির মধ্যে প্রধানতম অধিকার। এই অধিকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া হব্‌স্ বলিয়াছেন যে, জীবনরক্ষার জন্যই আদিম মানুষ চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, মানুষ সকল অধিকার সার্বভৌম নৃপতির হস্তে সমর্পণ করিলেও আত্মরক্ষার অধিকার সমর্পণ করে নাই এবং ইহা হস্তান্তরযোগ্যও নহে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণের মতে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হইল ব্যক্তির জীবনকে বৈদেশিকদের আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার হাত হইতে রক্ষা করা। আবার জীবনরক্ষার অধিকার যেমন সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, সেইরূপ আত্মহত্যার দ্বারা কোন জীবনের বিনষ্টিও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ ব্যক্তি তাঁহার নিজের জীবন বিনষ্ট করিলে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে পারে না। এই কারণে ব্যক্তির আত্মহত্যার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty) ঃ স্বাধীনতার অধিকার বলিতে বুঝায় গতিবিধির স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন প্রভৃতির অধিকার। জীবনকে সুন্দর ও কাম্য করিতে হইলে এই অধিকারগুলি অপরিহার্য। অবশ্য, স্বাধীনতার অধিকার অব্যাহত নহে, কারণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইলে রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে এই অধিকারগুলিকে খর্ব করিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে। সমালোচকগণের যুক্তি হইল, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই যদি রক্ষিত না হয় তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অচিরেই ধ্বংস হইবে। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র সাময়িকভাবে উহা খর্ব করে।

(৩) মত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Opinion) ঃ মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় স্বাধীনতা চিন্তা প্রকাশের অধিকার। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—বাক্-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। এই যুগের শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। এই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় জনমতের উপর। তাই বলা হয় যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকিলে কখনও জনমত গঠিত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলেন যে, জনগণের সতর্ক দৃষ্টি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা নিরর্থক। জনমতের দ্বারা সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনৈতিক জীবনই আদর্শ জীবন।

---

* Civil liberty consists of the rights and privileges which the State creates and protects for its subjects —*Gettel.*

কিন্তু এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা অনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়; কারণ, অনিয়ন্ত্রিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা এমন দুর্নীতিমূলক ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক প্রচারকার্যে রত থাকিতে পারে যাহা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। আবার মানহানি, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অজুহাতে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করাও অবাঞ্ছনীয়। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দেখা যায় ধনিকশ্রেণী—যাহাদের হস্তে শাসনক্ষমতা রহিয়াছে, তাহারা উপরোক্ত অজুহাতগুলির সাহায্যে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীকে অতি সহজেই আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করে। এই শ্রমিকশ্রেণী আদালতের ব্যয়ভার বহন করিতে না পারিয়া প্রায়শঃই কারাবরণ করে। আবার সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে মত প্রকাশিত হয় তাহা শ্রমিকশ্রেণীর মত নয়, কারণ সংবাদপত্রের ধনী মালিকশ্রেণী তাহাদের শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলেই মত প্রকাশ করিয়া থাকে। আর শ্রমিকশ্রেণীর যে মত তাহাতে প্রকাশিত হয় তাহা বিকৃত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। এই কারণে অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়, তাহাকে বলবৎ করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

(৪) **পরিবার গঠনের অধিকার (Right to Family):** গ্রীক দার্শনিক প্লেটো পারিবারিক জীবনের অবসান ঘটাইয়া এক সমভোগী, সমাজের পরিকল্পনা রচনা করেন। আবার অন্যতম গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল পরিবারকেই সমাজ-বন্ধনের মূল সূত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সমাজ-জীবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত পারিবারিক জীবনই সমাজের কেন্দ্রস্থল হিসাবে কার্য করিতেছে। এই পরিবার ধ্বংস হইলে সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংস হইবে। এই কারণে কোন রাষ্ট্রই পরিবার গঠনের অধিকারকে অস্বীকার করে না।

(৫) **সম্পত্তির অধিকার (Right to Property):** সম্পত্তির অধিকারকে এ্যারিস্টট্‌ল সমাজ-বন্ধনের মূল গ্রন্থি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সম্পত্তির অধিকার চুক্তিবাদীরাও সমর্থন করেন। সম্পত্তির অধিকার বলিতে বুঝায় সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ও দানের অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের ও ব্যবহারের অধিকার। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকারের বিলোপ সাধন করা হইয়াছে এই যুক্তিতে যে, সম্পত্তির অধিকার অব্যাহত থাকিলে শোষণ ব্যবস্থাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শোষণ-ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্যই এই অধিকারকে অস্বীকার করা হয়।

(৬) **সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (Right to Association):** মানুষ সংঘপ্রিয়। সংঘপ্রিয়তা তাহার প্রকৃতিগত। মানুষের এই সংঘপ্রিয়তার জন্যই বলা হয় যে, রাষ্ট্রনৈতিক সংঘ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। মানুষ তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্য শুধু সংঘ গড়িয়া তুলে নাই, মানুষ তাহার সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে বিকশিত করিবার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংঘ গড়িয়া তুলিয়াছে। ল্যাস্কি প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তি এই মন্তব্য করেন যে, মানুষ ধীরে ধীরে নিজেকে এই সকল সংঘের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিতেছে। অরেও বলা হয় যে, এই সংঘগুলি তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। কিন্তু ইহা একটি অতিশয়োক্তি। কারণ, রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল সংঘই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার নিয়ন্ত্রণাধীন।

(৭) **চুক্তির অধিকার (Right to Contract):** সমাজে যতদিন পর্যন্ত সম্পত্তির অধিকার ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের অধিকার স্বীকৃত হইবে ততদিন

পর্যন্ত চুক্তির অধিকারও স্বীকৃত হইবে। কারণ সম্পত্তির ক্রয়বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমেই হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক চুক্তি দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। এই কারণে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় চুক্তির অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অধিকার কখনও অব্যাহত ও অনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। কারণ, দুর্নীতিমূলক চুক্তিকে কোন আদর্শ রাষ্ট্রই স্বীকার করিবে না।

(৮) **স্বাধীন বিবেক ও ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Freedom of Conscience and Religion) :** ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্বে অনেক রাষ্ট্র ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মীয় রাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম (State Religion) থাকিত। এই রাষ্ট্রীয় ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনেক সময় অপরাপর ধর্মকে বিনাশ করা হইত। বর্তমানে পাকিস্তান প্রভৃতি কতিপয় রাষ্ট্র ছাড়া ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নাই বলিলেই চলে। কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্র না থাকিলেও প্রায় সকল রাষ্ট্রই বিবেক ও ধর্ম-বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য, এই বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার সহিত যদি রাষ্ট্রের আইনের সংঘর্ষ বাধে, তাহা হইলে রাষ্ট্র তাহার অস্তিত্ব ও স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(৯) **আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার (Right to Equality before Law) :** অধিকার বলিতে বুঝায় মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের পক্ষে সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু সমাজান্তর্গত অধিকার যদি অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে অধিক সুবিধাভোগকারীর অধিকার অপরের অধিকার ভোগ করিবার পথে বাধা সৃষ্টি করিবে। আইনের মাধ্যমেই একমাত্র সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আইনের দৃষ্টিতে যদি সমানাধিকার স্বীকৃত হয় তবে প্রত্যেকের অধিকার সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কারণ আইন নিজেই অধিকারী শ্রেণীর স্বার্থবাহী।

(১০) **ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার (Right to Education and Preserve distinct Language and Culture) :** এই তিনটি অধিকার ছাড়া ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইতে পারে না। অশিক্ষিত ও অজ্ঞদের সমাজে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার ছাড়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ লাভও সম্ভব নয়। ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার অধিকার সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করে। ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার অধিকারের অর্থ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করা। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখানো হইয়াছে যে. সর্বক্ষেত্রে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করা সম্ভব নয়। আবার শিক্ষার অধিকার বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রান্তর্গত প্রতিটি মানুষের একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত শিক্ষিত হইবার সমানাধিকার এবং উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষারোহণে সকলের সমানাধিকার। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ও সর্বপর্যায়ে এইভাবে শিক্ষার অধিকারকে স্বীকার করা যায় না। মেধাবী ছাত্রকে সকল রাষ্ট্রই বিশেষ অধিকার দিয়া থাকে।

(খ) রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার
(Political Rights)

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা। এই অধিকার নাগরিক ছাড়া অন্য কেহ ভোগ করিতে পারে না। পূর্বে এই অধিকার দ্বারা বুঝাইত সরকারকে দমন করিবার ক্ষমতা। আর বর্তমানে ইহার দ্বারা সরকারকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার সুযোগ-সুবিধাকে বুঝানো হয়। নিম্নে কতিপয় রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের আলোচনা করা হইল :

(১) **বসবাস করিবার অধিকার (Right of Residence) :** এই অধিকারের অর্থ রাষ্ট্রাভ্যন্তরে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার অধিকার। এই অধিকার নাগরিকেরাই ভোগ করে বিদেশীদের রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার অধিকার থাকে না। তাহারা শুধু রাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া অস্থায়িভাবে বসবাস করে। আবার রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত নাগরিক যখন স্থায়িভাবে রাষ্ট্রে বাস করিতে পারে না তখন সে আর নাগরিক থাকে না। অতএব নাগরিকদের ইহা হইল সর্বপ্রধান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার।

(২) **বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তার অধিকার (Right to Protection while staying Abroad) :** এই অধিকারের অর্থ রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যখন বিদেশে সাময়িকভাবে বাস করিবে তখন বৈদেশিক রাষ্ট্র যদি তাহার উপর কোন দুর্ব্যবহার করে তবে তাহার নিজের রাষ্ট্র উহার প্রতিকার করিবে। নাগরিকের এই অধিকার বলবৎ করিবার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে এমন কি যুদ্ধ পর্যন্ত ঘোষণা করিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন যখন অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার উপর এই ধরনের একটি অধিকারকে বলবৎ করিবার চেষ্টা করে।

(৩) **ভোটাধিকার (Right to Vote) :** রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল ভোটাধিকার। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ-সুবিধাই প্রধানতম রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। পূর্বে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সরাসরি ভোটদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিত। বর্তমানে বৃহদায়তন রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভবপর নয় বলিয়া ভোটদানের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহার মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে। এই অধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ও ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই কাম্য।

(৪) **নির্বাচিত হইবার অধিকার :** আবার ভোটদানের অধিকার হইতেই নির্বাচিত হইবার অধিকার জন্মায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যোগ্যতা থাকিলেই ভোটদানের অধিকার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রদান করা হয়।

(৫) **সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের অধিকার (Right to hold Public Office) :** সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের অধিকারের মাধ্যমে নাগরিক রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য যোগ্যতা অনুসারে এই অধিকার প্রদান করা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য। আবার অনেক সময় বিদেশীকে সরকারী কার্যে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ; রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার অনুসারে নয়।

(ঙ) **রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against the State) :** এই অধিকারের আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। সক্রেটিস্ প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকারের অর্থ অরাজকতা সৃষ্টি করিবার অধিকার। আবার অরাজকতাকে সমর্থন করার অর্থ সংঘবদ্ধ জীবনকে ব্যাহত হইতে দিবার সুযোগ দান। ইহা সমাজের মৌল আদর্শের পরিপন্থী এবং সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকারের অর্থ শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে অধিকার। রাষ্ট্র একটি তত্ত্বগত ধারণা মাত্র ; শাসনযন্ত্রই কার্যতঃ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় ও বলবৎ করে। আবার, রাসেলকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, অরাজকতার সম্ভাবনা থাকিলেও সরকার যদি নিকৃষ্ট হয় এবং সে তাহার কর্তব্য পালন না করে, তবে জনসাধারণের বিদ্রোহ করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়। এই বিদ্রোহের অধিকার না থাকিলে শাসকবর্গ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। ফলে জনগণের আত্মোপলব্ধির সকল সুযোগ ব্যাহত হইবে, সকল পথ রুদ্ধ হইবে।

কিন্তু, সকল অধিকারই সমাজসঞ্জাত। রাষ্ট্র ইহাদের স্বীকৃতি দেয় ও বলবৎ করে মাত্র। এখন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে অধিকার রাষ্ট্র কিভাবে তাহার স্বীকৃতি দিবে এবং তাহা বলবৎ করিবে ? এই কারণে কেহ কেহ এই অধিকারকে অবাস্তব ও অলীক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(গ) অর্থনৈতিক অধিকার
(Economic Right)

এই অধিকার সমাজজীবনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া অনেকে এই অধিকারকে মৌলিক সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। কিন্তু বর্তমান যুগের অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক অধিকারের একটি বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় এই অধিকারকে বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইল। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় অর্থনৈতিক অধিকার হইল, "দৈনন্দিন অন্নসংস্থান ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া পাইবার সুযোগ" ("The opportunity to find reasonable significance in the earning of one's daily bread.")। নিম্নে এই জাতীয় কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকারের আলোচনা করা হইল :

(১) **কর্মের অধিকার (Right to Work) :** এই অধিকারের প্রসঙ্গে ল্যাস্কি বলেন যে, কর্মের দ্বারাই মানুষ তাহার জীবিকার্জন করে ; অতএব মানুষের কর্ম-সংস্থান করিয়া দিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাজের। জীবিকার্জনের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধার পথ উন্মুক্ত না থাকিলে মানুষের জীবনের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। কর্মের অধিকার বলিতে যে-কোন কর্মে অধিকার বুঝায় না, ইহার দ্বারা বুঝায় যথাযোগ্য কর্মে অধিকার।

(২) **পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের অধিকার (Right to Adequate Wages :** ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কতিপয় লোকের প্রাচুর্যের রসদ যোগাইবার

পূর্বে দেখিতে হইবে, প্রত্যেকের যেন অভাবমোচন হয়।* সমাজে ধনী ও নির্ধনের জীবনযাত্রার মান এক নয়। জীবনযাত্রার মানের সাম্যবিধানের জন্য নাগরিককে শুধু কর্মের অধিকার দিলেই চলিবে না, তাহাকে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের অধিকারও দিতে হইবে।

(৩) **অবকাশের অধিকার (Right to Leisure) :** এই প্রসঙ্গে গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টটল বলেন যে, "সুখী হইবার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইল বিশ্রাম" ("Leisure is essential to happiness.")। মানুষের সত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয় যদি মানুষকে সারা দিনরাত অন্নসংস্থানের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। মানুষের কর্ম-শক্তির একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিলে মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়, সে অন্নসংস্থানের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে বিশ্রামের অধিকার দিতে হইবে। বিশ্রাম সত্তার বিকাশে সাহায্য করে।

উপসংহারে বলা যায়, উপরে যে তিন শ্রেণীর অধিকারের, অর্থাৎ সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অতিশয় অস্পষ্ট। কারণ প্রায় প্রত্যেকটি অধিকারই পরস্পর নির্ভরশীল। যেমন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইহা সামাজিক অধিকার। কিন্তু, ইহা আবার ভোটদানের অধিকার অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সহিত সম্পর্কিত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অস্পষ্ট। আবার সকল দেশে একই ধরনের অধিকার প্রদান করা হয় না। রাষ্ট্রিক কাঠামোর উপরই অধিকারের চরিত্র নির্ভর করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে ধরনের অধিকার প্রদান করা হয়, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেই ধরনের অধিকার প্রদান করা হয় না। এই কারণেই ল্যাস্কি অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন ("The State is known by the rights it maintains."—*Laski*)।

মৌলিক অধিকার
(Fundamental Rights)

নাগরিকের অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এই অধিকারগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া প্রায় সর্বদেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি হইল এই ধরনের অধিকার। প্রায় অধিকাংশ দেশেই এই অধিকারগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। এই অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

মৌলিক অধিকারের ধারণা

(১) ইহা রাষ্ট্র কর্তৃক মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়।

(২) এই অধিকারগুলিকে লিখিত বা অলিখিত শাসনতন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়।

* "There must be sufficiency for all before there is a superfluity for some." —*Laski*.

(৩) আবার বিশেষ সনদ দ্বারাও এইগুলি গৃহীত হইতে পারে। Charter of Rights or Bill of Rights এই ধরনের সনদের উদাহরণ।

ব্রিটেন ঃ এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় ব্রিটেনে যদিও লিখিত শাসনতন্ত্র নাই, কিন্তু সেখানে (১) প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদের (পার্লামেন্টের) প্রাধান্য, (২) বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা এবং প্রয়োজনবোধে জুরির সাহায্যে বিচার, (৩) বিনা বিচারে বন্দী না করিবার নিরাপত্তা (Habeas Corpus), (৪) দ্রুত বিচার পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে মৌলিক অধিকারের পদবাচ্য করা হয়। ব্রিটেনের লিখিত সংবিধান না থাকিলেও ম্যাগনাকার্টা (*Magna-Carta*), বিল অব রাইটস্ (Bill of Rights) এবং সাধারণ আইনে (Common Law) বহু মৌলিক অধিকারের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং লিখিত সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ না হইলেও ইংল্যাণ্ডে মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই বলিলে ভুল হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৭৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় তাহাতে মৌলিক অধিকারের কোন উল্লেখ ছিল না বটে, কিন্তু পরে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া নিম্নোক্ত অধিকারগুলিকে শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই অধিকারগুলি হইল ঃ (১) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, (২) বাক্-স্বাধীনতা, (৩) অভিযোগ খণ্ডন করিবার জন্য আবেদন করার অধিকার, (৪) অস্ত্র-ধারণের স্বাধীনতা, (৫) সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ হইতে নিরাপত্তা, (৬) আইন-বিগর্হিত অনুসন্ধান বন্ধ করা এবং (৭) সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিতগুলিকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে ঃ (১) কর্মের অধিকার, (২) কর্মানুযায়ী বেতন পাইবার অধিকার, (৩) বিশ্রাম ও অবকাশ পাইবার অধিকার এবং (৪) শারীরিক অক্ষমতায় রক্ষণাবেক্ষণ পাইবার অধিকার ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে নিম্নোক্তগুলিকে মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে ঃ (১) স্বাধীনতার অধিকার, (২) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৩) সমান ব্যবহার পাইবার অধিকার, (৪) স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার, (৫) সম্পত্তির অধিকার, (৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার এবং (৭) শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার।

উপসংহারে বলা যায়, এই সকল মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়াও আরও এমন বহু অধিকার আছে যাহা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করে। অতএব অধিকারগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি মৌলিক অধিকার আর কোন্‌গুলি মৌলিক অধিকার নয় অর্থাৎ কোন্‌গুলি আত্মোপলব্ধিতে একান্ত অপরিহার্য আর কোন্‌গুলি অপেক্ষাকৃত কম অপরিহার্য তাহা স্পষ্টাকারে প্রকাশ করা যায় না।

কর্তব্য (Duties) ঃ কর্তব্য বলিতে বুঝায় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব কোন কিছু করাও হইতে পারে আবার কোন কিছু করা হইতে বিরত থাকাও হইতে পারে ; যেমন, রাষ্ট্রের আইন মান্য করা একটি কর্তব্য আবার রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য না করাও একটি কর্তব্য। কর্তব্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা, (১) আইনসংগত কর্তব্য এবং (২) নৈতিক কর্তব্য। যে কর্তব্য পালন না করিলে রাষ্ট্র আইনসংগতভাবে শাস্তি দিতে পারে তাহাকে আইনসংগত

কর্তব্যের সংজ্ঞা

কর্তব্য বলা যাইতে পারে আর যে কর্তব্য মানুষ বিবেকের তাড়নায় পালন করে তাহাকে নৈতিক কর্তব্য বলা যাইতে পারে ; গরীবকে সাহায্য করা নৈতিক কর্তব্যের উদাহরণ ; এই কর্তব্য পালন না করিলে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে না, ইহা বিবেকের নির্দেশেই লোকে করিয়া থাকে। আবার রাষ্ট্রের আইন মান্য করা হইল আইনসংগত কর্তব্য। যদি কেহ রাষ্ট্রীয় আইন মান্য না করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিতে পারে। এই দুই শ্রেণীর কর্তব্য ছাড়া কতকগুলি কর্তব্যকে রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায়, যেমন ভোটদান করা। কোন কোন দেশে ভোটদান বাধ্যতামূলক, আবার অনেক দেশেই ভোটদান বাধ্যতামূলক নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, আর্জেন্টাইন, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে ভোটদান আইনগত ভাবে বাধ্যতামূলক। এই ক্ষেত্রে ভোটদানকে আইনসংগত কর্তব্যও বলা যাইতে পারে।

অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties) ঃ অধিকার যেমন সমাজবোধ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কর্তব্যও তেমনি সমাজবোধ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরের উপর যে সকল দাবি করে সেই সকল দাবি যদি পরস্পর কর্তৃক স্বীকৃত হয় তবেই দাবিগুলি অধিকারে পরিণত হয়। এই দাবিগুলি স্বীকারের অর্থ কতকগুলি দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার। এই দায়িত্বগুলিকেই বলে কর্তব্য। এই দায়িত্বগুলি যদি আইনানুমোদিত হয় তবেই তাহারা আইনসংগত কর্তব্যে পরিণত হয়। সমাজে একজনের অধিকার অপরের কর্তব্য পালনের উপর নির্ভরশীল। অতএব প্রত্যেকের কর্তব্য পালনের উপর নির্ভর করে প্রত্যেকের অধিকারের স্বীকৃতি। কোনও সম্পত্তির উপর আমার অধিকার বজায় থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না অপর কেহ আমার সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ না করিবার কর্তব্য পালন করিবে।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে হব্‌হাউস বলেন ঃ "আমার যদি ধাক্কা না খাইয়া পথে চলিবার অধিকার স্বীকৃত হয় তবে অপরের কর্তব্য হইবে আমাকে দরকার মতো পথ ছাড়িয়া দেওয়া" ("If I have a right to walk along the street without being pushed off the pavement......your duty is to give me reasonable room.")। এইদিক হইতে বিচার করিলে অধিকারের অর্থ কর্তব্য পালন করা ("Rights imply duties."—*Laski*)। অতএব অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

অধিকার বলিতে বুঝায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধা। অবশ্য ব্যক্তি সমাজে বাস করিয়াই এই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। সুতরাং ব্যক্তিকে তাহার খেয়ালখুশিমতো এই অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া যায় না। সামাজিক কল্যাণকে ব্যাহত করিয়া ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির জন্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাকে অধিকার বলা হয় না। সামাজিক কল্যাণের সহিত ব্যক্তিগত অধিকারের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। নাগরিক সম্পত্তির অধিকার পাইলে তাহার কতর্ব্য ঐ সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহার করা যাহাতে সমাজের কোন অকল্যাণ না হয়।

ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক কল্যাণের সহিত কর্তব্যের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয়

অধিকার বলিতে বুঝায় আইনসংগত অধিকার ও কর্তব্য। রাষ্ট্রই অধিকারকে স্বীকার করে এবং তাহাকে বলবৎ করে। সুতরাং সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য

প্রদর্শন করা, তাহাকে কর প্রদান করিয়া ব্যয় নির্বাহ করিতে সহায়তা করা এবং অপর দেশ কর্তৃক রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য যুদ্ধে যোগদান করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। কারণ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই যদি বজায় না থাকে তবে নাগরিকের অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবে কে? অতএব রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য নাগরিকের।

রাষ্ট্র বনাম কর্তব্য

আবার অধিকার বলিতে বুঝায় নাগরিকের ব্যক্তি-সত্তাকে প্রকাশ করার সুযোগ-সুবিধা। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই সকল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। রাষ্ট্র যদি তাহার এই কর্তব্য পালন না করে তবে রাষ্ট্রের এই কর্তব্য সম্পাদনকারী যন্ত্র সরকারের পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নাগরিকের কর্তব্য হইল আইনসঙ্গতভাবে বা বিদ্রোহের দ্বারা এই সরকারকে পরিবর্তন করা। এই কারণে বিদ্রোহের অধিকারকে কর্তব্যের অন্তর্গত করা হয়।

ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্রোহের অধিকারও একটি কর্তব্য

আবার ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধির জন্য সমাজ যে সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে তাহাকে সামাজিক অধিকারের পদবাচ্য করা হয়। এই সামাজিক অধিকারকে সামাজিক কল্যাণের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। একজনের সম্পত্তির অধিকারকে এমন ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে অপরের বা সমাজের কোন অনিষ্ট না হয়। ইহাও সম্পত্তির অধিকারীর কর্তব্য। এই কর্তব্য পালিত না হইলে সমাজ তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারে।

সমাজ ও কর্তব্য

নাগরিকের মূল কর্তব্যগুলি (Principal Duties of the Citizen) :

(ক) আইনকে মান্য করা (Obedience to laws)—আইনের মাধ্যমেই অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকেরই উচিত আইনকে মান্য করা। রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের জন্যই নাগরিকের আইন মান্য করিয়া চলা উচিত। আবার আইন যদি অন্যায় হয় তবে তাহাকে অমান্য না করিয়া জনমত গঠন করিয়া তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে।

(খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য (Allegiance) : ইহা নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। আনুগত্যের অর্থ হইল রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া সর্বতোভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। রাষ্ট্র এই আনুগত্যের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

নাগরিকের কর্তব্য (১) রাষ্ট্রের তথা স্বাধীনতার অস্তিত্বকে বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করা ;

(২) প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সৎভাবে ভোটদান করা ;

(৩) রাষ্ট্রকার্যে সরকারী কর্মীদের সহায়তা করা নাগরিকের বিশেষ কর্তব্য। এইজন্য সর্বদেশে জুরীর বিচার প্রবর্তিত হইয়াছে।

(৪) অপরাধীদের গ্রেপ্তারকার্যে, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে, রাষ্ট্ররক্ষার কার্যে প্রত্যেক নাগরিকেরই দায়িত্ব রহিয়াছে।

(গ) **করপ্রদান (Payments of taxes) :** রাষ্ট্রযন্ত্রকে চালু রাখিবার জন্য, জনহিতকর কার্য করিবার জন্য, ব্যয়নির্বাহার্থ নাগরিককে কর প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) **সামাজিক কাজ :** উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য নাগরিকগণকে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে সরকারকে সমালোচনা করা এবং ভোটদান ব্যাপারে সচেতন হওয়া কর্তব্য।

পরিশেষে বলা যায়, অধিকাংশ শাসনতন্ত্রেই নাগরিকেরই মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কর্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে অবশ্য দেখা যায় যে, অধিকারগুলির পাশাপাশি কর্তব্যগুলিও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, অধিকারগুলি যদি শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় তবে কর্তব্যগুলিও শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত ; তাহা না হইলে অধিকারগুলি একতরফা স্বীকৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য, কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকায় অধিকারের উল্লেখ করিলে কর্তব্যের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

স্বাধীনতা
(Liberty)

স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ (Difinition and Nature of Liberty) : স্বাধীনতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক সমস্যাবহুল আলোচ্য বিষয়বস্তু। স্বাধীনতা বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ ইচ্ছানুসারে আপন জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা। কোন ব্যক্তিই অপরের নির্দেশানুসারে চলিতে চায় না। ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকেই সাধারণতঃ স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। স্বাধীনতা ও অধিকার প্রায় সমার্থবোধক। অধিকার হইল আত্মশক্তির বিকাশের বা ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সুযোগ। আর স্বাধীনতা হইল ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ। অধিকার দ্বারাই স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মানুষ দুইটি সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রবৃত্তি দুইটির মধ্যে একটি হইল সামাজিক প্রবৃতি (Social nature) আর অপর প্রবৃত্তিটি হইল মানুষের অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণের স্পৃহা। মানুষের এই প্রবৃত্তি দুইটি একে অপরের বিপরীত। মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি মানুষকে সমাজে বাস করিতে বাধ্য করে। আর অবাধ স্বাধীনতার স্পৃহা মানুষকে সমাজচ্যুত করিবে। কারণ সমাজে বাস করিতে হইলে মানুষকে একে অপরের জন্য কিছু অবাধ স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইবে। অন্যথায় তাহাকে বনে যাইয়া বাস করিতে হইবে। মানুষের এই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার প্রশ্নের আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাধীনতার আলোচনা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণবিহীনতার অর্থে ব্যবহার করা হয় না, অর্থাৎ অবাধ স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। কারণ একজনের অবাধ স্বাধীনতার অর্থ অন্য সকলের স্বাধীনতায় তাহার হস্তক্ষেপের স্বীকৃতি। তাই

স্বাধীনতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্যাসঙ্কুল আলোচ্য বিষয়

নিয়ন্ত্রণবিহীন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিবার স্পৃহা সমাজবিরোধী। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, "মানুষের সহজাত বৃত্তির নিশ্চিত পরিণতিরূপে নিয়ন্ত্রণগুলি আবশ্যক" ("Regulations obviously enough, is the consequence of gregariousness ; for we cannot live together without common rule." —*Laski*)

প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীই স্বাধীনতার জন্মস্থান। এথেন্সবাসীরা এই স্বাধীনতার অর্থে সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত উভয় স্বাধীনতাকেই বুঝিতেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আবার দুইদিক হইতে বিচার্য হইত। একদিকে ইহার অর্থ করা হইত স্বশাসন আর অপরদিকে অর্থ করা হইত প্রতিদিনের অভাব অভিযোগ হইতে অব্যাহত লাভ। এথেন্সে স্বশাসনের নীতি হইতে উদ্ভূত হয় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। এ্যারিস্টটলের সময়ে এথেন্সে দাস প্রথা চালু থাকায় এথেনীয়রা প্রতিদিনকার অভাব অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া মুক্তজীবন যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অর্থ কালক্রমে বিবর্তিত হইয়া দাঁড়ায়, ব্যক্তির জীবনকে সুখী করিবার জন্য ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা কিন্তু ভূমিগত সার্বভৌমিকতার ধারণার পরিস্ফুটনের পর স্বাধীনতার ধারণার সহিত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণার এক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতার অর্থ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা আর সার্বভৌমিকতার দ্বারা বুঝায় এই স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার।

এই ধারণার অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্য জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁহার স্বাধীনতা সম্পর্কিত (Essay on Liberty) গ্রন্থে স্বাধীনতার এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

তাঁহার মতে স্বাধীনতার অর্থ বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রণবিহীনতা নয়; স্বাধীনতার অর্থ হইল মানুষের মৌলিক সামাজিক শক্তির এক শক্তিশালী, বহুবিধ ও অব্যাহত অভিব্যক্তি। সমাজকে যদি সুন্দর করিয়া গড়িতে হয় তবে ব্যক্তির মানসিক বৃত্তির অব্যাহত অভিব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। কিন্তু মিলের স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট তাই বার্কার বলিয়াছেন যে, মিল স্বাধীনতার ধারণার ক্ষেত্রে এক শূন্যগর্ভ উক্তি করিয়াছেন।

বার্কারের মতে রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতা বা আইনসঙ্গত স্বাধীনতা কখনও প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা হইতে পারে না; ইহা সর্বদাই সকলের জন্য শর্ত সাপেক্ষ স্বাধীনতা ("Liberty in the state or legal liberty is never absolute liberty of each but always the qualified liberty of all".—*Barker—Principles of Social and Political Theory*)। তিনি আরও বলেন যে, "প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীন হওয়া উচিত। কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্যে আর একটি পরিপূরক ও নিশ্চিত বক্তব্য জড়াইয়া আছে; তাহা হইল কোন ব্যক্তিই চূড়ান্ত ভাবে স্বাধীন হইতে পারে না।*

বার্কারের মত

---

*"The truth that every man ought to be free has for its other side the complementary consequential truth that no man can be absolutely free."
Barker—Principles of Social and Political Theory.

সমাজ-জীবনকে সার্থক করিবার জন্যই রাষ্ট্র আইন কানুনের মাধ্যমে মানুষের অবাধ স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করিয়া স্বাধীনতাকে প্রকৃত করিয়া তোলে। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতার প্রকৃতির মধ্যেই আছে বাধা-নিষেধ, কারণ আমি যে স্বতন্ত্র স্বাধীনতা ভোগ করি তাহা আমার সহবাসীদের স্বাধীনতা খর্ব করিবার স্বাধীনতা নয়"।* অবশ্য, হেগেল প্রমুখ আদর্শ-বাদিগণ বলেন যে, রাষ্ট্রের আইন মান্য করিবার অর্থই হইল স্বাধীনতা। এই মতের সঙ্গেও অধ্যাপক ল্যাস্কি একমত হইতে পারেন নাই। ল্যাস্কি তাঁহার Liberty in the Modern State গ্রন্থে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বিষয়টিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আইন দ্বারা যে নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয় সে নিয়ন্ত্রণ সকলের উপর সমানভাবে বর্তায় না। কারণ আইন প্রণয়ন করে সরকার। গণতন্ত্রে কিংবা ধনতন্ত্রে সরকার মুষ্টিমেয় লোক লইয়া গঠিত হয়। এই মুষ্টিমেয় লোক যদি নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য অপর শ্রেণীর লোকদের স্বাধীনতাকে খর্ব করিবার জন্য প্রয়োজনমতো আইন পাশ করিয়া নিয়ন্ত্রণ জারি করে তাহা হইলে সেই নিয়ন্ত্রণ কি প্রকৃত স্বাধীনতার পরিপন্থী হইবে না? যে আইনের দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করা হইবে সেই আইন মান্য না করাই উচিত। তাই দেখা যায় যুগে যুগে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ সংগ্রাম করিয়াছে। সরকার কি কি অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহার মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ব্যক্তিত্ববিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে কিনা। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন: "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি কতকগুলি পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ, যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।"** এখানে যে পরিবেশের কথা বলা হইয়াছে, সেই পরিবেশের সৃষ্টি হয় তখনই যখন মানুষের অধিকারগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। অধিকারই স্বাধীনতার উৎপত্তিস্থল ("Liberty is the product of rights.")। সুতরাং এই অধিকারের সংরক্ষণে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাহাই ব্যক্তির স্বাধীনতা।

ল্যাস্কির মত

আবার সাম্যের উপরই নির্ভর করে স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি। অসাম্যের সমাজে স্বাধীনতা নিরর্থক। ল্যাস্কি প্রমুখ এই ধারণা পোষণ করেন যে, রাষ্ট্র যদি (ক) পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমাজের এক শ্রেণীকে (খ) বিশেষ অধিকার প্রদান করিয়া অপর শ্রেণীর লোকদিগকে বিশেষ সুবিধাভোগকারী শ্রেণীর উপর (গ) নির্ভরশীল করে তবে যে বৈষম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হইবে তাহাতে সকলে আত্মোপলব্ধির সমান সুযোগ পাইবে না। ফলে স্বাধীনতার পরিবেশ গড়িয়া উঠিবে না।

আবার স্বাধীনতাকে একদিক হইতে নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বলিয়াও আখ্যায়িত করা যায়; তাহা হইলে, যে সকল বিষয়ে জনগণের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের উপর ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা রহিয়াছে। অর্থাৎ অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "স্বাধীনতা হইল সুখী জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক

*"Liberty thus involves in its nature restraints, because the separate freedoms I use are not freedoms to destroy the freedoms of those with whom I live."
Laski—Grammar of Politics.

**"By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves".—*Laski*.

কতকগুলি নিয়ন্ত্রণমুক্ত সামাজিক অবস্থা।" এখানে যে সামাজিক অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই বর্তমান ধারণানুসারে মানুষের অধিকার। এই নিয়ন্ত্রণমুক্ত অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করে। অতএব একদিক হইতে স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণমুক্তও বলা যাইতে পারে।

স্বাধীনতার দুইটি দিক, নেতিবাচক ও অস্তিবাচক

এখানে স্বাধীনতার দুইটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি হইল উহার নেতিবাচক দিক (Negative aspect) আর অপরটি হইল অস্তিবাচক দিক (Positive aspect)। নেতিবাচক দিক দ্বারা বুঝানো হয় মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য নিয়ন্ত্রণবিহীনতার প্রয়োজন। আর অস্তিবাচক দিক দ্বারা বুঝানো হয় মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে যাহা প্রয়োজন। যেমন জীবনধারণের মান উন্নয়নমূলক সুযোগ-সুবিধা, প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ ইত্যাদি। স্বাধীনতার আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতার পরিবর্তে ব্যক্তিত্ববিকাশের উপর বেশী জোর দিয়াছেন।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতা মানুষের লক্ষ্য (ends) নহে, স্বাধীনতা একটি পন্থা মাত্র। মানুষের সত্তার উপলব্ধিই ইহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে স্বাধীনতাকে প্রকৃত ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। বস্তুতঃ স্বাধীনতা যদি ব্যবহৃতই না হয়, তবে স্বাধীনতা না পাইলে ক্ষতি কি ?

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Kinds of Liberty) ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে স্বাধীনতাকে দেখা হয় বলিয়া 'স্বাধীনতা' রাষ্ট্রচিন্তা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে হাজির হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে স্বাধীনতাকে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা (Individual and National liberty) ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এথেনীয়গণ স্বাধীনতা বলিতে এই উভয় প্রকার স্বাধীনতাকেই বুঝিত। কিন্তু বর্তমানে সম্প্রদায়গত স্বাধীনতাকে বলা হয় জাতীয় স্বাধীনতা। আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণাও অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতাকে বার্ণস্ জাতির সর্বপ্রকার স্বাভাবিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেন। পরাধীন দেশের পরাধীন মানুষের আত্মোপলব্ধির আইনসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা থাকে না। এইজন্য জাতীয় স্বাধীনতা বা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। উপরে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(খ) স্বাভাবিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) ঃ প্রাক্-রাষ্ট্রিক যুগে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যে যথেচ্ছাচরণের ক্ষমতা ভোগ করিত তাহাকে বলা হয় স্বাভাবিক স্বাধীনতা। রুশোর ভাষায় বলা যায়, মানুষ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু চারিদিক হইতে সে আজ শৃঙ্খলাপাশে আবদ্ধ" ("Man is born free but everywhere he is in chains." (*Rousseau*)। দর্শন-মূলক নৈরাজ্যবাদিগণও বলেন যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আইনের অসংখ্য শৃঙ্খলে মানুষ আজ আবদ্ধ বলিয়া সে তাহার

সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ করিতে পারে না। তাই তাঁহারা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার

বিলোপসাধন করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিতে চান। কিন্তু আইন ছাড়া যে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়, তাহা এই সকল দার্শনিকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। এখানে ল্যাস্কির প্রাসঙ্গিক উক্তিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত মানুষ পরস্পর-বিরোধী আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার জন্য পরস্পরবিরোধী আচরণ করিবে, ততদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক স্বাধীনতার কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রিক অনুশাসনের বেড়াজালের মধ্যেই স্বাধীনতা প্রকৃত রূপ গ্রহণ করে। এই নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা যদি সমাজকল্যাণকর হয়, তাহা হইলে তাহাই স্বাভাবিক স্বাধীনতা।

(গ) **আইনসঙ্গত স্বাধীনতা** ঃ এই স্বাধীনতা হইল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা স্বীকৃত, সংরক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। ইহাকে নির্দিষ্ট ও পরস্পরের আপেক্ষিক হইতে হইবে। এক ব্যক্তির স্বাধীনতা দ্বারা অপর ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইবার পর মানুষ যে যথেচ্ছাচারিতা ভোগ করে তাহাই আইনসঙ্গত স্বাধীনতা।

(ঘ) **সামাজিক স্বাধীনতা** ঃ সামাজিক বিবেক দ্বারা স্বীকৃত, সামাজিক বিধি কর্তৃক সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় যে স্বাধীনতা তাহাই সামাজিক স্বাধীনতা।

সামাজিক ও আইনসঙ্গত স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য

সমাজ আর রাষ্ট্র এক নয় বলিয়া আইনসঙ্গত স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাধীনতাও এক নয়। রাষ্ট্রের এলাকার বাহিরে বৃহত্তম সমাজ-জীবনে মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করে, তাহাকেই সামাজিক স্বাধীনতা বলা হয়। বর্তমানে সামাজিক ও আইনসঙ্গত স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। কারণ প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র সামাজিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া সামাজিক স্বাধীনতাকে আইনসঙ্গত স্বাধীনতার রূপ দিয়া থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ধর্মাচরণের স্বাধীনতাকে এক সময়ে সামাজিক স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু, বর্তমানে ইহা আইনসঙ্গত স্বাধীনতার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্র ইহাকে স্বীকৃতি দিয়াছে।

আইনসঙ্গত স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক

স্বাধীনতাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—(১) ব্যক্তি স্বাধীনতা, (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও (৩) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

(১) **ব্যক্তি-স্বাধীনতা (Civil Liberty)** ঃ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এবং দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলি অধিকারকে বলা হয় পৌর স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গতিবিধির স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির স্বাধীনতাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। বর্তমানে অবশ্য আরও কতকগুলি স্বাধীনতা, যেমন—চিন্তা, বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা এবং চুক্তির স্বাধীনতা প্রভৃতিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পর্যায়-ভুক্ত করা হয়।

(২) **রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty)** ঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসন-পরিচালনা ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার অধিকারসমূহকে রাজনৈতিক

অধিকার বা স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। ব্ল্যাকস্টোনকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইল প্রধানতঃ সরকারকে দমন করার ক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য আবেদনের অধিকার, বিচারালয়ে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা প্রভৃতির অধিকার। বর্তমানে রাজনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় সরকারের গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা। ল্যাস্কি বলেন: "রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইল রাষ্ট্রকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষমতা" ("Political Liberty means the power to be active in affairs of State.")। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রাপ্তবয়স্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা এবং সরকারের কার্যাবলীর সমালোচনা করিবার অধিকার প্রভৃতি। এই অধিকারগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ভুক্ত। এই স্বাধীনতা মানুষকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে। অতএব এই স্বাধীনতাও ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক।

(৩) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (**Economic Liberty**): অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় প্রত্যেক মানুষের নিজের শিক্ষা ও সামর্থ্যানুযায়ী কার্য করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার। অনশনের ভয় মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। তাই প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। ইহা মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলে এবং তাহার অন্যান্য স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তোলে। এই স্বাধীনতাকে বাস্তব করিয়া তুলিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য একটা স্থিরীকৃত জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই স্বাধীনতার উদাহরণ হইল জীবিকা অর্জনের অধিকার, বেকার ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতি।

উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে, স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে যে পার্থক্য উপরিউক্ত আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধাটা অস্বাভাবিক নয়। পূর্বেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সংঘর্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সংঘর্ষের কথা চিন্তা করিয়া বার্কার এই মন্তব্য করেন: বস্তুতঃ স্বাধীনতা একটি জটিল ধারণা। ইহা একদিকে মানুষকে স্বাধীনতার প্রতি আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ করে, আবার অপরদিকে ইহার বিভিন্ন রূপের প্রতি আনুগত্যের জন্য পরস্পরকে পৃথক করে।"* এইভাবে পার্থক্য করে বলিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার সমর্থনকারীদের মধ্যে বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা যায়।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

(Safeguard of Liberty)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, দীর্ঘকাল ধরিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রাভ্যন্তরে স্বাধীনতা সংরক্ষণের কথা চিন্তা করিতেছেন। কারণ দেখা গিয়াছে যে, ক্ষমতার আসনে যে শ্রেণী অধিষ্ঠিত হয় সেই শ্রেণী শুধু তাহার

*"Liberty is indeed a complex notion, which at once unites men in its allegiance and divides them by its divisions."—*Barker*.

নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে। ফলে অপরাপর শ্রেণীর স্বাধীনতা ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না। আবার দেখা যায়, ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া শাসকবর্গ স্বাধীনতার বিনাশ করে; কারণ "ক্ষমতা (তাহাদিগকে) আদর্শভ্রষ্ট করে এবং অবাধক্ষমতা সম্পূর্ণভাবেই আদর্শভ্রষ্ট করে' ("Power corrupts and absolute power corrupts absolutely."—Lord Acton)। সমাজে বিশেষ সুযোগের সৃষ্টি, পক্ষপাতমূলক রাষ্ট্রকার্য প্রভৃতি একজনের স্বাধীনতাকে অপরের উপর নির্ভরশীল করিতে পারে বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন। পরপৃষ্ঠায় এই ব্যবস্থাগুলির আলোচনা করা হইল ঃ

স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

(১) **আইনের মাধ্যমে অবাধ স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ ঃ** সমাজে সকলের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিবিশেষের অবাধ স্বাধীনতাকে আইন প্রণয়ন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। অবশ্য, আইন সর্বদা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ নাও করিতে পারে। কারণ সমাজে সকলের কল্যাণের অজুহাতে স্বৈরাচারমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া সরকার আইনের অপপ্রয়োগ করিতে পারে। অবশ্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে আইন প্রণয়ন করিয়া লিখিতভাবে স্বৈরাচারকে স্বীকার করিয়া লইয়া কোন সরকারই স্বৈরাচার প্রবর্তন করিতে চাহে না। কারণ তাহাতে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে।

(২) **সংবিধানে লিপিবদ্ধ অধিকার ঃ** নাগরিকের অধিকারগুলির আইনগত স্বীকৃতি প্রয়োজন; কারণ তাহা হইলে বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনকে কার্যকরী করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করানো যায়।

(৩) **মৌলিক অধিকার ঃ** মৌলিক অধিকারগুলিকে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি দিতে হইবে। কারণ শাসনতন্ত্রে এইগুলি বিধিবদ্ধ হইলে যদি কখনও এই অধিকারগুলিকে খর্ব করা হয় তাহা হইলে আদালতের মাধ্যমে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়। বিধিবদ্ধ অধিকারগুলি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ইহারা শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলে বিশেষ মর্যাদাও লাভ করে এবং জনসাধারণও তাহাদের অধিকারগুলি কি তাহা জানিতে পারে। সরকারের পক্ষেও তাহার প্রযোগবিধির কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। শাসনতন্ত্রে এইগুলি লিপিবদ্ধ হইলে সহজে ইহাদের পরিবর্তনও সম্ভবপর হয় না এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষও সহজে নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ভারতের শাসনতন্ত্র এই (১) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation), (২) সাম্যের অধিকার (Right to equality), (৩) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom of religion), (৪) সম্পত্তির অধিকার (Right of property), (৫) শাসন তান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to constitutional remedies), (৬) সবিশেষ স্বাধীনতার অধিকার (Right to particular freedom), প্রভৃতি অধিকার লিপিবদ্ধ আকারে স্বীকৃত হইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রেও শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, সাম্যের অধিকার, চাকুরীর অধিকার এবং বৃদ্ধবয়সে ভাতার অধিকার প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়াছে।

মৌলিক অধিকার

(৪) **ক্ষমতা পৃথকীকরণ ঃ** লক্ (Loke), মঁতেসকিউয়ে (Montesquieu), ম্যাডিসন (Madison) প্রমুখ ক্ষমতা পৃথকীকরণকে (Separation of powers)

স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ বিচার-বিভাগ, শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগ পৃথক পৃথক ভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ করিবে। অন্যথায় একই ব্যক্তি যদি আইন প্রণেতা, আইনকে কার্যকরী করার ক্ষমতাধারী ও বিচার-পাতরূপে কার্য করে তবে স্বৈরাচারিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ধ্বংস হইবে। অবশ্য, বর্তমানে দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে আর কার্যকর নয়। কারণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাষ্ট্রনৈতিক দল আইনসভায় তাহার খুশিমতো আইন পাস করিয়া তাহাকে কার্যকর করে এবং শাসন-ব্যবস্থার তিনটি বিভাগই দলের মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত হয়। ক্ষমতা পৃথিকীকরণ নীতি প্রযুক্ত না হইলেও যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে তাহার নজীর ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা পৃথিকীকরণ নীতি চালু নাই কিন্তু তাই বলিয়া ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হইতেছে না এমন কথা বলা যায় না।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করা

(৫) **বিচার-বিভাগীয় স্বাধীনতা:** আবার বলা হয় যে, শুধু ক্ষমতা পৃথিকীকরণ করিলেই চলিবে না, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-বিভাগকে অন্যান্য বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিতে হইবে এবং (১) বিচারপতিগণের চাকুরীর নিরাপত্তা এবং (২) তাহাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর শাসকমণ্ডলী যাহাতে বিচারপতিগণের উপর কোন চাপসৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পক্ষপাতমূলক বিচার মীমাংসা দিতে বাধ্য না করিতে পারে সেই দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় আইন বিভাগ শাসনতন্ত্র বহির্ভূত যে আইন প্রণয়ন করে এবং শাসন-বিভাগ কর্তৃক যে আইন প্রণীত হয় তাহা যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হয় তাহা হইলে যাহাতে আদালতের নিকট আইন-ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার বিচার ব্যবস্থা যাহাতে মৌলিক অধিকারকে বলবৎ করিবার জন্য বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (Habess Corpus) এবং পরমাদেশ (Mandamus) প্রভৃতি জারি করিতে পারে উচ্চতর আদালতগুলিকে সে অধিকার দিতে হইবে। ভারতের শাসনতন্ত্র বিচার-বিভাগকে এই অধিকারগুলি প্রদান করিয়াছে।

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা

(৬) **আইনের অনুশাসন:** স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইল আইনের অনুশাসন (Rule of Law) বজায় রাখা। আইনের অনুশাসনের অর্থ, (ক) আইনের পূর্ণ প্রাধান্য এবং (খ) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যায়, আইনের অনুশাসন বলিতে বুঝায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলকেই আইন ব্যবস্থার অধীন থাকিতে হইবে। আইনের অনুশাসন স্বীকৃত হইলে সরকার পূর্বঘোষিত আইনানুসারে সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে। ফলে আইনানুমোদিত নয় এমন কোন ক্ষমতার ব্যবহার সরকার করিতে পারিবে না। আর আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অর্থ প্রত্যেকের জন্য এক আইন অর্থাৎ অধিকারে সাম্য রক্ষিত হইবার আইনগত স্বীকৃতি।

আইনের অনুশাসন

কিন্তু এক দুইটি উপায়কেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা যায় না; কারণ আইন কি? আইন হইল শ্রেণী-স্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ। যে শ্রেণী যখন রাষ্ট্রক্ষমতা

করায়ত্ত করে, সেই শ্রেণী প্রচলিত বৈষম্যমূলক শ্রেণী সম্পর্ককে প্রচলিত রাখে আইনের মাধ্যমে। আবার আইনের দৃষ্টিতে সাম্য স্বীকৃত হইলেও আদালতে মামলা দায়ের করিয়া এই সাম্য আদায় করিতে যে খরচ বহন করিতে হয় তাহাতে রাষ্ট্রের দরিদ্র জনগণের আর স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভবপর হয় না।*

আবার ফরাসীদেশে সরকারী কর্মচারীদের জন্য পৃথক আইন আছে। এই আইনকে বলা হয় শাসন সংক্রান্ত আইন (Droit administratiff)। এই আইন ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া অনেকে মনে করেন।

(৭) **দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা**: দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থাকে অনেকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে অভিহিত করেন। আইভর জেনিংসের প্রাসঙ্গিক উক্তি হইল: "শাসন-বিভাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের সন্ধান পাওয়া যায় কমন্সসভার দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে যেখানে সমালোচনাকে স্পষ্ট ও কার্যকর করিয়া তোলা হয়।" এই কারণেই ইংল্যাণ্ডে বিরোধী দলকে স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবে অভিহিত করা হয়। অবশ্য, অসংবদ্ধ বিরোধীদলের সমালোচনা অনেক সময় উপেক্ষিত হয়।

(৮) **জনগণের সচেতনতা**: জনগণের সদা জাগ্রত দৃষ্টি ও সাহসিকতাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ স্বাধীনতার প্রধানতম রক্ষাকবচরূপে অভিহিত করিয়াছেন। জনগণ যদি সদাজাগ্রত হয় তবে শাসকবর্গ সচেতন জনসমুদ্রকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না। অবশ্য, এইজন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার। জনগণকে ঠকানো খুবই সহজ। গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিসও চিরন্তন সতর্কতা ও সাহসিকতাকে স্বাধীনতার রক্ষা-কবচরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৯) **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ**: অধ্যাপক ল্যাস্কি তাঁহার Liberty in the Modern State গ্রন্থে এই মন্তব্য করেন যে, "যে রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে অতিমাত্রায় ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হইয়াছে সেই রাষ্ট্রে কোন প্রকার স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।"** রাষ্ট্রের ক্ষমতা যদি বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় তাহা হইলেই শুধু নাগরিকগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে সরকারের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ বেশী।

(১০) **গণভোট, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতি**: পরিশেষে বলা যায়, অনেক রাষ্ট্র জনগণের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য "গণভোট" ও "গণউদ্যোগ" এবং "পদচ্যুতি" প্রভৃতি অধিকার জনসাধারণকে প্রদান করিয়াছে। এইগুলি স্বাধীনতার রক্ষা-কবচরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু, বর্তমান বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে এইগুলির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভবপর নয় বলিয়া এইগুলিকেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে গণ্য করা যায় না। একমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দেশেই এইগুলির ব্যবহার সম্ভবপর এবং স্বাধীনতা রক্ষা করাও সহজতর।

* *Paradox of Freedom* : *Dr. Dhirendranath Sen.*

** "There will never be liberty in any state where there is an excessive concentration of power of the centre. – *Laski*".

স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব ও আইন
(Liberty, Authority and Law)

সাধারণতঃ স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজের ইচ্ছামতো কার্য করিবার অবাধ ক্ষমতা। কিন্তু মানুষের এই অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমাজে অধিকতর বলশালী ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। অর্থবলে বলীয়ান মিল-মালিক শ্রমিককে তাহার ন্যায্য মজুরি পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। স্বাধীনতার অর্থকে এইভাবে ধরিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়।

বস্তুতঃ, স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়। সমাজের প্রত্যেকেই ইহার সমান অংশীদার। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে নিরঙ্কুশ ভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের চরম সুযোগ পায় সেইজন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র অধিকার স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং উহাকে রক্ষা করে। একজনের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, সেইজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাকে কতকগুলি বিধি-নিষেধের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে। এই বিধি-নিষেধের অর্থ আইন। সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষভাবে যে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব আইনকে বলবৎ করে তাহার উপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতা আইনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া স্বাধীনতাকে আইনসঙ্গত (Legal Liberty) বলিয়াও অনেকে অভিহিত করেন।

আবার একজনের যাহাতে অধিকার অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ" (The need of liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty for all.")। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা এইরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজের অন্য লোকের অনুরূপ স্বাধীনতা কোনরূপে ব্যাহত না হয়। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া পারস্পরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে রাষ্ট্রশক্তি সাহায্য করে। অতএব এই কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার অর্থাৎ চরম ক্ষমতার প্রয়োজন। এইজন্যই বলা হয়, সার্বভৌমিকতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নয় (Sovereignty and Liberty are not contradictory terms)। আইন হইল রাষ্ট্রের হস্তে প্রধান হাতিয়ার, যাহার দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন একটি পরিবেশ গড়িয়া তোলে, যে পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে সক্ষম হয়। এই আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র (১) ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। আবার (২) আইনের মাধ্যমে শাসকবর্গের কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং (৩) আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। অতএব আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। বরং একে অন্যের পরিপূরক ঃ এই সকল কারণে আইনকে বলা হয় স্বাধীনতার রক্ষক (Law is the condition of

স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত এবং আইন স্বাধীনতার পরিপূরক

Liberty)। সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের জন্যই রাষ্ট্র আইন দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমা নির্দিষ্ট করে। প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে তাহা বলবানের স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। ইহা হইল "জোর যার মুল্লুক তার" নীতির প্রয়োগ মাত্র। সভ্য সমাজ-জীবনে একজনের স্বাধীন আচরণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে অপরের স্বাধীন আচরণ ব্যাহত না হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "স্বাধীনতার প্রকৃতিতেই রহিয়াছে নিয়ন্ত্রণ" (Liberty involves in its nature restraints)। আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যায় যে, রাষ্ট্রকর্তৃক আইনের মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যাহাতে একজনের আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা যেন অপরের আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

সমালোচনা ঃ অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, আইনসঙ্গত স্বাধীনতাই একমাত্র স্বাধীনতা নয় এবং আইনসঙ্গত স্বাধীনতার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃত্বে আইনের কর্তৃত্ব বজায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সামাজিক স্বধীনতার (Social freedom) ক্ষেত্রে আইনের কর্তৃত্ব বজায় থাকে না। রাষ্ট্রের বাহিরে আছে বৃহত্তর মানব সমাজ। এই মানব সমাজে জীবনের সামাজিক বিধির দ্বারা সৃষ্ট এবং সামাজিক বিধির দ্বারা সংরক্ষিত সামাজিক স্বাধীনতা বলিয়া একপ্রকারের স্বাধীনতার অস্তিত্ব রহিয়াছে। কিন্তু সামাজিক নিয়মকানুন অস্পষ্ট বলিয়া ইহার স্বাধীনতাও অস্পষ্ট আবার সামাজিক স্বাধীনতার পশ্চাতে বিবেকদংশন ছাড়া এমন কোন কর্তৃত্ব নাই যাহা ইহাকে কার্যকর করিতে পারে। এইজন্য রাষ্ট্র অনেক সময় আইন দ্বারা এই সামাজিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহাকে আইনানুমোদিত করে। এইভাবে আইনসঙ্গত হইয়া সামাজিক স্বাধীনতা স্বাধীনতার পর্যায়ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধর্ম-বিশ্বাসের স্বাধীনতা, যাহা পূর্বে সামাজিক স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য হইত, বর্তমানে তাহাকে অনেক রাষ্ট্র আইনানুমোদিত করায় ইহা প্রকৃত স্বাধীনতার পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

সাম্য

(Equality)

সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের ইতিহাস ও গুরুত্ব (History and importance of the Ideal of Liberty and Equality) ঃ সাম্য শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল সকল মানুষই সমান। এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের সমান-আয় করিবার এবং সমান আচরণ পাইবার অধিকার আছে। সাম্য নীতিকে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে এই অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ভোগ করিবার সমানাধিকার আছে। স্বাধীনতা বা অধিকার কাহারও দান নহে। অধিকারের অনুপস্থিতিতে অনেক নৈতিক ও সামাজিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়, এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর অভাব বোধ জাগ্রত হয়, ফলে মানুষ এই অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিয়া এই অধিকারকে আদায় করে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। অতএব প্রত্যেক মানুষই সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সাম্য ও স্বাধীনতার উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়,

গ্রীক দার্শনিকগণ হইতে শুরু করিয়া বর্তমানকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ পর্যন্ত প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা নিরর্থক।

প্রাচীন গ্রীসের স্টোইক দার্শনিকগণ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, মানুষ বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী জীব। সুতরাং এই দিক হইতে বিচার করিলে প্রত্যেকেই সগোত্র। প্রত্যেক মানুষই মানুষ হিসাবে সমানাধিকার পাইতে পারে। অবশ্য স্টোইকদের এই মতবাদ গ্রীসে বিশেষভাবে গৃহীত হয় নাই। গণতন্ত্রের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াও গ্রীসের সভ্যতার এক বিরাট কলঙ্ক ছিল তাহার দাসত্ব-প্রথা। স্বাধীনতা বলিতে গ্রীকরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উভয় প্রকার স্বাধীনতাকে বুঝিত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করিবার জন্য এবং সুখী ও সম্মানিত জীবন (happy and honourable life) যাপন করিবার জন্য ক্রীতদাসদিগের উপর সর্বপ্রকার দৈহিক কর্মের ভার চাপাইয়া দিয়া স্বাধীন নাগরিক সৃষ্টিশীল কার্যে নিমগ্ন থাকিত। অতএব দেখা যায় গ্রীসের স্বাধীনতার ধারণা এক অসাম্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রোমক যুগে স্টোইকদের মতবাদই গৃহীত হইয়াছিল। রোমান নাগরিকত্বের অধিকার অ-রোমকদের (Non-Romans) প্রদান করা হইত।

যীশুখ্রীস্টের দৃষ্টিতে সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। তিনি সকল মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া অভিহিত করায় তাঁহার ধর্ম এক সাম্য নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহার শিষ্যবর্গ প্রচার করিলেন যে, সকল মানুষই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান বটে, কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই সমান নয়।

ইহার পর সাম্যনীতির ভিত্তিতে স্বাধীনতার বাণী সজোরে প্রচার করেন স্যার টমাস মুর (Sir Thomas Moore) তাঁহার ইউটোপিয়ায় (Utopia), হ্যারিংটন (Harrington) তাঁহার ওসিয়ানায় (Oceana) এবং জন বল (John Ball)।

সর্বোপরি দেখা যায়, অসাম্যের প্রতিবাদে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রচার করেন চুক্তিবাদী রুশো ও লক্। টমাস পেইন ও জেফারসনও সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। রুশোর কণ্ঠে আওয়াজ শোনা গেল : "স্বাধীন হইয়াই মানুষ জন্মায়, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ" ("Man is born free but everywhere he is in chains.")। জেফারসন বলেন : স্রষ্টা মানুষকে কতকগুলি অচ্ছেদ্য অধিকার প্রদান করিয়াছেন" ("Men are endowed by their creator with certain inalienable rights.")। স্বাধীনতা ও সাম্যনীতি সম্বলিত দুইটি ঐতিহাসিক ঘোষণা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি ঘোষণা হইল আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা (Declaration of Independence by North American Colonies); আর অপরটি হইল ফরাসী বিপ্লবের সময় মানুষের অধিকারের ঘোষণা। ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণায় বলা হইয়াছে, "মানুষ জন্ম হইতেই স্বাধীন ও সমানাধিকারসম্পন্ন ("Men are from birth free and equal in rights.")।

সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হইল ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে (U. N.) মানবিক অধিকারের এক সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights)। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, স্বাধীনতা, শান্তি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিমূল হইল বিশ্বমানবের সকল পরিবারের

স্বভাবজ মর্যাদা রক্ষার এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি। সাম্য ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে এত ঘোষণা, এত প্রচার হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সাম্য ও স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া এই নীতিদ্বয়ের সমালোচনা করিয়াছেন।

সাম্যের সংজ্ঞা ও বিভাগ এবং স্বাধীনতার সহিত ইহার সম্পর্ক (Definition and classification of Equality and its relation with Liberty): সাম্য ও স্বাধীনতা শব্দ দুইটি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাম্য যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সে সমাজে কাহারও স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্ভাবনা কম। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য যেখানে বিদ্যমান সেখানে স্বাধীনতার সুযোগ নাই। সাম্য সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বাস্তব জীবনে দেখা যায় শারীরিক ও মানসিক গঠনে দুইটি মানুষ সমান নয়। মানুষ অসমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব সাম্য বলিতে সর্ববিষয়ে সমান বুঝায় না। একজন বড় কবি আর একজন চাষীকে সমানভাবে স্বীকৃতি দিলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য বলিতে সর্ববিষয়ে সমান ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা বুঝায় না। বাস্তব জীবনে যতক্ষণ মানুষের ক্ষমতা ও স্বভাবের পার্থক্য থাকিবে ততক্ষণ সকলে সমাজের নিকট একই প্রকারের ব্যবহার পাইতে পারে না; তাহা পাইলে সাম্যের আদর্শ ব্যাহত হইবে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে সাম্য বলিতে ব্যবহারের সমতা বুঝায় না (Equality does not mean identity of treatment)। ল্যাস্কির মতে সাম্য বলিতে বুঝায়—বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাইবার অনুপস্থিতি ("absence of special privilege") এবং প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকার ("adequte opportunity are laid open to all")। সাম্য বলিতে বুঝায় সুযোগের সমতা। বলা হয় যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিককেই রাষ্ট্র তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ দিবে—কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা সম্প্রদায়কে পার্থ্যকমূলক সুযোগ দান করিতে পারিবে না; এই বিষয়ে রাষ্ট্রকে সর্বদা নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

সাম্যের সংজ্ঞা

এই প্রসঙ্গে ল্যাস্কি আরও বলেন: মানুষের অভাবে, যোগ্যতায় এবং প্রয়োজনে যতদিন পর্যন্ত পার্থক্য থাকিবে ততদিন পর্যন্ত ব্যবহারের সমতা পরিপূর্ণভাবে থাকিতে পারে না।* ল্যাস্কির মতে "জনগণের কোন স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না যদি বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা থাকে"।**

বস্তুতঃ, যে সমাজে অসাম্য থাকিবে অর্থাৎ, বিশেষ সুবিধা ভোগকারী থাকিবে, সেই সমাজে একশ্রেণীর লোকের উপর অপর শ্রেণীর লোকদিগের স্বাধীনতা নির্ভরশীল হইবে। বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ অধিকার বলে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে। ফলে স্বাধীনতা নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইবে। যেমন শোষণের অধিকার স্বীকৃত হইলে শোষিত না হইবার অধিকার অস্বীকৃত হইবে।

---

*There can be no ultimate identity of treatment so long as men are different in want, capacity and need."

**Freedom for the mass of men can never firstly exist in the presence of special privilege. — *Laski.*

অবশ্য, টকভিল এবং লর্ড এ্যাক্‌টন (Lord Acton) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ স্বাধীনতা ও সাম্যকে পরস্পরবিরোধী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখ দার্শনিকেরা অর্থনৈতিক পার্থক্যকে সমর্থন করিবার জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করেন। অর্থনৈতিক বৈষম্যকে যদি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে শোষণের অধিকারকেও স্বাধীনতার নামে স্বীকৃত করিতে হয়। অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা নিরর্থক। কারণ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে বিত্তবান বিত্তহীনদের স্বাধীনতা হরণ করে। সুতরাং বলা যায়, স্বাধীনতা সার্থক হইয়া উঠে সেই সমাজে যেখানে কোন অর্থনৈতিক বৈষম্য নাই। অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য সুযোগ প্রাপ্তিতেও বৈষম্য ঘটে। ফলে অধিক সুযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিই স্বাধীনতা ভোগ করে।

সাম্যের প্রকারভেদ ঃ সাম্যের ধারণাটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) স্বাভাবিক সাম্য, (২) সামাজিক সাম্য, এবং (৩) আইনগত সাম্য।

(১) **স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality) ঃ** "মানুষ জন্ম হইতেই স্বাধীন ও সমানাধিকার সম্পন্ন" (Men are from birth free and equal in rights)। মানুষের মধ্যে জন্মগত কোন পার্থক্য না থাকাকে স্বাভাবিক সাম্য বলে। কিন্তু ইহা বাস্তব সত্য যে বুদ্ধি, শক্তি, আকৃতি ও প্রকৃতিতে একটি মানুষ অপর একটি মানুষের সমান হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাভাবিক সাম্যের তত্ত্ব প্রচারিত হয় বটে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। জন্ম হইতে কেহ সমান প্রতিভা লইয়া জন্মায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বর্তমান ধারণায় অবশ্য জন্মগত বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রত্যেককে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। বর্তমানে সাম্যের অর্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমান সুযোগ প্রদান। বৈষম্যমূলক ভাবে সুযোগ প্রদত্ত হইলে জন্মগত যে বৈষম্য থাকে তাহা আরও বিরাট বৈষম্যে পরিণত হয়।

(২) **সামাজিক সাম্য (Social Equality) ঃ** সামাজিক সাম্যের অর্থ সমাজে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশমর্যাদা প্রভৃতির ভিত্তিতে কোন মানুষকেই বৈষম্যমূলক ভাবে সমাজে গ্রহণ করা হইবে না। ভারতে জাতিগত বৈষম্য সমাজ ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র এই সামাজিক বৈষম্য তিরোহিত করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, অস্পৃশ্যতার কারণ দর্শাইয়া কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইলে উহা আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল গ্রীক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিক ও ক্রীতদাসদিগের মধ্যে বৈষম্য থাকার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৩) **আইনগত সাম্য (Legal Equality) ঃ** আইনগত সাম্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (ক) ব্যক্তিগত, (খ) রাষ্ট্রনৈতিক এবং (গ) অর্থনৈতিক্ সাম্য।

(ক) **ব্যক্তিগত সাম্য (Personal Equality) ঃ** আইন রাষ্ট্রের অধিকার-গুলিকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এই অধিকারগুলি যাহাতে জাতি, ধর্ম ও পেশা নির্বিশেষে সকলে সমানভাবে ভোগ করিতে পারে আইন যদি তাহার ব্যবস্থা করিয়া

দেয় তাহা হইলেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অধিকারের ভিত্তিতে আর অসাম্য থাকিবে না। সমাজে যদি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিশেষ সুবিধা-ভোগকারী কেহ না থাকে তাহা হইলেই ব্যক্তিগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

(খ) রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য (Political Equality): রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারগুলির ক্ষেত্রে যদি কোন পার্থক্য না করা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা চলে। যেমন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সকলকে যোগ্যতানুসারে সমানভাবে ব্যবহার করা, প্রত্যেক নাগরিককেই নির্বাচিত হইবার এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার সমান সুযোগ দেওয়া হইলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সভা সমিতি করিবার, গতিবিধির ক্ষেত্রে এবং মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া হইলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality): অর্থনৈতিক সাম্য বলিতে বুঝায় ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে স্বাধীনতা নিরর্থক হইবে। কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের ফলে বিত্তবান বিত্তহীনদের স্বাধীনতা হরণ করে। সুতরাং বলা যায়, স্বাধীনতা সার্থক হইয়া উঠে সেই সমাজে যেখানে কোন অর্থনৈতিক বৈষম্য নাই। অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য সুযোগ প্রাপ্তিতেও বৈষম্য ঘটে। ফলে অধিক সুযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিই স্বাধীনতা ভোগ করে। অর্থবলে বলীয়ান সম্প্রদায় অভাবী গরীব মানুষকে শোষণ করে এবং অভাবের সুযোগ লইয়া রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করে।

উপসংহারে বলা যায়, সাম্যের অর্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করা। তাহার অর্থ ইহা নহে, যে প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক হইতে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য থাকিবে না। সমাজে বৈষম্য থাকিবে, কারণ কোন একটি লোক অপর একটি লোকের সঙ্গে তুলনার ক্ষেত্রে সমান নয়। অবশ্য বৈষম্যের একটা ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি থাকা দরকার। যে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য না থাকিলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকার অর্থ নাগরিক তাহার জীবনের স্বাদ হইতে বঞ্চিত হইবে।

সারসংক্ষেপ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের মাঝেই মানুষ অধিকার ভোগ করিতে পারে। অধিকারের অর্থ স্বত্ব বা দাবি। একের দাবি অপরে স্বীকার করিলেই অধিকার জন্মায়। অতএব অধিকার নির্ভর করে স্বীকৃতির উপর।

স্বাধীনতা ও অধিকার সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইল এইখানে যে, অধিকার হইল কতকগুলি বাস্তব সুযোগ, আর এই সুযোগ সুবিধা একত্রিত হইয়া যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহাকে বলে স্বাধীনতা।

অধিকারের স্বরূপ: (১) নাগরিক বা সামাজিক অধিকার, যেমন—ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, স্বাধীনতার চলাফেরা করার অধিকার ইত্যাদি। (২) রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার, ভোট দানের অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার ইত্যাদি। (৩) অর্থনৈতিক অধিকার, যেমন—কর্মের অধিকার, পর্যাপ্ত মজুরি পাইবার অধিকার ইত্যাদি। স্বাভাবিক অধিকার বলিতে বুঝায় মানুষের জন্মগত কতকগুলি অধিকার।

অবাধ স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় স্বেচ্ছাচারিতা। একের স্বাধীনতা দ্বারা অপরের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। আইন ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়, বরং পরিপূরক। ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করিবার পক্ষে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে রাষ্ট্র। অতএব এই পরিবেশকেই যদি স্বাধীনতা বলা হয়, তবে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বকে স্বাধীনতার রক্ষক বলা যাইতে পারে।

স্বাধীনতা ও কর্তব্য—এই দুইটি ধারণা পরস্পরের পরিপূরক। স্বাধীনতা বা অধিকার ভোগ করিবে শুধু সেই সকল ব্যক্তি যাহারা কর্তব্য পালন করিবে।

স্বাধীনতার আদর্শের ইতিহাস শুরু হইয়াছে প্রাচীন গ্রীস হইতে। মধ্যযুগের অন্তে বিপ্লবী জনজাগরণের যুগ পার হইয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত স্বাধীনতার তাৎপর্য ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

১৩ রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্যাবলী

(End and Sphere of the State Actions)

রাষ্ট্রের লক্ষ্য (End and purpose of the State) : ব্যক্তির চরিত্রের উপর যেমন তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ভর করে তেমনি রাষ্ট্রের চরিত্র ও প্রকৃতির উপর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ভর করে। পূর্বে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদগুলি আলোচিত হওয়ায় এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া শুধু রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদগুলিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা করা হইল। এই দুইশ্রেণীর মধ্যে একশ্রেণীর লেখকগণ রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করিয়াছেন; আর একশ্রেণীর লেখকগণ ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন ভাববাদী ও জীববাদী দার্শনিকগণ। এই শ্রেণীর লেখকদিগের মতে রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইল জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও সম্পূর্ণতা সাধন করা। এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল : (ক) এই মতবাদ রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিবার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করে। কিন্তু ব্যক্তির ন্যায্য স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিয়া রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব নয়। আবার (খ) এই মতবাদ আন্তর্জাতিকতাকে অস্বীকার করে। কিন্তু বর্তমান পরস্পরনির্ভরশীল জগতে আন্তর্জাতিকতাকে অস্বীকার করিলে জাতিবিরোধ ও সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে।

(১) জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ
(২) ব্যক্তির জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি

দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক সম্প্রদায়ের মতে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এই শ্রেণীর লেখকগণ শুধু মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন; রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। রাষ্ট্রকে শুধু ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র বলিয়া মনে করা হয় এবং রাষ্ট্রকে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিকাশের পরিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু এই মতবাদ যেহেতু (ক) রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন এবং (খ) আন্তর্জাতিকতাকে অস্বীকার করিয়াছে, সেইহেতু এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নহে।

পরিশেষে বলা যায়, এই দুই মতবাদের অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহা অনস্বীকার্য। উভয় মতবাদের সারবস্তুকে গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্যকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় : আন্তর্জাতিক প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকটি মানুষের ন্যায্য অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করাই রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি (Sphere of State Action) : পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, মানব সমাজের কল্যাণসাধনের পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য প্লেটোর সময়

হইতে আজ পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। এই পন্থা-সংক্রান্ত নীতিসমূহকেই বলা হয় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের তত্ত্ব (Theory of State Functions or Theory of the Sphere of State Actions or Intervention)। এই তত্ত্বগুলির আলোচনা সুষ্ঠুভাবে করিতে গেলে নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন : (ক) বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ইতিহাস, (খ) রাষ্ট্রের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ, (গ) রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, (ঘ) সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী।

(ক) **বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ইতিহাস (History of the State Function in Different Ages) :** গ্রীক্ দার্শনিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। গ্রীক্ নগর-রাষ্ট্র ছিল একাধারে নগর ও রাষ্ট্র। প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করাই ছিল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। গ্রীক্ নগর-রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় নাই। ব্যক্তিকে মনে করা হইত রাষ্ট্রের একটি অচ্ছেদ্য অংশ। সমগ্র নাগরিক জীবন এবং সমগ্র সমাজ-জীবন ব্যাপিয়াই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। এই প্রসঙ্গে বার্ক ও বার্কারের মন্তব্য পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের উক্তি এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীন রোমক দার্শনিকেরা গ্রীক্‌দের রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে যে সর্বগ্রাসী সর্বব্যাপক মতবাদ তাহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। রোমক যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় তত্ত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি অনেক পরিমাণে সীমিত হয়; কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির কোন প্রকার লাঘব ঘটে নাই।

মধ্যযুগে সামন্তগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে এবং খৃস্ট ধর্মগুরু পোপের সহিত রাষ্ট্রের সংঘর্ষের ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিশেষভাবে সংকুচিত হয়। আবার এই যুগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হইলে ব্যক্তি ও এই সকল প্রতিষ্ঠান তাহাদের সত্তাকে রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করে। এই সকল কারণ মধ্যযুগে রাষ্ট্রের কার্য সীমিত হয় শুধু কর ধার্য করা এবং আইন-শৃংখলা বজায় রাখার মধ্যে।

ষোড়শ শতাব্দীতে আবার প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মযাজকগণ রাজাকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকৃতি দিলে সামন্তগণ হীনবল হইয়া পড়ে। এই যুগেই শক্তিশালী জাতীয় রাজতন্ত্রের (Absolute National Monarchy) উদ্ভবের ফলে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার হয়, ফলে আইন-শৃংখলা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও হল্যাণ্ড ছাড়া অপর দেশে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। ফলে রাষ্ট্রিক ক্ষমতার বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হয়। এই মতবাদ অবাধ বাণিজ্যের সমর্থনকারী (Laissez Fairist) এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের তত্ত্বগত ভিত্তি রচনা করে।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিল্পক্ষেত্রে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা চালু ছিল। ফলে শ্রমিকশ্রেণী

এই মালিকশ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও নিষ্পেষিত হইত। এই শোষণ-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহারা শীঘ্রই বিপ্লবের ঝড় তুলিল। আর শিল্পবিপ্লবের পর রাষ্ট্র তাহার সকল ক্ষমতা লইয়া নিপীড়িত শোষিত মানুষকে শোষণমুক্ত করিতে অগ্রসর হইল। শ্রমিককল্যাণকর আইন প্রণীত হইল। রাষ্ট্রব্যাপী সরকারী বিদ্যালয় ও হাসপাতাল গড়িয়া উঠিল। আবার সমাজে কাহাদের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে তাহা প্রতিযোগিতার দ্বারাই স্থিরীকৃত হইবে বলিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিশ্বাস করিত। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় শ্রমিকের উপর অধিকারী শ্রেণীই যে জয়লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। পরিশেষে রাষ্ট্রের সহায়তায় শ্রমিক শ্রেণী প্রতিবাদের আন্দোলন শুরু করিলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পতন ঘটে;

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অবসানের পরে শুরু হয় সমষ্টিবাদের যুগ (Age of Collectivism)। এই সমষ্টিবাদকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আবার দুইভাগে বিভক্ত করেন; যথা,—(১) পূর্ণ সমষ্টিবাদ, (২) আধা-সমষ্টিবাদ। পূর্ণ সমষ্টিবাদকে আবার কেহ কেহ সমাজতন্ত্রবাদও বলেন। পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। আধা-সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লওয়া হয়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের শেষ আশ্রয়স্থল বলিয়া পরিগণিত করা হয় বটে, কিন্তু এই দেশেও ধীরে ধীরে সমষ্টিবাদ প্রসার লাভ করিতেছে। ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করিতেছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে আজ পর্যন্ত দিন দিনই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি পাইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পুলিশ-রাষ্ট্র আজ সমাজকল্যাণকামী রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত হইয়াছে।

রাষ্ট্রের এই কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইবার পশ্চাতে যে সকল কারণ আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) শিল্প-বিপ্লব, (২) একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব, (৩) ভোটাধিকারের প্রসার, (৪) দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, (৫) সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার প্রভৃতি। এই সকল কারণে ধীরে ধীরে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং বর্তমান পৃথিবী দিন দিনই সমাজতন্ত্রের শিবিরে চলিয়া যাইতেছে।

(খ) রাষ্ট্রের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ (Classification of the State Functions) : রাষ্ট্রের আদর্শ হইল সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দেশকাল-অবস্থা ভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর কার্যাবলী রাষ্ট্র করিয়া থাকে। আবার কার্যাবলীর মধ্যে কতকগুলি হইল রাষ্ট্রের নিজেরই অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য, আর কতকগুলি সাধারণ। কার্যাবলীর গুরুত্ব অনুসারে কার্যাবলীকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়; যথা, (১) মৌলিক বা অপরিহার্য কার্যাবলী (Essential), (২) ইচ্ছাধীন কার্যাবলী (Optional)।

(১) মৌলিক কার্যাবলী : যে সকল কার্যের উপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহাদিগকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের মৌলিক কার্যাবলী বলিয়া অভিহিত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উড্রো উইলসন এই কার্যাবলীকে Constituent

Functions বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মৌলিক কার্যাবলীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা, (ক) রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তির সম্বন্ধ-সম্পর্কিত কার্যাবলী, (খ) এক রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক-বিষয়ক কার্যাবলী এবং (গ) রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক-বিষয়ক কার্যাবলী।

(ক) লকের মতানুসারে ব্যক্তির কতকগুলি অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের পত্তন হয়। এই অধিকারগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার। বর্তমানে আবার ভোটাধিকারের মতো রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার, ধর্মবিশ্বাসের মতো সামাজিক অধিকার এবং কর্মের অধিকারের মতো অর্থনৈতিক অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রকে স্বীকার ও সংরক্ষণ করিতে হয়। ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের স্বরূপ বুঝা যায় অধিকারগুলিকে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি দিবার ও সংরক্ষণ করিবার মাধ্যমে। এইজন্যই ল্যাস্কি বলিয়াছেন : রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের স্বরূপ বুঝা যায়" (A State is known by the rights it maintains.") ।

(খ) বর্তমান পরস্পর-নির্ভরশীল জগতে কোন রাষ্ট্রই এককভাবে চলিতে পারে না। তাই এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত হইতে হয়। কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সম্পর্ক রক্ষা করিয়া রাষ্ট্রকে চলিতে হয়। অতএব এই সম্পর্করক্ষা-সম্বন্ধীয় কার্যাবলী বর্তমান রাষ্ট্রের মৌলিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

(গ) আবার রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাহাতে কোনরূপ সংঘর্ষ না বাধে এবং এক নাগরিক যাহাতে অপর নাগরিকের স্বাধীনতা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, তাহার জন্য রাষ্ট্রকে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। প্রতিরক্ষা বাহিনী ও কর্মচারী নিয়োগ করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। আবার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি রক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

রাষ্ট্র হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা, কর ধার্য করিয়া শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যবস্থা করা, দেশের শান্তি, স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য বজায় রাখিবার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রভৃতি মৌলিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্র এই কার্যগুলি না করিতে পারিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে।

(২) ইচ্ছাধীন কার্যাবলী : রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন কার্যাবলী রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের সহিত সম্পর্কিত নয়। এই কার্যাবলী সামগ্রিক কল্যাণ-বৃদ্ধির সহিত সম্পর্কিত। এই ইচ্ছাধীন কার্যাবলীকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ দুইভাগে বিভক্ত করেন; যথা, (ক) ইচ্ছাধীন অসমাজতান্ত্রিক (Non-Socialistic), (খ) ইচ্ছাধীন সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) কার্যাবলী।

(ক) অসমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী হইল এমন কতকগুলি কার্য যাহা ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইলে সঠিকভাবে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই রাষ্ট্রকে এইগুলি সম্পাদন করিতে হয়। এই কার্যাবলী হইল পথঘাট-নির্মাণকার্য, বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণকার্য, সেচকার্যের প্রসার, ডাকবিভাগ পরিচালনা, শিক্ষার বিস্তার,

আদম সুমারী গ্রহণ, তথ্যানুসন্ধান, নূতন বনভূমির সৃষ্টি করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কল্যাণকামী ব্যবস্থা প্রভৃতি। ব্যক্তির হস্তে এই সকল কার্য সমর্পিত হইয়া প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এই সকল কার্য সম্পাদিত হইলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে না। এই কারণে বর্তমানে প্রায় সর্বদেশেই রাষ্ট্র এই সমস্ত কার্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে।

(খ) সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় এমন সকল কার্যাবলী যাহা ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইলে সমাজের বহু অমঙ্গল সাধিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রেলপথ ও বিমানপথ পরিচালনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সেচ-ব্যবস্থা, মূলশিল্পের সংগঠন, পূর্ণনিয়োগ-ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বণ্টনের প্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান শ্রমিক কল্যাণ আইন প্রণয়ন, নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ, শোষণমূলক প্রতিষ্ঠানের বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতি। আবার রাষ্ট্র যদি মনে করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে কোন কার্য সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে রাষ্ট্র নিজহস্তে এই সকল কার্যের ভার গ্রহণ করিতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক—এই দুইভাগের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট। আবার একদেশে কোন এক সময়ে যে সকল কার্যাবলীকে অসমাজতান্ত্রিক বলিয়া গণ্য করা হইত কালভেদে তাহাদিগকে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া গণ্য করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবহণ পরিচালনা-ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কিন্তু বর্তমানে পরিবহণ পরিচালনা-ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। বস্তুতঃ সমাজ-সংগঠনের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর রূপও পরিবর্তিত হইয়াছে। আবার মৌলিক ও ইচ্ছাধীন কার্যাবলীর ক্ষেত্রও অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারণ, এক দেশে যে সকল কার্য মৌলিক বলিয়া বিবেচিত হয় অপর দেশে সেই সকল কার্যকে মৌলিক বলিয়া গণ্য নাও করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিল্পক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে পূর্বে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই দুই দেশে শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্র-প্রচেষ্টার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবে একদিন যাহা ইচ্ছাধীন ছিল তাহা আজ মৌলিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(গ) রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of state Functions) : রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সমন্ধে এই মতবাদগুলিকে সাধারণতঃ চারি ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা,—(ক) নৈরাজ্যবাদ, (খ) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, (গ) ভাববাদ এবং (ঘ) সমষ্টিবাদ। এই চারিটি মতবাদের মধ্যেও আবার কতকগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। পরপৃষ্ঠায় তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :
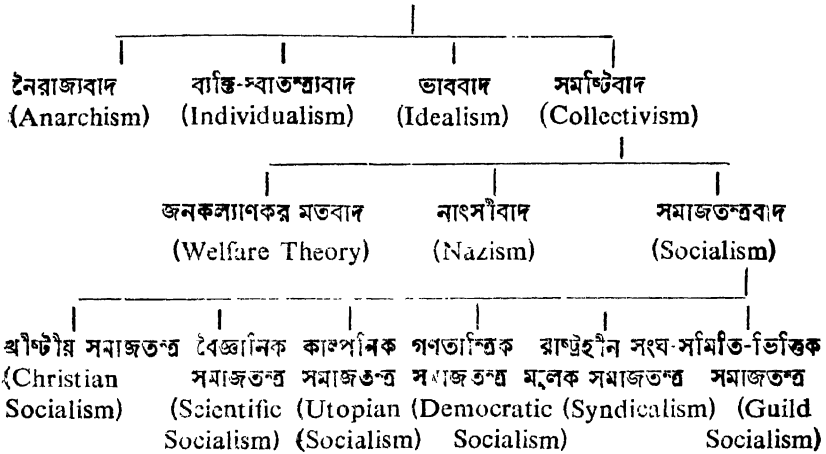
রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে সকল মতবাদগুলিকে এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নাই ; গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলিকে এখানে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) নৈরাজ্যবাদ

(Anarchism)

নৈরাজ্যবাদিগণ রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিতে চান। নৈরাজ্যবাদিগণ মনে করেন যে,রাষ্ট্র হইল শোষণের যন্ত্রবিশেষ এবং দুর্নীতির আশ্রয়স্থল। রাষ্ট্রকে বলা হইয়াছে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বেচ্ছাচারের প্রতীক। এই মতাবলম্বীদের ধারণানুসারে রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার পর রাষ্ট্রের স্থান দখল করিবে কতকগুলি সংঘ। মানুষ স্বেচ্ছায় এই সংঘগুলিতে যোগদান করিবে এবং স্বেচ্ছায় তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। নৈরাজ্যবাদ রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগকে মুক্ত করিতে চায়।

নৈরাজ্যবাদীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (১) দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ (Philosophical Anarchism) এবং (২) বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদ (Revolutionary Anarchism)। দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীরা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চায়। টলস্টয় এই মতবাদে বিশ্বাসী আর বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদীরা বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বিলোপের পক্ষপাতী। Bakunin Kroptkin এই মতবাদে বিশ্বাসী।

নৈরাজ্যবাদের জন্ম হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রবল হইয়া উঠে। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র একদিন বিলুপ্ত হইবে। সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। ইহাও নৈরাজ্যবাদেরই দ্যোতক।

সমালোচনা : নৈরাজ্যবাদের সত্যতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু এই মতবাদ কল্পনাভিত্তিক বলিয়া অনেকে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, রাষ্ট্র যদি বিলুপ্ত হয় তবে নিশ্চয়ই অন্য কোন শক্তি রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হইবে এবং এই শক্তি রাষ্ট্রেরই নামান্তর মাত্র। আবার রাষ্ট্র না থাকিলে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষিত ও স্বীকৃত হয় না। কারণ রাষ্ট্রই উহাদের স্বীকৃতি দেয় ও সংরক্ষণ করে। পরিশেষে বলা যায়, নৈরাজ্যে রাজ্য-শাসকের অভাবে নৈরাজ্য এক অরাজকতার রাজ্যে পরিণত হয়।

৮। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (The Individualistic Theory) : অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিলেও ইহার জন্ম সুদূর ঐতিহাসিক যুগে। আলেকজাণ্ডার গ্রীক্ নগররাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা ধ্বংস করিলে গ্রীসের সিনিক ও স্টোইক (Cynic and Stoics) দার্শনিক সম্প্রদায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা প্রচার করিতে সুরু করেন। স্টোইক সম্প্রদায়ের মতে সকল সামাজিক অবস্থাতেই মানুষ সুন্দর জীবন লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। ব্যক্তিই তার কাম্য জীবনের নির্ধারক। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মযাজকগণও এই মতবাদ প্রচার করেন যে, ব্যক্তিই তার শুভাশুভ নির্ধারণ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ সজোরে ঘোষিত হয়। ইংল্যাণ্ডে এ্যাডাম স্মিথ ও বেন্থাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ প্রচার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র এই নীতির দ্বারাই নির্ধারিত হইত। কেহ কেহ এই নীতিকে স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*Laissez Faire*) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ঐতিহাসিক পরিক্রমা

জন স্টুয়ার্ট মিলের ভাষায় এই নীতি হইল মানুষ যখন অপরের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হয় শুধু তখনই ক্ষতিসাধন হইতে বিরত করা উচিত এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাহাকে বিরত করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন মানুষ তাহার নিজের উপর, তাহার দেহের উপর সার্বভৌম ("Over himself, over his own body and mind the individual is sovereign.")। আত্মকেন্দ্রিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে বা ব্যক্তির যে সকল কার্যে অপর কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না (Self-regarding activities) রাষ্ট্র সেই সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবে না। আবার পরকেন্দ্রিক (Other regarding activities) কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তির যে সকল কার্যের ফলাফল অপরকে স্পর্শ করে সেই সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র ব্যক্তির কার্যের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করিতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইবে আর ব্যক্তির কার্যক্ষেত্র ব্যাপক হইবে। রাষ্ট্র শুধু ব্যক্তির অধিকারকে সংরক্ষণ করিবে আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান স্বাধীনতা ভোগ করিবে ("The individual has one right the right of equal freedom, with everybody else, and the state has but one duty the duty of protecting that right".—(*Herbert Spencer*)।

আত্মকেন্দ্রিক ও পর-কেন্দ্রিক কার্যাবলী

আবার নৈরাজ্যবাদিগণ ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি দাবি করেন। আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি দাবি করেন না বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার দ্বারা সংকুচিত করিতে চান। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণের মতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র শুধু রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায়

রাখা, ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তির অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সীমিত হইবে। এই মতাবলম্বীরা আশংকা করেন যে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র যতটা বৃদ্ধি পাইবে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা ততটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। অবশ্য সকল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীই এক মত পোষণ করেন না। এই মতবাদের যুক্তিগুলি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

সপক্ষে যুক্তি ঃ (১) **নৈতিক যুক্তি (Ethical Argument) ঃ** পরের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস থাকে না। ফলে সে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের সহায়তার উপর নির্ভর করিলে ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা দমিত হয়। এই কারণেই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করিয়া ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করাই এই মতবাদের প্রধান লক্ষ্য। বলা হয় যে, রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থ-সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করিয়া ব্যক্তিকে তাহার মঙ্গল সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়োজন নাই।

(২) **দার্শনিক যুক্তি (Philosophical Argument) ঃ** এই যুক্তিতে দেখানো হয় যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিমাত্র। ব্যক্তিকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় না। আগে ব্যক্তি, পরে রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হইল ব্যক্তির হাতের যন্ত্র। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতির অর্থ যন্ত্রের প্রাধান্যকে স্বীকার করা। সুতরাং মন্তব্য করা হয় যে, ব্যক্তির কর্ম-প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধি করার জন্য রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করা বিধেয়।

(৩) **রাজনৈতিক যুক্তি (Political Argument) ঃ** জন স্টুয়ার্ট মিলের মতানুসারে মানুষ নিজের উপর, নিজের দেহ ও চিত্তের উপর সার্বভৌম। মানুষ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। আর শুধু অপরকে ক্ষতি সাধন হইতে বিরত করার জন্যই বলপ্রয়োগ করা যায়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা। অনুরূপ ভাবে হার্বার্ট স্পেনসার বলেন ঃ ব্যক্তির একটিমাত্র কর্তব্য হইল, অপর সকলের সহিত সমান স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করা, আর রাষ্ট্রের মাত্র একটি কর্তব্য আছে, তাহা হইল ব্যক্তির অধিকারকে সংরক্ষণের কর্তব্য।

(৪) **অর্থনৈতিক যুক্তি (Economic Argument) ঃ** ফরাসী দেশের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ (*Lassez Faire*) এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, অর্থনীতি ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিলে ভোগ্যদ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং স্বল্পমূল্যে দ্রব্য বিক্রীত হয়। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিলে উৎপাদনক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু হয়। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অতএব রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) **বৈজ্ঞানিক যুক্তি (Scientific Argument) ঃ** হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখ এই মত পোষণ করেন যে, বাঁচার প্রতিযোগিতায় যাহারা বাঁচিতে পারে না, সেই অকর্মণ্য ব্যক্তিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করার অর্থ সমাজকে ভারাক্রান্ত করা। অতএব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজ প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা সমীচীন নয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সমাজ উন্নীত হইবে।

সমালোচনা ঃ (১) এই মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে অনেকে এই মন্তব্য

করেন যে, বর্তমান জটিল সমস্যাসংকুল সমাজে ব্যক্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানের মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসহায়তা বোধ করিতেছে। একমাত্র রাষ্ট্রই তাহাদিগকে অসহায়তা হইতে রক্ষা করিতে পারে।

(২) জোয়েডের মতে এই মতবাদানুসারে যে অবাধ প্রতিযোগিতার কথা বলা হইয়াছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয় শুধু তখনই যখন সকলেরই দরকষাকষি করার সমান ক্ষমতা থাকে। কিন্তু সমাজে সকলে সমান ক্ষমতার অধিকারী নয়, তাই সকলে সমানভাবে দরকষাকষি করিতে পারে না।

(৩) জোয়েড আরও বলেন যে, মানুষ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় অন্ধভাবে অগ্রসর হয়। ফলে সমাজের অনেক অপচয় ঘটে;

(৪) দার্শনিক যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিবর্গ ছাড়া রাষ্ট্রের কোন নিজস্ব সত্তা নাই, তাহা ভ্রান্ত। কারণ, ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে এক একটি রাষ্ট্র এক একটি চরিত্র লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রের এই চরিত্র রক্ষাকল্পে ব্যক্তিকে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রের যে একটা নিজস্ব চরিত্র ও অস্তিত্ব আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

(৫) রাজনৈতিক যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াও রাষ্ট্র সমাজকল্যাণকর বহু কাজ করিতে পারে।

(৬) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি যদৃচ্ছা দ্রব্য উৎপাদন করে, যদৃচ্ছা ভোগ করে। ফলে কখনো উৎপাদন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় আবার কখনো উৎপাদন প্রয়োজন হইতে কম হয়। এই পরিকল্পিত উৎপাদনের জন্য কখনো বাজার মন্দা যায় আবার কখনো তেজী হয়। মন্দা বাজারের ফল বেকারী, দারিদ্র্য ব্যবসায়ে চক্রবৃদ্ধি (Trade cycle) প্রভৃতি মানুষের জীবনে দুঃখ টানিয়া আনে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় কখনো ব্যবসায়ের চক্রবৃদ্ধির ঢেউ আসে না, ফলে মানুষকে বেকার অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় না।

উপসংহারে বলা যায়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। অবশ্য বলা যায় যে, যে যুগে-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচারিত হইয়াছিল সেই যুগে এই মতবাদের উপযোগিতা ছিল, কিন্তু বিবর্তনের রথচক্রতলে এই মতবাদ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

(খ) আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (**Modern Individualism**) : রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন ; যথা, (১) উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং (২) আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে জন্মলাভ করে সমষ্টিবাদ। আবার আদর্শবাদও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে বৃদ্ধি করার পক্ষে মতবাদ প্রচার করে। আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এই আদর্শবাদ ও সমষ্টিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে জন্মলাভ করে।

আদর্শবাদ যুদ্ধের পূজারী ; এই মতবাদ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিবার সমর্থনে মত প্রচার করে। তাই এই মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আধুনিক ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যবাদ জন্মলাভ করে। আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এই মত ব্যক্ত করে যে, ব্যক্তি শুধু রাষ্ট্রের সহিতই সম্পর্কিত নয়, সমাজের বিভিন্ন সংঘের মধ্য দিয়াও ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের মতো সংঘগুলিও ব্যক্তি-আনুগত্য দাবি করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিষ্পেষণ হইতে ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার পক্ষে মতবাদ প্রচার করেন নরম্যান এঞ্জেল এবং গ্রাহাম ওয়ালাস। নরম্যান এঞ্জেল তাঁহার দি গ্রেট ইলিউসন (Great Illusion) গ্রন্থে এই মতবাদ প্রচার করেন যে, অর্থনৈতিক সংস্বার্থের ভিত্তিতে মানুষ বহু সংঘ গড়িয়া তোলে। এই সংঘগুলি আবার রাষ্ট্রের চৌহদ্দি অতিক্রম করিয়া অর্থনৈতিক সমস্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংগঠনও গড়িয়া তোলে। ব্যক্তি শুধু আজ রাষ্ট্রের নাগরিকই নয়, সে আজ বিশ্বনাগরিকত্ব অর্জন করিবার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে। তাই বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রকে আজ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সভ্য হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সভ্য হিসাবে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবার ফলে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধিতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইবে শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ।

আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুক্তির নির্যাস

(১) আদর্শবাদের বিরোধিতা
(২) সংঘ-স্বাতন্ত্র্যের দাবি
(৩) সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার

গ্রাহাম ওয়ালাস সমষ্টিগত চেতনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সমষ্টিবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রে পরিচালনার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত চেতনার সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব। আবার নির্বাচনোত্তরকালে প্রতিনিধির উপর নির্বাচকের আর বিশেষ কোন অধিকার থাকে না। এই কারণে ওয়ালাস পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলীকে কয়েকটি সংঘে বিভক্ত করিয়া সমক্ষতাবিশিষ্ট পরিষদের একটি কক্ষকে সংঘসমূহের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত করিতে চান। এই পরিষদই সংখ্যাগরিষ্ঠের নিষ্পেষণ হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠকে রক্ষা করিবে। মূলতঃ আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (১) আদর্শবাদের বিরোধিতা করে—কারণ আদর্শবাদ রাষ্ট্রকেই সর্বগ্রাসী করিতে চায়। (২) ইহা পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদেরও বিরোধিতা করে—কারণ পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে অপচয় ঘটে, আবার (৩) ইহা সংঘ-স্বাতন্ত্র্যের জন্য দাবি করে। (৪) আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠের জনমত নামক নিষ্পেষণযন্ত্র হইতে ব্যক্তিসত্তাকে রক্ষা করিতে চায়। ব্যক্তিসত্তাকে রক্ষা কারবার জন্য ইহা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী।

গ্রাহাম ওয়ালাসের মতবাদ

উপসংহারে বলা যায়, আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় যত না বেশী যত্নপর তাহা অপেক্ষা সংঘ-স্বাতন্ত্র্যের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। এই মতবাদ যুক্ত-সংঘতেই সার্বভৌমিকতা আরোপ করে। এই কারণে ইহাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ না বলিয়া সংঘ-স্বাতন্ত্র্যবাদ বলাই সঙ্গত। ইহা রাষ্ট্রকে একটি যুক্ত-সংঘ হিসাবে মনে করে। ইহা রাষ্ট্রকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করিতে নারাজ।

(গ) ভাববাদী মতবাদ (Idealist Theory of State Functions): রাষ্ট্র

সম্বন্ধে ভাববাদী মতবাদ পূর্বে আলোচিত হওয়ায় এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ভাববাদী মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। ভাববাদীদের ধারণানুসারে ব্যক্তি রাষ্ট্রদেহে যত বেশী লয়প্রাপ্ত হইবে তত বেশী ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি হইবে। বলা হয় যে, ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মধ্যেই ব্যক্তি আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে। অতএব রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে ব্যক্তিরই মঙ্গল হইবে, কারণ, ব্যক্তি তো রাষ্ট্রের একটি অঙ্গবিশেষ। রাষ্ট্রকে বলা হইয়াছে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতীক। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সর্বব্যাপী। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, মানসিক, পারিবারিক প্রভৃতি বিষয়গুলি রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের অন্তর্গত।

ভাববাদী ধারণায় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি

সমালোচনা ঃ এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়াছে। এই মতবাদ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। আধুনিক সাকল্যবাদ (Totalitarianism) ভাববাদী নীতিরই পরিণতি। আধুনিক সাকল্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কার্যাবলী লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা মানব সভ্যতার পরিপন্থী। অতএব ভাববাদিগণ যে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে সর্বগ্রাসী করিতে চান তাহাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিক হইবে।

উপসংহারে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি রাষ্ট্র যখন উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছিল তখন হেগেলের সময়োপযোগী মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়া মানব সভ্যতার রক্ষাকল্পে যে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। (১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(ঘ) সমষ্টিবাদ (Collectivism) ঃ সমষ্টিবাদ সমষ্টির কর্তৃত্বকে স্বীকার করে। এই মতবাদকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদ হিসাবেও গণ্য করা যায়। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর পরিধিকে বৃদ্ধি করিতে হইবে। ব্যক্তিজীবনকে সমষ্টির কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করিয়া রাষ্ট্রের তথা সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণ-সাধন করাই এই মতবাদের উদ্দেশ্য। সমষ্টিবাদ আবার বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। সমষ্টিবাদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে সমাজতন্ত্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনা করা গেল।

(ঙ) সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) ঃ সমাজতন্ত্রবাদ একটি রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব। ইহা আবার একটি আন্দোলনও বটে। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষ লাভের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন এবং এই কারণে তাঁহারা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিবার পক্ষপাতী। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের যুক্তি হইল, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সকল সময় ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। সমাজের অধিকাংশ লোক প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রবাদের যুক্তির নির্যাস

আবার সমাজতন্ত্রবাদকে অন্যতম অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবেও গণ্য করা হয়। সমাজতন্ত্রবাদ উৎপাদনের মালিকানা রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে চায়। সমাজতন্ত্রবাদীরা অবাধ

প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ চালু করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে স্বাচ্ছন্দ্য নীতির অধীনে ধনতন্ত্রের জন্ম হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়; ফলে (১) সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদিত নাও হইতে পারে; কারণ পুঁজিপতি শুধু এমন দ্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাতে তাহার বেশী মুনাফা হইবে, (২) উৎপাদিত দ্রব্যাদির বণ্টন ব্যবস্থাও পুঁজিপতির স্বার্থবাহী হয়; সামাজিক কল্যাণের জন্য পুঁজিপতি কখনও বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত করে না। ফলে শ্রমিক শ্রেণী তাহার ন্যায্য মজুরি হইতে বঞ্চিত হয় এবং সমাজে উত্তরোত্তর ধনী ও নির্ধনের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, (৩) ধনতন্ত্রের আওতায় শ্রমিকের কোন নিরাপত্তা স্বীকৃত হয় না; ফলে বেকারত্ব, অনাহার সমাজের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায় এবং (৪) ধনী ও নির্ধনের মধ্যে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে। সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি দাবি করে।

আবার সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ যথেচ্ছচারিতা নহে। এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ হইতে মুক্ত, সকলের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে এই সুযোগ-সুবিধা ব্যক্তি ভোগ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারিলেই সে তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে।

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : কোলের মতে বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(১) এই ব্যবস্থায় ধনী-নির্ধনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না।

(২) উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা সাধারণের হস্তে, অর্থাৎ কল, খনি, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতির মালিকানা রাষ্ট্রের হস্তে থাকিবে।

(৩) শ্রেণীহীন, বর্ণহীন সমাজের পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধন সমাজতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৪) সকল নাগরিকের উপর শক্তি-সামর্থ্যানুসারে দায়িত্ব অর্পিত থাকিবে।

(৫) সমাজের প্রয়োজনীয় উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য বর্তমানে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

সমাজতন্ত্রের প্রকারভেদ (Different forms of Socialism) : সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য এক হইলেও সমাজতন্ত্রবাদীরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন। ফলে সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এই মতানৈক্যের জন্য সমাজতন্ত্র বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জোয়েড বলেন, সমাজতন্ত্রকে এমন একটি টুপির সহিত তুলনা করা যায় যাহা সকলেই পরিধান করে বলিয়া সে তাহার গঠন হারাইয়া ফেলিয়াছে। ("Socialism is like a hat that has lost its shape because everybody wears it.")। কার্যপদ্ধতির দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজতন্ত্রবাদকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়।

(১) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ (Utopian Socialism) : গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোকে সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা বলা হয়। প্লেটো তাঁহার 'রিপাব্লিক' গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা রচনা করেন। তাঁহার এই আদর্শ রাষ্ট্রে শাসকগোষ্ঠী

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক বন্ধন মুক্ত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করিবে। প্লেটো সামাজিক বিবাহবন্ধন (Community of wives) দ্বারা পরিবারগঠন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সামাজিক মালিকানার (Community of property) মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ এবং সন্তানসন্ততির সামাজিক পিতৃত্বের (Community of children) বন্ধনে আবদ্ধ এক সমাজ-রাষ্ট্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্লেটোর এই আদর্শ রাষ্ট্রের নীতিতে অনুপ্রাণিত হন টমাস মুর। তিনি তাঁহার 'ইউটোপিয়া' নামক গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অংকন করেন। মুরের পর ফরাসী দার্শনিক সেণ্ট সাইমন, ইংরেজ লেখক রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থন করেন। কিন্তু এই মতবাদ বাস্তবধর্মী নয় বলিয়া ইহা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই !

(২) রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism) : এই মতবাদ অনুসারে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া সামাজিক সাম্য ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। এই মতবাদের যুক্তি হইল শ্রমিকেরা তাহাদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করিতে অক্ষম ; সুতরাং রাষ্ট্রকেই তাহাদের স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদকে অনেকে সমষ্টিবাদ রূপেও আখ্যায়িত করেন। ইংল্যাণ্ডের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যার মধ্যেও এই মতবাদের স্বরূপ ধরা পড়ে। ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদীরা বিপ্লবে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা জনমতকে সুশিক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চান।

(৩) খ্রীস্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Christian Socialism) : খ্রীস্টীয় সমাজতন্ত্রীরা প্রতিযোগিতা না করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করিতে চান। তাঁহারা মনে করেন যে, যীশুখ্রীস্টের মতবাদের মধ্যেই প্রকৃত সমাজতন্ত্রের মূল কথাগুলি নিহিত রহিয়াছে। খ্রীস্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ সকল প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকদের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী।

(৪) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) : এই মতবাদকে কেহ কেহ ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ অথবা বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদ বলিয়া অভিহিত করেন। এই মতবাদের সার কথা হইল, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ যে বিপ্লবের পন্থায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলে তাহাতে একমাত্র একনায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ আর কখনই লাভ করা সম্ভব হয় না। একনায়কত্ব আর গণতন্ত্র পরস্পরবিরোধী। এই মতবাদ অনুসারে বিপ্লবের পন্থা পরিহার করিয়া ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধির ক্ষেত্রে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতে বিশ্বাস করে কিন্তু আলোচ্য মতবাদ রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতে বিশ্বাস করে না। আলোচ্য মতবাদ চিন্তা, ধর্ম ও নীতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং এমন কি মার্কসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে স্বীকার করিয়া লইয়াও অর্থনৈতিক উপাদানগুলির উপর মার্কসের মতো গুরুত্ব আরোপ করে না। ইংল্যাণ্ডের ফেবিয়ান (Fabian) সম্প্রদায়, জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটগণ (Social Democrats) এবং রিভিশনিস্ট দল এই মতবাদে বিশ্বাসী।

(৫) সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্র (Guild Socialism) : এই মতবাদে

বিশ্বাসীরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তি ও সমিতিগত স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া মনে করেন। সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রে যদি সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় তবে সমিতি ও উৎপাদনকারী শ্রমিক সংঘ নিজেদের কর্মক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করিতে পারিবে না। তাঁহাদের মতে উৎপাদনের উৎসগুলির মালিকানা উৎপাদনকারী শ্রমিক সমিতিগুলির (Guild) হস্তে ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়। এই মতবাদ বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করে। এই মতবাদ বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিবার বিরোধী। সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্র শ্রমিক সংগঠন ও কারখানাকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পক্ষপাতী। স্বায়ত্তশাসিত শ্রমিক সমিতিগুলি (Guild) কতকগুলি সংস্থা নির্বাচন করিবে। আবার আঞ্চলিক ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠনগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সমিতি (National Guild Congress) গঠন করিবে। ইহা ছাড়া ভৌগোলিক আঞ্চলিক ভিত্তিতেও আরও একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হইবে। ইহাদের মধ্যে একটি হইবে উৎপাদকগণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান আর দ্বিতীয়টি হইবে ভোক্তাদের প্রতিনিধিমূলক (Consumers Council) প্রতিষ্ঠান। প্রথমটি অর্থনৈতিক আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। অতএব দেখা যায় এই মতবাদ দ্বি-কক্ষীয় বিধানমণ্ডলীর মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থা চালু করিবার পক্ষপাতী। এই মতবাদ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। এই মতবাদের সমর্থক হইলেন জি. ডি. এইচ. কোল, এস. জি. হবসন প্রমুখ চিন্তাবীরগণ।

(৬) রাষ্ট্রহীন সংঘভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism): এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে, (১) শ্রমই হইল ধনোৎপাদনের একমাত্র উপাদান, (২) কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা শ্রমিকের হস্তে অর্পণ করা বিধেয়; (৩) এই অধিকার অর্জন করিবার জন্য শ্রমিকেরা এমন কি ধ্বংসাত্মক কার্যও করিতে পারে এবং (৪) শ্রমিক সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালনার ভার অর্পণ করা উচিত। মার্কসীয় শ্রেণী-সংগ্রাম ও উদ্বৃত্ত মূল্যে (Surplus Value) এই মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করে। ইহারা রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনও করিতে চায়। কারণ, রাষ্ট্রকে এই মতবাদ শোষণের যন্ত্র মাত্র বলিয়া মনে করে।

(৭) মার্কসীয় সমাজতন্ত্র (Marxian Socialism): এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল্যায়ন: সমাজতন্ত্রবাদ আজ একটি উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রাদর্শ। বৈষম্য, দারিদ্র্য ও শোষণের হাত হইতে মানুষকে মুক্ত করিতে চায় সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজকে পুনর্গঠিত না করিতে পারিলে সুন্দর সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নে এই মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইল:

(১) সমালোচকগণ বলেন যে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষ নিজের মংগলের জন্যই কাজ করিতে চায়। সমাজতন্ত্রবাদ মানুষকে দিয়া সামাজিক মংগলের জন্য কাজ করাইয়া লইতে চায়। ইহা মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এ্যারিস্টটলের মতে সামাজিক কল্যাণের দায়িত্ব কেহ পালন করে না। ফলে সমাজের বহু অপচয় ঘটে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে কোন লোকই দরদ দিয়া যত্ন করে না।

(২) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিপুল। এতো বিপুল পরিমাণ কাজ কোন রাষ্ট্রই সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে না।

(৩) সমালোচকগণ বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি নূতন শ্রেণী সম্পর্ক জন্মলাভ করে। এই শ্রেণী-সম্পর্কের একদিকে থাকে পরিচালকবৃন্দ (managerial class) আর একদিকে থাকে কর্মজীবী। উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা লুপ্ত হয় বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা রাষ্ট্রীয় মালিকানার নামে পরিচালক শ্রেণীর কর্তৃত্বের আওতায় আসিয়া পড়ে। বার্নহামের মতে এই পরিচালক শ্রেণী (a ruling class) পুঁজিপতি শ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত হয়। পরিচালক শ্রেণী মুনাফা আকারে কিছু না পাইলেও, তাহাদের মাসিক বেতন সাধারণ শ্রমিকদের অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। মোট মুনাফাকে মাহিয়ানার নামে আত্মসাৎ করে। রাশিয়ার পরিচালক শ্রেণীর অবস্থা পুঁজিতান্ত্রিক দেশের অনেক পুঁজিপতির অবস্থারই অনুরূপ।

(৪) সমালোচকগণ বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের পরিচালনায় উৎপাদন ও বণ্টন হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের পরিচালনার অর্থ সরকারের পরিচালনা। সরকার জনগণ লইয়াই গঠিত হয়। ফলে স্বজন পোষণ ও উৎকোচ গ্রহণ স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। আবার রাষ্ট্রের কাজ যেহেতু কাহারও ব্যক্তিগত কাজ নয় তাই কোন লোকই দরদ দিয়া কাজ করে না। ফলে মন্থর গতিতে কাজ হইয়া থাকে।

সর্বশেষে বলা যায়, মানুষ প্রকৃতিতে যশোলিপ্সু। মুনাফা লাভের আশায়ই সে সব কিছু করে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ যশের আশায় যদি সামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে তবে নিশ্চিত ভাবেই সামাজিক মঙ্গল হইবে। উপরোক্ত সমালোচনাগুলি পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে করা হইয়াছে। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থায় পরিচালকবর্গ শ্রমিক দিয়া খাটাইয়া মুনাফা আত্মসাৎ করে না। সে যাহা পায় তাহা তাহার পারিশ্রমিক মাত্র। শ্রমিকদের স্বার্থেই উৎপাদনের উপায়গুলি পরিচালিত হয়। বেকারীর হাত হইতে সমাজতন্ত্রই একমাত্র মানুষকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। দেশের সামগ্রিক আয়ের সমবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে আয়বৈষম্য যতদূর সম্ভব দূর করা হয়। আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব কিছুই কেন্দ্রপরিচালিত নয়। বিভিন্ন সংঘকেও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। সংঘের অধীনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিকাশের সুযোগ থাকে। তবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য পরীক্ষা সাপেক্ষ। তাই অধিকাংশ রাষ্ট্রই আজ তাহার কর্মক্ষেত্রকে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মিশ্রণের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করিয়া থাকে (..."a true theory of the state must be socialistic and iudividualistic at once." —*M' Kechnie*)

(৫) **ধনতন্ত্রবাদ (Capitalism):** ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলির স্থান দখল করে বিরাটকায় যন্ত্রচালিত কারখানা। এই বিরাট কারখানা চালু করিতে প্রয়োজন হয় প্রভূত পরিমাণ মূলধন। কিন্তু এই মূলধনের যোগান একমাত্র মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরা দিতে পারিত। এই পুঁজিপতিদের হস্তে কিভাবে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাই এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

ধনতন্ত্রবাদের সার কথা

উৎপাদন-ব্যবস্থা ধনিক শ্রেণীর করায়ত্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এবং শ্রমিক শ্রেণী মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দাসে পরিণত হয়। আবার অর্থনৈতিক ক্ষমতা ইহাদের করায়ত্ত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতাও ইহাদের হস্তগত হয়। এইভাবে সমগ্র সমাজ-জীবনের উপরই এই ধনিক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : (১) এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উৎসগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে চলিয়া যায়। (২) প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। (৩) শ্রমজীবীরা উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিকানা হইতে বঞ্চিত হইয়া দিনমজুরে পরিণত হয়। (৪) এই ব্যবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। (৫) ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু থাকে। (৬) এই শোষণভিত্তিক সমাজে একদিকে বিত্তবান আর অপরদিকে শোষিত শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল (Merits of Capitalism) : প্রথমতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম সুফল হইল, এই ব্যবস্থানুসারে ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির লোভে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পোন্নয়ন হইয়া থাকে। আবার যেহেতু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু হয় সেই হেতু স্বভাবতঃই উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষের জন্য প্রত্যেক উৎপাদকই যত্নপর হয়। আবার বাজারে প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। প্রতিযোগিতার ফলে একমাত্র যোগ্য উৎপাদকই টিকিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতাগণও লাভবান হয়, কারণ ক্রেতাগণ স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে : ক্রেতার চাহিদা পূরণের জন্য তাহার রুচিমতো দ্রব্য উৎপাদন করিতে উৎপাদকগণ বাধ্য হয়।

তৃতীয়তঃ, এই উৎপাদন-ব্যবস্থায় যথেষ্ট ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। ফলে উৎপাদনকার্যে প্রভূত দক্ষতার প্রয়োজন। দক্ষ পরিচালক পাইলে অপচয়ও কম হয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষ পরিচালক বাহির হইয়া আসে এবং তাহারাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করিয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষ-ত্রুটি অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল (Demerits of Capitalism) : প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, ফলে. সমাজ ধনী ও নির্ধনে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, ধনবৈষম্যের ফলে দরিদ্র জনসাধারণ তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমান সুযোগ পায় না।

তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রেতার যে স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে তাহা অবাস্তব ; কারণ. এই ব্যবস্থায় উৎপাদকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রেতাগণকে উচ্চমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য করে।

চতুর্থতঃ, সমাজকল্যাণের দিকে কোন দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু ব্যক্তিগত মুনাফার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই উৎপাদকগণ উৎপাদনকার্যে রত থাকে। এই ব্যবস্থায়

সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র যে ব্যবসায়ে বেশী মুনাফা তাহাতেই পুঁজিপতি মূলধন নিয়োগ করে।

পঞ্চমতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়, ব্যবসায়চক্র অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ সৃষ্টি হইয়া সমাজে নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

উপসংহারে বলা যায়, এই ব্যবস্থার গুণ ও দোষ উভয়ই আছে। এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে দুইটি উপায়ে সংশোধন করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ধনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যায়, আর দ্বিতীয় উপায় হইল মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া জাতীয় প্রয়োজনানুসারে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করা যায় এবং সাধারণ বিষয়কে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। এই মিশ্রনীতি বর্তমানে ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে।

(ছ) **ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ (Fascism and Nazism)**: প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালীতে ফ্যাসীবাদ এবং জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান হয়। ফ্যাসী-বাদের প্রবর্তক ছিলেন বোনটো মুসোলিনী আর নাৎসীবাদের প্রবর্তক হইলেন হের হিট্‌লার। ইতালীর গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যর্থতা এবং যুদ্ধোত্তর জার্মানীর করুণ দৈন্য ও গ্লানিপূর্ণ অবস্থাই এই দুইটি মতবাদের অভ্যুত্থানের কারণ। জার্মানগণ মনে করিতেন যে, তাঁহারা আর্যবংশোদ্ভব এবং জগতের শ্রেষ্ঠ নরকুল। তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নাৎসীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মুসোলিনীর ফ্যাসীবাদের পশ্চাতে ছিল দুইটি উদ্দেশ্য: (১) ইতালীতে রুশ বিপ্লবের অনুকরণে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী কল-কারখানা দখল করিতে আরম্ভ করে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার দিকে অগ্রসর হয়। এই কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী যাহাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করিতে পারে তাহার জন্য মুসোলিনী এই ফ্যাসীবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন; আর (২) ইতালীর গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যর্থতায় এক নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়, ফলে ইতালীতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ফ্যাসীবাদের উপরই এই নূতন সরকারকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ফ্যাসীবাদের অর্থ "একসঙ্গে একখানি কুঠারসহ আবদ্ধ কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড"। ইহা একটি রোমান শব্দ। এই মতবাদের সার কথা হইল রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ হইবে অভিন্ন এক সর্বাত্মক সংগঠন। রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী, চিরন্তন ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী। ফ্যাসীবাদ জাতীয় স্বার্থের বিরোধী সাম্য, স্বাধীনতা এবং কোন আদর্শে বিশ্বাসী নয়। এই মতবাদ সমষ্টিগত জাতীয় জীবনকে কাম্য বলিয়া মনে করে। এই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি অভিজাততান্ত্রিক। এই মতবাদ যুদ্ধে বিশ্বাসী। অবশ্য, এই মতবাদ বিভিন্ন দলের শাসন, বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় আস্থাবান। অর্থনীতি ক্ষেত্রে এই মতবাদ মিশ্রনীতি (Mixed Economic Policy) গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ের ভিত্তিতে এক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করে।

ফ্যাসিবাদের সার কথা

ফ্যাসীবাদের ন্যায় নাৎসীবাদও ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের একাধিপত্য বিস্তারের পক্ষপাতী। এই মতবাদ একদলীয় শাসনে বিশ্বাসী। নাৎসীবাদ অনুসারে রাষ্ট্রই সর্বক্ষমতার অধিকারী, সর্বগ্রাসী। এই মতবাদ একনায়কত্বে বিশ্বাসী।

নাৎসীবাদের সার কথা

উপসংহারে বলা যায়, এই মতবাদ দুইটি যদিও বহু দোষে দুষ্ট কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইতালী ও জার্মানীর পুনর্গঠনের জন্য এই ধরনের মতবাদের প্রয়োজন ছিল। অন্যথায় বিধ্বস্ত জার্মানীকে পুনর্গঠন করা সম্ভবপর হইত না। জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া হিট্‌লার যেভাবে জার্মানীকে সংগঠিত ও উন্নত করিয়াছিলেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ।

(জ) সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী
(Functions of the Social Welfare State)

এই মতবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণ (the greatest good of the greatest number) সাধন করা। ভারতবর্ষ এই মতবাদে বিশ্বাসী। ভারতবর্ষের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি (Directive principles) লক্ষ্য করিলে দেখা যায় সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক উন্নয়ন করার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, উৎপাদনের উপায়গুলি যাহাতে কয়েকজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইবে। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মপরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে তাহা নিম্নোক্ত কার্যবিবরণী হইতে বুঝা যাইবে ঃ

(১) সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা করিবে। ইহার অর্থ আভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণ হইতে ব্যক্তিকে রক্ষা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে।

(২) সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রত্যেকের সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রদান করিলেও সামাজিক স্বার্থে এই সম্পত্তি রক্ষার অধিকারকে প্রদান নাও করিতে পারে।

(৩) আবার সামাজিক কল্যাণসাধনের জন্য অনেক সময় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (Family Planning) প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দিয়া থাকে।

(৪) রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তির অধিকারকে যেমন রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় তেমনি আবার এই অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রাষ্ট্র করিয়া থাকে। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র তাহাই করে।

(৫) সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রে শিল্প-বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, এই রাষ্ট্র উৎপাদকের স্বার্থ যেমন সংরক্ষণ করে তেমনি আবার শ্রমিকের স্বার্থও সংরক্ষণ করে।

(৬) সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র শুধু উৎপাদন-ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করে না, এই রাষ্ট্র উৎপাদনের সামাজিক বণ্টন-ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করিয়া ধনী-নির্ধনের মধ্যে পার্থক্য লাঘব করিবার চেষ্টা করে।

(৭) এই প্রকৃতির রাষ্ট্র দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রোগীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, শ্রমিককে শোষণমুক্ত করিবার জন্য বিভিন্ন শ্রমিক আইন প্রণয়ন, বিমানপথ, ডাক, রেলপথ, প্রতিষ্ঠা করিয়া যাতায়াতের উন্নতিবিধান, জাতীয় মুদ্রা, ঋণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার

উন্নতি, আদমশুমারি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্র দেশের নানাবিধ উন্নতিবিধান প্রভৃতি বহুবিধ কার্য করিয়া থাকে। বর্তমান রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিস্তৃত। মধ্যযুগের পুলিশ রাষ্ট্র আজ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

(ঝ) চৈনিক সাম্যবাদ
(Chinese Communism)

চীন অতি প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পন্ন জাতি। অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর অত্যাচারে এই অতি প্রাচীন জাতিটির রাজনৈতিক জীবন ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত জাতীয় সরকার চীনে রাষ্ট্রশাসন পরিচালনা করে। ১৯৫১ খৃস্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর এই জাতীয় সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া সাম্যবাদের ভিত্তিতে এক প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ম্যাকাও এবং ফরমোজা প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ ছাড়া প্রায় সমগ্র মহাচীনে সাম্যবাদী শাসন প্রচলিত আছে। ভারত, পাকিস্তান, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রায় সকল রাষ্ট্রই মহাচীন সরকারকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়াছে।

চৈনিক সাম্যবাদী সরকার সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করিয়া চাষী-প্রধান ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। নারীর স্বাধীনতা ও সমানাধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

চীনের নূতন সরকার গঠিত হইবার পর চীন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে এবং শান্তিকামী জাতিগুলির সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়।

চীনের বিভ্রান্ত নীতি ঃ বর্তমান চীন আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করিয়া শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পরিবর্তে সারা এশিয়ায় এক অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। চীনের তিব্বত দখল, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র (Theocratic State) পাকিস্তানের সঙ্গে আঁতাত, চীনের ভারত আক্রমণ, রুশিয়ার সীমান্তে চৈনিক সৈন্য-বাহিনী জমায়েত, শিক্ষাগুরু দেশ রুশিয়ার সঙ্গে বিবাদ, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী দলে ফাটল ধরানো প্রভৃতি কার্যের দ্বারা চীন সাম্যবাদের যে এক নতুন ছবি প্রদান করিতেছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

আবার চীনের সরকার প্রধানতঃ সাম্যবাদী-দল কর্তৃক গঠিত হইলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এখানে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা হয় নাই। পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা হয় নাই। ক্ষেত্রবিশেষে পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া সরকার কাজ করিয়া থাকে।

রুশিয়ার সাম্যবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও রুশ সাম্যবাদের সঙ্গে চৈনিক সাম্যবাদের অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নয়া গণতন্ত্র (New Democracy)

বলিয়া চীনের রাষ্ট্র কর্ণধার মাও-সে-তুং গণতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে বর্তমানে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা কাজ করিবার পরিকল্পনা আছে বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখা হইয়াছে সাম্যবাদের দিকে। অন্যান্য দলের অস্তিত্বকে আপাততঃ স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখা হইয়াছে সাম্যবাদীদলের প্রাধান্যের দিকে। রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয়। এখানে বেসরকারী খাতেও কার্য করিবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রই যে সকল শিল্প পরিচালনা করিবে এমন নয়। ধীরে ধীরে সকল শিল্পই বিনা খেসারতে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পরিকল্পনা আছে। চীন জগতের সর্বাধিক লোকসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্র। চীনের লোক-ভার ভয়ংকর।

(ঞ) **গান্ধীবাদ (Gandhism)**: মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী জাতিকে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। গান্ধীজীকে জাতির জনক হিসাবে অভিহিত করা হয়। সারা জীবনই গান্ধীজী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছেন এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে মান্য করিতে বৃটিশ সরকারকে বাধ্য করিয়াছেন। সারা রাজনৈতিক জীবনে তিনি যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাকেই গান্ধীবাদ বলা হয়।

গান্ধীবাদ ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান ও রাজনীতি এই তিনকে এক করার নীতি গান্ধীজী প্রচার করেন। তাঁহার মতে ধর্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান বিবর্জিত রাজনীতি রাজনীতিই নয়। "অহিংসা পরমধর্ম"—এই কথাটি তিনি রাজনীতিতে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে হিংসার দ্বারা কখনও কোন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় না। ইহা মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। মার্কস বিশ্বাস করিতেন শ্রেণী সংঘর্ষ এবং বিপ্লবই একমাত্র সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে।
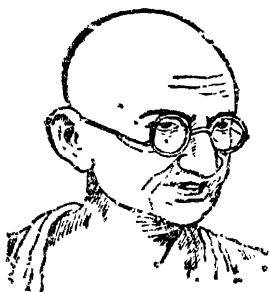
অহিংসা নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন গান্ধীজী। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে তিনি ধনিক শ্রেণীর শোষণযন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন। আবার সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সাম্যবাদী সমাজে মানুষের অর্থনৈতিক সুখ থাকিতে পারে কিন্তু ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভবপর নয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে হিংসার পথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শুধু মাত্র কতিপয় ব্যক্তির করায়ত্ত হয়। গান্ধীজী রাষ্ট্রকর্তৃত্বে ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রমুক্ত পঞ্চায়েতী-রাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন মানুষের সমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। সমাজকে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ করিয়া পঞ্চায়েতীর মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্রের পথে সাম্য প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন গান্ধীজী।

গান্ধীজীর মতে মানুষ আজ যন্ত্র-দানবের ক্রীতদাসে পরিণত হইতে চলিয়াছে। গান্ধীবাদ এই যন্ত্র-দানবের হাত হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার জন্য বিকেন্দ্রীকৃত

ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। গান্ধীবাদ বৃহদায়তন শিল্পগুলির সম্পূর্ণ বিরোধী নয়। শুধুমাত্র যে যন্ত্রপাতি মানুষের শ্রম লাঘব করিতে সক্ষম সেই জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতির যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার জন্য যে বৃহদায়তন শিল্পের আবশ্যক হইবে তাহাই শুধু গান্ধীবাদ অনুমোদন করে; আবার এই জাতীয় শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পক্ষপাতী। গান্ধীবাদ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করিতে চায়। ধনতান্ত্রিক শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তার কাম্য নয়। গান্ধীবাদ একটি সহজ সরল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চায়। যে উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রের মালিকশ্রেণী শ্রমিককে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপাদানে পরিণত করিতে পারে, বৃহদায়তন শিল্প-কারখানায় মজুর যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়, সামগ্রী উৎপাদনে তাহার আনন্দ কোথায়? শিল্পাবকেন্দ্রীকরণের পক্ষে গান্ধীবাদ আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করে যে, বৃহৎ শিল্প যতই দানা বাঁধিবে ক্ষমতাও ততই কেন্দ্রীভূত হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পব্যবস্থা ক্ষমতাকেও বিকেন্দ্রী করে। বিকেন্দ্রীয় ক্ষমতা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কুফল দূর করে। এইভাবে গান্ধীবাদ সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনধারা সমাজে প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিল, যেখানে মানুষ উচ্চ চিন্তার সুযোগ পাইবে, ক্ষুদ্রশিল্পে কাজ করিয়া সৃষ্টির আনন্দ ভোগ করিতে পারিবে।

সমালোচনা : (১) গান্ধীবাদের জন্ম ভারতে। সমালোচকগণ বলেন, ভারতের প্রধান সমস্যা হইলে দারিদ্র্য। ভারতকে অর্থনৈতিক দুর্গতি হইতে বাঁচাইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। যন্ত্রপাতির সাহায্যে ছাড়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যায় না। প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন না বাড়াইতে পারিলে বেকার সমস্যারও সমাধান হইবে না। অর্থাভাব দূর করার জন্য ধনোৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। দ্রুত ধনোৎপাদন বৃদ্ধির একমাত্র পথ বৃহদায়তন শিল্প স্থাপন করা। তাই বোধহয় স্বাধীন ভারতের সরকার উৎপাদন ব্যবস্থায় গান্ধীনীতিকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(২) গান্ধীবাদ রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির চরিত্রকে উন্নত করিবার পক্ষপাতী; কিন্তু রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্যই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করা এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা। তাই রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া ব্যক্তির চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব নয়।

(৩) সমালোচকগণ বলেন যে, অহিংসার পথে আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা করা যায় বলিয়া গান্ধীবাদ যে নীতি প্রচার করে সেই নীতি ভ্রান্ত। কারণ একতরফ অহিংস হইলে রণোন্মত্ত বৈদেশিকরা ভারতকে জয় করিয়া আবার পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চীন যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিল তখন ভারতীয় সৈনিকগণ যদি অহিংস হইয়া উপবেশন ধর্মঘট করিত তাহা হইলে ভারত চীনের অধীন হইয়া যাইত। সুতরাং রণোন্মত্ত জগতে কোনও একটি দেশের পক্ষে অহিংসনীতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

উপসংহারে বলা যায়, গান্ধীবাদের ত্রুটি যতই থাকুক না কেন মানুষ একদিন রণক্লান্ত হইয়া পড়িবেই। তার রণক্ষুধা যখন মিটিয়া যাইবে হিংসার লোলিহান কুটিল জিহ্বার পরিণতি যখন ধ্বংসের মধ্যে সমাহিত হইবে তখন মানুষ বুঝিতে পারিবে গান্ধীবাদের ধর্ম জ্ঞানমিশ্রিত ন্যায়মিশ্রিত অহিংস বাণীর মর্মকথা।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি লইয়া মতপার্থক্য থাকার ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি লইয়াও মতবিরোধ আছে। একদল লেখক রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে সংকুচিত করিতে চান। আর একদল লেখক রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে বাড়াইতে চান।

প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হইত, ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ছিল সীমাহীন। প্রাচীন রোমে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি কিছুটা সংকুচিত হয়। তারপর অভিভাবক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ জন্মগ্রহণ করে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রধানতঃ চারটি মতবাদ আছে—যথা, (১) নৈরাজ্যবাদ, (২) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, (৩) ভাববাদ, (৪) সমষ্টিবাদ। ইহা ছাড়া, সমাজকল্যাণ মতবাদও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) অপরিহার্য কার্যাবলী, (২) ইচ্ছাধীন কার্যবলী। রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য যে সকল কার্য রাষ্ট্র করিয়া থাকে তাহাকে বলা হয় রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী। আর ইচ্ছাধীন কার্য আবার দুইভাগে বিভক্ত; যেমন, সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী।

(১) নৈরাজ্যবাদ: এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সাধন করিয়া কতকগুলি স্বেচ্ছা-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(২) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ: এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তিরই শুধু অস্তিত্ব আছে। রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তিবর্গ লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র মাত্র দুইটি কার্য করিবে: যথা, (১) দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করিবে, (২) বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবে। এইরূপ রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র বলা হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করাই এই মতবাদের উদ্দেশ্য।

(৩) ভাববাদ: এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তি বিলীন হইয়া যায় এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্রের মধ্য দিয়াই মূর্ত হইয়া উঠে। অতএব রাষ্ট্রের কর্যাবলী সর্বগ্রাসী। ব্যক্তির স্বধীনতাকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চায় এই মতবাদ।

(৪) সমষ্টিবাদ: এই মতবাদ ব্যক্তি-জীবনকে সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনিতে চায়। এই মতবাদের অন্তর্গত হয় সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রবাদ আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, (১) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, (২) সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, (৩) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ, (৪) খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ, (৫) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ, (৬) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ, (৭) রাষ্ট্রহীন সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, (৮) সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ।

১৪

শাসনতন্ত্র
(Constitution)

শাসনতন্ত্রের ইতিহাস (History of Constitution) ঃ রাষ্ট্রের সাংগঠনিক নিয়মাবলী, যাহাকে বর্তমানে শাসনতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহার নজীর বহু দেশের প্রাচীনকালের ইতিহাসে পাওয়া যায়। গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রনীতি গ্রন্থে অনেক শাসনতন্ত্রের উল্লেখ আছে। তিনি প্রায় শতাধিক শাসনতন্ত্রের আলোচনা করিয়া একটি আদর্শ শাসনতন্ত্র রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া কথিত আছে।

রোমকরাও শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যে একটা পার্থক্যের নির্দেশ প্রদান করেন।

মধ্যযুগেও নগর এবং কর্পোরেশনের অধিকার, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক এবং রাজন্যবর্গ হইতে প্রাপ্ত অধিকারসমূহকে লিপিবদ্ধ করিবার রীতি লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে মৌলিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে মৌলিক আইনের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই যুগেও শাসনতন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে স্টুয়ার্ট রাজাদের সহিত পার্লামেন্টের বিবাদের মধ্যে শাসনতন্ত্রের ধারণা পরিস্ফুট হয়। মে ফ্লাওয়ার চুক্তি (১৬২০), কনেকটিকাটের মৌলিক আদেশ (১৬৩৯), আমেরিকার সনদ, ক্রমওয়েলের মানব চুক্তি (Agreement of the people) (১৬৪৭), সামাজিক চুক্তিবাদীদের ধারণা, ভেটালের "ল অব নেশনস" (Law of Nations) (১৭৭৩), ব্ল্যাকস্টোনের Commentaries on the Law of England (১৭৬৫-৬৯), আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণাবলী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার ১৮০০ হইতে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে প্রায় তিন শতাধিক শাসনতন্ত্র সংবদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে।

এই সকল শাসনতন্ত্র এবং দলিলগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রতি যুগের শাসনতন্ত্রই যুগধর্মকে প্রকাশ করিয়াছে এবং রাষ্ট্র যে শ্রেণীর করায়ত্ত হইয়াছে সেই শ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শাসনতন্ত্র প্রণীত হইয়াছে। অবশ্য, উদীয়মান শ্রেণীর দাবির কথাও শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র যে গতিশীল সমাজের চাপে বার বার পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন দলিলগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রাক্-ম্যাগনাকার্টা যুগের শাসনতন্ত্র এবং রাজা জনের ম্যাগনাকার্টার ঘোষণার মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান আছে। রাজা জন জনগণের দাবিকে স্বীকার করিয়া লওয়ায় ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইংল্যাণ্ডে ত' আর লিখিত কোন শাসনতন্ত্র নাই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শাসনতন্ত্র অলিখিতও হইতে পারে। শাসনতন্ত্রের ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে যে, জনসাধারণের বিভিন্ন অধিকার স্বীকার করিতে গিয়া শাসনতন্ত্র বিভিন্ন যুগে তাহার রূপ পাল্টাইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা (Utility of Constitution) : প্রথমতঃ, শাসক ও শাসিতের আইনগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কই রাষ্ট্রচরিত্র নির্ধারণ করে। পূর্বে এই সম্পর্ক নির্ধারণ করিত শাসকশ্রেণী। বর্তমানে শাসিত শ্রেণীই রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। শাসিতের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল যে শাসন-ব্যবস্থা তাহাকেই বলা হয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসিতশ্রেণী তাহাদের এই সম্পর্ককে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করিয়া লয়। শাসক-শাসিতের সম্পর্ককে সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য শাসিতের মৌলিক অধিকারগুলিকে বিধিবদ্ধ করিয়া স্বৈরাচারিতার পথ রোধ করা হয়। শাসনতন্ত্র শাসক ও শাসিতের সম্পর্ককে বিধিবদ্ধ করিয়া এবং মৌলিক বিধিনিষেধগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে রাষ্ট্রে অরাজকতা দেখা দিবে এবং রাষ্ট্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য বানচাল হইবে।

শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রচরিত্রের নিদর্শন। একটি দেশের শাসনতন্ত্র দেখিলেই সেই দেশের স্বরূপ বুঝা যায়।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রাভ্যন্তরস্থ ক্ষমতা সম্পর্কটি ব্যক্ত করে। ডঃ ফাইনারের ভাষায় বলা যায়, শাসনতন্ত্র হইল রাষ্ট্রাভ্যন্তরস্থ সম্পর্কের আত্মজীবনী ("A Constitution is the auto-biography of a power relationship.")।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রীয় জীবন-বিকাশের জন্য শাসনতন্ত্র অপরিহার্য। শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার মানের মাপকাঠি। শাসন-ব্যবস্থা একদিন কি ছিল, আজ সে কি রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা দেশের শাসনতন্ত্র হইতে জানা যায়।

এই সকল কারণের জন্য শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে কেহই অস্বীকার করে না। কেহ কেহ অবশ্য এইরূপ মন্তব্য করেন যে, শাসনতন্ত্র না থাকিলে ক্ষতি কি? ইংল্যাণ্ডের নজির দেখাইয়া বলেন যে, ইংল্যাণ্ডে শাসনতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের উন্নতি অপরাপর রাষ্ট্রের তুলনায় কম হইতেছে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংল্যাণ্ডে শাসনতন্ত্র আছে তবে তাহা অলিখিত।

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Constitution) : প্রত্যেক সংগঠনেরই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংগঠনের সদস্যদের আচরণকে বিভিন্ন নিয়মকানুনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাষ্ট্রও একটি সংগঠন। সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে এবং এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রসংস্থার সদস্য হিসাবে মানুষের আচরণকে কতকগুলি নিয়মকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়মকানুনের অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী ও প্রকৃতি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, বিভিন্ন সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের প্রণালী প্রভৃতি। এই নিয়মকানুনগুলিকেই বলে শাসনতন্ত্র। লুইয়ার বলেন, যে উদ্দেশ্য ও যে সমস্ত বিভাগ দ্বারা শাসন-ক্ষমতা পরিচালিত হয় তাহাদিগের নিয়ন্ত্রণ করিবার নিয়মাবলীকে শাসনতন্ত্র বলে ("The body of rules which regulates the ends for which and the organs through which Government power is exercised.")।

ডাইসির মতানুসারে শাসনতন্ত্র হইল এমন কতকগুলি নিয়মকানুন যাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের এবং বণ্টনের ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। শাসনতন্ত্রের সাম্প্রতিক ধারণাকে ডঃ ফাইনারের (Dr. Finer) ভাষায় বলা যায়, মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত সংবন্ধ রূপই হইল শাসনতন্ত্র ("The system of Fundamental Political institutions is the Constitution.")। ডঃ ফাইনার শাসনতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ ক্ষমতা সম্পর্কের আত্মজীবনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ("A constitution is an auto-biography of a power relationship.")। শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা নির্ধারণ করে। সরকারের পারস্পরিক ক্ষমতা নির্ধারণ করে।

আবার কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শাসনতন্ত্রকে দুইটি অর্থে ব্যবহার করেন; যথা (১) প্রথম অর্থ অনুসারে শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত বা অলিখিত নিয়মকানুন, যাহা রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ জন্য ব্যবহৃত হয়, আর (২) দ্বিতীয় অর্থানুসারে শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিপিবদ্ধ মৌলিক আইন, যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের সম্পর্ক প্রভৃতি মৌলিক নীতিগুলি নির্ধারিত হয়।

এই দুইটি অর্থকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত অর্থে শুধু লিখিত বা অলিখিত নিয়মকানুনই অন্তর্ভুক্ত হয় না, আদালতগ্রাহ্য আইন এবং প্রচলিত রীতিগুলিও শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রচলিত রীতিগুলি যদিও আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হয় না, কিন্তু এইগুলিকে শাসনতন্ত্রের অঙ্গীভূত করিবার কারণ, এইগুলি শাসন-ব্যবস্থাকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত করে।

দ্বিতীয়োক্ত অর্থে শাসনতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একমত হইতে পারেন নাই। কারণ কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চান বিধিবদ্ধ মৌলিক আইনটিকে অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন করিতে। এই কারণে টক্‌ভিলের ন্যায় অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শাসনতন্ত্রের সহজসাধ্য পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা ব্রিটেনে কোন শাসনতন্ত্র আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ, ব্রিটেনে শাসনতন্ত্র অলিখিত ও ইহার পরিবর্তন সহজসাধ্য।

শাসনতন্ত্রের উপাদান ও লক্ষণ (Contents of the Constitution and requisites of a good Constitution) :

(ক) **শাসনতন্ত্রের উপাদান :** শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু কি হইবে, সে সম্বন্ধে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একমত হইতে পারেন নাই। অবশ্য, শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর; যথা (১) শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং (২) রাষ্ট্রের চরিত্র। এই বিষয়ের আলোচনায় একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। প্রশ্নটি হইল শাসনতন্ত্র কি কেবলমাত্র সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া বিবেচিত হইবে, না ইহা মূলত ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে বিবেচিত হইবে। এই বিষয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একমত হইতে পারেন নাই। এই কারণেই মনে হয়, বিভিন্নদেশে শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করাই শাসনতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিম্নে উপরোক্ত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তুর আলোচনা করা গেল :

(১) শাসনতন্ত্রের প্রথমেই একটি প্রস্তাবনা (Preamble) থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইবে। এই প্রস্তাবনার উপকারিতা এই যে শাসনতন্ত্রের যে সকল ধারা স্পষ্ট নয় সে সকল ধারার ব্যাখ্যা করিবার সময় মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা যাইবে।

(২) শাসনতন্ত্রকে বলা হয় ব্যক্তি স্বাধীনতার উৎস। তাই সমাজ জীবনে নাগরিকগণ অপর নাগরিকের ও সরকারের সম্পর্কে কতটা অধিকার ভোগ করিবে শাসনতন্ত্র তাহাই স্থির করিয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করিবে। শাসনতন্ত্র শুধু অধিকারই নির্ধারণ করিবে না, নাগরিকের কর্তব্যও স্থির করিবে।

(৩) সুষ্ঠু শাসনকার্যের জন্য শাসকমণ্ডলীর নির্বাচন পদ্ধতি, শাসকমণ্ডলীর ক্ষমতা এবং সরকারের কি কি বিষয়ে ক্ষমতা নাই তাহা শাসনতন্ত্রে পরিষ্কার ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তাহা না হইলে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হইতে পারে।

(৪) আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা, এই তিন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি পরিষ্কার ভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকিবে।

(৫) শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের অধিকার সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত থাকিবে, নচেৎ শাসকবর্গ নাগরিকদিগের অধিকারকে তাহাদের প্রয়োজন মতো অস্বীকার করিতে পারে। অবশ্য, হোয়ারে প্রমুখ এই মতের বিরোধী। তাঁহারা এই মত পোষণ করেন যে, আদর্শ আইন যদিও অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে এবং অধিকারের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে কিন্তু আদর্শ শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের অধিকারকে লিপিবদ্ধ করা সমীচীন হইবে না।

(৬) সরকারী কার্যে লোক নিয়োগ সম্পর্কিত কতকগুলি মৌলিক আইন শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। আইন অনুসারে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বা অন্যকোন উপায়ে যোগ্যতানুসারে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করে।

সরকারী হিসাব পরীক্ষা, নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধও শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়।

(৭) আদর্শ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ করে। কিভাবে ও কে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবে তাহাও লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(খ) সুশাসনতন্ত্রের লক্ষণ: আদর্শ শাসনতন্ত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয় নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল:

(১) আদর্শ শাসনতন্ত্রকে সুস্পষ্ট হইতে হইবে। এই কারণে শাসনতন্ত্রের ভাষারও স্পষ্টতা প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রের ভাষা যদি অস্পষ্ট হয় তবে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা কালে মত-বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে।

(২) আবার শাসনতন্ত্র লিখিত হইলে লিখিত শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিমতের অবকাশ থাকে না। এই দিক হইতে বিচার করিলে লিখিত শাসনতন্ত্র অলিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা স্পষ্ট ও শ্রেয়।

(৩) আদর্শ শাসনতন্ত্রকে যেমন ব্যাপক (Comprehensive) হইতে হইবে আবার ইহাকে সংক্ষিপ্তও হইতে হইবে। হোয়ারে বলেন: আদর্শ শাসনতন্ত্রের

একটি অপরিহার্য গুণ হইল ইহার সংক্ষিপ্ততা ("One essential characteristic of the ideally best form of Constitution is that it should be as short as possible.")। বলা হয় যে, যদি সকল খুঁটিনাটি বিষয়গুলি শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে শাসনতন্ত্র বৃহদায়তন বিশিষ্ট হইবে। বৃহদায়তন পুস্তকাকারের শাসনতন্ত্র স্বভাবতই জটিল হইয়া পড়ে। জটিলতা দূরীকরণের জন্য শাসনতন্ত্র সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য রাষ্ট্রের কাঠামো ও চরিত্রের উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের আয়তন। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন প্রভৃতি শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হওয়ায় শাসনতন্ত্রের আয়তন দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

(৪) আদর্শ শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হইবে কিনা এই সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। ল্যাস্কির (Laski) মতে শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত হইলে শাসকবর্গ এই অধিকারগুলিকে যদি ভঙ্গ করে তবে জনসাধারণ আদালতের মাধ্যমে অধিকারগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে এবং জনগণ তাহাদের কি কি অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহাও জানিতে পারিবে। আবার হোয়ারে প্রমুখ লেখকগণ অধিকারকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান না। হোয়ারে বলেন যে, আদর্শ শাসনতন্ত্র যদিও অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে এবং তাহা সংরক্ষণ করিবার জন্য অঙ্গীকার করিবে কিন্তু আদর্শ শাসনতন্ত্র অতি অল্পসংখ্যক অধিকারই লিপিবদ্ধ করিবে ("The ideal Constitution would contain few or no declaration of rights, though the ideal system of law would define and guarantee many rights.")। এই শ্রেণীর লেখকগণের মতে অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ হইলে অধিকারের কোন মূল্য থাকে না, কারণ অধিকারের সঙ্গে আবার তাহার বাধা-নিষেধের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অবশ্য, বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইবার প্রচলন দেখা যায়।

(৫) ল্যাস্কি প্রমুখ এই ধারণা পোষণ করেন যে, আদর্শ শাসনতন্ত্র অতিরিক্ত মাত্রায় সুপরিবর্তনীয়ও হইবে না আবার অতিরিক্ত মাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয়ও হইবে না। আদর্শ শাসনতন্ত্র মধ্যপন্থাই অবলম্বন করিবে। এই যুক্তি দেখানো হয় যে, শাসনতন্ত্র অতিরিক্ত মাত্রায় সুপরিবর্তনীয় হইলে শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব ও অস্তিত্ব বেশীদিন থাকে না। আবার ইহা অতিরিক্ত মাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয় হইলে গতিশীল সমাজের সহিত ইহা তালরক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ব্রাইসের মতটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ব্রাইস বলেন যে, 'বিপদকালে প্রয়োজনের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া এবং শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে সংবিধান পরিবর্তিত হইতে পারে তাহাই আদর্শ শাসনতন্ত্র। ব্রাইসের এই মন্তব্য অনুসারে যে শাসনতন্ত্র তৈয়ারী হইবে তাহা মধ্যপন্থাই গ্রহণ করিবে।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitution) : সাধারণতঃ শাসনতন্ত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা,—(ক) লিখিত ও অলিখিত, (খ) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়।

(ক) লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র (Written and Unwritten Constitution) : শাসনতন্ত্রকে লিখিত বলিয়া বর্ণনা করা হয় তখনই যখন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলিকে এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়

("A written Constitution is one in which most of the fundamental principles of Governmental organisation are contained in a formal written instrument or instruments deliberately created."—*R. G. Gettel*)

লিখিত শাসনতন্ত্রের উদাহরণ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র ইত্যাদি, আর অলিখিত শাসনতন্ত্রের উদাহরণ হইল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে অলিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়, কারণ ব্রিটেনে কোন আইন-প্রণেতৃমণ্ডলী কখনও একটিমাত্র বিধিবন্ধ ঘোষণার দ্বারা ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার রূপটি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। এই কারণে টকভিল্‌ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, ব্রিটেনে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু টকভিলের এই উক্তি যথার্থ নহে, কারণ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র যদিও একটি ঘোষণার মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই তথাপি, (১) বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত নানা আইনের মধ্যে, (২) বিভিন্ন রীতিনীতি-প্রথা ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে এবং (৩) বহু বিচারপতির বিচার-মীমাংসার মধ্যে সমগ্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রটি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আবার যে সকল রাষ্ট্রে লিখিত শাসনতন্ত্র আছে সেই সকল রাষ্ট্রেও এমন অনেক অলিখিত প্রথায় সৃষ্টি হইয়াছে যেগুলি প্রায় লিখিত আইনের মর্যাদা পায়। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরা যাইতে পারে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, দল, প্রথা প্রভৃতি লিখিত হয় নাই। কিন্তু, এইগুলি শাসনতান্ত্রিক প্রথা হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

অলিখিত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল (১) অলিখিত শাসনতন্ত্রের বিষয়-বস্তুগুলি এমন হইতে হইবে যাহা লিখিত শাসনতন্ত্রে স্থান পাইতে পারিত, কিন্তু স্থান পায় নাই, (২) অন্যান্য দেশে এই বিষয়গুলি যে শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে তাহার নজির; (৩) আর ইহাকে শাসনতন্ত্র বলিয়া কোন আইন-প্রণেতৃমণ্ডলী কোনদিন ঘোষণা করেন নাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলেই শাসনতন্ত্রকে অলিখিত বলা হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল (ক) বিষয়বস্তুগুলি লিখিত থাকিবে, (২) আইন-প্রণেতৃমণ্ডলী তাহাকে শাসনতান্ত্রিক আইন বলিয়া কোন এক সময়ে ঘোষণা করিবেন এবং প্রবর্তন করিবেন।

কিন্তু লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। এই প্রসঙ্গে লর্ড ব্রাইসের উক্তি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন যে, লিখিত শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা ও রীতিনীতি দ্বারা সম্প্র-সারিত হইয়া থাকে, ফলে কিছুদিন পরে লিখিত নিয়মকানুন হইতে উহার স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না ("Written Constitutions are developed by interpretations, fringed with decisions and enlarged by customs so that after a time the letter of the text does not convey the full effect".)। লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা যখন অস্পষ্ট এবং লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্যও অতি অস্পষ্ট তখন লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয় দুইটি কারণে; যথা—(১) পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাঙিয়া

পড়িলে যখন শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় তখন ক্ষমতা সম্পর্কে নূতন অবস্থা ঘোষণা করিবার জন্য লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ হইতে স্বাধীন ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ছিল। শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়া লিখিতভাবে এই ঘোষণা প্রদান করা হয়।

(২) আর একটি কারণ হইল পুরাতন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অক্ষমতাকে ও সংঘর্ষকে এড়াইবার জন্য, নূতন ভারসাম্যকে নির্দিষ্ট করিবার জন্য এবং রাষ্ট্রাশ্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকারকে সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ বিচার: (১) লিখিত শাসনতন্ত্রকে বলা হয় স্থায়ী ও নির্দিষ্ট আর অলিখিত শাসনতন্ত্র অস্থায়ী ও অনির্দিষ্ট। অবশ্য লিখিত হইলেই যে শাসনতন্ত্র স্থায়ী হইবে এমন কথা বলা যায় না, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই দুইটি শাসনতন্ত্র বহুবার পুনর্লিখিত ও সংশোধিত হইয়াছে। আবার শাসনতন্ত্র অলিখিত হইলেও যে তাহা স্থায়ী ও নির্দিষ্ট হইবে না এমন কথাও বলা যায় না। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত বটে, কিন্তু ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র ক্রমবিবর্তনের ফলে, দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ ও আপস মীমাংসার মধ্য দিয়া তাহার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আবার দীর্ঘকালব্যাপী যে সুপরিচিত ও সুনির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহার প্রতি ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব ব্রিটেনের অলিখিত শাসনতন্ত্রকেও স্থায়ী ও নির্দিষ্ট বলা যাইতে পারে। ব্রিটেনের প্রথাগত রীতিনীতি সমাজদেহের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে। অতএব ব্রিটেনের এই প্রথাগত আইনগুলিকে অস্থায়ী বলা যায় না।

(২) আবার লিখিত শাসনতন্ত্রকে যে নির্দিষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাও যথার্থ নয়, কারণ শাসনতন্ত্র যে ভাষায় লিখিত হয় তাহার একাধিক ব্যাখ্যার ফলে লিখিত শাসনতন্ত্র আর নির্দিষ্ট থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত শাসনতন্ত্রকে বিচারপতিগণ কখনও কখনও এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, শাসনতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ আর নির্দিষ্ট থাকে না, বরং ব্রিটেনের সমাজদেহে বদ্ধমূল যে প্রথাগত আইনগুলি আছে তাহাদিগকেই নির্দিষ্ট বলা চলে।

(খ) **সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible and Rigid Constitution):** লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের বহুবিধ দোষত্রুটি থাকার জন্য লর্ড ব্রাইস শাসনতন্ত্রকে সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র হইল এমন শাসনতন্ত্র যাহাতে অতি সহজ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায়। আর দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র হইল এমন শাসনতন্ত্র যাহাকে সহজে কোন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায়

(১) সুপরিবর্তনীয় এবং (২) দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

সুপরিবর্তনীয় আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয়

আইনের পরিবর্তন কোন সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে হয় না। ইহার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হয় এক বিশেষ পদ্ধতি। এই শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে সংশোধনের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উদাহরণ হইল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র হইল দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সংশোধনের প্রণালী লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, উহার সংশোধন প্রণালী কতটা দুষ্পরিবর্তনীয়। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য নির্ণয় করিয়া ব্রাইস এই মন্তব্য করেন যে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রও পরিবর্তিত হয় কিনা তাহাই সুপরিবর্তনীয় আর দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য নির্ণয় করে ("The whole ground of difference here is whether the process of constitutional law making is or not identical with the process of ordinary law making".)।

আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাজ্যগুলির সংখ্যালঘুদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া উচিত। অধ্যাপক ল্যাস্কি অবশ্য মনে করেন যে, শাসনতন্ত্র একদিকে যেমন আমেরিকার মতো দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া উচিত নয়, তেমনি আবার ইংল্যাণ্ডের মতো সুপরিবর্তনীয়ও হওয়া উচিত নয়

লাওয়েলের মতে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য মূলগত নয়। এই পার্থক্য পরিমাণগত। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন প্রণালী নিয়মতান্ত্রিকভাবে অতিশয় জটিল। তাই এ পর্যন্ত মাত্র ২৩টি সংশোধন হইয়াছে। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধিত না হইলেও নিয়ম প্রথার ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা সংবিধানের সংশোধনকে সহজ করা হইয়াছে। 'Constitution is what the judges say'. ইহাই যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংজ্ঞা হয় তবে উহা যে কত সুপরিবর্তনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

আবার ইংল্যাণ্ডের সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে ইহা মোটেই সুপরিবর্তনীয় নয়, কারণ ইংল্যাণ্ডের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ আলোচনার প্রয়োজন; রক্ষণশীল ইংরেজ জাতির বদ্ধমূল ধারণাকে পাল্টানো এবং জনমত ও জনচেতনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নাই বলিলেই চলে।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Flexible and Regid Constitution) : সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে লর্ড ব্রাইস বলেন যে, সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সময়োপযোগী, প্রয়োজনানুসারে এবং সংকট কালে শাসনতন্ত্রের মৌলিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বাড়ানো বা কমানো যায় ("They can be streched or bent so as to meet emergencies without breaking their framework."—*Bryce*)।

বিপক্ষে আবার এই ধরনের যুক্তি দাঁড় করানো হয় যে, সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট নয় এবং ইহার পরিবর্তন অতি সহজসাধ্য বলিয়া সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া এবং রাষ্ট্রনেতাগণের খেয়ালখুশিমতো কারণে-অকারণে যখন-তখন ইহা পরিবর্তিত হইতে পারে। এই সহজসাধ্য পরিবর্তনের ফলে শাসনতন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে শাসনতন্ত্রের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। আবার মৌলিক আইন হিসাবে সাধারণ আইন হইতে এইরূপে শাসনতন্ত্রের পৃথক কোন মর্যাদা না থাকায় এবং জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা পার্লামেন্টের খামখেয়ালীর উপর নির্ভরশীল বলিয়া সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

সংশোধন সহজসাধ্য বলিয়া ইহা ক্ষণভঙ্গুর

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের দোষত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না। ইহা নির্দিষ্ট, স্থিতিশীল ও সুস্পষ্ট। পার্লামেন্টের খেয়ালখুশিমতো কারণে-অকারণে ইহার পরিবর্তন হয় না। এই কারণে ইহা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্তু এই ধরনের শাসনতন্ত্রও দোষমুক্ত নয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সহিত ইহা তাল রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। সমাজ-বিপ্লবের একটি কারণ ব্যাখ্যা করিয়া মেকলে (Mecaulay) বলিয়াছিলেন যে, বিপ্লবের একটি মস্তবড় কারণ হইল জাতি যখন অগ্রসর হয় সংবিধান তখন স্থিতিশীল থাকে ("The great cause of revolutions lies in this that while nations move onward, constitution stands still.")।

উপরোক্ত দোষত্রুটিগুলি দূরীভূত করিবার জন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া বলেন যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্রের মতো অতিশয় সুপরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্রও যেমন কাম্য নয়, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুষ্পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্রও অবাঞ্ছনীয়। শাসনতন্ত্র আইনসভার ২/৩ অংশ সদস্যের অনুমোদন-সাপেক্ষ হওয়া উচিত।

উপসংহারে বলা যায়, সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধনের নিয়মকানুনের সরলতা ও কাঠিন্যতার পরিমাণের উপরই নির্ভর করে এই দুইপ্রকারের শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ। আবার সর্বোপরি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কষ্টসাধ্য কি সহজসাধ্য, তাহা আইনগত সংশোধন পদ্ধতির উপরই নির্ভরশীল নয়; ইহা নির্ভর করে প্রভাবশালী শ্রেণীর উপর। কারণ আইন হইল শ্রেণীস্বার্থের বাহ্যিক প্রকাশ। প্রভাবশালী শ্রেণী তাহার স্বার্থের জন্যই আইনকে প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করিয়া লয়: পুরাতন আইনকে ধ্বংস করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করে।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of Constitutional Amendment): সমাজ গতিশীল। গতিশীল সমাজের সঙ্গে তালরক্ষা করিয়া চলিতে হইলে শাসনতন্ত্রকে প্রায়শঃই পরিবর্তন করিতে হয়। আবার শাসনতন্ত্রের প্রকারভেদের উপর শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের পদ্ধতি নির্ভর করে। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন পদ্ধতি জটিল নয়। সাধারণ আইনের মতো সাধারণ পদ্ধতিতে আইনসভাই ইহার পরিবর্তন করিতে পারে। ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয়। তাহার পরিবর্তন পদ্ধতি সরল।

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রও পরিবর্তন করা যায়। তবে তাহার পরিবর্তন

পদ্ধতি সরল নয়। আবার দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র এক প্রকার উপায়েই পরিবর্তিত হয় না।

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার উভয় কক্ষে সংশোধনী প্রস্তাবটিকে ⅔ অংশ সদস্যের ভোটাধিক্যে পাস করিতে হইবে অথবা বিভিন্ন রাজ্যগুলির ⅔ অংশের প্রস্তাবে শাসনতন্ত্র সংশোধনী একটি সম্মেলন আহূত হইবে এবং উক্ত সম্মেলনে আইনসম্মতভাবে সংশোধনী প্রস্তাবটি পাস করিতে হইবে এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলির ¾ অংশকে (অর্থাৎ বর্তমানের ৫০টি রাজ্যের আইনসভার মধ্যে ৩৮টি আইনসভাকে) সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে হইবে; অথবা ¾ অংশ রাজ্যে অনুষ্ঠিত সংশোধনী সম্মেলন হইতে সংশোধনী প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে দুইপ্রকারে শাসনতন্ত্রটি সংশোধিত হইবে। নিম্নে কতিপয় দেশের দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া গেল ঃ

ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রের সংশোধন প্রণালী ঃ ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রের সংশোধন প্রণালীকে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, (১) এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহাদিগকে কেন্দ্রীয় আইনসভার সাধারণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই সংশোধন করা যায়; (২) আবার কতকগুলি বিষয় সংশোধন করিতে হইলে উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন হয়; আর (৩) কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় সংশোধনের জন্য উভয়কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজনের সহিত কমপক্ষে অর্ধেক অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রকে এই সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা চলে না। কারণ এখানে কোন কোন বিষয় অতি সহজেই সংশোধিত হইতে পারে। ফলে ইহাকে সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় উভয় প্রকারের মিশ্র শাসনতন্ত্র বলা যাইতে পারে।

সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়ায় দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের জন্য সমগ্র দেশের ভোটদাতার সম্মতি থাকা প্রয়োজন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র আইনসভার উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সম্মতিতে পরিবর্তিত হয়।

সংবিধানের বৃদ্ধি (Development of Constitutions) ঃ বিভিন্ন প্রকারের সংবিধান পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন সংবিধানই চিরন্তন হইতে পারে না। গতিশীল জগতে কোন কিছুই চিরন্তন হইতে পারে না। উড্রো উইলসনের ভাষায় সংবিধানকে জীবন্ত হইতে হইলে পরিবর্তনশীল (ডারউইনিয়ন) হইতে হইবে। অলিখিত সংবিধান সমাজজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। আর লিখিত সংবিধান শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং প্রথা, আদালতের ব্যাখ্যা এবং আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন দেশের সংবিধানের বৃদ্ধির উদাহরণের সাহায্যে দেখানো যাইতেছে যে প্রায় প্রত্যেক দেশের সংবিধানই পরিবর্তিত হইতেছে।

সংবিধান চিরন্তন হইতে পারে না

(১) প্রথা ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ঃ বলা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অতিশয় দুষ্পরিবর্তনীয় ও লিখিত। কিন্তু অতিশয় দুষ্পরিবর্তনীয়

বলিয়াই অর্থাৎ সহজ পদ্ধতিতে ইহাকে পরিবর্তন করা যাইবে না বলিয়াই হয়ত কতকগুলি প্রথার ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্ভব ঘটাইয়া গতিশীল সমাজের সহিত শাসনব্যবস্থাকে ঠিক ভাবে চালানো হইতেছে। যেমন, রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটের উদ্ভব সম্বন্ধে সংবিধানে কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু ইহার সৃষ্টি হইয়াছে প্রথাগত রীতিনীতির মাধ্যমে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান আপনা হইতেই বাড়িয়া উঠে, ইহাকে সৃষ্টি করিতে হয় না।

(২) আদালতের ব্যাখ্যা: আদালত সংবিধানের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান আয়তনে ছোট। ইহার অনেক ধারা অস্পষ্ট। আদালতই ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইহাকে স্পষ্ট করিয়া দেয়। যেমন, সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থলবাহিনীর কর্তৃত্ব থাকিবে বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এই স্থলবাহিনীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনী। ফলে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার, নৌ স্থল ও বিমান বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে।

(৩) আনুষ্ঠানিক উপায়: সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্দিষ্ট উপায়ে সংবিধানের সংশোধন করিতে পারে। ভারতে বিগত ২৮ বৎসরে ৪০ বার সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য সংবিধানকে পরিবর্তন করিয়া লইতেই হয়। গতিশীল সমাজে অস্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা ক্ষণভঙ্গুর হইবেই। তাই বলা হয় সংবিধান সৃষ্টি হয় না, ইহা আপনা হইতেই জন্মায় (Constitutions grow and are not made).

সারসংক্ষেপ

শাসনতন্ত্রের ইতিহাস শুরু হইয়াছে গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতার যুগ হইতে। শাসনতন্ত্র হইল মৌলিক আইন। এই আইনের মধ্যে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো অঙ্কিত হয়। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হয় শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, সরকারী বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ইত্যাদি। শাসনতন্ত্র যেহেতু সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের নাগরিক ও সরকারের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক নির্ধারণ করে সেই হেতু ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

আদর্শ শাসনতন্ত্র লিখিত ও স্পষ্ট হইবে।

শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। যথা, (১) লিখিত ও অলিখিত, (২) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়। লিখিত আইন কোন নির্দিষ্ট সময়ে আইন প্রণেতৃমণ্ডলী কর্তৃক আইন হিসাবে ঘোষিত হয়। আর অলিখিত আইন হইল এমন আইন যাহা লিখিত হইতে পারিত কিন্তু লিখিত হয় নাই এবং কোন এক সময়ে বিধিবদ্ধ আইন-প্রণেতৃমণ্ডলী ইহাকে আইন হিসাবে ঘোষণা করেন নাই।

শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল স্থায়িত্ব, নির্দিষ্টতা ও গতিশীলতা। লিখিত আইন স্থায়ী, নির্দিষ্ট আর অলিখিত আইন স্থায়ী নয়, নির্দিষ্টও নয় তবে গতিশীল। কিন্তু লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করার বিরুদ্ধে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

আবার দ্বিতীয় বিভাগ হইল সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়। সুপরি-

বর্তনীয় আইন হইল এমন আইন যাহার পরিবর্তন ও সংশোধন সহজসাধ্য। আবার দুষ্পরিবর্তনীয় আইনের সংশোধন সহজসাধ্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের আইনকে বলা হয় দুষ্পরিবর্তনীয় আর বৃটেনের আইনকে বলা হয় সুপরিবর্তনীয়। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের সমালোচনায় বলা হয় যে, ইহা অস্থায়ী ও পার্লামেণ্টের খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল। আর দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে বলা হইয়াছে স্থায়ী ও নির্দিষ্ট।

শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে: (১) ইহা লিখিত হইবে, (২) ইহা কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে। (৩) শাসনতন্ত্রের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হইবে। (৪) শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ হইবে।

১৫ রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ

(Theory of Separation of Powers)

রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি (Principle of Separation of Powers) : রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সমাজের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করা। রাষ্ট্রের কার্যাবলীর পরিধিও বিরাট এবং ব্যাপক। এই বিরাট কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সাধন করিতে হইলে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করিতে হয়। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি হইল এইরূপ একটি নীতি (principle)। অ্যারিস্টটলের সময় হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ, এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রকে তিন প্রকারের ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হয় : প্রথম ক্ষমতা হইল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র সুস্পষ্ট আইনের মধ্য দিয়া জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্যের নির্দেশ দেয়। দ্বিতীয় ক্ষমতা হইল আইনকে কার্যকর করার ক্ষমতা। আর তৃতীয় ক্ষমতা হইল বিচারক্ষমতা। রাষ্ট্রকে এই ক্ষমতাবলে পক্ষপাতশূন্যভাবে বিচার-ব্যবস্থার দায়িত্ব লইতে হয়। এই তিন প্রকারের ক্ষমতার ব্যবহারের জন্য আধুনিক রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ আছে; যথা— ১) আইনবিভাগ (Legislature), (২) শাসনবিভাগ (Executive) ৩) বিচারবিভাগ (Judiciary)। এই তিন বিভাগে পৃথক পৃথক কার্য সম্পাদন করার নীতিকেই বলে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি। এই নীতি অনুসারে প্রত্যেকটি বিভাগকেই স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা হয়। আবার অন্যভাবে বলা যায়, ইহা হইল কোন বিভাগের পক্ষে নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া অন্যের কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতি।

রাষ্ট্রের তিনটি কার্যবিভাগ
(১) আইন প্রণয়ন
(২) আইন পরিচালনা
(৩) বিচার-ব্যবস্থা

ফরাসী দার্শনিক মঁতেসকিউয়ে (Montesquieu) ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'Spirit of Laws' নামক গ্রন্থে এই নীতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে গঠিত করেন। মঁতেসকিউয়ে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "যদি একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সরকারী আইন প্রণয়ন ও আইন পরিচালন ক্ষমতার অধিকারী হন তাহা হইলে নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, কারণ তাহা হইলে একই রাজা অথবা একই সেনেট স্বৈরাচারী আইন প্রণয়ন করিবে এবং তাহাকে স্বৈরাচারিতার মধ্য দিয়াই কার্যে পরিণত করিবে। আবার স্বাধীনতা আরও বিপন্ন হইবে যদি না বিচারবিভাগকে আইন প্রণয়ন ও আইন পরিচালন বিভাগ হইতে পৃথক করা হয়। যদি বিচারবিভাগ ও আইন প্রণয়ন বিভাগের ভার একজনের হস্তে অর্পিত হয় তবে বিচারকই আইন প্রণয়নকর্তা হইবে, ফলে নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। অর্থাৎ যদি বিচার ও আইন পরিচালনভার একহস্তে ন্যস্ত করা হয়, তবে বিচারকের অত্যাচার করার ক্ষমতা হস্তগত হইবে।"

মতবাদের সার কথা

মঁতেসকিউয়ের এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, (ক) রাষ্ট্রের তিনটি কার্যবিভাগ আছে ; যথা, (১) আইনবিভাগ, (২) শাসনবিভাগ, (৩) বিচার-বিভাগ। (খ) এই তিনটি বিভাগকে পৃথক রাখা বিশেষ প্রয়োজন। (গ) এক বিভাগীয় ক্ষমতাধিকারীকে অপর বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া চলিবে না। (ঘ) যদি এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হস্তে একাধিক বিভাগীয় ক্ষমতা থাকে তবে রাষ্ট্রে এক স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তিত হইবে। ফলে নাগরিক তাহার স্বাধীনতা হারাইবে।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির সহিত আর একটি মতবাদ বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই নীতিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের (Theory of checks and balances) নীতি। এই নীতির সারমর্ম হইল প্রত্যেক বিভাগ নিজের ক্ষমতা এমনভাবে ব্যবহার করিবে যাহাতে অপরাপর বিভাগগুলিও নিয়ন্ত্রিত হইয়া সরকারী ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায়, এই নীতি অনুসারে এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। কিন্তু ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির অর্থ এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে না। সুতরাং সূক্ষ্মবিচারে এই নীতি ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির বিরোধী।

আবার ক্ষমতা পৃথকীকরণ দ্বারা বুঝায় কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of personnel) অর্থাৎ এক ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত যুক্ত থাকিতে পারিবে না।

আরও বলা হয় যে, ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পৃথকীকরণ করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা। বিশ্বাস করা হয় যে, একমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণের মাধ্যমেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। এই নীতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এই নীতির ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। নিম্নে এই নীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইল।

মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এ্যারিস্টটল তাঁহার রাষ্ট্রনীতিতে (Politics) এই নীতি প্রচার করেন। অবশ্য, এ্যারিস্টটল আধুনিক কালের রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি প্রচার করেন নাই। তথাপি এ্যারিস্টটলকেই এই নীতির আদি প্রচারক বলা হয়। এ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন : (১) নীতি নির্ধারণ-মূলক (Deliberative), শাসনমূলক (Magisterial) ও বিচারমূলক (Judicial)। এ্যারিস্টটলের এই নীতি তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন শ্রমবিভাগ (Division of labour) নীতির ভিত্তিতে। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শাসন-ব্যবস্থার সুপরিচালনা প্রতিষ্ঠা করা। মঁতেসকিউয়ের মত তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি প্রচার করেন নাই। আবার তিনি কর্মবিভাগ করিলেও কর্মকর্তাদের বিভাগ করেন নাই। কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্র করার কোন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি একজনের হস্তেই সকল ক্ষমতা অর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি এই মতও পোষণ করিতেন যে, বৃহৎ রাষ্ট্রে যেহেতু একজনের পক্ষে সকল কর্ম করা সম্ভব নয় সেইহেতু ক্ষমতা পৃথকীকরণ করা উচিত।

এ্যারিস্টটলের পর ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি রোমান দার্শনিক পলিবিয়াস ও

সিসারোর হস্তে পরিস্ফুট হয়। পলিবিয়াস ও সিসারো নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি (Theory of checks and balances) প্রচার করেন। মধ্যযুগে এই নীতি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে বোঁড্যার হস্তে এই নীতি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। বোঁড্যা এ্যারিস্টটলের মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু তিনি এই মতবাদ প্রচার করিলেন যে, শাসনবিভাগ ও বিচার বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক না হইলে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে।

পলিবিয়াস, সিসারো ও বোঁড্যার হস্তে এই মতবাদ পরিস্ফুট হয়

বোঁড্যার পর হ্যারিংটন ও লক্ এই মতবাদের আলোচনা করেন। জন লক্ তিনটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উল্লেখ করেন, যথা (১) আইনের ক্ষমতা, (২) শাসনগত ক্ষমতা, (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষমতা। লকের মতে প্রথম ও তৃতীয় ক্ষমতা প্রায় একত্রিত হইয়াছে। এই দুইটি ক্ষমতাই শাসনকার্য পরিচালনা-বিষয়ক। তিনি এই দুইটি ক্ষমতার একত্রীকরণে বিশেষ আপত্তি করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি আইন-সভাকে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করিতে দিবার বিরোধী। কারণ ইহাতে ক্ষমতার অপ-ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা থাকে। লকই সর্বাগ্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা-ভিত্তিক ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির আলোচনা করেন। লকের পর ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির আলোচনা করেন মঁতেস্কিউয়ে। মঁতেসকিউয়ের মতবাদ পূর্বেই আলোচিত হওয়ায় এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মঁতেসকিউয়ের পর ইংল্যাণ্ডে ব্লাকস্টোন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির সমর্থন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ম্যাডিসন বলেন: "একই হস্তে সর্বক্ষমতার সমন্বয়কে স্বেচ্ছাচারিতার সংজ্ঞা বলিয়াই অভিহিত করা যাইতে পারে।" (The accumulation of all powers...in the same hands......may justly be pronounced the very definition of tyranny.")

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় এই নীতি বহু বিপ্লবী জনসাধারণ কর্তৃক স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্বে সংবিধানের ভিতর দিয়া ঘোষণা করা হয় যে, ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যক্তি স্বাধীনতার স্তম্ভস্বরূপ। আমেরিকার বিপ্লবীরাও এই নীতিকে সমর্থন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা ও ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের শাসন-তন্ত্রেও এই নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপে অবশ্য ফ্রান্স ব্যতীত অন্য কোন দেশে এই মতবাদের প্রভাব খুব কমই। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয় যে, ব্রিটেন, ইটালী প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতা হইতে যখন দেখা গেল যে, মঁতেসকিউয়ের নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিয়াও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব তখন এই নীতির মূল্য অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ, ব্রিটেনে মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে শাসন ও আইন-প্রণয়নক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। কারণ কমন্সসভায় (House of Commons) যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহারাই মন্ত্রিমণ্ডলী (Cabinet) গঠন করে। অতএব বলা যায় মন্ত্রিসভার পশ্চাতে কমন্সসভার সমর্থন আছে। আবার মন্ত্রিসভাও বর্তমানে কমন্সসভার উপর কর্তৃত্ব করে (Cabinet Dictatorship)। অতএব কার্যতঃ মন্ত্রিসভার হস্তে শাসনক্ষমতা একত্রীভূত হইয়াছে। অবশ্য, ইহার ফলে ব্রিটেনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় নাই।

বর্তমানে কল্যাণ-রাষ্ট্রে (Welfare State) এই মতবাদটি প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কারণ রাষ্ট্রের কল্যাণে শাসনবিভাগ অপরাপর দুইটি বিভাগের উপর কিছু কিং কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। অবশ্য, এই কর্তৃত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াও বলা চলে যে, এই মতবাদের যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

মতবাদের সমালোচনা ও মূল্যায়ন: (ক) ওতপ্রোত সম্পর্কের যুক্তি: গুডনাউ (F. G. Goodnow), জেংকস্ (Jenks) প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণের মতে মঁতেসকিউয়ে যে তিনটি বিভাগে রাষ্ট্রক্ষমতাকে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা যথার্থ নহে। কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, বিচারবিভাগ শাসন বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। শাসনবিভাগ যেমন আইনকে বলবৎ করে তেমনি বিচারবিভাগও আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে বিচার-মীমাংসার মাধ্যমে আইনকে প্রয়োগ করে। অতএব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে তিনভাগে ভাগ না করিয়া আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা বিধেয়। আবার এই দুইভাগে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে এই যুক্তি দাঁড় করানো হয় যে, বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নয়, কারণ শাসনতন্ত্র হইতে বিচারবিভাগ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন না হয় তবে ইহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিবে না। বিচার পক্ষপাতশূন্য, নৈর্ব্যক্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একজন শাসক যদি অন্যায়ভাবে জনসাধারণকে নিপীড়ন করিবার পর সে নিজেই বিচার-আসনে বসিয়া নিজের বিচার করে তবে সেই বিচার প্রহসনে পরিণত হইবে।

ক্ষমতাকে দুইভাগে বিভক্ত করার পক্ষে যুক্তি

(খ) শ্রেণীবিভাগে মতপার্থক্যের যুক্তি: উইলোবী (Willoughby) তাঁহার "The Gevernment of Modern State" গ্রন্থে সরকারের কার্যাবলীকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই পাঁচটি বিভাগ হইল: (১) আইন বিভাগ, (২) শাসনবিভাগ, (৩) বিচারবিভাগ, (৪) নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate) এবং (৫) শাসনবিভাগের সাধারণ কর্মচারিবৃন্দ (Administration)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই শ্রেণীর রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণ শাসনবিভাগের কর্মকর্তাগণকে শাসনবিভাগের সাধারণ কর্মচারীদের সহিত একই শ্রেণীভুক্ত করিতে চান না। মঁতেসকিউয়ে শাসনবিভাগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গ্ল্যাডেন এই মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, নির্বাচকমণ্ডলীকে আইনসভা হইতে পৃথক করিয়া চিন্তা করা যায় না। আরও বলা হয় যে, সরকারের কর্মচারিবৃন্দকে শাসনবিভাগের অংশ হিসাবে গণ্য করা উচিত।

(গ) সহযোগিতার যুক্তি: সহযোগিতাই বর্তমান যুগধর্ম। বর্তমানে শাসন-ব্যবস্থা জটিল হইয়া পড়ায়, কোন বিভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আইনসভার প্রধান কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা, কিন্তু আইনসভা যখন স্থগিত থাকে তখন দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী কালে জরুরী প্রয়োজনে শাসনকর্তৃপক্ষই সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া শাসনকার্য চালু রাখে। আবার অনেক সময় বিচারপতিগণ আইনের অস্পষ্টতার জন্য নিজেদের ন্যায়বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিচার-মীমাংসা করিয়া থাকেন এবং তাহার মধ্যে হইতেই নূতন আইনের সৃষ্টি হয়। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিচার করে আইনসভার উচ্চপরিষদ। আবার শাসনবিভাগও সময় সময় বিচারকার্য সম্পাদন করে। এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই বর্তমান রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অতএব ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বর্তমানে ক্ষমতা

পৃথকীকরণ নীতি একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংল্যান্ড প্রভৃতি মন্ত্রিমণ্ডলী-শাসিত রাষ্ট্রে এই নীতি গৃহীত হয় নাই।

নিম্নে মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনে গ্রেট ব্রিটেন, রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক শাসনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া এই নীতি প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

(১) গ্রেট ব্রিটেন: ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, আপাতদৃষ্টিতে গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুসৃত হয়, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইংল্যান্ডের রাজা শাসনকার্যের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ; কিন্তু, তিনি আবার আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইংল্যান্ডের রাজা বা রাণীর বিচারক্ষমতাও আছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে লর্ডসভার চ্যান্সেলরের পদমর্যাদা লক্ষ্য করিলে। তিনি লর্ডসভার সভাপতি। এই লর্ডসভা যদিও আইনসভার একটি অংশ, কিন্তু ইহার বিচারক্ষমতাও আছে। লর্ড চ্যান্সেলর আবার মন্ত্রিমণ্ডলীর একজন সদস্য এবং তিনিই বিচারালয়ের একজন বিচারপতি। অতএব তিনি একাধারে তিন বিভাগের সংযোগ সাধন করিতেছেন।

(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে পবিত্র নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে; এখানে আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক। এই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এখানে আইনসভা ও বিচারবিভাগ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ক্ষমতা পৃথকী-করণ নীতির ব্যবহার অত্যন্তই সামান্য। এখানে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিকে নিযুক্ত করেন। আবার বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশকেও বাতিল করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। আবার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিভিন্ন নিয়োগ এবং বৈদেশিকদের সহিত সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি আইনসভার উচ্চ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ। অতএব এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করার সম্পূর্ণ সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র দিয়াছে। ফলে বাস্তবে ক্ষমতাপৃথকীকরণ নীতি এখানে প্রবর্তিত হয় নাই। আবার বিশ্বাস করা হয় যে, সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা পৃথক করাও সম্ভব নয়; কারণ, ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিলে সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের সময় এবং রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের সময় শাসনবিভাগের সহিত আইন বিভাগের দ্বন্দ্ব এই কথাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পৃথকীকরণের নীতি সংঘর্ষ ও বিভেদের সৃষ্টি করে। অতএব যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে অভ্রান্ত বলা চলে না।

(৩) ভারতবর্ষ: ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি একদিকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, আবার তিনি জরুরী প্রয়োজনে অর্ডিনান্স বলিয়া খ্যাত বিশেষ আইন প্রয়োগ করেন, বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, এবং প্রাণদণ্ড মকুব প্রভৃতি বিচারবিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন। আবার প্রয়োজনবোধে তিনি পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিতেও পারেন এবং রাজ্য বিধানসভা ও মন্ত্রিমণ্ডলীকে ভাঙ্গিয়া দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা চালু করিতে পারেন। ইংল্যান্ডের

মতো ভারতবর্ষের মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যদের আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। ফলে আইনসভা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। ভারতের জিলা শাসনব্যবস্থা লক্ষ্য করিলে আরও স্পষ্ট হইবে যে, এই নীতি বাস্তবে এখানে ব্যবহৃত হয় নাই। জিলা-শাসক একাধারে ফৌজদারী মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিচারপতির কাজ করেন, আবার তিনিই জিলার সর্বময় শাসনকর্তা।

ভারতবর্ষেও এই নীতি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় না

ভারতবর্ষে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি বিশেষভাবে প্রযুক্ত না হইলেও শাসনতন্ত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। বিচারপতিগণ যাহাতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন তাহার জন্য বিচারপতিগণের বেতন, নিয়োগ ও পদচ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বিচারপতিগণের বেতন ও অন্যান্য ভাতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা আইনসভার বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ নয়। এইভাবে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগের প্রভাবমুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

(৪) **সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র:** সাম্যবাদীরা ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার কৌশল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। লেনিন এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের সকল অবস্থায়ই অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী দল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বিত্তহীনদের নানাভাবে শোষণ করে এবং পুঁজিপতিদল রাষ্ট্রের প্রকৃত ধনতান্ত্রিক রূপকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ মতবাদ প্রচার করে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি হইল এইজাতীয় একটি মতবাদ। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করাই রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে প্রয়োজনবোধে বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিত্তহীনদের উপর শোষণ অব্যাহত রাখে। এই মুষ্টিমেয় লোকদিগকে বলা হয় প্রভাবশালী ব্যক্তি-সংস্থা (Pressure Group)। আইন পরিষদ ইহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করে। বিচারপতি ইহাদের স্বার্থরক্ষা করিয়া বিচার করেন। ইহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখে শাসনবিভাগ। অতএব সব কিছুই বিঘূর্ণিত হয় এই প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অঙ্গুলি সংকেতে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতির প্রয়োগ

(ঘ) **জৈব মতবাদের যুক্তি:** এই মতবাদের যুক্তি অনুসারে বলা যায় যে, জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া কাজ করিতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগগুলিও সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না। কর্মবিভাগের পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহা হইলে শাসনকার্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে।

(ঙ) **ব্যক্তি স্বাধীনতার যুক্তি:** বলা হয় যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষমতা পৃথকীকরণ ব্যবস্থার দ্বারা রক্ষিত হয় না। ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইল ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য আবেগ ও আগ্রহ। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ উপস্থাপিত করিয়া বলা হয় যে, বৃটেনের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতাপৃথকীকরণ নীতি কম অনুসৃত হয়।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতি অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসৃত হয়। কিন্তু বৃটেনের নাগরিকগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ অপেক্ষা কম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে না। সুতরাং বলা চলে যে, এই নীতির মৌলিক উদ্দেশ্যও যথার্থ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

(চ) **একটি বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার যুক্তি ঃ** ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুসারে সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট হইতে পারে না। আবার যদি সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট হয়ও তাহা শাসন-ব্যবস্থার নীতির দিক হইতে সঠিক হইবে না। শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ আইন-বিভাগের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের শাসক-ব্যবস্থায় একটি বিভাগকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে। অন্যথায় শাসন বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

(ছ) **অসাফল্যের যুক্তি ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজীর দেখাইয়া বলা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার-বিভাগকে আইন-বিভাগ ও শাসন-বিভাগ হইতে প্রভাবমুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি রাজ্যের বিচারপতিগণকে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত করা হয়। ফলে বিচারকগণ যোগ্যতা অপেক্ষা জনপ্রিয়তার দিকেই বেশী নজর দেন। ভোট পাইবার আশায় বিচারকগণ নির্ভীক হইতে পারেন না।

উপসংহার ঃ উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সাম্যবাদী, নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতো প্রহসনবাদকে শাসনতন্ত্রে স্থান দেওয়া হয় নাই। সোভিয়েত ইউনিয়নে মাত্র একটি দল ক্ষমতার অধিকারী। এই দলের সভাপতিমণ্ডলীই সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। অতএব সমাজতন্ত্রী দেশে এই নীতি প্রয়োগের কোন প্রশ্নই উঠে না এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই সমাজ-তন্ত্রী দেশের শাসনতন্ত্রে এই নীতির কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যপরিধি প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় ও সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের (ক) এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য সম্পাদন না করিয়া পারে না ; (খ) আবার সরকারের একটি বিভাগের কার্য অপর বিভাগ সম্পাদন করে বলিয়া একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক বিভাগের কার্যে জড়িত হইতে হয় এবং (গ) এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অতএব ক্ষমতা-পৃথকীকরণ পূর্বে যে উপরোক্ত তিনটি অর্থে প্রযুক্ত হইত বর্তমানে তাহা সম্ভব নয়। অবশ্য, ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির প্রচলন বর্তমানে অচল হইলেও ব্যবস্থা বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সকল দেশেই বর্তমানে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থা বিভাগ অপরাপর বিভাগকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাই পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

ক্ষমতা-পৃথককীরণ নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা (Modern Interpretation of the Theory) ঃ রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাখ্যা যেমন পরিবর্তিত হইয়া নূতন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ রাষ্ট্রের ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বর্তমানে রাষ্ট্রের জনহিতকর কার্যাবলীর উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোন কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা মূলতঃ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কল্যাণরাষ্ট্রের ক্ষমতা সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কল্যাণরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ করিবার

প্রয়োজন খুবই কম। সুতরাং বর্তমানে সহযোগিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র কার্য সম্পাদানের নীতি, ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নয়।

কিন্তু বর্তমানে শাসনকর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সর্বদেশেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসন-বিভাগকে বিচার-বিভাগের নির্দেশ ও আইনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে যথেচ্ছচারিতা প্রশ্রয় পাইবে।

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতিঃ এই নীতি বলিতে বুঝায় সরকারের তিনটি বিভাগের কার্য স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইবে। এই তিনটি বিভাগ হইলঃ (১) ব্যবস্থাপক-বিভাগ, (২) শাসন-বিভাগ, (৩) বিচার-বিভাগ।

ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির সহিত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি বিশেষভাবে জড়িত। এই নীতি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না, (২) একই ব্যক্তি একটির বেশী বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবে না, (৩) এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না।

মতবাদের ইতিহাসঃ এই নীতি এ্যারিস্টটলের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে মঁতেসকিউয়ের হস্তে এই মতবাদ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়।

সমালোচনাঃ এই নীতি তাত্ত্বিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহা অনেক গুণের অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সরকারের এক বিভাগ অপর বিভাগের কার্য করিয়া থাকে।

১৬ | সরকারের বিভিন্ন বিভাগ
(Different Organs of Government)

এ্যারিস্টট্‌লের সময় হইতেই রাষ্ট্রক্ষমতা তিনটি বিভাগে বিস্তৃতভাবে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রথম ভাগে পড়ে আইন-বিভাগ, দ্বিতীয় ভাগে শাসন-বিভাগ, আর তৃতীয় ভাগে বিচার-বিভাগ। অবশ্য, এই বিভাগগুলির মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই।* এই তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন-বিভাগের কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা। শাসন-বিভাগের কাজ হইল আইনকে বলবৎ করা। আর আইনভঙ্গকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করে বিচার-বিভাগ। নিম্নে আলোচ্য বিভাগসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল:

আইন-বিভাগ
(The Legislature)

বলা হয় যে, গণতন্ত্রে আইন-বিভাগের গুরুত্ব ও মর্যাদা অধিক। রাজতন্ত্রে, একনায়কতন্ত্রে বা আমলাতন্ত্রে শাসন-বিভাগের স্থান আইন-বিভাগের ঊর্ধ্বে নির্দিষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে ভারতের ব্যবস্থাপক সভা শাসন-বিভাগের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিত। রাজতন্ত্রে রাজার আদেশই আইন। অতএব শাসক হিসাবে রাজা আইনের ঊর্ধ্বে। আবার একনায়কতন্ত্রে ব্যবস্থা-বিভাগ সম্বন্ধে মুসোলিনী যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা হইতেই ব্যবস্থা-বিভাগের মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন "পার্লামেণ্ট একটি ক্রীড়নক মাত্র" ("Parliament is a plaything.")।

কার্যাবলী (Functions): উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ব্যবস্থা-বিভাগের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সকল দেশে এক প্রকারের না হওয়ায় এই বিভাগের কার্যাবলীও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকৃতির। নিম্নে এই বিভাগের মূল কতকগুলি কার্যাবলী দেওয়া গেল। এই কার্যাবলী প্রায় সকল দেশেই মোটামুটিভাবে অনুসৃত হয়।

(১) আইন-বিভাগ আইন প্রণয়ন করে এবং গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য প্রথাগত আইনের সংশোধন করে অথবা বিলোপ সাধন করে।

(২) সমগ্র দেশের চিন্তা ও মতামতকে আইনে প্রতিফলিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন-সম্বন্ধীয় আলোচনা চালানোও আইনসভার একটি কার্য। মিল্‌-এর মতে

* "Since the time of Aristotle, it has been generally agreed that political power is divisible into three broad categories. There is, first, the legislative power. There is secondly, the executive power. There is thirdly, the judical power. It may be admitted that these categories are of art and not of nature."—*Laski*.

প্রকৃত পক্ষে আইন প্রণয়ন করে কতিপয় সুদক্ষ লোক। কিন্তু আলোচনার মূলকার্য ন্যস্ত থাকিবে সমগ্র সভার উপর।

(৩) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সম্মতি ব্যতীত জাতীয় অর্থ ব্যয় করা হয় না। ব্যবস্থা-বিভাগ জাতীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও করধার্য প্রভৃতি করিয়া থাকে। ব্যবস্থাপক সভা জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণও করিয়া থাকে।

(৪) ব্যবস্থা-বিভাগ আবার শাসনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদনও করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ব্যবস্থাপক সভার উর্ধ্বতন পরিষদ সেনেটের (Senate) হস্তে শাসনসংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে। সেনেট সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করে বা নিয়োগের অনুমোদন করে। রাষ্ট্রপতির কোন সন্ধি-সম্পাদন সেনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। অতএব দেখা যায় শুধু রাষ্ট্রপতি-শাসিত রাষ্ট্রেও ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় না।

(৫) ব্যবস্থাপক সভা বিচারসংক্রান্ত কার্যও করিয়া থাকে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ রাষ্ট্রপতির বিচার এবং ইম্‌পিচমেণ্ট প্রভৃতি করিয়া থাকে।

(৬) ব্যবস্থাপক সভা সংবিধানের ব্যাখ্যা, ইহার সংশোধন প্রভৃতি কার্যও করিয়া থাকে।

আইনসভার সংগঠন (Organisation of the Legislature): ব্যবস্থাপক সভার গঠনকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) যে সকল দেশের ব্যবস্থাপক সভা দুইটি অংশে বিভক্ত অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা নিম্নপরিষদ (Lower House or Popular Assembly) এবং উচ্চপরিষদে (Upper House or Second Chamber) বিভক্ত সেই সকল দেশের ব্যবস্থাপক সভাকে দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা (Bi-cameralism) বলা হয়; আর যে সকল দেশের ব্যবস্থাপক সভার একটিমাত্র পরিষদ থাকে তাহাকে একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা (Unicameralism) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্নপরিষদ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত হয়। ইহা গণতন্ত্রের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর উচ্চপরিষদের নির্বাচনের পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের। ইংল্যাণ্ডে অভিজাতদিগকে লইয়া গঠিত হয় উচ্চপরিষদ (House of Lords), কানাডায় মনোনীত ধনী ব্যক্তিদের লইয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া উচ্চপরিষদ গঠিত হয়। আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যায় যে, ইংল্যাণ্ডে উত্তরাধিকারসূত্র (Heredity Principle), কানাডায় মনোনয়ন নীতি (Nomination Principle), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ফরাসী দেশে নির্বাচনের নীতি (Election Principle) অনুসারে উচ্চপরিষদ গঠিত হয়। অবশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট অর্থাৎ উচ্চকক্ষ ভোটদাতাগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হয় আর ভারতে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাজ্য আইনসভাগুলি উচ্চপরিষদের সদস্য নির্বাচন করে অর্থাৎ পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতিতে প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন। অবশ্য, ভারতে কতিপয় সদস্য মনোনীতও হন।

একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা (Unicameral Legislature) : সরকারের আইন-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাপক সভা যদি এককক্ষ বিশিষ্ট হয় তবে তাহাকে বলা হয় একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা (Unicameral Legislature)। এক-পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। অবশ্য শাসনতন্ত্র প্রদত্ত অধিকার বলে কতিপয় সদস্যকে সরকার মনোনয়ন করিতেও পারেন। একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার ক্ষেত্রে মনোনয়ন পদ্ধতি প্রায় অচল। নিম্নে একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল :

সপক্ষে যুক্তি : (১) একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভায় ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা বেশী, তাহাদের ভাতা খরচ বেশী। এক-পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা কম, তাহাদের ভাতা খরচও কম।

(২) একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাস ত্বরান্বিত হয়। কারণ এক কক্ষেই বিলটি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে আলোচনা হইয়া যায়। একপরিষদ অযথা বিলম্ব না করিয়া আইনটি পাস করিয়া লইতে পারে। জরুরী অবস্থায় আইন পাসের ক্ষেত্রে একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা বিশেষ সুবিধাজনক।

(৩) একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা দায়িত্বস্খলন করিতে পারে না। দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভায় দায়িত্বস্খলন করা সহজ। কারণ এক কক্ষ অপর কক্ষের উপর দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে পারে।

(৪) একপরিষদের সভ্যগণ সাধারণতঃ ভোটদাতাগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সুতরাং ধনিক শ্রেণী বা উত্তরাধিকার সূত্রে অভিজাত শ্রেণীর আইনসভায় প্রবেশের পথ সুগম হয় না।

(৫) অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রমুখের মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা ভালভাবে কাজ চালাইতে পারে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত থাকে এবং সাধারণতঃ দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। তাই পরিষদকে বড় একটা আইন পাস করিতে হয় না; এবং বিলের উপর অযথা বিতর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিতে হয় না।

একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার বিপক্ষে যুক্তি : (১) লেকি তাঁহার Democracy and Liberty নামক গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করেন যে, একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এক কক্ষে যে আইন পাস করা হইবে তাহাই চূড়ান্ত।

(২) একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভায় সুচিন্তিতভাবে আইন প্রণয়ন করা কষ্টকর। কারণ একটি পরিষদ যদি শুধু আইন প্রণয়ন করে তাহা হইলে মুহূর্তের আবেগে এমন আইন হয়ত প্রণীত হইতে পারে যাহা অবিবেচনাপ্রসূত হইতে পারে।

(৩) একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা কষ্টকর। কারণ নির্বাচনে তাঁহারা জয়লাভ নাও করিতে পারেন। প্রায়শই দেখা যায় নির্বাচন কৌশলে পারদর্শী অজ্ঞ লোক বিজ্ঞ লোককে নির্বাচনে পরাজিত করে।

(৪) লর্ড ব্রাইস্ বলেন যে, এক্পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভায় নাগরিকগণ এক-পরিষদের স্বেচ্ছাচার হইতে রক্ষা পায় না।

(৫) আরও বলা হয় যে, বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটি পরিষদের পক্ষে সমস্ত বিষয়কে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

(৬) আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একপরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভা দুইটি স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি স্বার্থ থাকে জাতীয় আর একটি স্বার্থ থাকে আঞ্চলিক। এই দুইটি স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব একটি পরিষদে থাকা কষ্টকর।

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থাপক সভা (Bi-Cameral Legislature) : ফরাসী-বিপ্লবই আইন পরিষদগুলিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত হইবার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে এক হইতে চার পরিষদসম্পন্ন আইনসভার সন্ধান পাওয়া যায় ইংল্যান্ডে অনেক পূর্বেই দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু ক্রমওয়েলের শাসনকালে লর্ডসভার উচ্ছেদ করা হয়। অবশ্য, কিছুদিন পরেই আবার দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভা ইংল্যান্ডে চালু হয়। ফরাসী-বিপ্লবের পর ফরাসী দেশে ও আমেরিকার বিপ্লবের পর আমেরিকায় একপরিষদবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই এই দুই দেশে দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্তন করা হয়।

বর্তমানে আবার একপরিষদ-ব্যবস্থার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হন্ডুরাস, পানামা, সালভেডর এবং সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টনগুলি একপরিষদ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।

সমালোচনা : (ক) সপক্ষে যুক্তি : (১) দুই-পরিষদের দ্বারা যে আইন প্রণীত হইবে তাহা স্বভাবতঃই সুচিন্তিত হইবে। কিন্তু এক-পরিষদের দ্বারা আইন প্রণয়ন করিলে তাহা অবিবেচনাপ্রসূতও হইতে পারে। একপরিষদের দ্বারা প্রণীত আইন আকস্মিক উত্তেজনাপ্রসূতও হইতে পারে। কারণ এক-পরিষদ আইন প্রণয়ন করিলে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন করার জন্য অপর কোন পরিষদ থাকে না। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এরূপ ঘটে না।

(২) দুইটি পরিষদের ব্যবস্থায় সাধারণের ইচ্ছা প্রকাশিত হইতে পারে। কারণ দুইটি পরিষদ বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হইয়া প্রবহমান জনমতের সুষ্ঠুভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। এক-পরিষদের ব্যবস্থায় একই সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রবহমান জনমতের সহিত ইহা সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে।

(৩) লর্ড ব্রাইস্‌কে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, আইনসভা যদি এক-পরিষদ বিশিষ্ট হয় তবে ইহার স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা থাকে ("The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly to become hateful, tyrannical and corrupt needs to be checked by the co-existence of the house of equal authority.") আর আইন পরিষদকে যদি দুইটি সমান ক্ষমতার অধিকারী পরিষদে বিভক্ত করা হয় তবে ইহা স্বৈরাচারী হইতে পারে না। অবশ্য, রুশিয়াকে বাদ দিলে প্রায়

অধিকাংশ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট পরিষদের ব্যবস্থাধীনে রাষ্ট্রের দুইটি পরিষদই সমক্ষমতা-সম্পন্ন নয়।

(৪) দ্বি-পরিষদ-ব্যবস্থা শাসনবিভাগকেও এক-পরিষদীয় আইনসভার স্বৈরাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করে। এক-পরিষদের খামখেয়ালের বিরুদ্ধে শাসন-বিভাগ দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে তাহার মাধ্যমে আবেদন করিতে পারে।

(৫) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যায়। অনেক সময় দেখা যায় এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে চান না, অথচ তাঁহাদিগকে আইনভার সদস্য হিসাবে পাওয়া গেলে জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হইত, এমন অবস্থায় যদি দ্বি-পরিষদের ব্যবস্থা থাকে তবে এই শ্রেণীর লোকদিগকে দ্বিতীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত করিয়া লইতে পারা যায়। আবার সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও দ্বি-পরিষদ-ব্যবস্থায় করা যায়। কিন্তু এক-পরিষদ-ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়।

(৬) বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কার্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক-পরিষদীয় ব্যবস্থায় সকল বিষয় খুঁটিনাটিভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করা সম্ভব নয়। এইদিক হইতে দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা সুবিধাজনক। আবার দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় অল্প বিতর্কমূলক বিলগুলিকে প্রথম পরিষদের পরিবর্তে দ্বিতীয় পরিষদে উত্থাপিত করার সুবিধা আছে।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুইটি স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। একটি হইল জাতীয় (National), আর একটি হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থ। দুইটি স্বার্থকে পূরণ করিবার জন্য প্রয়োজন দুইটি কক্ষের। একটি কক্ষে থাকিবে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ, আর অপর কক্ষে থাকিবে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্যগণ। প্রথমটি হইল উচ্চ পরিষদ আর দ্বিতীয়টি হইল নিম্নপরিষদ। এক-পরিষদ-ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় না।

দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থাপক সভার বিরুদ্ধে যুক্তি : (১) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় ব্যয়-বাহুল্য বৃদ্ধি পায়।

(২) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ শাসনতন্ত্র দ্বারা সংরক্ষিত হইলে উক্ত স্বার্থের জন্য দ্বি-পরিষদের প্রয়োজন হয় না।

(৩) ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, অভিজাত বিত্তবানদের আইনসভায় আসন পাইবার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করিবার জন্যই দ্বি-পরিষদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মিল্ যে গুণবান ব্যক্তিদের স্থান নির্দিষ্ট করিবার জন্য দ্বি-পরিষদের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে।

(৪) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় একে অপরের উপর দোষ চাপাইয়া দায়িত্ব স্খালন করে। আবার দুই কক্ষের দ্বন্দ্বের ফলে আইন প্রণয়ন-বিভাগ আইন প্রণয়নে অক্ষম হইয়া পড়ে।

(৫) ল্যাস্কির মতে দ্বিতীয় কক্ষ থাকিলে দ্রুত চলমান জগতে আইন প্রণয়ন বিলম্বিত হয়। সাম্প্রতিক কালে দেখা যায় উচ্চকক্ষের ক্ষমতা অনেক দেশে হ্রাস করা হইয়াছে। ১৯১১ সালের ও ১৯৪৯ সালের আইনে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের উচ্চপরিষদ অর্থাৎ লর্ডসভার অনেক ক্ষমতা বিলোপ করা হয়।

(৬) ল্যাস্কি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায়ও দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা অনাবশ্যক। তাঁহার মতে, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থসংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

(৭) পরিশেষে আবে সিয়েসের (Abbe Siyes) উক্তিটি উল্লেখ করা গেল। তিনি বলিয়াছিলেন: "দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষের বিরোধিতা করে তবে উহা ক্ষতিকর আর যদি অনুসরণ করে তবে উহা অনাবশ্যক" ("If a second chamber dissents from the first, it is mischievous; if it agrees with it, itis superfluous.")। কারণ নিম্নকক্ষেই জনসাধারণের সার্বভৌম ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয় কক্ষ শুধু জনমতের প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে।

উপসংহারে বলা যায়, তাত্ত্বিক বিচারে দ্বি-পরিষদের ত্রুটি নির্দিষ্ট হইলেও বাস্তবে দেখা যায় দ্বিতীয় কক্ষ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী।

এক-পরিষদ বনাম দ্বি-পরিষদ

(১) যে দেশের আইনসভা মাত্র একটি কক্ষযুক্ত তাহাকে এক-পরিষদীয় আইনসভা বলা হয়।

(২) এক-পরিষদীয় ব্যবস্থায় ব্যয় কম হয়।

(৩) এক-পরিষদে আইন পাস ত্বরান্বিত হয়।

(৪) এক-পরিষদীয় ব্যবস্থায় দায়িত্ব স্খালনের উপায় নাই। কারণ এক-পরিষদই আইন পাসের জন্য সরাসরি দায়ী।

(৫) এক-পরিষদীয় ব্যবস্থা যদি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয় তাহা হইলে বিত্তবানগণ আর আইন-সভায় স্থান পাইবে না।

(৬) দলভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে নির্বাচনের ভিত্তিতে আইনসভায় প্রবেশ করা সহজ হয়। অর্থাৎ এক-পরিষদীয় ব্যবস্থায় দলীয় রাজনীতিরই প্রাধান্য বেশী। এক-পরিষদীয় ব্যবস্থায় দলবহির্ভূত গুণী লোকের আইনসভায় প্রবেশ বন্ধ হয়।

(১) যে দেশের আইনসভা দুইটি কক্ষযুক্ত তাহাকে দ্বি-পরিষদীয় আইন সভা বলা হয়।

(২) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় ব্যয় বেশী হয়।

(৩) দ্বি-পরিষদে আইন পাস বিলম্বিত হয়।

(৪) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় দায়িত্ব স্খালনের উপায় আছে। এই ব্যবস্থায় এক কক্ষ অপর কক্ষের উপর দোষ চাপাইয়া দায়িত্ব স্খালন করিতে পারে। এবং দুই কক্ষের মধ্যে বিবাদের ফলে আইন প্রণয়ন বিলম্বিত হয়।

(৫) বলা হয় বিত্তবানদিগের আইন সভায় আসন সুরক্ষিত করিবার জন্যই দ্বি-পরিষদ গঠন করা হয়।

(৬) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় নির্দলীয় গুণী লোকেরাও মনোনয়নের মাধ্যমে উচ্চকক্ষে আসনলাভ করিয়া আইন প্রণয়নে তাঁহাদের পারদর্শিতা ব্যক্ত করিতে পারেন।

এক-পরিষদ বনাম দ্বি-পরিষদ

এক-পরিষদ	দ্বি-পরিষদ
(৭) এক-পরিষদীয় ব্যবস্থায় একটি কক্ষই আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ফলে এই সভা স্বেচ্ছাচারী হইলে তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও থাকে না।	(৭) দ্বিতীয় পরিষদ নাগরিকগণকে স্বেচ্ছাচারের হাত হইতে রক্ষা করে।
(৮) এক-পরিষদীয় সভার বিলের উপর আলোচনায় জনসাধারণের রাষ্ট্র-নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় না এবং বিলে ভুল থাকিলে তাহা ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম।	(৮) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় বিলটি দুই কক্ষে আলোচনা হয় বলিয়া ভুল থাকিলে তাহা ধরা পড়ে এবং জন-সাধারণেরও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়।
(৯) বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং একটি পরিষদের পক্ষে সমস্ত বিষয়ে সুষ্ঠুভাবেসকল জটিল আইন আলোচনা করা সম্ভব নয়।	(৯) দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের বিলগুলিকে দুই কক্ষে উত্থাপন করিয়া বিল পাস ত্বরান্বিত করা যায় না।
(১০) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি পরিষদে জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া বলা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়ায় এক-পরিষদের পক্ষে খুব একটা অসুবিধাজনক হয় না।	(১০) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থ দুইটি পরিষদের দ্বারা রক্ষিত হয়; দুইটি পরিষদে দুই স্বার্থের প্রতিনিধি নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করিতে পারে।

সার্বভৌম ও অসার্বভৌম আইনসভা (Sovereign and Non-Sovereign Law-making body) : আইনসভার কার্যাবলী ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিয়া ডাইসি আইনসভাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার একটি হইল সার্বভৌম আইনসভা (Sovereign Law-making body), আর অপরটি হইল অসার্বভৌম আইনসভ (Non-Sovereign Law-making body)। সার্বভৌম আইন-সভা বলিতে বুঝায় এমন আইনসভা যাহা সকল প্রকার আইন প্রণয়ন করিবার ও আইন সংশোধন করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা-ধিকারী। এই আইনসভার ক্ষমতা চরম ও চূড়ান্ত। প্রত্যেককেই ইহার নির্দেশ মান্য করিতে হয়। কোনরূপ বাধা-নিষেধ দ্বারাই ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে এইরূপ আইনসভা লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ইহার উদাহরণ। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট যে আইন প্রণয়ন করে কোন আদালতই তাহাকে বাতিল করিতে পারে না।

সার্বভৌম আইন-সভার সংজ্ঞা

অসার্বভৌম আইনসভা হইল এমন আইনসভা যাহার ক্ষমতা চূড়ান্ত নয়, যাহার ক্ষমতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। ইহার আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাগুলি এই ধরনের অসার্বভৌম আইনসভা। সার্বভৌম আইনসভার আইনকে আদালত স্বীকার করিতে বাধ্য, কিন্তু অসার্বভৌম আইনসভার আইনকে আদালত স্বীকার করিতে বাধ্য নয়।

ডাইসি বলেন যে, যে আইনসভা আইনসভার গঠনতন্ত্র সম্পর্কীয় আইনের পরিবর্তন করিতে পারে না এবং যাহা সে নিজেই মান্য করিতে বাধ্য, তাহাকে অসার্বভৌম আইনসভা বলা যাইতে পারে ("the existence of law effecting its constitution which such body must obey and cannot change.")। ডাইসি আরও বলেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ আইনের সঙ্গে মৌলিক আইনের পার্থক্য আছে। অসার্বভৌম আইনসভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। আবার আদালত অসার্বভৌম আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্বন্ধে রায় দিবার অধিকারী। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে ধরা যাইতে পারে। মার্কিন সুপ্রীমকোর্ট কংগ্রেস প্রণীত আইনকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

অসার্বভৌম আইনসভার সংজ্ঞা

ডাইসি ইংল্যাণ্ডের আইনসভাকে সার্বভৌম আইনসভা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডে সাধারণ আইন ও মৌলিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনকে আদালত বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না। সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতেই পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে ও উহার সংশোধন করিয়া লইতে পারে।

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট সার্বভৌম আইনসভা

ডাইসি আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কোম্পানী এবং ঔপনিবেশিক আইনসভাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে অসার্বভৌম আইনসভার পদবাচ্য করিয়াছেন। এই সকল আইনসভাকে অসার্বভৌম আইনসভা বলিবার কারণ, ইহারা শাসনতন্ত্রের নীচে। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসই সার্বভৌম নয়, কারণ আদালত কংগ্রেস প্রণীত আইনকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

জেনিংস সার্বভৌম ও অসার্বভৌম আইনসভার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। তিনি বলেন যে, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়। কারণ রাজনৈতিক পরিবেশ ও শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির দ্বারা তাহার ক্ষমতা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ক্ষমতা সীমিত হইলেও ইহা ক্ষমতাহীন নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাগুলি এবং উপনিবেশের আইনসভাগুলি সার্বভৌম আইনসভা না হইতে পারে, কিন্তু ইহাদিগকে সীমার মধ্যে সার্বভৌম আইনসভা বলা যাইতে পারে। কারণ ইহারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে আইন প্রণয়ন করে তাহা সার্বভৌম। উপনিবেশের আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সাম্রাজ্যের আইনসভার দ্বারা নির্দিষ্ট। কিন্তু জেনিংস বলেন যে, উপনিবেশের আইনসভাগুলি আইনই প্রণয়ন করে। ইহাদের রেলওয়ে কোম্পানীর আইন প্রণয়নের সহিত তুলনা করিলে আইনের মূল নীতিকে অস্বীকার করিতে হয়। রেলওয়ে কোম্পানী যে আইন প্রণয়ন করে তাহাকে উপআইন (By law) বলা যাইতে পারে। উপআইন আইন নহে ; ইহা হইল অর্পিত ক্ষমতা বলে (Delegated power) কোম্পানীর বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা প্রণীত কোম্পানীর খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধীয় আইন। রেলওয়ে কোম্পানীকে পার্লামেণ্ট যে ক্ষমতা অর্পণ করে তাহার বলেই কোম্পানী এই আইন প্রণয়ন করে। রেলওয়ে কোম্পানী এই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আর কাহাকেও অর্পণ করিতে পারে না। কারণ আইনের মূল নীতিই হইল অর্পিত ক্ষমতা পুনরায় অর্পণ করা যায় না (*delegatus non protest delegare*)। কিন্তু

ডাইসি ও জেনিংসের মত

উপনিবেশের আইনসভাগুলি যে ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা অর্পিত নহে। তাই জেনিংস উপনিবেশের আইনসভাগুলিকে সীমার মধ্যে সার্বভৌম (Sovereign within powers) আইনসভা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণীত হইলে সার্বভৌম আইনসভা তাহা বাতিল করিতে পারে কিন্তু উপনিবেশের আইনসভা প্রণীত আইন বাতিল হইতে পারে না।

অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন ও আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস

(Decline of Legislature and Delegated Legislation)

আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস : বলা যায় যে, আইনসভার মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। আর শাসন-বিভাগের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে আইন-বিভাগের ক্ষমতা হ্রাসের কারণ ও শাসন-বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ লিপিবদ্ধ হইল :

(১) বর্তমানে গতিশীল সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল জটিল সমস্যার সঙ্গে তাল রক্ষা করিয়া চলিবার মতো ক্ষমতা বা সময় আইনসভার নাই।

(২) আবার আইনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে আলোচনা করিবার মতো সময় ও ক্ষমতা আইনসভার নাই। এই প্রসঙ্গে র‍্যামসে ম্যুওর বলেন : "কিছুটা বিপুল পরিমাণে কাজের চাপ বৃদ্ধির জন্য, কিছুটা ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য, কিছুটা হিসাব প্রদানের কর্মধারায় ভয়াবহ ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করিবার জন্য কমন্সসভা তাহার কার্য করিতে দিন দিনই অক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছে"।*

(৩) বিশ্বযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক অবস্থার অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক সংকট প্রভৃতি জরুরী সমস্যার সমাধান শাসন-বিভাগকেই করিতে হয়। আবার আইনসভা নীতি নির্ধারণ করে কিন্তু শাসন বিভাগ নীতিকে কার্যকর করে। শাসন-বিভাগ কিভাবে নীতিকে কার্যকর করিবে তাহার উপরই সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। জনসাধারণও প্রত্যহ শাসনবিভাগেরই সম্মুখীন হয়। তাই জনগণ আইনসভা অপেক্ষা শাসন-বিভাগকেই অধিক গুরুত্ব দেয়।

(৪) আইনসভা আইন প্রণয়ন করে বটে, কিন্তু আইন প্রণয়ন ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে শাসন-বিভাগ, শাসন-বিভাগই আইনসভাকে পরিচালনা করে। আবার নিয়মকানুন (regulations), নির্দেশ (ordinance) জারী করিবার ক্ষমতা শাসনবিভাগকে প্রদান করিবার ফলে আইনসভা অপেক্ষা শাসন-বিভাগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য, আপাতদৃষ্টিতে আইনসভাই শাসন-বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, শাসন-বিভাগের কার্যের সমালোচনা করে এবং শাসন পরিষদের সদস্যদের রদবদল করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার ফলে এবং নির্বাচনের

* "The House of Commons has shown its increasing incapacity to perform its work, partly through excessive pressure of business, partly because of cabinet dictatorship, party owing to the faults of procedure of the bewildering way in which the national accounts are presented."—*Ramsay Muir.*

প্রভৃতে খরচ বহন করিতে হয় বলিয়া আইনসভার সদস্যগণ দলীয় নির্দেশেই কাজ করিয়া থাকে। তাই বলা হয় আইনসভা ও শাসন-বিভাগ—কাহারও কোন ক্ষমতা নাই; প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষমতাই রাষ্ট্রনৈতিক দলের হাতে সমর্পিত হইয়াছে ("Executive and Legislature, Government and Parliament are constitutional focades, in reality the party alone exercises power." —*M. Duverger*)। আইনসভার সদস্যগণকে যেহেতু নির্বাচিত হইতে হয়, এবং কোনও একটি দলের সমর্থন ছাড়াও নির্বাচিত হওয়া কঠিন, সেইহেতু পরবর্তী নির্বাচনে দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার আশায় আইনসভার সদস্যগণকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়াও দলীয় নির্দেশ পালন করিতে হয়। ফলে আইনসভার মর্যাদা হ্রাস পাইতেছে। আবার শাসন-বিভাগ যেহেতু আইনসভার কর্মতালিকা প্রণয়ন করে, আইনসভার সময় ঠিক করে, বিলের খসড়া রচনা করে, ফলে আইনসভাকে শাসন-বিভাগ নানা ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে।

দলীয় ব্যবস্থার আওতায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে

(৫) আইনসভা বর্তমানে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জনগণের অভিযোগ সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনিতে পারে এবং ইহা জনমত গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু বর্তমানে টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমেও জনমত গঠন করা যায়। আবার ব্যবসায়-সংগঠন, শ্রমিকসংঘ, কৃষক সভা প্রভৃতি জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে পারে। সুতরাং দেখা যায় আইনসভার জনমত গঠনের কার্যাবলী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও হইতে পারে। ফলে ইহার মর্যাদা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

(৬) বর্তমান সমাজের উপযোগী আইন প্রণয়নের জন্য যে কলাকৌশলগত জ্ঞানের (Technical knowledge) প্রয়োজন তাহা আইনসভার নাই। তাই শাসন-বিভাগকেই এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে করিতে হয় যে, সকল বিষয়ে কলাকৌশলগত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

(৭) জরুরী অবস্থায় ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য শাসন-বিভাগকেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে হয়।

(৮) পরিবর্তনশীল সমস্যার সমাধানের জন্য আইনসভার দুই অধিবেশন অন্তর্বর্তিকালে শাসনবিভাগকেই নির্দেশ (Ordinance) বা নিয়মকানুন (regulation) জারী করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হয়। ফলে আইনসভার এক্তিয়ারের মধ্যে থাকিয়া শাসন-বিভাগ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

(খ) অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Delegated Legislation): অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন বলিতে বুঝায় আইন-বিভাগ কর্তৃক শাসন বিভাগকে বা অন্য কোন সংস্থাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা। যুদ্ধের সময় শাসন বিভাগের একটি কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা ("In times of war lawmaking tends to become a function of the executive. It is usual for wide power of lawmaking to be delegated to the executive by the legislature."

K. C. Wheare—*Legislatures.*)। অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন ও অধস্তন আইন (Subordinate Legislation) একই রকম। অধস্তন আইন বলিতে বুঝায় আইনসভা ছাড়া আইন সভার অধস্তন যে কোন সংস্থা কর্তৃক প্রণীত আইন। বর্তমানে অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ বর্তমানে কল্যাণ রাষ্ট্রে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন-বিভাগের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে এবং জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। আবার যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি সমস্যার সমাধান আইনসভার দীর্ঘ বিতর্কের মাধ্যমে সমাধান করা যায় না। তাই আইনসভা বিস্তৃত ভাবে আইন পাস না করিয়া আইনের সাধারণ নীতিগুলি বিধিবদ্ধ করিয়া আইনের মধ্যে কতকগুলি ফাঁক রাখিয়া দেয়, শাসন-বিভাগের হাতে ছাড়িয়া দেয়, শাসন-বিভাগ আইনকে বলবৎ করিবার সময় যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাহা সমাধান করিবার জন্য ঐ আইনের ফাঁকের সুযোগে কতকগুলি নিয়মকানুন জারী করিয়া বা নির্দেশ জারী করিয়া সমস্যার সমাধান করে। এই সকল নির্দেশ, আদেশ বা নিয়মকানুনকে বলে শাসন-বিভাগীয় আইন (Administrative Legislation) বা অধস্তন আইন (Subordinate Legislation) অথবা অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Delegated Legislation) বা দপ্তরীয় আইন (Departmental Legislation)। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। রেলওয়ে বিভাগের খুঁটিনাটি নিয়মাবলী রচনা করিবার মতো যোগ্যতা বা সময় আইনসভার নাই। তাই আইনসভা রেলওয়ে বিভাগের মৌলিক নীতি রচনা করিয়া উহার খুঁটিনাটি নিয়মাবলী রচনার ভার শাসন-বিভাগকেই দিয়া থাকে।

অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন-এর সংজ্ঞা

নিয়ন্ত্রণ : সমালোচনা ও মূল্যায়ন : বার্কারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন আইনবিভাগের প্রাধান্য ছিল তেমনি বিংশ শতাব্দীতে শাসন-বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমালোচকগণ বলেন যে, বর্তমানে আইনসভা যেভাবে হীনবল হইয়া যাইতেছে তাহাতে গণতন্ত্র রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা খুবই কম। আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস ও শাসন-বিভাগের হাতে আইন প্রণয়নের ভার অর্পণ সম্পর্কে লর্ড হিউয়ার্ট নয়া স্বৈরাচার (New Despotism) গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। বলা হয় যে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে হইলে, (ক) পার্লামেণ্টকে শাসন-বিভাগের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে; (খ) শাসন বিভাগ প্রণীত নিয়মকানুনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা আদালতকে দিতে হইবে; (গ) আদালতের এই ক্ষমতা যদি শাসন-বিভাগ কাড়িয়া লয় তবে শাসন-বিভাগকে কারণ দর্শাইতে হইবে।

অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন আইনসভার সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব করে। ফলে শাসন-বিভাগে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। আইন প্রণয়নে জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় না এবং আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইনকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ইংল্যাণ্ড, ভারত ও মাঃ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডে শাসন-বিভাগীয় আইনকে পার্লামেণ্টকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়। শাসন-বিভাগীয় আইনগুলিকে পরীক্ষা করিবার জন্য সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। অবশ্য সিলেক্ট কমিটি শাসন-বিভাগীয় আইনের কোন নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে না।

অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইনের নিয়ন্ত্রণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-বিভাগীয় আইনের বিচার বিবেচনা করিতে পারে বিচার-বিভাগ। ইংল্যাণ্ডে বিচার-বিভাগের এই ক্ষমতা নাই।

ভারতে সংশোধনের ১৩(৩)ক অনুচ্ছেদেই উপআইন (By Law), আদেশ (Order), নিয়মকানুন (Rule), নিয়ন্ত্রণের (Regulation) উল্লেখ আছে। এই আইনবলেই পার্লামেণ্ট শাসন-বিভাগকে শাসন-বিভাগীয় আইন প্রণয়ন করিতে বলিতে পারে। কিন্তু আইনসভা আইনের নীতি নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। ভারতেও শাসন-বিভাগীয় আইনকে পার্লামেণ্টের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। ইহা ছাড়া পার্লামেণ্টের একটি অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Subordinate Legislation) আছে। এই কমিটি শাসন-বিভাগীয় আইনের বিচার বিবেচনা করে। ভারতে শাসন-বিভাগীয় আইনের শাসনতান্ত্রিক বৈধতা বিচার করিতে পারে আদালত। আদালত নিয়মকানুনের যৌক্তিকতা বিচার করিতে পারে। মূল আইনের সহিত শাসন-বিভাগীয় আইনের সংঘর্ষ বাধিলে আদালত শাসন-বিভাগীয় আইনকে বাতিল করিয়া দিতে পারে। শাসন-বিভাগীয় আইনকে যুক্তিসংগত হইতে হইবে, ইহা কোন কর স্থাপন সম্পর্কিত হইবে না, ইহাকে ভারতীয় পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিতে হইবে।

শাসন বিভাগ
(The Executive)

শাসন-বিভাগ বলিতে বুঝায় আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যকরী করিবার জন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দকে। ব্যাপক অর্থে আইন পরিষদ ও বিচার-বিভাগ ছাড়া সরকারী কার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগকেই শাসন-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শাসন-বিভাগের গুরুত্ব সম্বন্ধে লেসলি লিপসনের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : "রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র যদি উহার গুণাগুণের মাপকাঠি হয় তবে সরকারের উৎকর্ষের মাপকাঠি হইল শাসন-বিভাগের কর্মচারীদের কার্যাবলী, শাসন-বিভাগের কর্মচারীদের উপরই নির্ভর করিবে রাষ্ট্রের নীতির সাফল্য অথবা ব্যর্থতা ("If the state is what its functions are, a government becomes what its functionaries do. It is the administrator who makes or mars the policy." L. Lipson.—*Great Issues of Politics*)।

কিন্তু এতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগকে ব্যাখ্যা করিবার ভার এই বিভাগের প্রধানদেরই উপর ন্যস্ত ; তাই এই প্রধানদেরই সরকার বলা হয়। সংকীর্ণ অর্থে তাই শাসন কর্তৃপক্ষ বলিতে বুঝায়, শাসন-বিভাগের নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই সংকীর্ণ অর্থেই শাসনবিভাগকে ধরা হইয়া থাকে। সংকীর্ণ অর্থে যাঁহাদের শাসনবিভাগের কর্মকর্তা হিসাবে ধরা হইয়াছে, তাঁহারাই রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণ করেন এবং এই নীতিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য শাসন-বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে বণ্টন করেন, অধীনস্থ কর্মচারীরা ঠিকমত কার্য সম্পাদন করে কিনা তাহার তদারক করেন এবং বিভিন্ন দপ্তরের কার্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করেন। আবার শাসন-

শাসন-বিভাগের সংজ্ঞা

বিভাগকে দুইভাগে ভাগ করা হয় : যথা—(১) উর্ধ্বতন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষ ; এই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপর শাসন পরিচালনার রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে ; আর (২) অধীনস্থ কর্মচারিবৃন্দ।

আবার উর্ধ্বতন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় : যথা—(১) নামসর্বস্ব শাসনকর্তৃপক্ষ, আর (২) বাস্তব শাসনকর্তৃপক্ষ। নামসর্বস্ব শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে বুঝায় যাহার নামে সকল রাষ্ট্রকার্য পরিচালিত হয়, যিনি আইনগতভাবে রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু বাস্তবে তিনি কোন নীতি নির্ধারণ করেন না, অথবা নিজে কোন কার্য পরিচালনা করেন না। ইংল্যাণ্ডের রাণী এবং ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতিকে নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধানের উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়।

বাস্তব শাসন কর্তৃপক্ষের উদাহরণ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি এবং মন্ত্রিমণ্ডলী (Cabinet)। এই সকল শাসক রাষ্ট্রকার্য বাস্তবে পরিচালিত করেন, কার্যের নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত হয়। ইহারা অনেকক্ষেত্রে নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধানের আইনগতভাবে অধীনস্থ গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ; কিন্তু রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের অন্যান্য কর্মচারিগণ যাহারা ইহাদের অধীনে কাজ করে তাহাদের পর্যায়ে ইহাদিগকে ধরা যায় না।

শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের শ্রেণী বিভাগ ও স্বরূপ (Classification and nature of the executive) : **(১) নামসর্বস্ব এবং প্রকৃত শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ :** গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার কখন কখন এক নামসর্বস্ব শাসকের সন্ধান পাওয়া যায় ; যেমন, ইংল্যাণ্ডের রাণী, ভারতের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু এই প্রকারের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হইল মন্ত্রিসভা (Cabinet)। অবশ্য, এখানে উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে যেখানে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট থাকেন সেখানে রাষ্ট্রপতিকে নামসর্বস্ব শাসন-বিভাগীয়-কর্তৃপক্ষ বলা চলে না। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিয়া অনেকে এই মন্তব্য করেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নন। তিনি প্রকৃত শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষও বটে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বলা চলে।

নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ

(২) পার্লামেণ্টীয়-ব্যবস্থায় শাসন-কর্তৃপক্ষ : পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যাদিগের মধ্যে হইতেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভা তাহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আবার আইনসভার সদস্যগণ সাধারণতঃ কোন-না-কোন দলের সদস্য হয়। দলীয় ব্যবস্থা দলের সভ্যদের মধ্যে যাহারা আইনসভার সদস্য তাহাদিগের মাধ্যমে প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষের উপর কর্তৃত্ব করে। পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিপরিষদ, দল এবং আইনসভার মধ্যে একটি সহযোগিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় দলও মন্ত্রিসভার মাধ্যমে কর্তৃত্ব করে। দলের নির্দেশ মতো প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করে মন্ত্রিপরিষদ। আবার যদি রাষ্ট্রপতি থাকেন তাহা হইলে প্রকৃত শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নামসর্বস্ব শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-কর্তৃপক্ষ

(৩) রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন-ব্যবস্থা : রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন-ব্যবস্থায়

রাষ্ট্রপতি যেহেতু আইনসভার সদস্য থাকেন না সেইহেতু আইনসভার নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। পরামর্শদাতা মন্ত্রিসভার সাহায্যে তিনি শাসন পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। আইনসভার সভ্য নন বলিয়া রাষ্ট্রপতি স্বদলীয় সদস্যদের মাধ্যমে ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে আইনসভাকে প্রভাবিত করিতে পারেন না। আইনসভাও শাসন-কর্তৃপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার কার্যের জন্য দায়ী করিতে পারে না বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিধান প্রায় পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হইতে পারে। আইনসভা পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় যেমন মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে তেমন পারে না। আবার আইনসভার উপর যেহেতু প্রেসিডেণ্টের কার্যকাল নির্ভর করে না, সেইহেতু প্রেসিডেণ্ট অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন-ব্যবস্থা

(৪) **একক পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা (Single Executive)ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে একক পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। জার্মানীতে হিটলার ও নাজী পার্টির শাসন, ইটালীতে মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ট পার্টির শাসন-ব্যবস্থাকে একক পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যখন আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত নন এবং আইনসভার নিকট তাঁর কার্যের জন্য দায়ী থাকেন না, এবং গ্রেট ব্রিটেনে যৌথ দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা হইলেও এক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যাণ্ডেও একক পরিচালিত শাসন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

একক পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা

(৫) **বহু-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা (Plural Executive)ঃ** বহু-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার নজীর সুইজারল্যাণ্ড। এই শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের প্রত্যেক মন্ত্রীই সমান ক্ষমতা ও দায়িত্বের অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যে সকলেই একদলভুক্ত হইবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। আইনসভা কর্তৃক মন্ত্রিসভার কাজ সমর্থিত না হইলে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য নন। মন্ত্রিপরিষদের একজন সভাপতি থাকেন বটে কিন্তু তিনি অন্যান্য শাসন-ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর মতো ক্ষমতাশীল নন। তিনি মন্ত্রিসভার সভায় সভাপতিত্ব করেন বটে কিন্তু বিশেষ কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই।

বহু-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা

আইনসভার সহিত সম্পর্কঃ উপরোক্ত আলোচনায় শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানকে একক হিসাবে ধরা হইয়াছে। কিন্তু শাসক একজন না হইয়া বহু শাসকের মিলিত সংস্থাও (Plural Executive) হইতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাকে এই শ্রেণীর শাসন-ব্যবস্থার পর্যায়ভুক্ত করা যায়। সুইজারল্যাণ্ড বহু শাসকের মিলিত সংস্থার (Plural or Collegiate Executive) দ্বারা শাসিত হয়। এই সংস্থার আনুষ্ঠানিক সভাপতিকে শাসক শ্রেণীর মধ্য হইতে একজনকে আইনসভা নির্বাচিত করে। আইনসভার নির্দেশে এই সংস্থা মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কার্য নির্বাহ করে। এই শাসকসম্প্রদায় আইমসভায় বসিতে পারেন কিন্তু আইনসভার নেতৃত্ব ইঁহারা দেন না। আবার মন্ত্রিমণ্ডলীকেও বহুত্ববাচক শাসকমণ্ডলী বলা হয়, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভাকে নেতৃত্ব দানও করে।

(ক) নিয়োগ পদ্ধতি ঃ প্রধান শাসকের মনোনয়ন পদ্ধতিসমূহ (Modes of choice of the Chief Executive) ঃ রাষ্ট্রের প্রধান শাসককে চারিটি পদ্ধতিতে মনোনয়ন করা হয়। নিম্নে এই চারিটি পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া গেল ঃ

(১) উত্তরাধিকার সূত্র ঃ রাজতন্ত্রেই এই নীতি প্রযুক্ত হয়। রাজার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়। অতীতকালে অবশ্য পোলাণ্ড ও অন্যান্য দেশে রাজাকে নির্বাচিত করা হইত। ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রের পশ্চাতেও এই নির্বাচন-নীতির আইনগত স্বীকৃতি রহিয়াছে।

(২) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ঃ জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবেও রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত করে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি রাষ্ট্রে, সুইজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ ক্যাণ্টনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিতে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। প্রাচীন গ্রীসেও এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হইত।

(৩) পরোক্ষ নির্বাচন ঃ পরোক্ষ নির্বাচনের অর্থ—জনসাধারণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রের শাসকপ্রধানকে নির্বাচন করা এবং শাসনকার্য পরিচালনা করা। বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই পরোক্ষ নির্বাচন-ব্যবস্থা চালু আছে।

(৪) ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্ব দ্বারা মনোনয়ন ঃ ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যগুলির প্রধান শাসক (Governor) কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনীত হন। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির প্রধান শাসককে (Governor General) মনোনীত করেন ইংল্যাণ্ডের রাণী বা রাজা। অবশ্য, বর্তমানে ডোমিনিয়নগুলির মন্ত্রিসভার মনোনীত ব্যক্তিই বিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোনয়ন লাভ করেন বলিয়া ডোমিনিয়নগুলিকে আর পূর্বের ন্যায় পরাধীন বলা চলে না।

(খ) রাষ্ট্রীয় কর্মচারিবৃন্দ (The Civil Service) ঃ রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রিমণ্ডলীর অধীনস্থ কর্মচারিগণকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মচারিবৃন্দ বা জনপালন কৃত্যক (Civil Service) অথবা রাষ্ট্রভৃত্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। এইরূপে রাষ্ট্রভৃত্যগণ স্থায়িভাবে রাষ্ট্রকার্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রধান শাসক ও মন্ত্রিমণ্ডলী স্থায়িভাবে রাষ্ট্রকার্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রধান শাসক ও মন্ত্রিমণ্ডলী স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন না। নির্দিষ্ট সময় অন্তে একদল মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিলে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের স্থান অধিকার করেন। এই পুরাতন ও নূতনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেন রাষ্ট্রভৃত্য। সরকারের এই পরিবর্তনের মধ্যে শাসনবিভাগের কার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন রাষ্ট্রভৃত্যগণ। রাষ্ট্রভৃত্যগণ কোন দলভুক্ত নন। ফলে ইঁহারা সাধারণতঃ নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রভৃত্যগণই প্রকৃতপক্ষে আইন ও নীতি প্রয়োগ করেন এবং নীতি-নির্ধারণে প্রধান শাসক ও মন্ত্রিমণ্ডলীকে সহায়তা করেন।

(গ) অন্যান্য নিয়োগ-পদ্ধতি (Principles of Appointment) ঃ ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, কর্মচারী নিয়োগের উপর শাসনকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ কম হওয়া উচিত। কারণ, মন্ত্রিমণ্ডলী সাধারণতঃ দলভিত্তিক হইয়া থাকে। এই মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক যদি রাষ্ট্রভৃত্য নিযুক্ত হয় তবে দলীয় পক্ষপাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি

হয়। আবার ইহার ফলে অযোগ্য ব্যক্তিও মনোনীত হইতে পারে, মন্ত্রিবর্গ যোগ্য-অযোগ্য-নির্বিচারে তাঁহাদের নিজেদের লোককেই কর্মে নিযুক্ত করেন।

আবার চাকুরি যদি স্থায়ী না হয় তবে যোগ্য লোকেরা সরকারী কার্যভার গ্রহণ করিবেন না। বর্তমানে যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত করিবার ভার স্বতন্ত্র ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গের একটি সংস্থার (Public Service Commission) উপর ন্যস্ত করা হয়। এই কমিশন যেহেতু মন্ত্রিমণ্ডলীর আওতার বাহিরে, সেই হেতু মনোনয়নে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা কম। আর কার্যকাল ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকারও প্রয়োজনীয়তা আছে। এইভাবে রাষ্ট্রকর্মচারী নিয়োগের ফলে শাসনকার্যে দক্ষতা, পক্ষপাতিত্বহীনতা প্রভৃতি গুণগুলির সুফল পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

শাসনবিভাগীয় কার্যাবলী (Functions of the Executive) : ডঃ গার্নারকে অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিতভাবে শাসনবিভাগীর কার্যাবলীর বর্ণনা করা গেল :

(১) **পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যাবলী :** বর্তমানে পরস্পর-নির্ভরশীল রাষ্ট্রে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের প্রতিভূস্বরূপ অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখেন। রাষ্ট্রপ্রধান অপর রাষ্ট্রে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং অপর রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে স্বীকার করেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করেন। অবশ্য, বর্তমানে অনেক দেশে এই চুক্তি আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

(২) **সামরিক কার্যাবলী :** শাসনকর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব হইল বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা। নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনী এক কথায় সমগ্র সামরিক শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা, সামরিক বিভাগগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ করা, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষের মনোনয়ন প্রভৃতি কার্য রাষ্ট্রপ্রধান করিয়া থাকেন। অবশ্য, যুদ্ধ ঘোষণার মতো ঘোষণা প্রভৃতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মতো আইন পরিষদও অনেক দেশে করিয়া থাকে :

(৩) **অভ্যন্তরীণ শাসন-সংক্রান্ত কার্যাবলী :** পূর্বে ধারণা ছিল রাষ্ট্র শুধু আইন ও শৃঙ্খলা (Law and order) বজায় রাখিবে। এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যাবলী অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে রাষ্ট্র হইল কল্যাণকর রাষ্ট্র। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিস্তৃত। রাষ্ট্রের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইতেছে শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি-বিষয়ক কার্যাবলী। ফলে শাসন-বিভাগের দায়িত্ব বাড়িতেছে এবং শাসনবিভাগের প্রভাবও জনজীবনে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৪) **আইন-সংক্রান্ত কার্যাবলী :** রাষ্ট্রপ্রধান আইন পরিষদের সভা আহ্বান করেন, প্রয়োজনবোধে আইন পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দেন এবং আইনসভার অধিবেশনকে স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। আবার রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুমনামা (Ordinance) জারি করিবার ক্ষমতা প্রায় সকল রাষ্ট্রেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর পরিধি ব্যাপক হওয়ায় এবং আইনসভার কার্যাবলীও ব্যাপক হওয়ায় আইনসভা খুঁটিনাটি আইন প্রণয়নের ভার (Delegated Legislation) শাসন-বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রিমণ্ডলী-শাসিত রাষ্ট্রে মন্ত্রিগণই আইনসভার

পরিচালনা করেন ; সর্বোপরি আইনসভার নেতৃত্ব দেন, ফলে মন্ত্রিমণ্ডলীর নায়কত্ব (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) **বিচারবিভাগীয় কার্যাবলী :** ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুসারে বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু বর্তমান কালে রাষ্ট্রপতি-শাসিত রাষ্ট্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি দণ্ডিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারেন। পার্লামেন্টও অনেক বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে ; সর্বোপরি, বিচারপতিকে নিয়োগ করার ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাষ্ট্রপ্রধান। ফলে বিচারবিভাগের উপর তাঁহার যে ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

(৬) **শাসনবিভাগীয় বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলীও** শাসনবিভাগের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

শাসনবিভাগীয় বিচার (Administrative Justice or Adjudication) : সাধারণ আদালতের বাহিরে অন্যান্যভাবে যে সকল বিবাদ-মীমাংসা হইয়া থাকে তাহাকে শাসনবিভাগীয় বিচার বলা হয়। শাসনবিভাগীয় বোর্ড বা কমিশন অথবা শাসনবিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল (Administrative Tribunals) প্রভৃতির মাধ্যমে অনেক সময় বিচার হইয়া থাকে। আবার মন্ত্রীরাও বিভিন্ন মামলার বিচার করিয়া থাকেন। কোন কোন দেশে শিল্প সংক্রান্ত আদালত (Industrial Tribunal) আছে। এই আদালত শিল্প-সংক্রান্ত, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে নানাবিধ মামলার বিচার করিয়া থাকে। ভারতে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রক (the Rent Controller), উদ্বাস্তু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (the Custodian of Evacuee property) প্রমুখ শাসনবিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন মামলার বিচার করিয়া থাকেন।

সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই কল্যাণকর রাষ্ট্র (Welfare State)। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি খুব ব্যাপ্ত ছিল না। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে। রাষ্ট্রের কর্ম-ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হইবার অর্থ শাসনবিভাগের কাজ বাড়িয়া যাওয়া। আবার পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রচেষ্টা চলিতেছে। শাসনবিভাগই এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে কার্যকর করে বলিয়া শাসনবিভাগের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ ব্যবস্থার দায়িত্ব আজ রাষ্ট্রের, অর্থাৎ শাসনবিভাগকে এই সকল কাজের ভার গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণ আদালত এই ধরনের বিচার মীমাংসার পক্ষে উপযোগী নয় বলিয়া ভারত, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে শাসনবিভাগীয় বিচার ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন-ব্যবস্থার গুরুত্ব

শাসনবিভাগীয় বিচারের কেন উদ্ভব হইল ? (১) বর্তমানে সামগ্রিক স্বার্থের সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘর্ষ বাধিলে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। রাষ্ট্রকে সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। সাধারণ আদালত ব্যক্তিগত অধিকারকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। শাসনবিভাগীয় বিচারে সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ আদালতের বিচার পদ্ধতি শাসনবিভাগীয় বিচার পদ্ধতি অপেক্ষা ব্যয়বহুল। শাসনবিভাগীয় বিচারে সময় কম লাগে, খরচ কম লাগে, ফলে সাধারণ আদালত অপেক্ষা ইহা বেশী

প্রচলিত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, আবার আজকাল এমন কতকগুলি মামলা আসিয়া হাজির হয়, যাহার বিচারে কলাকৌশলগত জ্ঞানের প্রয়োজন। সাধারণ আদালতে এই বিশেষ ধরনের মামলা হওয়া বিশেষ অসুবিধাজনক। তাই বিশেষ ধরনের মামলা পরিচালনা করিবার জন্য শাসনবিভাগীয় বিচারালয়ের উদ্ভব হইয়াছে। চতুর্থতঃ, শাসনবিভাগীয় বিচার গতিশীল সমাজের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। সাধারণ আদালতকে প্রাচীন মামলার মীমাংসার নজীরের ও নির্দিষ্ট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলার বিচার করিতে হয় বলিয়া সাধারণ আদালতের বিচার গতিশীল হয় না। এই সকল কারণে শাসনবিভাগীয় বিচারের উদ্ভব হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যায়, শাসনবিভাগীয় বিচারে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। ইহা অনেকটা বিভাগীয় রেষারেষিতে পূর্ণ থাকে। বিভাগীয় বা বিভাগের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া তৃতীয় নিরপেক্ষ স্বাধীন আদালতের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা পায়। অবশ্য যদি শাসনবিভাগীয় আদালতের গঠন অত্যাবশ্যক হয় তবে উহার উপর সাধারণ আদালতের নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকা প্রয়োজন। একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া ভারত, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগীয় প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয় নাই। ইংল্যান্ডে শাসনবিভাগীয় বিচার সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য ফ্রাংক্স কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে (১) শাসন-বিভাগীয় বিচার পদ্ধতি ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে, (২) এই বিচার প্রকাশ্যে হইবে এবং ইহার বিচার মীমাংসা প্রকাশিত হইবে, (৩) ইহাকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে, (৪) প্রত্যেক পক্ষেরই বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ দিতে হইবে, (৫) শাসনবিভাগীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যাইবে, (৬) ইহাদের কার্যাবলীর তদারক করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ আদালত শাসনবিভাগীয় বিচারের বৈধতা বিচার করিতে পারে।

ভারতে শাসনবিভাগীয় বিচার সংস্থা গঠিত হইয়াছে। শাসনবিভাগীয় বিচার সম্পর্কে কতিপয় আইন প্রণীত হইয়াছে। এই আইন দ্বারা শাসনবিভাগীয় বিচারের প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন মামলার বিচার চূড়ান্তভাবেই শাসনবিভাগীয় বিচারালয় করিতে পারিবে, আবার কোন কোন মামলার ক্ষেত্রে শাসনবিভাগীয় বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ আদালতে আপীল করা যাইবে, এবং কোন্ কোন্ মামলার ক্ষেত্রে শাসনবিভাগীয় বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করা যায় তাহা স্থির হইবে। আবার কোন শাসনবিভাগীয় বিচার সংস্থা ক্ষমতার বাহিরে যদি কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করে তবে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ৩২ ধারা প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন লেখ (writs)-এর মাধ্যমে শাসনবিভাগীয় আদালতের সিদ্ধান্তকে বাতিল করিতে পারে। আবার সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রীমকোর্ট সামরিক ছাড়া যে কোন আদালত বা বিচার সংস্থার রায়ের বিরুদ্ধে উহার নিকট আপীল করিবার অনুমতি দিতে পারে। অনুরূপভাবে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যের হাইকোর্ট তাহার সীমানার মধ্যে অবস্থিত যে কোন বিচার সংস্থা যদি নির্দিষ্ট ক্ষমতা বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে উক্ত মামলায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইংল্যান্ডের ফ্রাংক্স

কমিটির মতো ভারতেও ১৯৫৫ সালে একটি আইন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। এই কমিশনও ফ্রাংক্স কমিশনের মত সুপারিশ করিয়াছে এবং শাসনবিভাগীয় বিচার সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিয়াছে।

বিচার-বিভাগ
(The Judiciary)

লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণ করা যায় একমাত্র সেই দেশের বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষের মাধ্যমে। লর্ড ব্রাইসের এই উক্তিটি যে সত্য তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। কারণ, আইনসভা কর্তৃক যে আইন প্রণীত হয় তাহাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্পিত হয় বিচার বিভাগের উপর। অবশ্য, বিচার বিভাগের বিচারপতিগণ আইন-ভঙ্গকারী দোষীকে শাস্তি প্রদানই করেন না, বিচারপতিগণ প্রয়োজনবোধে আইনের ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত আইনের যথোপযুক্ত ব্যবহারও করেন। আবার দোষী ব্যক্তির দোষের গুরুত্ব অনুসারে এবং আইন ভঙ্গকারীর দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ ভেদে বিচারপতিগণকে বিচার মীমাংসা করিয়া দিতে হয়। বিচারপতিগণ এই নীতি অনুসরণ করেন যে, একাধিক অপরাধী ব্যক্তি শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইলেও যেন একজন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি না পায়। সর্বোপরি দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ন্যায়বিচার-ব্যবস্থার গুরুত্ব সর্বদেশে স্বীকৃত হওয়ায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary) : বিচার বিভাগের গুরুত্ব বর্তমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিভাগের কার্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে এই বিভাগের কার্যাবলীর বিবরণ দেওয়া গেল :

(১) বিচার বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনের ব্যাখ্যা করা এবং আইনের প্রয়োগ করা। এখানে আইন বলিতে ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইন, লিখিত শাসনতান্ত্রিক আইন এবং প্রথাগত আইনকে বুঝানো হয়।

(২) বিচার বিভাগের প্রধানতম কার্য হইল আইনভঙ্গকারীর বিচার করা।

(৩) স্থিতিশীল লিখিত শাসনতন্ত্র গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। এই কারণে বিচারপতিগণ অনেক সময় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধে অনুসারে বিচার করেন। বিচারপতিগণের এই রায় (Judgment) ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হয়। এইরূপ আইনকে বিচারকগণ প্রণীত আইন (Judge-made laws) বলা হয়। অতএব দেখা যায় বিচার বিভাগ শুধু আইনের ব্যাখ্যাই করে না, আইন প্রণয়নও করে।

(৪) বিচার বিভাগকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অভিভাবক ও চরম ব্যাখ্যাকর্তা বলা হয়। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বিচার বিভাগ কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

(৫) অনেক দেশে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপতিকে এবং ব্যবস্থাপক সভাকে বিচার বিভাগ পরামর্শ দিয়া থাকে।

(৬) উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও বিচার বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য আছে; যেমন, (ক) কর্মচারী ও অভিভাবক নিয়োগ, (খ) লাইসেন্স প্রদান, (গ) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা, (ঘ) দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারীর কার্য করা, (ঙ) ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষাকল্পে লেখ (writ) ও নির্দেশ জারি করা।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা (Independence and Impartiality of the Judiciary) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপরই নির্ভর করে ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর :

(১) **বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি (Appointment of Judges) :** প্রথমতঃ, গুণাবলীর দিক হইতে বিচারকগণকে বিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, মর্যাদাবোধসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, এই গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনপ্রকারে বিচারকগণ নিযুক্ত হন; যথা, (ক) শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক, (খ) আইনসভা কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে এবং (গ) জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারকগণের নিয়োগপদ্ধতি প্রচলিত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিতে এবং সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনে। অধ্যাপক ল্যাস্কি এই প্রক্রিয়ায় নিয়োগ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলেন, বিচারকগণের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবার পদ্ধতি প্রচলিত হইলে পুনর্নির্বাচনে জয়লাভের আশায় বিচারক-গণ ন্যায়বিচারের পথ পরিত্যাগ করিবেন। আবার জনপ্রিয়তার উপরই যদি বিচারকের কার্যকাল নির্ভর করে তবে নিরপেক্ষ বিচারপ্রাপ্তির আশা করা যায় না।

এতদ্ব্যতীত দলীয় প্রথায় নির্বাচন হইলে রাজনীতির অশুভ প্রভাব বিচারপতিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিবে। সর্বোপরি বিচারপতির যে সকল গুণ অপরিহার্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে জনসাধারণের নির্বাচিত বিচারপতি সেই গুণগুলির অধিকারী নাও হইতে পারেন। কারণ গুণী ব্যক্তি জনপ্রিয় নাও হইতে পারেন।

আইনসভা দ্বারা নিয়োগপদ্ধতিও অনুরূপ দোষে দুষ্ট। আইনসভা দ্বারা বিচারপতিকে নিয়োগ করা হইলে স্থানীয় স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, প্রভাবশালীদের চাপ প্রভৃতি বিচারপতির মূল উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবে।

উপরোক্ত অসুবিধার জন্য অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, বিচারকগণ শাসনবিভাগ দ্বারা নিযুক্ত হইলে অনেক পরিমাণে দোষমুক্ত হইতে পারিবেন। অবশ্য ল্যাস্কি এই পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য সুপারিশ করেন। তাঁহার মতে বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে বিচারকদের নিয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বিচারবিভাগীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবকে বিচারকদের একটি কমিটির দ্বারা অনুমোদন করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।*

---

*"...to make appointments on the recommendation of the Minister of Justice, with the consent of a standing committee of the judges, which would represent all sides of their work."

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি সতর্কতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাসন-বিভাগের কার্যে ব্যাপৃত কোন ব্যক্তিকে বিচারকের পদে নিয়োগ করা অনুচিত। কারণ ইহাতে যে ক্ষেত্রে শাসনবিভাগের স্বার্থ জড়িত থাকে সেই বিষয়ের বিচারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার বিচারকগণের যদি কোন রাষ্ট্রনৈতিক পদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে তাঁহারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রনৈতিক পদপ্রাপ্তির আশায় শাসনবিভাগের সমর্থন করিয়া বিচারকার্য সম্পাদন করিবেন। ফলে নিরপেক্ষতা রক্ষা পাইবে না।

(২) **বিচারকগণের কার্যকাল (Judicial Tenure) :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারপতিগণের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিশেষ প্রয়োজন। হ্যামিলটন (Hamilton) বলেন যে, বিচারপতিগণের পদের স্থায়িত্ব সাম্প্রতিক সরকারী ব্যবস্থার অন্যতম উৎকর্ষের নিদর্শক। রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ইহা স্বৈরাচারের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ ; প্রজাতন্ত্রে ইহা জনপ্রতিনিধিদের আতিশয্য ও অত্যাচার রোধ করে। আমেরিকার অঙ্গরাজ্যে ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনে বিচারকদিগের কার্যকাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু কাম্য ব্যবস্থা হইল অক্ষমতা ও অপরাধের কারণ ব্যতীত বিচারপতিদের অপসারণ করা উচিত নয়।

(৩) **বিচারকগণের অপসারণ (Removal of Judges) :** বিচারকগণের পদচ্যুতির পদ্ধতির উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভরশীল। অক্ষমতা ও দুর্নীতির কারণ ছাড়া স্থায়িভাবে নিযুক্ত বিচারকগণকে পদচ্যুত করা যায় না। কিন্তু অক্ষম ও দুর্নীতিপরায়ণ বিচারকের অপসারণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু এই অপসারণের জন্য শাসনবিভাগকে এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে অন্য কোন চাপ এই কার্যকে প্রভাবিত না করিতে পারে। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ হইতে উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে রাজাকে অনুরোধ জানাইলে বিচারককে রাণী বা রাজা পদচ্যুত করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইমপিচমেণ্ট পদ্ধতিতে বিচারককে পদচ্যুত করা যায়। ইমপিচমেণ্ট পদ্ধতি অনুসারে কংগ্রেসের নিম্নতম কক্ষ বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে। এই অভিযোগের বিচার করে ঊর্ধ্বতন কক্ষ। ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের মোট সংখ্যাধিক এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ যদি কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে তবে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। ল্যাস্কি বলেন, সপ্ততিতম বৎসর বয়সে বিচারপতির অবসর গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য, নাতিশীতোষ্ণ দেশে আরও কম বয়সে বিচারপতিকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

(৪) **বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা (Salaries and Emoluments of Judges) :** নীতির দিক হইতে বিচারকগণের বেতন ও ভাতা এমন হওয়া উচিত যাহাতে শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার না করেন। বেতন কম হইলে অর্থাভাবে বিচারকগণ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। কার্যকাল, বেতন ও ভাতার হার বিশেষ পরিবর্তিত হওয়া উচিত নয়। কারণ বেতনের হার পরিবর্তনের আশঙ্কা তাঁহাদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারে। আবার শাসনবিভাগের মঞ্জুরির উপরও এই বেতন ও ভাতা ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন নয়।

(৫) **বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Judiciary) :** বিচার

বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের উপর। শাসন বিভাগের উপর যদি বিচার বিভাগের বেতন অনুমোদনের ভার অর্পিত হয় এবং বিচারকগণকে নিয়োগের ভার অর্পিত হয় অর্থাৎ শাসন বিভাগের উপর বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার অর্পিত হয়, তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, এই স্বতন্ত্রীকরণ, এই নিয়োগ পদ্ধতি এবং অপসারণ পদ্ধতি সবই নির্ভর করে রাষ্ট্রিক কাঠামোর উপর। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণীই সরকারের এই তিনটি বিভাগ নিয়ন্ত্রিত করে। আবার বিচারকগণ যে বয়সে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হন, তাহাতে স্বভাবতঃই তাঁহারা রক্ষণশীল হইয়া থাকেন। আবার ল্যাস্কি বলেন, বিচারপতিগণ উচ্চশিক্ষা পান এবং যে শ্রেণী হইতে তাঁহারা আসেন তাহা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং যে পরিবেশে তাঁহারা বাস করেন তাহাতে প্রগতিশীল কোন মতবাদ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। আবার শ্রেণী-স্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ হিসাবে যে আইন প্রণীত হয় তাহাকেই বিচারকগণ বলবৎ করেন। অতএব শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাঁহারা কোন কিছুর কথা চিন্তা করিতে পারেন না। এইদিক হইতে বলা যায় যে, বিচার বিভাগও শ্রেণী-স্বার্থকে বলবৎ রাখিবার যন্ত্রবিশেষ। সরকারের এই তিনটি বিভাগের মৌলিক উদ্দেশ্য এক হওয়ায় ইহাদের মধ্যে যে স্বতন্ত্রীকরণ করা হয় তাহাকে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ বলা চলে না।

সারসংক্ষেপ

সরকারের তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে ; যথা, ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

ব্যবস্থা বিভাগ : এই বিভাগের দুইটি পরিষদও থাকিতে পারে আবার একটি পরিষদও থাকিতে পারে। আইনসভার কার্যাবলী হইল : (১) আইন প্রণয়ন, (২) আলোচনা করা, (৩) অর্থবিষয়ক কার্য, (৪) শাসনবিষয়ক কার্য, (৫) বিচারবিষয়ক কার্য।

সকল সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে এই বিভাগই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে অন্যান্য বিভাগ তাহাকে বলবৎ করে।

এক-পরিষদীয় ও দ্বি-পরিষদীয় এই দুইভাগে আইনসভাকে ভাগ করা যাইতে পারে। দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার অনেক ত্রুটি থাকিলেও বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই দ্বি-পরিষদীয় আইনসভা প্রচলিত আছে।

শাসন বিভাগ : শাসন বিভাগ আইনকে বলবৎ করে। এই বিভাগ রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারী কর্মচারীদের লইয়া গঠিত। এই বিভাগের কার্যাবলী হইল : (১) আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা করা, (২) পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য করা, (৩) যুদ্ধ পরিচালনা করা, (৪) অর্থসংক্রান্ত কার্য করা, (৫) আইন প্রণয়ন-বিষয়ক কার্য করা, (৬) বিচার-বিষয়ক কার্য করা, এবং (৭) অন্যান্য কার্য করা। এই বিভাগ যদি নিরপেক্ষ না হয় তবে নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হইবে।

বিচার বিভাগ ঃ বিচার বিভাগ বিচার করে এবং আইনকে প্রয়োগ করে। বিচার বিভাগের কার্যাবলী হইল ঃ (১) আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা, (২) আইন সৃষ্টি করা, (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্ব করা, (৪) শাসন বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া এবং (৫) শাসন-সংক্রান্ত কার্য করা।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপরই ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণ নির্ভর করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে—(ক) নিয়োগপদ্ধতির উপর, (খ) কার্যকালের উপর, (গ) পদচ্যুতির উপর, (ঘ) বেতন ও ভাতার উপর, (ঙ) বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের উপর।

১৭ | # সরকারের বিভিন্ন রূপ
রাজতন্ত্র, সামরিক স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র
(Forms of Government—Monarchy, Military Dictatorship & Aristocracy

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ (Classifcation of States) : প্রত্যক রাষ্ট্র একই উপাদানে গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। অবশ্য, অনেক সময় বাহ্য বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা হইয়াছে ; যেমন বৃহৎ রাষ্ট্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, ধনশালী রাষ্ট্র, শক্তিশালী রাষ্ট্র ও দুর্বল রাষ্ট্র প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা হইয়াছে ; কিন্তু, এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ না করিয়া সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিতে চান। কিন্তু সকল দেশের সরকারের কর্তব্য এক হওয়ায় অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা, বিচার-ব্যবস্থা প্রভৃতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় সরকারের শ্রেণীবিভাগ করাও যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশে ইহার প্রকারভেদ দেখা যায়।

বাহ্য বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

বস্তুতঃ উপরোক্ত দুইটি মতবাদেরই যৌক্তিকতা রহিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দুইটি মতবাদ অনুসারেই রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ করার সন্ধান পাওয়া যায়। পৃথকভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ এবং একই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ : রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগের সন্ধান এ্যারিস্টটলের সুপ্রসিদ্ধ পালিটিক্‌স্‌ (Politics) গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ্যারিস্টটল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্যের নির্দেশ করেন নাই। তিনি সরকারের গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এ্যারিস্টটল তিনটি সূত্র ধরিয়া গ্রীক্‌ নগর-রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এই তিনটি সূত্র হইল—(১) সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারীর সংখ্যা, (২) স্বাভাবিক রূপ অর্থাৎ, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ও (৩) বিকৃত রূপ অর্থাৎ যেগুলি শাসকশ্রেণীর স্বার্থের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এ্যারিস্টটল রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :

সার্বভৌমের সংখ্যা	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
একজনের শাসন (Government of one)	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বৈরতন্ত্র (Tyranny or Despotism)
কতিপয় লোকের শাসন (Government of the Few)	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	ধনিকতন্ত্র বা মুখ্যতন্ত্র (Oligarchy)
বহুজনের শাসন (Government of the Many)	গণতন্ত্র (Polity)	জনতাতন্ত্র (Democracy or Mobocracy)

সমালোচনা ঃ প্রথমতঃ সমালোচকগণের মতে এ্যারিস্টট্‌ল প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ অচল। তিনি শুধু গ্রীক্‌ নগর-রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। বর্তমানের বৃহদায়তন রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। স্ট্রং-কে (Strong) অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, এ্যারিস্টটল যে 'রাজতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বর্তমানের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে পারে না; কারণ, বর্তমানের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সংমিশ্রণে গঠিত এক প্রকারের রাষ্ট্র। আরও বলা হয় যে, আধুনিক সরকারের প্রকৃতিই হইল মিশ্র প্রকৃতি। আবার এ্যারিস্টট্‌লের রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু বর্তমানের সকল রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত নয়। এ্যারিস্টট্‌ল অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক্‌ নগর-রাষ্ট্রের কাঠামোর ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। ইতিহাসের বিবর্তনে যে রাষ্ট্রচরিত্র পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইলে এ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা যায় না। এ্যারিস্টট্‌লের আমলের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো আর বর্তমানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো মূলতঃ একই প্রকৃতির। জেলিনেক, বার্জেস, ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ এ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের মতে, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র আধুনিক রাষ্ট্রেরও শ্রেণীবিভাগ। অবশ্য বলা হয় যে, গণতন্ত্র বলিতে বর্তমানে কোন বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র বুঝায় না। ইংল্যান্ডের মতো রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পার্লামেন্টীয় ধরনের গণতন্ত্র যে চালু থাকিতে পারে তাহার সন্ধান এ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগে পাওয়া যায় না।

এ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ ও বর্তমান ধারণা

দ্বিতীয়তঃ, এ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। তিনি যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহাতে শাসনপদ্ধতিকেই রাষ্ট্র প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ সংখ্যানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁহার স্বাভাবিক ও বিকৃত রূপ অনুসারে রাষ্ট্রের যে প্রকৃতি উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বর্তমান কালের দৃষ্টিকোণ হইতে মূল্যহীন।

চতুর্থতঃ, এ্যারিস্টট্‌ল যে গণতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ আর বর্তমানের গণতন্ত্র পরোক্ষ।

উপসংহারে বলা যায়, এ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগের দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই শ্রেণীবিভাগ যে রাষ্ট্র চিন্তাক্ষেত্রে তাঁহার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ (Other Classifications of the States) ঃ পরবর্তীকালে ব্লুন্টস্‌লি, জেলিনেক, বার্জেস প্রমুখ লেখকগণ এ্যারিস্টট্‌লের সংখ্যানীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করায় এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ না করায় এই সকল লেখকগণের শ্রেণীবিভাগও বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সকল রাষ্ট্রের উপাদান এক হওয়ায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকৃতির সরকারের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে।

গেটেল বলেন যে, সরকারের বিভিন্ন রূপের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ করা যায় (..."the most satisfactory classification is based on the similarities and differences of Governmental forms.")। কারণ একমাত্র সরকারের বিভিন্ন রূপ অনুসারেই রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। কিন্তু এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করিলে তাহা রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ হইবে না, তাহা হইবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ। তাই বর্তমান আলোচনা সরকারের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Governments)ঃ সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগের সন্ধান পাওয়া যায় ম্যারিয়ট (J. A. R. Marriot) এবং ডাঃ লিককের (Dr. Stephen Leacock) লেখার মধ্যে। ম্যারিয়ট এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগকে মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাকে আধুনিক কালোপযোগী করিবার জন্য দুইটি নীতি অনুসরণ করেন ঃ (১) শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বন্টননীতি (Territorial Distribution); (২) শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের সম্পর্কনীতি। প্রথম নীতি অনুসারে সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক —এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। আর দ্বিতীয় নীতি অনুসারে সরকারকে পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত—এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

ডাঃ লিকক্, ম্যারিয়টকে অনুসরণ করিয়া ম্যারিয়টের শ্রেণীবিভাগকে আরও স্পষ্ট করিয়া যে শ্রেণীবিভাগ করেন তাহাকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যায় ঃ
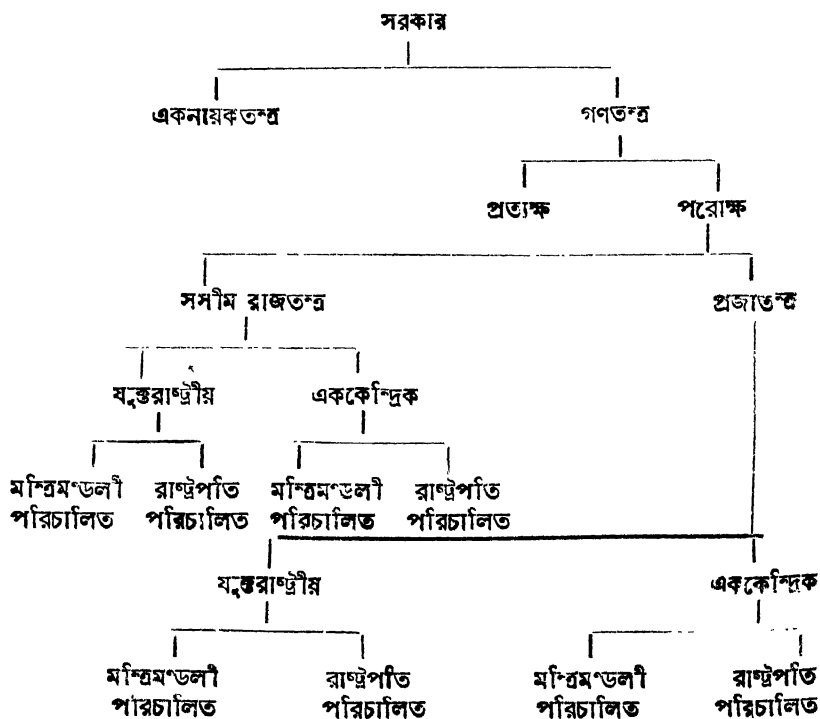
লিককের শ্রেণীবিভাগে দেখা যায় যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আবার একনায়কতন্ত্রে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার উল্লেখ তিনি করেন নাই। এতদ্ব্যতীত অভিজাততন্ত্রের সে রূপ সামরিক চক্রীদল (Clique or Junta) কর্তৃক শাসনভার করায়ত্ত করার মধ্যে বর্তমানে প্রকাশ পায় তাহারও উল্লেখ তিনি করেন নাই। এই ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগকে সাজানো যায় :

এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আধুনিক রাষ্ট্রকে প্রথমতঃ স্বৈরতন্ত্র, একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। তারপর আবার এই তিন বিভাগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। আধুনিক শ্রেণীবিভাগে প্রধানতঃ তিনটি নীতির উপর নির্ভর করা হইয়াছে। যথা—(১) সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারীর সংখ্যানীতি, (২) রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি, এবং (৩) শাসন-ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টননীতি। নিম্নে রাষ্ট্র ও সরকারের প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেণীবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Modern State and Government) : আধুনিককালে রাষ্ট্র ও সরকারকে এক অর্থে ধরা হয় না। যেমন, ইংল্যান্ডের শাসন-ব্যবস্থা হইল রাজতান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনগণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা হয়। এখানে শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা কাহার হস্তে তাহার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের চরিত্র ঠিক করা হইতেছে। শাসন-ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসন-ব্যবস্থার পরিচালনাভার যেহেতু জনগণের হস্তে সেইহেতু রাষ্ট্রের চরিত্রও গণতান্ত্রিক হইয়াছে। সরকার রাষ্ট্রের অঙ্গ। এই অঙ্গের মধ্যে রাষ্ট্র মূর্ত হইয়া উঠে। সরকারের চরিত্রানুসারে যেহেতু রাষ্ট্রের চরিত্র ঠিক করা হইতেছে সেইহেতু আধুনিক রাষ্ট্র-চিন্তাবীরগণ নিম্নলিখিতভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ একসঙ্গে করিয়াছেন। পরপৃষ্ঠায় শ্রেণীবিভাগের ছকটি দেওয়া গেল।

স্বৈরতন্ত্র
(Despotism)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ স্বৈরতন্ত্রকে একনায়কত্বের সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একনায়কত্ব আর স্বৈরতন্ত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ, একনায়কত্বের সহিত জনমতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকে। আর স্বৈরতন্ত্রে তাহা থাকে না। অর্থাৎ শাসক যদি স্বৈরাচারী হয় তাহা হইলে তাহাকেই বলে স্বৈরতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্রকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয় ; যথা, রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, (খ) সামরিক স্বৈরতন্ত্র এবং (গ) অভিজাততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র। নিম্নে এই ত্রিবিধ স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

(ক) **রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র :** রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একজনই থাকে রাষ্ট্রনায়ক। সুতরাং ইহাকে একনায়কত্বের পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই একনায়ক রাজা যদি স্বেচ্ছাচারী হয় তবে তাহাকে রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র বলা যাইতে

আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Modern State and Government)
স্বৈরতন্ত্র (Despotism)
একনায়কত্ব Dictatorship
গণতন্ত্র (Democracy)
রাজতান্ত্রিক (Monarchical)
সামরিক (Military)
অভিজাততান্ত্রিক (Aristocracy)
ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Personal)
দলগত (Party)
শ্রেণীগত (Class)
প্রজাতন্ত্র (Republic)
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)
যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)
এককেন্দ্রিক (Unitary)
যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)
এককেন্দ্রিক (Unitary)
মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)
মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)
মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত (Perlia-mentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)
মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)

পারে। ভারতবর্ষের মহম্মদ বিন তোগলক, ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর শাসন-ব্যবস্থাকে রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের নজীর হিসাবে দেখানো যায়। চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন : আমিই রাষ্ট্র ("I am the State")। এই উক্তি হইতে চতুর্দশ লুই-এর রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণাটি সুস্পষ্ট হয়। রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রে রাজার আদেশই আইন। রাজাই বিচারক। রাজার আদেশই যদি আইন হয় তাহা হইলে রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না। তিনি যে আদেশ দ্বারা অন্যায় করিবেন সেই আদেশই আইন হইবে। সুতরাং তিনি আর আইনভঙ্গ করিতে পারেন না। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনি। জনগণের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে না। তিনি যদি নীতিভ্রষ্ট হন তাহা হইলে স্বেচ্ছাতন্ত্র চরমে পৌঁছাইবে।

বৈশিষ্ট্য

রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল : (১) রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ শাসনভার ন্যস্ত একজন রাজার উপর ; (২) তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে শাসনক্ষমতা অধিকার করেন এবং (৩) তাঁহার আদেশই আইন। তিনি সকল ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। রাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ত্র, কিন্তু সকল একনায়কত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয় না।

আবার রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; যথা, (১) রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, (২) নির্বাচিত রাজতন্ত্র এবং (৩) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নেপালের রাজতন্ত্রকে রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র বলা যায়। আর প্রাচীন ভারতে, রোমে ও পোল্যাণ্ডে নির্বাচিত রাজতন্ত্রের উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্তমান ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে। নির্বাচিত রাজতন্ত্রে গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধাগুলির অধিকাংশই নাগরিকগণ পাইয়া থাকে। আর নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে শাসনক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। রাজা শুধু নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রের নায়ক। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে।

ত্রিবিধ রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা :
(১) স্বৈরতন্ত্র
(২) নির্বাচিত
(৩) নিয়মতান্ত্রিক

রাজতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits & Defects of Absolute Monarchy) : রাজতন্ত্রকে যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইল তাহার মধ্যে চরম রাজতন্ত্র বা রাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রেরই নামান্তর। কারণ ইহাতে রাজা হয় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নচেৎ তাঁহার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজতন্ত্রে রাজা চরম ক্ষমতার অধিকারী হন এবং ইচ্ছা করিলে রাজা স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। এই চরম রাজতন্ত্রের গুণাগুণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) **চরম রাজতন্ত্রের সপক্ষে যুক্তি হইল—সমাজ** একদিনেই সুসভ্য হয় নাই। সমাজকে সভ্য করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল শৃঙ্খলা ও আনুগত্য। বর্বরসুলভ স্বেচ্ছাচারিতার যুগে রাজতন্ত্র মানুষকে আনুগত্য ও শৃঙ্খলা-পরায়ণতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সুসংবদ্ধ সমাজ জীবন গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। তাই জন স্টুয়ার্ট মিল বর্বরদের জন্য রাজতন্ত্রকেই উপযুক্ত শাসন-ব্যবস্থারূপে গণ্য করিয়াছিলেন। আবার রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করার জন্যই সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে জনসাধারণকে আনুগত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা সহজতর

হইয়াছিল। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রাজা জনগণের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিয়া বর্বর মানুষকে সুসভ্য করিতে সহায়তা করিয়াছেন।*

আবার জাতীয় রাজতন্ত্র (National Monarchy) জাতীয় ভাবের সৃষ্টি করিয়া যে সমাজে প্রভূত সংস্কার সাধন করিতে সক্ষম হয় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের অধীনে ইউরোপের সংস্কারের মধ্যে।

(ক) ট্রিট্‌স্‌কে রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেন এই কারণে যে, রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সাধারণতঃ সরল হয় এবং শাসননীতি ও শাসনকার্য পরিচালনায় ঐক্য বজায় থাকে। কিন্তু এই সকল গুণ থাকা সত্বেও রাজা যখন উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন অধিকার করেন তখন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, রাজা সুযোগ্যভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারিবেন। আবার রাজা ইচ্ছা করিলে স্বেচ্ছাচারীও হইতে পারেন, কারণ তাঁহার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করার মতো অন্য কোন ক্ষমতা নাই।

ত্রুটি (Demerits) : (ক) চরম রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্রে রাজপদ প্রাপ্তি ঘটে। ফলে সুশাসন দৈবের উপর নির্ভর করে। সেন্ট অগাস্টিন বলেন : অজ্ঞ রাজা হইলেন মুকুটধারী গাধা ("an illiterate King is a crowned ass'.—*St Augustine*)। সুশাসনের জন্য রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন করা যায় কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে যিনি রাজা হইবেন তিনি সুযোগ্য শাসক নাও হইতে পারেন। লীককের ভাষায় বলা যায়, ''উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা, উত্তরাধিকারসূত্রে কবি অথবা গণিতবিদের ন্যায় অকল্পিত।''

(খ) চরম রাজতন্ত্রে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রজাবর্গের আর কোন স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে না। ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বার বার প্রজাবর্গ বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়াছে।

(গ) ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান বলেন যে, "উত্তম স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বশাসন শ্রেয়'' ('Better bad Government under self-Government than good Government under alien dictatorship".)। সরকারের কাজ হইল নাগরিকদের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। রাজতন্ত্রে জনগণকে রাষ্ট্র-কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। ফলে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে বটে কিন্তু সুনাগরিক সৃষ্টি হয় না। তাই স্বশাসনকে শ্রেয় বলা হয়, কারণ স্বশাসনে নাগরিকগণ রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠে, জনগণ সচেতন হয়। আরও মহাকবির ভাষায় বলা যায় "নিগুর্ণ স্বধর্ম শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ''।

উপসংহারে বলা যায়, প্রাচীনকালে বর্বরসুলভ মানুষকে আনুগত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য প্রজাপালক রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হইত। কিন্তু প্রাচীনকালেও রাজাকেও কোন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হইত। কখনো কখনো রাজাকে তাহার কাজের জন্য ধর্মের নিকট দায়ী থাকিতে হইত। মহাভারতে শান্তি পর্বে রাজাকে স্বৈরক্ষমতা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা প্রদানের কথা

*"Despotism is a legitimate mode of government for dealing with the barbarians, provided the end be their improvement and the means be justified by actually effecting that end".—*J. S. Mill.*

উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজাকে ধর্মের নিকট দায়ী থাকিতে হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। ম্যাকিয়াভেলীর রাজাকে নীতি বিরোধী কাজ করিবার পরামর্শ দান রাষ্ট্র দর্শনে কোন দিনও সমর্থিত হয় নাই। রাজাকে প্রজাপালক হইতে হইবে, প্রজার ইচ্ছায়ই রাজা কাজ করিবেন। তাই রামকেও প্রজার ইচ্ছায় সীতাকে বনবাসে পাঠাইতে হইয়াছিল।

নির্বাচিত রাজতন্ত্রে রাজা নির্বাচিত হন। ইহা প্রায় আধুনিক গণতন্ত্রের মতোই, তাই পৃথকভাবে আর ইহার অলোচনা করা হইল না। রাজা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। মাত্র জনগণের ইচ্ছায় তাহাকে শাসন করিতে হইবে।

(খ) সামরিক স্বৈরতন্ত্র

(Military Dictatorship or, Junta)

বর্তমানে প্রায়ই কোন এক সেনানায়কের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (coup) সংঘটিত হইতে দেখা যায়। এই বিদ্রোহে জয়লাভ করিলে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা তাহার হাতেই চলিয়া আসে। পূর্বেকার সরকারের বহু লোককে হত্যা করিয়া তিনি স্বেচ্ছাচারী শাসক হিসাবে পরিগণিত হন। জনগণের সমর্থন সংসা তিনি চান না। অবশ্য, অভিজাততন্ত্রের আওতায় সামরিক চক্রীদল (clique or zunta) কর্তৃক শাসনভার করায়ত্ত করার উদাহরণ বর্তমানে লক্ষ্য করা যায়। এখানে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইল।

অভিজাততন্ত্র

(Aristocracy)

প্রাচীন গ্রীসে যে অভিজন (aristos) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠব্যক্তির শাসন বর্তমান ছিল তাহাকেই বলা হইত অভিজাততন্ত্র (aristocracy)। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যখন সর্বসাধারণের কল্যাণে শাসন করিতেন তখন বলা হইত অভিজাততন্ত্র। আর এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যখন ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করিতেন তখন শাসন-ব্যবস্থা যে বিকৃতরূপ ধারণ করিত তাহাকে বলা হইত মুখ্যতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র (oligarchy)। বর্তমানে অভিজাততন্ত্র বলিতে আর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন বুঝায় না। রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মগত এবং ধনগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কোন এক সামাজিক শ্রেণী যখন রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে তখনই অভিজাততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায়ও দেখা যায়, শাসন-ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয় মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা। অর্থাৎ, মাত্র কয়েকজন লোকের নেতৃত্বেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সুতরাং, গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তবে সুস্পষ্ট সীমারেখার নির্দেশ না করা গেলেও বলা যাইতে পারে যে, জনগণের শাসন ক্ষমতাকে এবং শাসন-কর্তৃত্বকে অবিশ্বাস করিয়া যদি শুধু অল্প কয়েকজনের শাসনকর্তৃত্বে বিশ্বাস করা হয় তবে অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি জনগণের শাসনক্ষমতা ও শাসন-কর্তৃত্বের উপর অটুট বিশ্বাস রাখিয়া অল্প

কয়েকজনের শাসনে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অভিজাততন্ত্র স্বৈরশাসনও প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থে ধনিকগোষ্ঠী স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের স্বার্থ পূরণ করে।

অভিজাততন্ত্রের গুণাগুণ : অভিজাততন্ত্রের সপক্ষের যুক্তিকে মিলের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। মিল বলেন : "শাসনকার্যে স্থায়ী উদ্যমশীলতা ও দক্ষতার দিক দিয়া ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য শাসন-ব্যবস্থা-সমূহের অধিকাংশই হইল অভিজাততন্ত্র" (..."The Governments which have been remarkable in history for sustained ability and vigour···have generally been aristocracies.")। অভিজাততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যা অপেক্ষা গুণের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অল্প কয়েকজন দক্ষ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলিয়া ইহা গণতন্ত্র অপেক্ষা কাম্য শাসন-ব্যবস্থা।

ত্রুটি : কিন্তু অভিজাততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটির অন্ত নাই। প্রথমতঃ কারলাইল (Carlyle) যদিও বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দ্বারা শাসিত হওয়াই মূর্খের চিরন্তন সম্মান ("It is the everlasting privilege of the foolish to be governed by the wise.")। কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণ নিজেদেরকে মূর্খ বলিয়া মনে করে না এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হওয়াকেও সম্মানের বলিয়া মনে করে না।

দ্বিতীয়তঃ, অভিজাততন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার জনসাধারণকে মূর্খ বলিয়া ধরিয়া লইলে এই মূর্খ ব্যক্তিদের দ্বারা কখনই প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারে না। কারণ মূর্খদের জ্ঞানী ও অজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। অতএব সুশাসক নির্বাচন করা খুবই শক্ত।

তৃতীয়তঃ, অভিজাততন্ত্রে শাসকবর্গ যে রাষ্ট্রযন্ত্রকে কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত করিবে তাহার কোন শর্ত নাই। তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই কায়েম করে। সাধারণতঃ তাহাই হইয়া থাকে। সর্বোপরি অভিজাততন্ত্র রক্ষণশীল হইতে বাধ্য। এই রক্ষণশীলতার জন্য ইহা প্রগতির অন্তরায় হইয়া বিপ্লবকে ডাকিয়া আনে। ফলে ইহা অস্থায়ী হয়।

উপসংহারে বলা যায়, অভিজাততন্ত্রে শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হয় এবং ইহা যদি সমাজের কল্যাণে সচেষ্ট হয় তবে নিশ্চিত ভাবেই ইহা শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা। কিন্তু যেহেতু অভিজাতগণ যে কল্যাণে কাজ করিবে এমন কোন শর্ত নাই সেইহেতু এই শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট মন্তব্য করা যায় না।

সারসংক্ষেপ

সরকারের বিভিন্ন রূপ : রাজতন্ত্র, সামরিক স্বৈরতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র। সরকারের বিভিন্ন রূপ অনুসারে রাষ্ট্র ও সরকারকে বিভক্ত করা হইয়াছে। এ্যারিস্টটল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্যের নির্দেশ করেন নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহকারীর সংখ্যা, স্বাভাবিক রূপ এবং বিকৃত রূপের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র

ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। পরবর্তিকালে ব্লান্টসলি এবং আরও অনেকে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। বর্তমানে (১) সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারীর সংখ্যা, (২) শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক এবং (৩) শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

প্রথম নীতি অনুসারে সরকারকে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে পার্লামেন্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আর তৃতীয় নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

রাজতন্ত্রে রাজাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাজতন্ত্র আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) চরম রাজতন্ত্র, (২) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের অনেক দোষত্রুটি আছে বটে, কিন্তু অসভ্য মানুষকে সভ্য করার জন্য এক সময়ে রাজতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল।

অভিজাততন্ত্র : ইহা হইল কতিপয় লোকের শাসন। ইহা যদি জনগণের কল্যাণের জন্য হয় তবে ইহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। আর ইহা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থকে কায়েম করার জন্য হয় তবে ইহাকে মুখ্যতন্ত্র বলা হয়।

সামরিক স্বৈরতন্ত্র : সামরিক স্বৈরতন্ত্রে কোন সামরিক নায়ক রাষ্ট্র-ক্ষমতার মালিক হয়।

১৮ | সরকারের বিভিন্ন রূপ—একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র
(Dictatorship and Democracy)

আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন রূপের দ্বিতীয় পর্যায়ে একনায়কতন্ত্র ও তাহার বিভিন্ন রূপ এবং গণতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য এবং গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারের দ্বিতীয় পর্যায়ে একনায়কতন্ত্রকে ধরা হয়। নিম্নে একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল ঃ

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) : একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের নায়ক হইবেন একজন। একনায়কতন্ত্রকে আবার সাত ভাগে ভাগ করিয়া দেখানো যায় ; যথা, **(ক) ব্যক্তি-কেন্দ্রিক** (Personal), **(খ) আমলাতন্ত্র, (গ) দলগত** (Party dictatorship), **(ঘ) শ্রেণীগত** (Class dictatorship), **(ঙ) রাজতন্ত্র** এবং **(চ) সমাজতান্ত্রিক, (ছ) সামরিক একনায়কত্ব।**

ইতিহাস (History) ঃ একনায়কতন্ত্র নূতন নয়। প্রাচীন গ্রীসে অভিজাত-তন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া শক্তিশালী সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে (zunta) একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। রোমের ইতিহাসেও একনায়কতন্ত্রের নজীর পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে অলিভার ক্রমওয়েল সৈন্যবাহিনীর উপর ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী ও ইতালীতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানীতে হিটলার এবং ইতালীতে মুসোলিনী যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট দলের দলীয় নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১৭ সালে রুশদেশেও লেনিনের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টির দলীয় নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

একনায়কতন্ত্রের ইতিহাস

একনায়কতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি ঃ গ্রীক্ ও জার্মান রাষ্ট্র-চিন্তাবীরগণ যে দর্শন রচনা করেন তাহা একনায়কত্বের দার্শনিক ভিত্তি। জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেন, রাষ্ট্র পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদক্ষেপ ("State is the March of God on Earth")। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র একটি সদাসচেতন নৈতিক সত্তা ("A self-conscious ethical substance and a self-knowing and a self-actualising individual.")। কান্ট্ বলেন, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই উক্তি-গুলির মধ্য হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, রাষ্ট্রই প্রধান, মানুষ অপ্রধান। প্রথমে রাষ্ট্র পরে মানুষ। রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে মানুষের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, অধিকার উৎসর্গীকৃত হইবে। মানুষ ছিল পশু। রাষ্ট্রই তাহাকে মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে। গ্রীক্ ও জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। একনায়কত্বের আর একটি দার্শনিক ভিত্তি প্রকাশ পাইয়াছে নীৎসে (Neitzsche), ট্রিটস্কে (Treitschke) প্রভৃতির যুক্তির মধ্যে। নীৎসে এই ধারণা পোষণ করেন যে, প্রত্যেক জাতিকে শান্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া শক্তির সাধনা করিতে হইবে। কারণ দুর্বল কখনও বাঁচিতে পারে না। শান্তির নীতি দুর্বলের নীতি। ট্রিটস্কে রাষ্ট্রকে একটি শক্তির বিমূর্ত রূপ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রকর্তৃত্বের যুক্তি

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ উপরোক্ত দার্শনিক ভিত্তিকে স্মরণে রাখিয়া নিম্নে একনায়কতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) একনায়কতন্ত্র বিশ্বাস করে এক নায়ক, এক জাতি, এক রাষ্ট্র। ইহাতে কোন দলগত মতপার্থক্য থাকিবে না। রাষ্ট্রনায়ক হইবেন একজন আর দল থাকিবে একটি। দলের সাহায্যে এবং সামরিক শক্তির সাহায্যে সকল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ (totalitarianism) করিবেন রাষ্ট্রনায়ক। একনায়কতন্ত্রের সামরিক শক্তির সাহায্যে কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করা হয়।

(২) একনায়কতন্ত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রবণতা অত্যধিক। রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে, বৈদেশিকদিগের সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে, সামরিক দিকে, আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ ও সংস্কৃতি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) একনায়কতন্ত্রে সরকারী নীতি, পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দান করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। রাশিয়ার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য বহু প্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

(৪) একনায়কতন্ত্রে নায়ক তাহার ক্ষমতায় অধিষ্ঠানকে আইনসিদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। দেখা যায় যখনই কোন সামরিক উত্থানের নামে নায়ক বিদ্রোহ করিয়া ক্ষমতা অধিকার করেন তারপরই নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি তাঁহার ক্ষমতাধিকারকে আইনসিদ্ধ করিয়া থাকেন।

(৫) একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিপুণ গুপ্তচরব্যবস্থা (espionage system) প্রবর্তিত হয়। হিটলারের গ্যাস্টাপো (Gestapo) বাহিনী সোভিয়েত রাশিয়া অগপু (Ogpu) এবং মুসোলিনীর কালোকোর্তা বাহিনী (Black Shirt) সংবাদ সংগ্রাহক হিসাবে বিশেষ খ্যাত।

একনায়কতন্ত্র প্রসারের কারণ ঃ একনায়কতন্ত্রের প্রসারের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সংকট এবং বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য বাঁটোয়ারা লইয়া ঝগড়া যুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুদ্ধের মধ্যেই একনায়কতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর-কালে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও মুখ্যতন্ত্র (Economic Oligarchy) পাশাপাশি চলিবার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য, আইনের অনুশাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে দেখা দিয়াছে অপরিমেয় হতাশা, তীব্র অসন্তোষ এবং গণতন্ত্রের উপর অবিশ্বাস। ডঃ গুচ (Gooch) বলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে যখন এইরূপ মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে তখন একনায়কতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে দেখা যায় স্পেনের ন্যায় অনেক রাষ্ট্র সামরিক রাষ্ট্রের নীতিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং এশিয়ার অনেক দেশে সামরিক একনায়কত্ব (Military Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদ ঃ একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদ আলোচনা করার পূর্বে একনায়কতন্ত্রের সহিত স্বেচ্ছাতন্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন।

একনায়কতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্র

একনায়কতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না, কারণ, একনায়কতন্ত্রের সহিত জনমতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকে কিন্তু স্বেচ্ছাতন্ত্রে তাহা থাকে না। স্বেচ্ছাতন্ত্রে বা স্বৈরতন্ত্রে রাজা, সামরিক নেতা (Junta) অথবা অভিজাত শ্রেণীর হাতেই রাষ্ট্রের

সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। অতএব তাহাদিগকে সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না।

(ক) **ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র (Personal Dictatorship)**ঃ ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রে এক ব্যক্তির উপর সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জুলিয়াস সিজার ও সিনসিনেটাস প্রমুখকে একনায়কত্বে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল, মুসোলিনী যদিও ফ্যাসিস্ট দলের নেতাহিসাবে একনায়ক কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই ব্যক্তিগত একনায়কত্বে অভিষিক্ত হন। রাশিয়ার স্ট্যালিন যদিও সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু কাহারও কাহারও মতে শেষপর্যন্ত তাঁহাকেও ব্যক্তিগত একনায়কত্বে অভিষিক্ত করা হয়। স্ট্যালিনের (Stalin) বিরুদ্ধে Personality Cult (ব্যক্তিপূজা)-এর যে অভিযোগ আনা হয় তাহা হইতেই বুঝা যায় ব্যক্তিগত একনায়কত্ব রাশিয়ায় কতদূর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(খ) **আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)**ঃ অনেক সময় দেখা যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে কার্যতঃ অধিকাংশ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিতে দেওয়া হয়। গার্ণারের মতে আমলাতন্ত্র হইল এমন এক শাসন-ব্যবস্থা যেখানে সরকার সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সরকারী দপ্তরগুলি কর্মকর্তারাই সরকারী সিদ্ধান্ত স্থির করেন এবং প্রধান প্রধান নীতিগুলি নির্ধারণ করেন ("Strictly speaking a bureaucratic government is one which is carried on largly by ministrial bureaus and in which improtant policies are determined and decisions rendered by the administrative chiefs of such bureaus."—*Garner*)।

আমলাদের উপর শাসন পরিচালনার ভার অর্পণ করার নাম আমলাতন্ত্র। গণতান্ত্রিক বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে আইনসভা আইনের মূলনীতি নির্ধারণ করিয়া সরকারী কর্মচারীদের নিকট তাহা প্রেরণ করে তাহাকে কার্যকর করার জন্য। এই আইনকে কার্যকর করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ ব্যক্তিদের লইয়া এক কর্মচারীমণ্ডলী গঠন করা হয়। এই কর্মচারীবৃন্দই প্রকৃতপক্ষে শাসন পরিচালনা করে। দপ্তরশাহী এই শাসন পরিচালনাকেই আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিজেদের যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা জনমতকে বিশেষভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। বিভাগীয় নিয়মকানুনের শুষ্ক বাঁধনে বদ্ধ করিয়া অতি ধীর গতিতে তাঁহাদের কার্যাবলী চালু করেন। বাংলায় যাহাকে 'লালফিতার শাসন' (Red tapism) বলা হয়, তাহাই আমলাতন্ত্রে চালু হয়। জনপ্রতিনিধিগণ যেহেতু নিজেরা শাসন পরিচালনার খুঁটিনাটি দিকটা দেখিতে পারেন না এবং তাঁহাদের কার্যকালও সীমাবদ্ধ এবং নির্বাচনে জয়লাভ করিবার উপর নির্ভরশীল সেইহেতু স্থায়ী সরকারী কর্মচারিবৃন্দের হাতে তাঁহাদের অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয় এবং স্থায়ী সুদক্ষ কর্মচারীরা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুর্বলচেতা মন্ত্রীকে তাঁহাদের ইচ্ছামতো কর্মক্ষেত্রে পরামর্শ দিবার নামে নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করিয়া থাকেন। আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জনগণের আবেদন দপ্তরবন্দী হইয়া থাকে। আবার বিভাগীয় সিদ্ধান্তকে আনুষ্ঠানিক বহু প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়া অতিক্রম করিয়া কার্যকর করিতে হয় বলিয়া শেষ পর্যন্ত যখন সে কার্য সম্পাদিত হয় তখন তাহার আর প্রয়োজন থাকে না।

আমলাতন্ত্রের ত্রুটি

ব্রিটিশ আমলে ভারতে এই আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু হয়। আমলাতন্ত্রের ত্রুটি সম্বন্ধে ব্রিটিশ আমলে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন বহু সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য, সরকারী আমলাদের যোগ্যতা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে অনেকেই প্রশংসার চক্ষে দেখিয়াছেন। বর্তমানের স্বাধীন ভারতেও আমলাতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ তাহার নিজের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য যে আমলাতন্ত্রের পত্তন করিয়াছিল আজও সরকারী কর্মচারিবৃন্দ তাহার ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে সরকারী কাজের পরিমাণ ও জটিলতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে সরকারী আমলাদের ক্ষমতাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমলাতন্ত্রে: ক্ষমতা বৃদ্ধি

(গ) **রাজতন্ত্র ঃ** রাজা যেহেতু রাষ্ট্রের নায়ক সেইহেতু কেহ কেহ রাজতন্ত্রকেও একনায়কতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। একনায়কতন্ত্রে জনমতের সহিত রাষ্ট্র-ক্ষমতার সম্পর্ক থাকে কিন্তু রাজতন্ত্রে তাহা থাকে না। অবশ্য নির্বাচিত বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সহিত জনমতের সম্পর্ক থাকে। তাই ক্ষেত্রবিশেষে রাজতন্ত্রকে অনেকে একনায়কতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করেন না।

(ঘ) **দলগত ও (ঙ) শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র ঃ** অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্রের অধীন ("All States in the world are in essence, class dictatorship.")। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে যে ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্র শাসন করে তাহা শ্রেণীগত একনায়কত্বের নামান্তর মাত্র।

আবার দলগত একনায়কত্ব আর শ্রেণীগত একনায়কত্বকে সমার্থক বলিয়াও কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। কারণস্বরূপ বলা হয়, দল হইল একটি শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ। প্রত্যেকটি দলই যখন এক একটি শ্রেণীর প্রতিভূ তখন যে দল ক্ষমতায় আসীন হইবে তখন সেই দল যে শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ সেই শ্রেণীরই স্বার্থ বজায় রাখিবে। অবশ্য আবার অনেকে বলেন, দলগত একনায়কত্ব আর শ্রেণীগত একনায়কত্ব এক নয়। কারণ রাষ্ট্র যদি বহু দলের স্বীকৃতি দেয় তাহা হইলে ক্ষমতায় আসীন দল বিরোধী দলকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে জনমতকে বিরোধীদলের সমর্থনে আনয়ন করিয়া বিরোধীদল পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবে। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো যদি একটি দলই রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে শ্রেণীগত আর দলগত একনায়কত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না।

(চ) **সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও নাৎসী-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব ঃ** নিম্নে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তুলনা করা হইতেছে—

(১) ইতালীর ফ্যাসিবাদ এবং (২) জার্মানীর নাৎসীবাদের মূল বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্র এবং জাতি। ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। নাৎসীবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় জাতির কর্তৃত্ব।

(৩) আর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মূল বিষয়বস্তু হইল শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থাকে

প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয়। অতএব রাষ্ট্রই সব কিছু নয়।

(ক) ফ্যাসিবাদ (Fascism) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২২ সালে ইটালীতে মুসোলিনীর ক্ষমতাদখলের মধ্য দিয়া ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্যাসিবাদের জন্ম

১৯২৩ সালে স্পেনে প্রাইমো ডি রি ভেরা এবং ১৯২৩ সালে পোলাণ্ডে পিলসুড্স্কি এবং ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন, এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, পর্তুগাল প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে হয় রাজতন্ত্রের নামে, নয় সম্পূর্ণ নগ্নরূপে স্বৈরাচার ও একনায়কত্ব দেখা দেয়। এশিয়ার জাপানে জাপানী একনায়কত্ব এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বহু রাষ্ট্রে অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইতালীতে ফ্যাসিস্টদল বিভিন্ন মতবাদের সংমিশ্রণে একটি মতবাদের প্রচার করে। এই মতবাদই ফ্যাসিবাদ। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ হিসাবে ফ্যাসিবাদ **গণতন্ত্রবিরোধী,**

ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য

সমাজতন্ত্রবিরোধী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী এবং **যুদ্ধের পূজারী**। রাষ্ট্রকেই একমাত্র সার্বভৌম বলিয়া ধরা হয় (Primacy of the State is the basis of Fascism)। ফ্যাসিস্ট নায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র সর্বদাই জনগণের সহিত সম্পর্কিত থাকিবে, তাহাদের স্বার্থসাধন করিবে। ফ্যাসিবাদ জাতিসত্তার গৌরব প্রচার করে। নিম্নে ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(১) ফ্যাসিবাদী ধারণায় রাষ্ট্র সর্বাত্মক, সর্বশক্তিমান। রাষ্ট্রই সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবে। রাষ্ট্রই ব্যক্তির সকল ভার গ্রহণ করিবে। ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপরে ব্যক্তি নয়। রাষ্ট্রের প্রাধান্য

(১) রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য

সর্বত্র স্বীকৃত হইবে। ব্যক্তির স্বার্থের সহিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সংঘর্ষ বাধিলে রাষ্ট্রীয় স্বার্থই কার্যকর হইবে আর ব্যক্তির স্বার্থকে ধ্বংস করা হইবে। ইহা ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে।

(২) ফ্যাসিবাদ **যুদ্ধের পূজা** করে। ইহা শান্তির বিরোধী। ইহার

(২) যুদ্ধের পূজারী

মূলভিত্তি সাম্রাজ্যবাদ। মুসোলিনীর ভাষায় শান্তি হইল ভীরুদের স্বপ্ন (Dream of the cowards)।

(৩) ফ্যাসিবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করিতে চায় না। ইহা

(৩) সমাজতন্ত্রের বিরোধী

সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চায় কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করিতে চায় না। আর সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করে ; এই কারণে ফ্যাসিবাদ সমাজতন্ত্রের বিরোধী।

(৪) ফ্যাসিবাদ বীরের পূজা করে এবং গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে। ইহা পার্লামেণ্ট, সংবিধান ও নির্বাচনকে নিরর্থক বলিয়া মনে করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের

(৪) গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে

সুপরিচালনার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যেও এমন সুযোগ্য নেতা থাকিতে পারে, যিনি রাষ্ট্রযন্ত্রকে জাতির উন্নতিতে সাম্রাজ্যের বিস্তারে কাজে লাগাইতে পারিবেন।

উপসংহারে বলা যায়, ফ্যাসিবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে চায়। নেতার আজ্ঞাকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখিয়া তাহাকে মান্য করিতে চায়। জাতিসত্তার গৌরব গাথায় ইহা মুখর। এবং বিশ্বশান্তিকে ধ্বংস করিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে চায়। ফ্যাসিবাদের কোন ভাবাদর্শ নাই। তাই জনগণ ইহাকে গ্রহণ করে নাই। মুসোলিনীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীতে ফ্যাসিবাদের সমাপ্তি ঘটে।

(খ) নাৎসীবাদ (Nazism) ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান হয়। নাৎসীবাদের প্রবর্তন করেন হের হিটলার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানীর করুণ দৈন্য ও গ্লানিপূর্ণ অবস্থাই এই মতবাদের অভ্যুত্থানের কারণ। জার্মানগণ মনে করিতেন যে, তাঁহারা আর্যবংশসম্ভূত এবং জগতের শ্রেষ্ঠ নরকুল। তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নাৎসীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

নাৎসীবাদের সারকথা

নাৎসীবাদ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের একাধিপত্য বিস্তারের পক্ষপাতী। এই মতবাদ একদলীয় শাসনে বিশ্বাসী। নাৎসীবাদ অনুসারে রাষ্ট্রই সর্বক্ষমতার অধিকারী, সর্বগ্রাসী। এই মতবাদ একনায়কত্বে বিশ্বাসী।

উপসংহারে বলা যায় যে, এই মতবাদ যদিও বহুদোষে দুষ্ট কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানজাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একনায়কত্বের। নাৎসীবাদ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। জাতির শ্রেষ্ঠত্বই ছিল এই মতবাদের প্রাণ। জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে সমগ্র জার্মান জাতিকে হিটলার একসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে সকল ব্যক্তি ও সংঘের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে হইবে। ইহা হেগেলের দর্শনের ভিত্তিতেই রচিত। নেতৃপূজা, গণতন্ত্রের ধ্বংসসাধন, ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিসর্জন, যুদ্ধের মহিমা প্রচার, জার্মান জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা, জার্মান সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রভৃতি এই মতবাদ প্রচার করিত। হিটলার বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব করিবার পশ্চাতে এই যুক্তি প্রদর্শন করিতেন যে, একমাত্র জার্মান জাতিই শ্রেষ্ঠ এবং জাতিহিসাবে অপর সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার তাহার আছে। হিটলারের মৃত্যু ঘটিয়াছে কিন্তু নাৎসীবাদ আজও পশ্চিম জার্মানীতে প্রচলিত আছে।

(ছ) সামরিক একনায়কত্ব (Military dictatorship) ঃ পূর্বে সামরিক স্বৈরতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে সামরিক একনায়কত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। সামরিক একনায়কত্বে কোনও সামরিক একনায়ক অর্থাৎ মিলিটারী জেনারেল প্রমুখকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে দেখা যায়। পাকিস্তানে জেনারেল আয়ুব খাঁ মিলিটারী বিদ্রোহের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া লইয়াছিল। গ্রীসে বর্তমানে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করিয়া মিলিটারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লাতিন আমেরিকা, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশেও দেখা যায় সামরিক অধিকর্তাগণ বিদ্রোহ করিয়া, আইনানুমোদিত সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিয়া লইয়াছে।

অন্যান্য একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপই ইহার গুণাগুণ। এই শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক একনায়কই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক হইয়া থাকেন। নাগরিকগণের কোন অধিকারকেই স্বীকার করা হয় না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ হিসাবেই সামরিক অভ্যুত্থান হইয়া থাকে।

একনায়কত্বের মূল্যায়ন : সপক্ষে যুক্তি : (১) নীৎসেকে (Friedrich Neitzche) অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, শক্তিই আরাধ্য বস্তু, দুর্বলতাই পাপ। দুর্বলতা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। গণতন্ত্র মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়, ইহা পুরুষকে নারীতে পরিণত করে। সুতরাং গণতন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া বীরপূজা করাই উচিত।— নীৎসের ধারণায় নেপোলিয়নই আদর্শ পুরুষ। গণতন্ত্র মানুষকে দেয় অনাহারে মৃত্যু আর একনায়কত্ব দেয় সম্মানজনক মৃত্যু। গণতন্ত্রে ব্যবসায়ীদের শোষণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শোষণব্যবস্থার হাত হইতে বাঁচার উপায় হইল বীরের অধীনে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিচালিত করা।

(২) একনায়কতন্ত্রে উচ্ছৃংখল জনতার শাসনের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় সুযোগ্য নায়কের সুশাসন।

(৩) একনায়কতন্ত্রে দলীয় বিরোধ থাকে না। কারণ নায়কের সমর্থক ছাড়া আর অন্য কাহাকেও দলগঠন করিবার অধিকার দেওয়া হয় না। ফলে দলীয় বিবাদের সম্ভাবনা নাই।

(৪) একনায়কতন্ত্রে সরকার স্থায়ী হয়। গণতন্ত্রে সরকার অস্থায়ী হয়। বিশেষত বহু দলীয় ব্যবস্থায় সরকার কখনো স্থায়ী হইতে পারে না। এই শাসন-ব্যবস্থা মন্থর গতিতে চলে না। একনায়কের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উহাকে কার্যকর করা অতিদ্রুত হইয়া থাকে।

ত্রুটি : (১) একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শুধু একনায়কই স্বাধীনতা ভোগ করে। জনগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। সাম্য ও স্বাধীনতা মানুষ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে না। ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সকল পথ রুদ্ধ হয়।

(২) একনায়কতন্ত্রে একনায়কের খেয়ালের উপর সবকিছু নির্ভর করে। নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। তাই তাহারা জীবনের স্বাদ পায় না। তাহারা অচেতন পদার্থের মতোই বাস করে।

(৩) একনায়কতন্ত্রে যুদ্ধের বিভীষিকা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। যুদ্ধের ভয়ে মানুষের জীবন অস্বস্তিকর হইয়া উঠে। বিপ্লবের সম্ভাবনা সর্বত্র বিদ্যমান থাকে।

(৪) একনায়কতন্ত্রে শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়। তাই বিশালাকার দেশের পক্ষে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। ক্ষুদ্রকায় দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা কাম্য হইলেও বৃহদায়তন বিশিষ্ট দেশে ইহা কাম্য নয়। বিশাল রাজ্যের এক কোণে বসিয়া একনায়ক অতি দূর সীমান্তের কোন খবরই পায় না, ফলে দূর সীমান্ত অঞ্চল অবহেলিত হইতে বাধ্য হয়, এবং তথায় বিপ্লব সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আবার তাহাকে দমন করিতে গেলে রাজধানী বিপদাপন্ন হইয়া পড়িতে পারে।

(৫) একনায়কতন্ত্রে একনায়কের পারিষদবর্গ লুণ্ঠন করিতে শুরু করে। পারিষদবর্গ ছাড়া একনায়ক রাজ্যশাসন করিতে পারেন না।

উপসংহারে বলা যায়, একনায়কতন্ত্রকে অন্তর্বর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। একটা পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন নূতন একটা সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অবশ্য, বর্তমানের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, একনায়কতন্ত্র কোন অন্তর্বর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থা নয়। বরং নূতন সমাজ ব্যবস্থাকে কার্যকর করিবার জন্যই ইহাকে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। একনায়কতন্ত্র যদি ব্যক্তিগত না

হইয়া দলগত হয় এবং এই দল যদি মানুষের মনে আশার আলো আনিয়া দিতে পারে তবে দলীয় নায়কত্বকে অকাম্য বলা যায় না। সমাজতান্ত্রিক নায়কত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নে যে শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহাকে অকাম্য বলা যায় না।

গণতন্ত্র
(Democracy)

গণতন্ত্রের ইতিহাস (History of Democracy) : "গণতন্ত্র" নূতন নয়। প্রাচীন কালেই ইহার জন্ম হইয়াছে। মানুষের গোষ্ঠীজীবন আরম্ভ হইলে প্রত্যেককেই শাসন ক্ষেত্রে সমানাধিকার দেওয়া হইত। পরে মানুষ যখন উপজাতিতে সংঘবদ্ধ হইল তখন উপজাতীয় প্রধান ব্যক্তিদের লইয়া একটি পরিষদ গঠন করিয়া পরিষদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করিত। গোষ্ঠী জীবনে মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনের আওতায় ছিল আর উপজাতীয় স্তরে মানুষ যে পরিষদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাকে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে **উপজাতীয় গণতন্ত্র (Tribal Democracy)** পরোক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই গঠিত হইত।

পরবর্তিকালে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এই সময়ে বণিক শ্রেণী ধনবলে বলীয়ান হইয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। জনসাধারণের অধিকার নাম মাত্র স্বীকৃত হয়, কার্যত বণিক শ্রেণীর নির্দেশে ও তাহাদের স্বার্থেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এই শাসন ব্যবস্থাকে **বাণিজ্যিক গণতন্ত্র (Commercial Democracy)** হিসাবে ধরা যাইতে পারে। সক্রেটিসের আমলে এথেন্সে আবার যে ধরনের গণতন্ত্র লক্ষ্য করা যায় তাহাতে শাসন ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই ছিল। তাই ইহাকে **শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্রও (Proletarian Democracy)** বলা হইয়া থাকে। এই সময়েও ক্রীতদাস শ্রেণীর কোন অধিকার ছিল না। এথেনীয় গণতন্ত্রে সকল মানুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হইল। ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হইল। সাম্যবাদ জগতে স্বীকৃত হইল। নারী পুরুষের সহিত সমান মর্যাদা ভোগ করিতে লাগিল। স্বাভাবিক আইনের প্রচার চলিতে লাগিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যাধিকার প্রবর্তনের জন্য প্রচার শুরু হইল। এইরূপ অবস্থায় গণতন্ত্র মধ্যযুগীয় ভাবধারার সীমা অতিক্রম করিয়া এক উদার দর্শনের আওতায় আসিয়া পড়িল। গণতন্ত্র আজ তাহার সংকীর্ণ এলাকা পার হইয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

গণতন্ত্র কাহাকে বলে

রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে গণতন্ত্রকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে। গণতন্ত্র বলিতে শুধু সরকারের রূপ বা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই বুঝায় না। গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সামগ্রিক সমাজ জীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ, রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র রূপ এবং শাসন-ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট রূপ। আবার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে গণতন্ত্র হইল একটি জীবনদর্শন। বর্তমানে গণতন্ত্র বলিতে একটি অর্থব্যবস্থাকেও

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

বুঝানো হয়। তাহা হইলে গণতন্ত্র হইল একটি মহৎ আদর্শ, একটি বিশেষ সমাজ-চেতনা, একটি বিশেষ ধরনের জীবনধারণ পদ্ধতি। অবশ্য গণতন্ত্রের অর্থ যাহাই হউক সাম্যের উপরই ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাম্যই গণতন্ত্রের মূল কথা।

আবার সকল রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক মতবাদেই যুগধর্ম প্রতিফলিত হয়। প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতার যুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন যুগের সামাজিক চরিত্র গণতন্ত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ায় গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণাটি অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। **সামাজিক** দৃষ্টিকোণ হইতে গণতন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা যাহা সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থাকে বলা হয় গণতান্ত্রিক সমাজ (Democratic Society)।

(১) গণতান্ত্রিক সমাজ

উপরোক্ত আলোচনায় যে **রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের** কথা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা বুঝায় প্রত্যেকটি লোকের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি। এই অধিকার স্বীকৃত হইলে রাষ্ট্রের উপর জনগণের কর্তৃত্ব বজায় থাকে। রুশো যে গণতন্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই ধরনের গণতন্ত্র। তাঁহার মতে সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছায় পরিচালিত যে-কোন রাষ্ট্রকেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে।

(২) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনসাধারণের হস্তে। অতএব জনগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে যে-কোন প্রকারের সরকার গঠন করিতে পারে। এই কারণেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত রাজতন্ত্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (ইংল্যান্ড), অভিজাত-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে "জনগণের শাসন" (Rule of the people) প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার অর্থ জনগণ রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের অধিকারী হইবে। অবশ্য, বলা হয় যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু যে-কোন প্রকার সরকার গঠিত হইতে পারে সেইহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে "জনগণের দ্বারা শাসন" (Rule by the people) নাও হইতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রের অর্থকে আব্রাহাম লিংকনের ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করা হয়ঃ গণতন্ত্র হইল জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার এবং জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার ("Government of the people, by the people, and for the people.")। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আব্রাহাম লিংকনের যে সংজ্ঞা তাহা গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর গণতান্ত্রিক সরকার এক নয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ইংল্যান্ডের রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের হস্তে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, এইজন্য ঐ রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা যাইতে পারে ; কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক।

(৩) গণতান্ত্রিক সরকার

আবার অনেকে সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের কথা ছাড়া **শিল্প-ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের কথা (Industrial Democracy)** বলিয়া থাকেন। ইহার অর্থ হইল শ্রমিক যেহেতু ধনোৎপাদনের মূল উৎস, সেইহেতু খনি, কারখানা প্রভৃতির মালিক হইবে শ্রমজীবী জনসাধারণ। আর উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের ভার তাহাদের উপরই ন্যস্ত করা উচিত। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সমাজে ধনী-নির্ধনের বৈষম্য

(৪) শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্র

তিরোহিত হইবে এবং এক **অর্থনৈতিক গণতন্ত্র (Economic Democracy) প্রতিষ্ঠিত হইবে।**

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Democratic Government): শাসন-ব্যবস্থার রূপ হিসাবে যে গণতন্ত্র তাহাকে বলা হয় গণতান্ত্রিক সরকার (Democratic Government)। 'গণতন্ত্র' শব্দটি আজ গণতান্ত্রিক সরকারকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন সংজ্ঞার নির্দেশ দিয়াছেন। লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক সরকার হইল, সেই সরকার যেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদিগের অধিকাংশের শাসন বর্তমান; এই যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদিগের সংখ্যা আবার কমপক্ষে অধিবাসীদের তিন-চতুর্থাংশের সমান হওয়া প্রয়োজন। নাগরিকদের বাহুবল এবং ভোটের অধিকার মোটামুটি সমপরিমাণ হইতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এ্যাব্রাহাম লিংকন বলেন: গণতান্ত্রিক সরকার হইল "জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন" ("Government of the people, by the people, and for the people.")। লিংকনের মতে গণতন্ত্রে **জনসাধারণের সরকার (Government of the people)** গঠিত হইবে; **জনগণের দ্বারাই (By the people)** এই সরকার গঠিত হইবে। এবং **জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই (For the people)** এই সরকার গঠিত হইবে। রুশোও গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণকালে বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতায় সকলের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইবে। রুশো ও এ্যাব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞানুসারে দেখা যায়, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা জনসাধারণের হস্তগত হইবে। লর্ড ব্রাইসও অনুরূপভাবে অধিবাসীদের বৃহত্তর সংখ্যা অর্থাৎ ¾ অংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা লইয়া আজ পর্যন্ত বহু তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে UNESCO-এর বিশেষজ্ঞগণ এই মত পোষণ করেন যে, জনগণের শাসন-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্য। অবশ্য, সুইজি প্রমুখ লেখক সম্প্রদায় বলেন যে, গণতন্ত্রে জনগণই সরকারের উৎস এবং সরকারকে জনগণ হইতে পৃথক করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে ডাইসির মতটিই অধিক কার্যকর। বাস্তবে গণতন্ত্র হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। রাষ্ট্রকার্যে সকলেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ভোটাভুটির মাধ্যমে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

অবশ্য আজ জনসাধারণ যাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয় কিছুকাল পরে জনসাধারণ তাহাদের সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। অর্থাৎ এক নির্বাচনে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল পরবর্তী নির্বাচনে তাহারাই সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাই প্রকৃতপক্ষে জনমতের উপরই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। রুশো এই জনমতকে **সাধারণ ইচ্ছা (general will)** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বদাই সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপেক্ষা করিয়া শাসন পরিচালনা করিতে পারে না, কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠকে বেশী উপেক্ষা করিলে তাহারা এমন জনমত গঠন করিবে যাহাতে পরবর্তী নির্বাচনে বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে তাহা হইলেও শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় না। তাই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ ও

সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয়েই **সম্মতি দিয়া থাকে** (rule based on consent)। সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতকেও শ্রদ্ধা করিতে হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্মত হইলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন চালাইতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, বুঝাপড়ার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। বার্কার গণতন্ত্রকে "আলাপ-আলোচনার পদ্ধতিতে সরকার ("a system of government by discussion)" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার জনগণের দ্বারা যে সরকার গঠিত হয় তাহাকে ঐক্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করে। গণতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের কাজের সমালোচনা করিয়া জনমতকে তাহার পক্ষে আনে। সংখ্যাগরিষ্ঠকে কাহারও মত উপেক্ষা না করিয়া সকলের মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হয়।

গণতন্ত্রী সরকারের প্রকৃতি

সর্বশেষে বলা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে যদি শাসন পরিচালিত হয়, যে শাসন ব্যবস্থায় সকলেই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তবেই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃত হইয়া উঠিবে।

বর্তমান যুগ গণতান্ত্রিকতার যুগ। এই যুগের শাসকবর্গ গণদেবতাকেই পূজা করে। আবার গণদেবতাও রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থাকে সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করিতে সহায়তা করে। সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন সকল মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত করা। কিন্তু একমাত্র গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব। এই সকল সংজ্ঞা হইতে গণতন্ত্রের যেসকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Democracy) ঃ (১) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা **সকলের মতামতের** উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে (Resting on public opinion)।

(২) গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে বুঝায় যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের **সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন**।

(৩) স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর নাগরিক হইবার যোগ্যতা থাকিতে পারে না।

(৪) সমগ্র অধিবাসীর অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশের যোগ্য হইতে হইবে।

(৫) রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হস্তে থাকিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাকে কার্যকর করার সুযোগ দিতে হইবে।

(৭) বার্ণস বলেন যে, গণতন্ত্রে প্রত্যেকেই সমাজের অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় অংশ। ইহা হইল **সমান মানুষের সমাজ**।

(৮) গণতন্ত্র শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধও নয়। শক্তি প্রয়োগ করা হইবে শুধু সামগ্রিক স্বার্থকে বজায় রাখিবার জন্য। এখানে ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় বটে, তবে তাহা সমষ্টিগত স্বার্থ ও স্বাধীনতার অঙ্গীভূত হইয়াই মূর্ত হইয়া উঠে।

গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন রূপ (Forms of Democratic Govern-

ment) : গণতান্ত্রিক সরকারকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : যথা (ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ; (খ) পরোক্ষ গণতন্ত্র ।

(ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) : প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় নাগরিকগণের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা। প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় নাগরিকগণ একত্রে মিলিত হইয়া আইন প্রণয়ন করে, আইনকে কার্যকর করে এবং আইনভঙ্গকারীর বিচার করে। এরূপে শাসন-ব্যবস্থা বর্তমানে বিরল ; কারণ, বর্তমানের বৃহদায়তন রাষ্ট্রের কোটি কোটি জনসমষ্টিকে একত্র কোথাও মিলিত করিয়া আইন প্রণয়ন, প্রণীত আইনকে বলবৎকরণ এবং আইনভঙ্গকারীর বিচার করা সম্ভব নয়। অবশ্য বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের ৫টি ক্ষুদ্রাকৃতি ক্যান্টনে (Cantons) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানীয় সরকারের পরিচালনায় এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমানে কোটি কোটি জনসমষ্টি-বিশিষ্ট রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করা সম্ভব না হইলেও **'গণভোট', 'গণউদ্যোগ'** ও **'পদচ্যুতির'** মতো কতকগুলি ব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুফল লাভ করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সারকথা হইল প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে অর্পিত হইবে। 'গণভোট', 'গণউদ্যোগ' ও 'পদচ্যুতি'র মতো অধিকার যদি শাসনতন্ত্র দ্বারা স্বীকৃত হইয়া শাসন-ব্যবস্থাকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা যায় তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলিলে অযৌক্তিক হইবে না।

মন্তব্য

অবশ্য বর্তমানে বৃহদায়তন রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিবিধ অসুবিধার জন্য পরোক্ষ গণতন্ত্র বলিয়া পরিচিত এক প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। নিম্নে পরোক্ষ গণতন্ত্রের আলোচনা করা হইল :

(খ) পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect Democracy) : জন স্টুয়ার্ট মিলকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হইল এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা যেখানে, "সমগ্র জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন-ক্ষমতা ব্যবহার করে" (It is a form of Government where..."the whole people or some numerous portion of them exercise the governing power through deputies, periodically elected by themselves.") ।

মিল প্রদত্ত উপরোক্ত সংজ্ঞা এবং এই প্রসঙ্গে আরও কতিপয় সংজ্ঞার আলোচনা হইতে পরোক্ষ গণতন্ত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Indirect or Representative Democracy) : (১) এই শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আইন-প্রণেতৃবর্গ ও শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। অবশ্য, শাসকমণ্ডলী যদি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত না হয় তবে তাহাদিগকে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল হইতে হইবে।

(২) যে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকমণ্ডলী নির্বাচিত হইবে তাহা ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) নির্বাচনে স্বাধীনভাবে ভোট দিবার অধিকার স্বীকৃত হইবে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকারের উপর যথাসম্ভব কম বাধানিষেধ থাকিবে।

(৪) নির্বাচন প্রসঙ্গে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গতিবিধির স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা এবং সমালোচনা করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতির স্বীকৃতি দিতে হইবে।

(৫) আবার কেহ কেহ এই ধারণা পোষণ করেন যে, একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৬) শাসনবিভাগের কর্মকর্তাগণ হয় জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবে নচেৎ আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে শাসকবর্গকে মনোনীত করা যাইতে পারে।

অবশ্য যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল তাহা সকল প্রকার প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে দৃষ্ট হয় না ; তথাপি এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মান হিসাবে ধরা হইয়াছে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) ঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্র গণতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট রূপ। সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক উদার নীতি জন্মলাভ করে। ইহাই উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy বা Political liberalism)। সমাজতান্ত্রিক যুগের শেষের দিকে যখন উৎপাদনের কলাকৌশল উন্নত হয়, পণ্যের বাজার প্রসারিত হয় তখন নূতন বুর্জোয়া শ্রেণী বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর নেতৃত্বে মানবিক অধিকারের দাবিতে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এই বিপ্লবের পর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক উদারনৈতিক নীতি অনুসৃত হয়। ইহাকেই রাষ্ট্রনৈতিক উদারনীতি বা উদারনৈতিক গণতন্ত্র বলা হয়। ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রসার লাভ করে। এই মতবাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাগণ হইলেন লক্, বেন্হাম, মিল ও এ্যাডাম স্মিথ।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্ম

আবার উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রাষ্ট্রাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় এবং ১৭৯১ সালের ফরাসীবিপ্লবের অধিকারের ঘোষণায়। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষই সমানাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সুখসন্ধানের অধিকার আছে। ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণায় বলা হয় যে, রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, অহস্তান্তরযোগ্য অধিকারকে সংরক্ষণ করা, স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অধিকার এই সকল অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আরও প্রচার করা হয় যে, শাসিতের সম্মতির উপরই সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইংল্যাণ্ড, ফরাসী ও আমেরিকার বিপ্লবের ঘোষণায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বাণী প্রচারিত হয়

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এই নীতি অনুসারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। (২) শাসিতের সম্মতিতেই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩) প্রত্যেক মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। (৪)

ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করা। (৫) রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। (৬) রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। (৭) প্রত্যেকের চুক্তি করিবার অধিকার, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার, সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার, গতিবিধির অধিকার সংরক্ষণ করা। (৮) আর উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আইনের অনুশাসন (Rule of Law) প্রচলিত থাকিবে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে না। এ্যাডাম স্মিথ বলেন যে, অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য হইতেই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি বাহির হইয়া আসিবে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলেই দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি মানুষই তার স্বাধীনতাকে খুঁজিয়া পায়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে সকল অধিকার প্রয়োজন রাষ্ট্রকে তাহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু হয়। বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। উদারনৈতিক গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায় কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষপাতী নয়। ফলে সমাজতন্ত্রের সহিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Democratic Government): গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলিতে বর্তমানে পরোক্ষ গণতন্ত্রকেই মনে করা হয়। এই শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, (ক) স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বে (Doctrine of Natural Rights), (খ) হিতবাদীদের ও (গ) ভাববাদীদের ধারণায় গণতন্ত্রের সারকথার সন্ধান পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেক মানুষই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বিভিন্ন মতবাদে গণতন্ত্রের স্থান

গণতন্ত্র হইল এই নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার একটি উপায়। হিতবাদীরা প্রচার করিয়াছিলেন যে, সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক মঙ্গলসাধন (Greatest good of the greatest number) করাই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এই ধারণার মধ্যেও গণতন্ত্রের মৌলিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আদর্শবাদীদের ধারণায় গণতন্ত্রই এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম যেখানে মানুষ আত্মোপলব্ধি করিবার সর্বাধিক সুযোগ লাভ করে। গণতন্ত্রে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করে। নিজেরাই নিজেদের সরকার গঠন করিয়া স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

গণতন্ত্রের গুণাবলী: (১) বার্কারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, গণতান্ত্রিক সরকার হইল, "আলাপ-আলোচনার পদ্ধতিতে সরকার।"* সকলের আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় সেই সরকারের দৃষ্টিতে সব কিছুই ধরা পড়ে। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুরই উন্নতি গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে হইতে পারে।

(২) মিলকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন-

* "Democracy...is a system of government by discussion."

ব্যবস্থাতেই জনগণের মানসিক উন্নতি হইতে পারে। সুশাসন ছাড়াও জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাধীনে হইতে পারে।

(৩) বেন্থাম বলেন যে, সুশাসনের সমস্যা হইল শাসক ও শাসিতের স্বার্থকে এক ও অভিন্ন করিয়া তুলিয়া সর্বাধিক জনগণের সর্বাধিক মঙ্গলসাধনের সমস্যা। শাসিতকে শাসক করিয়া তুলিতে পারিলেই এই সমস্যার সমাধান করা যায়। গণতন্ত্রেই একমাত্র শাসিতকে শাসকের পদে উন্নীত করা যায়।

(৪) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে বিপ্লবের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়। সরকার যদি জনগণেরই হয় তবে জনগণ বিপ্লব বা বিদ্রোহ করিবে কাহার বিরুদ্ধে ?

(৫) ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "সরকারের উদ্দেশ্য যদি জনসাধারণের হয়, তবে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ এই উদ্দেশ্যসাধনের অপরিহার্য শর্ত।" একমাত্র গণতন্ত্রেই জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

(৬) গণতন্ত্র সকল মানুষকে সমান অধিকার দান করে; সকল মানুষকে আত্মোপলব্ধির সমান সুযোগ প্রদান করে। মানুষ গণতন্ত্রের আওতায় রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দায়িত্বশীল হইয়া উঠে।

গণতন্ত্রের ত্রুটি ঃ প্লেটোর সময় হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত বহু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনাগুলিকে নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১) উইলী (M. M. Willey) বলেন যে, গণতন্ত্র হইল অজ্ঞ ও অক্ষমের শাসন। ইহাকে স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থাও বলা যায় না। ক্ষণভঙ্গুরতাই ইহার প্রকৃতি। কিন্তু এই সমালোচনা যথার্থ নহে। বহু বৎসর ধরিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(২) এমিল ফ্যাগুয়েট (Emile Faguet) গণতন্ত্রকে অকর্মণ্যতার মন্ত্র (Cult of Incompetence) বলিয়া অভিহিত করেন। লেকীকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, গণতন্ত্র হইল দরিদ্রতম, সর্বাধিক অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য ব্যক্তির শাসন-ব্যবস্থা। কারণ গণতন্ত্র হইল সর্বাধিক লোকের শাসন এবং অকর্মণ্য লোকের সংখ্যাই আবার সর্বাধিক।* কিন্তু অজ্ঞকে বিজ্ঞ করার জন্যই তো গণতন্ত্র প্রয়োজন।

(৩) আরও বলা হয় যে, গণতন্ত্র যেহেতু অজ্ঞদের শাসন-ব্যবস্থা এবং এই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরা যেহেতু চরিত্রে রক্ষণশীল, সেইহেতু গণতন্ত্রও এক রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা, ফলে এই শাসন-ব্যবস্থা নিত্য নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। ইহা প্রগতির পথে মস্তবড়ো বাধা।

(৪) ফ্যাগুয়েট বলেন, গণতন্ত্রে নেতৃত্বের চরিত্র ক্রমে অবনত হইয়া পড়ে এবং নেতৃত্ব সামগ্রিকভাবে দুর্বল হয়। আবার বর্তমানের জটিল সরকারকে পরিচালনা করিবার জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাহা জনগণের নাই। জনগণ নিজেদের ক্ষমতাকেই নিজেদের মতামত বলিয়া মনে করে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, জনসাধারণ তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিতেও অক্ষম।

---

* "It is government by the poorest, the most, ignorant, the most incapable who are necessarily the most numerous."—*Lecky.*

(৫) গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বলিয়া যে এক স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহা **অলীক**; কারণ স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন যে প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতা তাহা জনসাধারণের নাই।

(৬) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণতঃ কতকগুলি স্বার্থান্বেষী বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসমূহের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে সামাজিক চেতনাও প্রসার লাভ করিতে পারে না। আবার ইহা **পুঁজিবাদকে প্রশ্রয় দেয়** বলিয়াও অনেকে মন্তব্য করেন।

(৭) সর্বশেষে বলা যায়, জীববিজ্ঞানের ধারণানুসারে সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে বলিয়াই গণতন্ত্রে সভ্যতার পশ্চাৎগামী লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু জীববিজ্ঞানের এই ধারণা অভ্রান্ত নয়। কারণ জীব-বিজ্ঞানিগণ মানুষে মানুষে যে গুণগত পার্থক্যের কথা বলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যে গুণাবলীর কথা বলেন তাহা তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কারণ সমাজের একজন উচ্চস্তরের লোকের সন্তান যে গুণসম্পন্ন হইবেই এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অবশ্য যদি তাহা হয় তবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর জোরে হয় না। তাহারা অধিকতর সামাজিক সুবিধা পায় বলিয়াই অধিকতর গুণসম্পন্ন হয়।

উপসংহারে বলা যায়, আক্রমণ যতই তীব্র হউক না কেন, গণতন্ত্র আজ বিশ্বের সর্বস্বীকৃত, সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই তাহার আসন করিয়া লইয়াছে। সমালোচনা তীব্র হইবার কারণ গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতা রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে মনে করিয়াছেন সমাজ-ব্যবস্থা, কেহ কেহ ইহাকে বলিয়াছেন একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, আবার কেহ কেহ ইহাকে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এবং বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দ্বারা সমালোচনা হওয়ায় সমালোচনাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক হইয়াছে। যাঁহারা ইহাকে অজ্ঞদের শাসন বলিয়াছেন তাঁহাদিগের এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, অজ্ঞদের বিজ্ঞ করার জন্যই বিশেষ ভাবে প্রয়োজন অজ্ঞদের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী

(Safeguards of Democracy)

(ক) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শাসকমণ্ডলী একবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হইয়া গেলে, জনসাধারণের হস্তে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করার আর কোন ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু এমন কতকগুলি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে (Direct Democratic checks) যাহার মাধ্যমে পরোক্ষ গণতন্ত্রেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুফল লাভ করা যায়। এই ব্যবস্থাগুলি হইল, (১) **গণভোট (Referendum)**, **(২) গণউদ্যোগ (Initiative)** এবং **(৩) পদচ্যুতি (Recall)**।

(১) গণভোট (Referendum): শাসনতন্ত্রে যদি উল্লিখিত থাকে যে, প্রত্যেকটি আইন পাস করিবার পূর্বে আইনের খসড়া জনসমীপে উপস্থিত করিতে হইবে এবং ভোটদাতাদের দ্বারা আইনকে পাস করাইয়া লইতে হইবে তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণই আইন পাস করিতে পারিবে। এইভাবে

আইন পাস করানোর পদ্ধতিকেই বলে **বাধ্যতামূলক গণভোট (Obligatory Referendum)**। আবার শাসনতন্ত্রে যদি এইরূপ উল্লেখ থাকে যে, কতকগুলি বিষয়ে খসড়া নির্বাচকগণের আবেদন-সাপেক্ষ জনসমীপে উপস্থিত করিতে হইবে তাহা হইলে এই পদ্ধতিতে আইন পাসের নীতিকে বলা হয় **ঐচ্ছিক গণভোট (Optional বা Facultative Referendum)**।

(২) **গণউদ্যোগ (Initiative)ঃ** গণউদ্যোগ বলিতে বুঝায় নির্বাচকগণের উদ্যোগে আইন-প্রণয়ন। শাসনতন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচকগণ আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া আইনসভাকে আইন পাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলে আইনসভা যদি উক্ত খসড়াকে নির্বাচকগণের নিকট উপস্থিত করিয়া গণভোটের মাধ্যমে উহাকে আইনে পরিণত করে তবে বুঝিতে হইবে গণউদ্যোগে আইন প্রণীত হইল।

(৩) **পদচ্যুতি (Recall)ঃ** পদচ্যুতি হইল নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই পদচ্যুত করিবার পদ্ধতি। নির্দিষ্ট-সংখ্যক নির্বাচক যদি তাহাদের প্রতিনিধির এইরূপ পদচ্যুতি দাবি করে তবে এই দাবি আইনসভা সকল নির্বাচকগণের নিকট উপস্থিত করিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচক যদি এই দাবি সমর্থন করে তাহা হইলে সংশিলষ্ট প্রতিনিধি পদচ্যুত হইবে।

এই তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারা যায়।

(খ) জন **স্টুয়ার্ট মিল** বলেন যে, গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে তিনটি শর্ত পালন করিতে হইবে। এই শর্ত তিনটি হইলঃ (১) গণতন্ত্রকে জনগণের গ্রহণ করিবার ইচ্ছা—ও ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন; (২) গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য জনগণকে সংগ্রাম করিবার সংকল্প গ্রহণ করিবার প্রয়োজন; এবং (৩) জনগণের পক্ষে কর্তব্যপালনে এবং অধিকার রক্ষা করিবার জন্য **সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা** থাকা প্রয়োজন। এই তিন প্রকার গুণসম্পন্ন লোকদিগকে বার্নস "গণতান্ত্রিক জনগণ" (Democratic people) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(গ) গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের উপর। জনগণ যদি গণতান্ত্রিক হয়, জনগণ যদি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় তবেই গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইবে। জনগণকে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া তোলার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক পরিবেশ, যে পরিবেশে মানুষ তাহার ব্যক্তিসত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় একমাত্র তখনই যখন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণ এবং সাম্যের ভিত্তিতে এই সকল অধিকারের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ করিতে হইলে এই পরিবেশকেও সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই গণতান্ত্রিক পরিবেশের অসম্পূর্ণতার জন্যই গণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

(ঘ) আবার **অর্থনৈতিক গণতন্ত্র** (Economic Democracy) ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে 'অর্থনৈতিক মুখ্যতন্ত্র' (Economic oligarchy) বা পুঁজিবাদের আওতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্র একরূপ অলীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্যই বলা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সহিত মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং গণতন্ত্রও অলীক-ই থাকিবে। সাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই গণতন্ত্র মূর্ত হইয়া উঠে।

(ঙ) আবার গণতন্ত্র যেহেতু সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেইহেতু গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় না। শ্রেণীর অস্তিত্ব যখন স্বীকৃত তখন শ্রেণী সম্বন্ধে প্রত্যেককে সচেতন হইতে হইবে। এখানে শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতনতার অর্থ **সমাজের সম্বন্ধে সচেতনতা**। এই সচেতনতাই গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি সর্ত।

(চ) সর্বশেষে বলা যায়, **সহিষ্ণুতাই** গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তখন সংখ্যালঘিষ্ঠকে সহিষ্ণুতার সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানিয়া লইতে হইবে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে **সহযোগিতাই** গণতন্ত্রের ভিত্তি।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

(Future of Democracy)

লয়েডের ভাষায় বলা যায়, "গণতন্ত্র তাহার সভ্যদের অলসতার জন্য দিন দিনই পুরাতন হইবার বিপদের সম্মুখীন হইতেছে" ("Democracy is in danger of growing stale through the laziness of its members.")। সুতরাং গণতন্ত্রকে যদি জিয়াইয়া রাখিতে হয় তবে জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। বর্তমান সমাজ অতিশয় জটিল ও সমস্যাসংকুল। এই সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণ অজ্ঞ। এই অজ্ঞতাই গণতন্ত্রের বিপদের কারণ। আবার পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় যে গণতন্ত্র চালু করা হইয়াছে তাহাও ধনতান্ত্রিক শোষণের যাঁতাকলে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এই শোষণের হস্ত হইতে জনগণকে বাঁচানোর জন্য কেহ কেহ একনায়কত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কিন্তু তত্ত্বের দিক হইতে দেখা যায়, একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সমাধিস্থ হয়। আবার কেহ কেহ শাসনতান্ত্রিক ও বিবর্তনমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই নূতন সমাজ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতে পান। বর্তমান এই জটিল অবস্থায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়, যেখানে (১) ব্যাপক বেকারী, (২) সুষ্ঠু কর্ম-পরিবেশ ও বিশ্রামের অভাব, (৩) শিক্ষা পাইবার সুযোগের অভাব রহিয়াছে, (৪) সংখ্যালঘুর স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইবার ব্যবস্থা নাই সেখানে আর যাহা কিছু হউক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তবে 'সভ্যতার সংকট' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই। আশার বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন যে, **"জনসাধারণ অসাধারণ" এই 'অসাধারণ' গণতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবেই**।

গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নঃ বলা হয় যে, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই প্রকৃত পক্ষে শ্রেণীগত একনায়কত্বের অধীন (All States in the world are in essence, class dictatorship.")। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে যে ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্র শাসন করে তাহা শ্রেণীগত একনায়কত্বের নামান্তর মাত্র। অবশ্য, আবার পশ্চিমী গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নেও

গণতন্ত্র নাই। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয়, (১) সোভিয়েত ইউনিয়নে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দিয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের পথ রুদ্ধ করিয়াছে ; (২) সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য নাই। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, দল হইল একটি শ্রেণী স্বার্থের প্রতিভূ। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পপতি, জমিদার প্রভৃতি শ্রেণী বিলুপ্ত হওয়ায় সেখানে একটি মাত্র শ্রেণীর অস্তিত্বই বজায় আছে। ফলে একটিমাত্র শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে একটি মাত্র দলই সেখানে আছে। আরও বলা হয় যে, রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তিসত্তা যখন মূর্ত হইয়া ওঠে যখন ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, আত্মোপলব্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ রাষ্ট্রের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইবে। তাই রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবে। ব্যক্তির ভোটাধিকার, ব্যক্তির জীবনের বৃদ্ধবয়সে অক্ষমতার ভাতা, বেকার ভাতা প্রভৃতি স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হইয়াছে ; অতএব ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় তাহা সত্য নহে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি মাত্র শ্রেণীর যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। এই ধাঁচের একনায়কত্বকে **সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব** বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এবার সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তুলনা করা হইতেছে। প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব শুধু সেখানে যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য তিরোহিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক সাম্য অথবা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের কোন অর্থ হয় না। বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থায় যে শ্রেণী ধনবলে বলীয়ান তাহারাই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে এবং তাহাদের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। ফলে অপরাপর শ্রেণীর সকল গণতান্ত্রিক অধিকার ধনবলে বলীয়ান শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা গণতন্ত্রের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্রেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাৎসী-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্য হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে এবং নেতার আজ্ঞাকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখিয়া তাহাকে মান্য করিতে হইবে, জাতিসত্তার গৌরব প্রচার এবং কুলের অহমিকা প্রচার করিতে হইবে ; এবং যুদ্ধের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবিস্তারে বিশ্বাসী হইতে হইবে। ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালে ইটালীতে মুসোলিনির ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়া। ১৯২৩ সালে স্পেনে প্রাইমো ডিরিভেরা, ১৯২৩ সালে পোল্যাণ্ডে পিলসুড্স্কি এবং ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলার শাসনক্ষমতা দখল করেন এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, গ্রীস, যুগোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া, পর্টুগ্যাল প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে হয় রাজতন্ত্রের নামে, নয় সম্পূর্ণ নগ্নরূপে স্বৈরাচার ও একনায়কত্ব দেখা দেয়। এশিয়ায় জাপানে জাপানী একনায়কত্ব এবং দক্ষিণ আমেরিকার বহু রাষ্ট্রে অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র (Democracy and Dictatorship) : এই অধ্যায়ের পূর্ব-অধ্যায়ে একনায়কত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আর বর্তমান অধ্যায়ে গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের মধ্যে তুলনা-মূলক একটি আলোচনা এখানে দেওয়া গেল।

(১) এখানে যে গণতন্ত্রের কথা বলা হইতেছে তাহা পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আলোচনা এখানে করা হইতেছে না কারণ বর্তমানে উহা প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। একনায়কতন্ত্র বলিতে এখানে বুঝানো হইতেছে এমন রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে যেখানে রাষ্ট্রনায়ক মাত্র একটি দলের নেতা বা সৈন্যাধ্যক্ষ বা রাজা বা একটি শ্রেণীর নেতা বা সমাজতান্ত্রিক একনায়ক অথবা নাৎসী-ফ্যাসিস্ট একনায়ক।

পরোক্ষ গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্র বিশ্বাস করে জনগণের শক্তিতে এবং গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে বুঝায় জনগণের সম্মতিতে সরকার। চিরস্থায়ী-ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতায় কেহ অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। সরকার জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয়। আর একনায়কতন্ত্রে সরকার জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয় না। যখন কোন সেনাধ্যক্ষ সেনানীদের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন তখন সেনাধ্যক্ষের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের ক্ষেত্রে একটিমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নায়ক হিসাবে নায়ক রাষ্ট্রে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। একনায়কতন্ত্রের মূল ভিত্তি শক্তি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবিশেষ জোর করিয়া তাহার সিদ্ধান্তকে জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেয়।

গণতন্ত্র সম্মতির ভিত্তিতে সরকার আর একনায়কতন্ত্র শক্তির ভিত্তিতে সরকার

(২) গণতন্ত্রে বহুদলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। কারণ গণতন্ত্র বিরোধী মতের সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। কিন্তু একনায়কতন্ত্র বিরোধী মতের সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় একটিমাত্র দলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির বা দলের আদর্শানুসারে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

গণতন্ত্র বহুদলের আর একনায়কতন্ত্র একটি দলের অস্তিত্বে বিশ্বাসী

(৩) গুচ বলেন, একনায়কতন্ত্রে আইনের অনুশাসনের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতার অনুশাসন প্রবর্তিত হয়। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য অসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায়ই শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আইনের সঙ্গে যদি তাহা সম্পর্কযুক্ত না হয় তবে তাহা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনকই হইবে। কিন্তু গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় আইনের অনুশাসন।

(৪) লর্ড এ্যাক্টনের মতে "সকল ক্ষমতা ক্ষমতাধিকারীকে বিকৃত করে, চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে বিকৃত করে" ("All power corrupts and absolute power corrupts absolutely.")। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ককে তাঁহার কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। তিনি অবাধ ক্ষমতা ভোগ করেন। ফলে ক্ষমতাধিকারীকে নিশ্চিতভাবেই বিকৃত করিবে। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ক একজন থাকেন না। বিরোধীদলও থাকে সরকারী কার্যের সমালোচনা করিবার জন্য। ফলে ক্ষমতাধিকারীদের বিকৃত হইবার সম্ভাবনা কম।

(৫) একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্যকে অস্বীকার করা হয় কিন্তু গণতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্যকে স্বীকার করা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকৃত হয় বলিয়া একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সুযোগ প্রায় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু গণতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্যই হইল মানুষের আত্মোপলব্ধির সুযোগ প্রদানের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করা।

(৬) একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহার ফলে উপজাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রে জনসাধারণের উপর

জোর করিয়া কিছু চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ গণতন্ত্রে জনমতের সম্মতির ভিত্তিতেই শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয় বলিয়া সরকারকে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা সহজতর হয়। জনগণের ইচ্ছার উপরই সরকারের কার্যকাল নির্ভর করে। একনায়কতন্ত্রে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ক্ষমতার জোরে জনসাধারণের উপর রাষ্ট্রনায়কের সিদ্ধান্তকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয়।

(৭) গণতন্ত্রে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না, কারণ শাসকবর্গকে তাঁহাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট কৈফিয়ত দিতে হয়। আইনসভায় বহু বিতর্কের পর আইন পাস করিতে হয়। একনায়কতন্ত্রে জনগণের নিকট কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে হয় না। আইনসভায় কোন বিষয়ের উপর বিতর্ক করিয়া কাল অতিবাহিত হয় না।

উপসংহারে বলা যায়, গণতন্ত্রে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া যে প্রচার করা হয় তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের অধিকাংশই গরীব এবং সর্বহারা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সরকারই সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র যে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার বলিয়া দাবি করে তাহা ঠিক নয়। কারণ যে শ্রেণী ধনবলে বলীয়ান তাহারাই সরকার গঠন করে। গণতন্ত্রেও দলীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। যে দল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে সেই দলই নায়কত্ব করে। সুতরাং গণতন্ত্রেও দলীয় নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে যে দল শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তাহাও শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ। আবার একনায়কত্বে যে একটি দল থাকে তাহাও শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ। উভয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই শ্রেণী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় গণতন্ত্রেও শ্রেণীগত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।)

সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র

(Socialism and Democracy)

বর্তমানে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপায়িত করিতে না পারিলে গণতন্ত্র সফল হইবে না। এই কারণেই জগতের বিভিন্নদেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক সমানাধিকারের দাবিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য স্বীকৃত হয়। রুশো যে গণতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন তাহাকে সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছায় পরিচালিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনসাধারণের হস্তে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে (Rule of the people) অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা নিয়মতান্ত্রিক বা নির্বাচিত রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হইবে। এ্যাব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞায় গণতন্ত্র হইল জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার,

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

জনগণের জন্য সরকার (Government of the people, by the people and for the people.)। গণতন্ত্রের এইরূপ সংজ্ঞা গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা জনগণের হস্তে অর্পিত হইবে। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিকও হইতে পারে। যেমন, ইংল্যাণ্ডে জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক।

বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমানে গণতন্ত্র শব্দটি শুধু একটি বিশেষ ধরনের শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় না অথবা রাজনৈতিক সমানাধিকারের অর্থেই শুধু ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সামগ্রিক সমাজজীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ। রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র রূপ এবং শাসন-ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট রূপ। ইহা হইল একটি বিশিষ্ট জীবন দর্শন। বর্তমানে গণতন্ত্র বলিতে একটি অর্থব্যবস্থাকেও বুঝানো হয়। গণতন্ত্র হইল একটি মহৎ আদর্শ, একটি বিশেষ সমাজ চেতনা, একটি বিশেষ ধরনের জীবন পদ্ধতি। সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে গণতন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যাহা সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক সমানাধিকারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইহা ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের আদর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে। শুধু রাজনৈতিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যদি সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ধনবলে বলীয়ান শ্রেণী ধনবলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ; নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে তাহাকে ব্যবহার করে।

গণতন্ত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রে স্বীকৃত হয় এবং নির্বাচনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিককেই দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সমাজে যদি ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর লোকের বাস করিবার সুযোগ থাকে তাহা হইলে নির্বাচন ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই ধনিকশ্রেণী দরিদ্রের অভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং যে সরকার গঠন করিবে সেই সরকার ধনিক শ্রেণীরই সরকার হইবে ; তাই গণতন্ত্রের যে মুখ্য উদ্দেশ্য, জনগণের জন্য সরকার গঠন করা, তাহা মিথ্যায় পর্যবসিত হইবে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকারের আদর্শকে কার্যকর করিতে পারে না। ইহার কারণ, ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই রাজনৈতিক সমানাধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে অর্থনৈতিক সমানাধিকার অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে। ল্যাস্কি বলেন ঃ অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র ভিত্তিহীন ("Political democracy is meaningless without economic democracy" – *Laski*)। প্রকৃত গণতন্ত্রের অর্থ হইল সাম্য। এই কারণে কেহ কেহ এই মন্তব্য করেন যে, গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ করিলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রেই একমাত্র অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক সাম্য এবং রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রকৃত গণতন্ত্রও সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা। ধনী ও নির্ধন এই দুই শ্রেণীতে সমাজ যদি বিভক্ত হয় তাহা হইলে সমাজে

ধনিক শ্রেণী সর্বদাই কর্তৃত্ব করিবে। গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে। সমাজতন্ত্রীরাও মানুষকে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিতে চায়। কিন্তু অসাম্যের সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সকলে সমান ভাবে পাইবে না। শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে বিশ্বাস করা যায় যে, সকলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইলে খাঁটি জিনিসটি বাহির হইয়া আসিবে (Survival of the fittest)। কিন্তু ধনী ও নির্ধনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইলে সে প্রতিযোগিতায় আর খাঁটি জিনিসটি বাহির হইয়া আসিবে না। কারণ এই প্রতিযোগিতায় স্বভাবতই দরিদ্র সম্প্রদায় পরাজিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।

সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র

ল্যাস্কি তাই বলিয়াছেন, প্রত্যেককে সুযোগের সমতা প্রদান করিতে হইবে অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হইলে প্রত্যেককেই সমান সুযোগ প্রদান করিয়া তারপর প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতে হইবে; নচেৎ অসাম্যের সমাজে প্রতিযোগিতা সার্থক হয় না এবং তাহার ফল অতিশয় ভয়ংকর হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার প্রয়োজন সমাজের অসাম্য দূর করা; যে অসাম্যের কারণে গণতন্ত্র নিষ্ফল হয়, তাহা দূরে না করিলে জনগণের সরকার মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। সমাজতন্ত্রও চায় অর্থনৈতিক বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা। সুতরাং উভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে কোন প্রকৃত পার্থক্য নাই

গণতন্ত্রে যে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে ধনোৎপাদনের উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ব্যবস্থায় ধনোৎপাদনের উপায়গুলির মালিকগণ শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। এইরূপে সমাজ ব্যবস্থায় পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে। ফলে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর হয় না। সমাজতন্ত্রে ধনোৎপাদনের উৎস এবং উপাদানগুলির মালিক কোন ব্যক্তি বিশেষ হয় না, উহার মালিকানা সমাজ ও রাষ্ট্রের। এইরূপে সমাজ ব্যবস্থায় পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীস্বার্থের বিকাশ ঘটে এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়াস চলে। রাষ্ট্র শিল্প, কারখানা, ট্রাম, বাস, রেডিও, ট্রেন, ব্যাংক, ব্যবসা প্রভৃতির মালিক হয়। মানুষ আর বেকার থাকে না। জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়িত হয়। তাই বিশ্বাস করা হয় যে গণতন্ত্রকে বাস্তব করিতে হইলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রও চায় সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার। গণতন্ত্র গণদেবতারই পূজা করে। এই গণদেবতাকে বেকারী হইতে মুক্তি দিতে হইবে, সভ্য ও সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী বেতন দিতে হইবে, বার্ধক্যে ও বিপর্যয়ে ভাতা দিতে হইবে, শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। তবেই গণদেবতা তুষ্ট হইবে। কিন্তু ইহা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র ছাড়া শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। তাই বলা হয় সমাজতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে না; ইহা বরং গণতন্ত্রকে পূর্ণ করিবার প্রস্তাব দিয়া থাকে ("Socialism proposes to complete rather than oppose liberal democratic creed".) আবার কেহ কেহ বলেন সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র পূর্ণ হয় না ("Democracy is not compelte without Socialism.")।

সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রকে পূর্ণ করে, গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে না

উপসংহারে বলা যায়, সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসর্বস্ব নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বড় একটা স্বীকার করা হয় না। সমাজতন্ত্র সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাই বলা হয় রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে সমাজতন্ত্রে নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রের নামে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা এক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের এক বিশেষ অবস্থায় যেমন ধনতন্ত্রের বিকাশ হয় সেইরূপ সমাজতন্ত্রের এক পর্যায়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের যে সকল গুণগুলি আছে তাহার সমন্বয়ে যদি শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় তবেই গণতন্ত্র পূর্ণ হইবে। সমাজতন্ত্রে যেমন রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কষ্টকর, তেমনি গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক সাম্যাধিকার প্রতিষ্ঠা করাও কষ্টকর। সুতরাং এমন মতবাদকেই বাছিয়া লইতে হইবে যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ যদিও সমর্থনযোগ্য নহে, তথাপি এ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ। আর এই শ্রেণীবিভাগ সরকারের পক্ষেই প্রযোজ্য।

বর্তমানে (১) সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারকারীর সংখ্যানুসারে, (২) শাসন ও আইনবিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং (৩) শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন অনুসারে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। প্রথম নীতি অনুসারে রাজতন্ত্র, একনায়ক তন্ত্র এবং গণতন্ত্রে সরকারকে বিভক্ত করা হয়। আর দ্বিতীয় নীতিকে অবলম্বন করিয়া পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তৃতীয় নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(২) গণতন্ত্র : গণতন্ত্রে সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইল জনগণ। গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার। গণতন্ত্র দুই প্রকার, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করে এবং আইনকে বলবৎ করে। আর পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের গুণ : (ক) পরোক্ষ গণতন্ত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়, (খ) জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার হয়, (গ) শাসক ও শাসিতের স্বার্থকে অভিন্ন করিয়া তোলা হয় ইত্যাদি।

গণতন্ত্রের ত্রুটি : (ক) ইহা ক্ষণভঙ্গুর, (খ) অজ্ঞদের শাসন ইত্যাদি।

গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত : গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হইলে জনগণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করিতে হইবে।

একনায়কত্ব : গণতন্ত্রের অক্ষমতার জন্যই একনায়কতন্ত্রের জন্ম হইয়াছে। একনায়কতন্ত্রের তিনটি রূপ ; (১) রাজতন্ত্র, (২) ফ্যাসিবাদ, (৩) নাৎসীবাদ। কেহ কেহ গণতন্ত্রকে দলীয় একনায়কত্ব বলিয়াও অভিহিত করেন।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র : (১) গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের বিরোধী বলিয়া মনে করা হয় না। (২) অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিংশ শতাব্দীর অর্থ-

নৈতিক গণতন্ত্রের সহিত একযোগে প্রতিষ্ঠিত না হইলে গণতন্ত্র লক্ষ্যে পেঁাছিতে পারিবে না। (৩) গণতন্ত্রে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কারণ সমানাধিকার স্বীকৃত হয়, এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ধনিক শ্রেণী ধনবলে রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে পারে। (৪) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিতে না পারিলে গণতন্ত্র অসাম্যের সমাজে পরিণত হইবে এবং উহা অবাস্তব হইবে। তাই প্রয়োজন সমাজতন্ত্র। (৫) সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সাম্য। সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রকে পূর্ণ করে।

১৯

সরকারের বিভিন্ন রূপ
পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
(Parliamentary and Presidential Governments)

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা (১) পার্লামেণ্টীয় সরকার এবং (২) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। পার্লামেণ্টীয় সরকারে তত্ত্বের দিক হইতে ব্যবস্থাবিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, আর রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে তাহা থাকে না।

পার্লামেন্টীয় বা মন্ত্রিমণ্ডলী-শাসিত সরকার (Parliamentary or Cabinet Government) ঃ শাসনবিভাগ পরিচালনার প্রকৃত কর্তৃপক্ষ (Real Executive) যদি আইনসভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন থাকেন তাহা হইলে তাহাকে পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থা বা মন্ত্রিমণ্ডলীশাসিত শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। নিম্নে এই শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্টাগুলি দেওয়া গেল ঃ

পার্লামেন্টীয় বা মন্ত্রিমণ্ডলী শাসিত শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এই শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণতঃ একটি **নামসর্বস্ব শাসক (Titular Head)** বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Head) থাকেন। তিনি আইনগতভাবে শাসক, কিন্তু প্রকৃত শাসনভার অর্পিত থাকে মন্ত্রিসভার উপর। তিনি এই মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই কারণে মন্ত্রি-সভাকে বলা হয় প্রধান শাসকের উপদেষ্টা। কিন্তু মন্ত্রিসভার উপদেশই শাসন কর্তৃপক্ষের প্রকৃত আদেশ। শাসকপ্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আদেশকে আইনসিদ্ধ করেন মাত্র। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হইলেন এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উপযুক্ত উদাহরণ। নিয়মতান্ত্রিক শাসক রাষ্ট্রপ্রধান বটে, কিন্তু সরকারের মধ্যে প্রধান নহেন। ইঁহাদের সম্মান ও মর্যাদা আছে, কিন্তু কর্তৃত্ব নাই। ফলে ইঁহাদের দায়িত্বও নাই। প্রকৃতপক্ষে, নামসর্বস্ব শাসক রাষ্ট্রের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ হিসাবে সর্বসমক্ষে উপস্থিত থাকেন। তিনি বহু আনুষ্ঠানিক কার্যও সম্পাদন করেন।

(২) এই ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, পার্লামেণ্টের নিকট মন্ত্রিসভার **যৌথভাবে (collective)** এবং **ব্যক্তিগতভাবে (individual)** দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্ব **আইনগত (Legal)** ও **রাষ্ট্রনীতিগত (Political)**। সমগ্র শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়-দায়িত্ব মন্ত্রিমণ্ডলীর। যৌথ দায়িত্বের অর্থ হইল যদি কোন একটি বিশেষ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আইনসভায় আনয়ন করা হয় এবং তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাস করানো হয় তবে সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীকেই পদত্যাগ করিতে হইবে। আর ব্যক্তিগত (Severally) দায়িত্বশীলতার তাৎপর্য হইল কোন দপ্তরের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে অনাস্থা প্রস্তাব আসিলে শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হইবে। এই সকল কারণে ইহাকে **দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government)** বলা হয়।

(৩) এই শাসন ব্যবস্থায় সমালোচনা, সমস্বার্থ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার ফলে সাধারণতঃ দেখা যায়, একই দলের সদস্যবৃন্দ লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অবশ্য, একদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে অনেক সময় অপরাপর দলের সহিত একত্রিত হইয়াও সম্মিলিত মন্ত্রিসভা (Coalition Ministry) গঠিত হয়।

(৪) এই মন্ত্রিসভার গঠন সম্পর্কে ল্যাস্কি বলেন, "ইহা হইল বিধানসভায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের একটি কমিটী" (A committee of the party in power in the Legislative Assembly")। মন্ত্রিসভার সভ্যদের বিধান-মণ্ডলীর কোন-না কোন কক্ষের সভ্য হইতে হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতাকে রাষ্ট্রপ্রধান (Head of the State) প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত হইবে।

(৫) পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী একদিকে যেমন পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকে, তেমনি আবার অপরদিকে মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেণ্টের নায়ক হিসাবে কাজ করে। কারণ, পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের যাঁহারা নেতা তাঁহারাই আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফলে, বর্তমানে মন্ত্রিসভার নায়কত্ব (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে ল্যাস্কি পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—(ক) মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রিত পার্লামেণ্ট ; যেমন, ব্রিটেন আর (খ) পার্লামেণ্ট নিয়ন্ত্রিত মন্ত্রিসভা, যেমন, ফ্রান্স।

(৬) জেনিংস, ম্যারিয়ট প্রমুখ লেখকদের মতে পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থার আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য হইল **প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব** এবং **বিরোধী দলের অস্তিত্ব** ("opposition is...a definite and essential part of the Constitution.)"।

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ ঃ (১) এই শাসন ব্যবস্থায় ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে যোগসূত্র থাকায় এক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

(২) জনসাধারণের সম্মতির ভিত্তিতেই এই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা যায়। জনপ্রতিনিধিগণই মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন। ফলে **জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণও** বজায় থাকে।

(৩) সহজ ও সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন্ত্রিমণ্ডলীর রদ বদল করা যায় বলিয়া এই শাসন ব্যবস্থা **সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা** করিয়া চলিতে সমর্থ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রয়োজনবোধে ইংল্যাণ্ডে চেম্বারলেনের বদলে চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করিয়া ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল শুধু এই শাসন ব্যবস্থার জন্যই।

(৪) দলীয় ব্যবস্থা এই শাসনব্যবস্থার একটি অঙ্গ বলিয়া দলীয় ব্যবস্থাধীনে যে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে তাহাও এই শাসন ব্যবস্থার অপর আর একটি গুণ।

(৫) আবার এই শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রকে বজায় রাখিয়াও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৬) ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, ইহাতে দায়িত্ব নির্ণয় করা সহজ, কারণ মন্ত্রিগণই আইন প্রণয়ন ও শাসনের জন্য দায়িত্ববদ্ধ।

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি ঃ (১) পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় যেহেতু ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয় না সেইহেতু কেহ কেহ বলেন যে, এই ব্যবস্থায় স্বাধীনতা বিপদাপন্ন হয়। কিন্তু এই সমালোচনা ক্ষমতা পৃথকীকরণের প্রতি একটা অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ হইতে বলা যায়, ক্ষমতা পৃথকীকরণ ব্যতীতও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে।

(২) পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ জনগণের মনোহরণ করিয়া ভোট সংগ্রহে পটু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা শাসন ব্যাপারে দক্ষ হইবেন এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না।

(৩) লর্ড হিউয়ার্ট (Lord Hewart) তাঁহার 'নয়া স্বৈরাচার' (New Despotism) গ্রন্থে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমান দলীয় শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা এরূপ কঠোর হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রতিনিধিবর্গ দলীয় নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণ করিতে বাধ্য। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার ফলে মন্ত্রিসভার স্বৈরাচারিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

(৪) এই শাসন ব্যবস্থায় শাসনকার্যে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে। কারণ মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরদানে এত ব্যস্ত থাকেন যে, নিজ দপ্তরের কাজ করার জন্য তাঁহাদের আর বিশেষ সময় থাকে না।

(৫) পরিশেষে বলা যায়, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা **স্থিতিশীল নয়**। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত সরকারী নীতি। কিন্তু, অনবরত মন্ত্রিসভা পরিবর্তিত হওয়ায় সরকারের স্থায়িত্ব এবং সরকারী নীতির স্থায়িত্ব রক্ষিত হয় না।

উপসংহারে বলা যায়, অভিযোগ যতই তীব্র হউক, এই ব্যবস্থা আজ প্রায় সর্বদেশে স্বীকৃত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ক্ষমতা-পৃথকীকরণের দিক হইতে যে সমালোচনা করা হয় তাহা বর্তমানে যথার্থ নয়। কারণ, দেখা গিয়াছে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ হইতে সহযোগিতা অনেক পরিমাণে কাম্য বলিয়া বিবেচিত। আবার গতিশীলতাই সমাজের ধর্ম। অতএব ইহাকে স্থিতিশীল বলিয়া যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন।

পার্লামেণ্টীয় সরকারের সফলতার শর্তাবলী ঃ বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কাম্য শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতেছে। তবে পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। নিম্নে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের শর্তাবলী দেওয়া গেল ঃ

(১) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে সুগঠিত বিরোধী দলের অস্তিত্বের উপর। বিরোধী দল না থাকিলে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে যেহেতু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে সেই কারণে আইনবিভাগের সহায়তায় শাসনবিভাগ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। একদলীয় ব্যবস্থায় তাই বিরোধী দল না থাকার দরুন শাসনবিভাগ স্বৈরাচারী হইয়া উঠে ; ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়, শুধু দলেরই স্বার্থ সাধিত হয়।

(২) বিরোধীদলকে সুসংগঠিত হইতে হইবে। অসংগঠিত বিরোধীদল সুসংগঠিত সরকারী দলকে সমালোচনা করিয়া সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে না।

(৩) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সফলতার আর একটি

শর্ত। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় সরকারী দল এবং বিরোধীদল উভয়ই ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে। আর বহুদল থাকিলে কোন দলই আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে না। ফলে সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়। সভ্যদের দল পরিবর্তন, সম্মিলিত সরকার গঠন প্রভৃতি শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে। তাই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায়ই পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সফলতার একটি শর্ত। এই কারণেই ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাকে সফল করিয়াছে আর ফ্রান্সের বহুদলীয় ব্যবস্থা উহার পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়াছে।

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের জনসমর্থনের পার্থক্য কম হওয়া পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের একটি শর্ত। সরকারী দলের সহিত বিরোধী দলের জনসমর্থনের পার্থক্য যদি কম থাকে তবে বিরোধী দলের সরকার গঠনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা থাকে। ফলে তাহাদের সমালোচনা সরকারী দলকে সংযত করিতে পারে। কিন্তু জনসমর্থনের পার্থক্য যদি খুব বেশী হয় তবে সরকারী দল বিরোধী দলের সমালোচনায় আর ভয় করিবে না।

উপসংহারে বলা যায় পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি যাহাই হউক না কেন বর্তমান দিনের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থাই কাম্য।

পার্লামেণ্টে কর্তৃক শাসন-বিভাগ নিয়ন্ত্রণ (Control of the executive by Legislature) : পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় এমন এক শাসন-ব্যবস্থা যাহা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবে ("Parlimentary Government does not mean Government by Parliament but Government responsible to Parliament.")। নিম্নে পার্লামেণ্ট যে সকল উপায়ে মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে তাহার উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) পার্লামেণ্টের ইচ্ছার উপরেই মন্ত্রিপরিষদের গঠন নির্ভরশীল। পার্লামেণ্টীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

(২) পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদ কাহাদের লইয়া গঠিত হইবে তাহা প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে সুপারিশ করিয়া লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে মন্ত্রিপরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাশীল থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ যতদিন পার্লামেণ্টের আস্থাশীল থাকিবে ততদিনই মন্ত্রি-পরিষদ কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য, দুই সাধারণ নির্বাচনের অন্তর্বর্তী-কালেই এই নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু থাকিতে পারে।

(৩) পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সদস্যই শাসন সম্পর্কে প্রত্যেক মন্ত্রীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে এবং জাতির স্বার্থসম্বলিত খবরাখবর জানিতে চাহিতে পারে। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পার্লামেণ্ট মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং জনসমক্ষে মন্ত্রীদের কার্যাবলীকে তুলিয়া ধরিতে পারে।

(৪) পার্লামেণ্ট মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনা করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি বা রাণী বা রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তৃতার উপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে ক্যাবি-নেটের সাধারণ নীতির উপর বিতর্ক হইতে পারে এবং এই সময় সাধারণ নীতির সমালোচনা করা যাইতে পারে। এইভাবে তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে মন্ত্রীদের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ ধার্য করা যায়।

(৫) পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের নেতা যে কোন সময় মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। এই অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিতে পারিলে

মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের ভয় দেখাইয়া সরকারকে সংযত করা যায়।

(৬) পার্লামেণ্ট কোন বিষয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্ত্রিপরিষদকে তাহা কার্যকর করিতে বলিতে পারে। আইন পাস করিয়া মন্ত্রীদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আর সভ্যদের দল পরিবর্তন বন্ধ করিতে পারে।

(৭) পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্র দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইবে। এই নীতি অনুসারে দায়িত্বহীন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানকে এমন এক মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে কাজ করিতে হইবে, যে মন্ত্রিপরিষদের উপর পার্লামেন্টের আস্থা থাকে। মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেন্টের আস্থা হারাইলে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিপরিষদ তাহার কাজের জন্য যৌথভাবে তথা ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্ববন্ধ থাকে। মন্ত্রিমণ্ডলীই রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টা এবং কর্মকর্তা। মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যাদিগকে আইন সভার সদস্য হইতে হইবে।

(৮) মন্ত্রিপরিষদ বাজেট রচনা করেন। কিন্তু তাহা পার্লামেণ্টকে দিয়া পাস করাইয়া লইতে হয়। পার্লামেণ্ট বাজেট না-মঞ্জুর করিয়া বা বাজেটের অর্থ বরাদ্দ হ্রাস করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। বাজেট নামঞ্জুর হইলে মন্ত্রি-মণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। বাজেট পাসের মাধ্যমে পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের কাজের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে।

(৯) যে কোন সময়েই পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের কোন একজনের বিরুদ্ধে নিন্দা-সূচক প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভাকে সংযত রাখিতে পারে।

সমালোচনা : ক্যাবিনেট কর্তৃক পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ

(Control of the Parliament by the Cabinet)

প্রথমতঃ, সমালোচকগণ বলেন পার্লামেণ্টের এতো ক্ষমতা নাই ; বরং মন্ত্রি-পরিষদ রাষ্ট্রের প্রধানকে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া পার্লামেণ্টকে দিয়া যদৃচ্ছা কাজ করাইয়া লইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্টকে পরিচালনা করে মন্ত্রিপরিষদ। পার্লামেণ্টের কার্যসূচী তৈয়ারী করে মন্ত্রিপরিষদ। প্রয়োজনবোধে কার্যসূচী রদবদল করিয়া মন্ত্রিসভার অভিপ্রেত কাজের অগ্রাধিকার দিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রধান তাঁহার মন্ত্রিপরিষদকে শক্তিশালী করিবার জন্য নানা-ভাবে পার্লামেণ্টে নিজের লোকজনকে মনোনয়ন করিয়া তাঁহার নিযুক্ত মন্ত্রিসভাকে শক্তিশালী করিয়া লইতে পারেন।

চতুর্থতঃ, বর্তমান আইন বড় জটিল আইন। পার্লামেণ্ট দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই জটিল আইনের আলোচনা করিতে পারে না, তাই তাহাকে অন্যান্য শাসন-বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানকে আইন প্রণয়নের অধিকার অর্পণ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে র‍্যামসে মুওর বলেন : কিছুটা বিপুল পরিমাণ কাজের চাপ বৃদ্ধির জন্য, কিছুটা ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, কিছুটা হিসাব প্রদানের কার্যধারার ভয়াবহ ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করিবার জন্য কমন্সসভা তাহার কার্য করিতে দিন দিনই অক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছে।

পঞ্চমতঃ, নির্বাচনের বিপুল খরচ, অধিকাংশ আসনগুলিকে একজন সভ্যের আসনে পরিণত করার এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করিবার ফলে পার্লামেণ্টে একটি মাত্র দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া পার্লামেণ্টের সভ্যগণকে দলের নেতৃত্বকে অনুসরণ করিতেই হয়। নচেৎ পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত না হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই সকল কারণে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ক্যাবিনেট বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে, যাহার ফলে পার্লামেণ্ট অনেক হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। আবার সভ্যগণের বক্তৃতা করিবার সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য, সভ্যগণের আলোচনার অধিকার খর্ব করিবার জন্য ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই দেখা যায়, ক্যাবিনেটের হুমকী এবং প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার ভয় প্রদর্শন এই দুইটি পন্থার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন কার্য শাসন-বিভাগই করিয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ, পার্লামেণ্টের সময়ের বড় অভাব। আবার জটিল সমস্যার দ্রুত মীমাংসা করিবার মতো যোগ্যতাও পার্লামেণ্টের নাই। আবার আইনকে গতিশীল করিবার জন্য এবং সময়ের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য শাসন বিভাগের হাতে নিয়ম কানুন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। আবার শাসন-বিভাগ জরুরী অবস্থার নামে অনেক সময় জরুরী আইন প্রণয়ন করিয়া লয়। পার্লামেণ্টের সময়ের অভাবের জন্য আইনের মৌলিক নীতিগুলি ঘোষণা করিয়া আইনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা শাসনবিভাগের হাতে অর্পণ করে। এই অর্পিত ক্ষমতাবলে শাসনবিভাগ আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে (Deligated Legislation)।

সপ্তমতঃ, বর্তমান দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার ফলে দলের নির্দেশেই শাসনবিভাগকে কাজ করিতে হয়। পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে সরকারী দলের একজন বেতনভুক হুইপ থাকেন। হুইপের নির্দেশেই পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সভ্যগণকে চলিতে হয়। সভ্যগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিয়া হুইপের নির্দেশেই সভ্যগণকে কাজ করিতে হয়। পার্লামেণ্টের আলোচনা চালাইবার সময় স্থির করা এবং কি কি বিষয়ের উপর আলোচনা হইবে তাহার সূচী নির্ধারণ করা, জাতীয় চরিত্রের বিলগুলি উত্থাপন করার দায়িত্ব ক্যাবিনেটের। ক্যাবিনেট এই সকল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টের সমর্থন পাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যাবিনেট সকল ব্যাপারে সর্বেসর্বা।

উপসংহারে বলা যায়, মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের নিকট ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে দায়িত্ববদ্ধ। তাহাদের কাজের জন্য তাহাদিগকে পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি হইতে হয়। পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিলে মন্ত্রিপরিষদকে বিদায় লইতে হয়। পার্লামেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে পারে, সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা ছাঁটাই করিতে পারে, ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। এইভাবে ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

(Presidential form of Government)

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি তাঁহার শাসন

সংক্রান্ত নীতির জন্য এবং কোন কার্যের জন্য আইন সভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন নহেন। এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসনবিভাগ পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে গঠিত হয়। এই ব্যবস্থা এককেন্দ্রিকও হইতে পারে আবার যুক্তরাষ্ট্রীয়ও হইতে পারে। এই শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ থাকিতেও পারে আবার মন্ত্রিসভা নাও থাকিতে পারে। এই শাসন ব্যবস্থায় যদি মন্ত্রিপরিষদ থাকে তবে মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নহেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। শাসন-বিভাগের চরম কর্তৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্রপতি নিজেই। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এই শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুসৃত হয়।

(২) মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য নহেন। ফলে তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তাঁহারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। মন্ত্রিসভার সদস্যকে অপসারণ করার অধিকার আইনসভার নাই।

(৩) রাষ্ট্রপতিও আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তিনি জনসাধারণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য, রাষ্ট্রপতি সংবিধান ভঙ্গ করিলে এবং কোন দুর্নীতিমূলক কার্য করিলেই তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায়।

(৪) এই শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। প্রথাগতভাবে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না। তবে ভিটো (Veto) প্রয়োগ করিয়া আইন প্রণয়ন বন্ধ রাখিতে পারেন। এই শাসন ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ ঃ (১) এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল স্থায়িত্ব। এই স্থায়িত্বের জন্য অনুসৃত নীতি ও কার্যধারার মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্নতা বিদ্যমান থাকে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও সুনাম বৃদ্ধি পায়। আবার শাসকগণকে নির্বাচকদের মনোহরণ কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় না বলিয়া শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে।

(২) এই ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য। রাষ্ট্রপতি অপর কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়াই ক্ষিপ্রতার সহিত জরুরী প্রয়োজনে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় তাহা সম্ভব নয়।

(৩) বহু দল ও বহু স্বার্থ যেখানে বিদ্যমান সেখানে এই শাসন ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর। কারণ, বহুদল প্রথায় পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে কিন্তু আলোচ্য ব্যবস্থায় বহু দল থাকা সত্ত্বেও শাসনযন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে না।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি ঃ (১) এই শাসন ব্যবস্থা পূর্ণ ক্ষমতা পৃথকীকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্যবস্থাবিভাগ ও শাসনবিভাগ পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে। মার্কিন শাসনযন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই ধরনের বহু সংঘর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

(২) এই শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। আইনসভার প্রতি রাষ্ট্রপতির যেহেতু কোন দায়দায়িত্ব নাই অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার যেহেতু কোন উপায় নাই সেইহেতু রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন।

(৩) ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় অন্ততঃ একটি গুণ লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইল দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা অতিশ

সহজতর। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভা কমিটিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পৃথক পৃথক ভাবে কমিটিগুলি আইন প্রণয়ন কার্যে রত থাকে। এইভাবে দায়িত্ব বিভিন্ন কমিটিগুলির মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয়ও কঠিন হইয়া পড়ে।

(৪) আবার আইন প্রণয়ন কমিটিগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ পরিপূর্ণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করে বলিয়া সমগ্র দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না।

(৫) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্ব নির্ণয় করা কঠিন। পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় যেহেতু মন্ত্রিপরিষদই আইন প্রণয়নকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে এবং শাসন বিভাগেরও কর্তৃত্ব মন্ত্রীদেরই হাতে, সেইহেতু দায়িত্ব নির্ণয় করা কঠিন নয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সহিত আইন বিভাগের কোন সম্পর্ক থাকে না। তাই দায়িত্ব নির্ণয় করা কঠিন।

(৬) রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন কার্য সাধিত হইয়া থাকে, সেইহেতু জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা আঞ্চলিক স্বার্থের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ কমিটিগুলি অনেক সময় আঞ্চলিক স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখে।

(৭) এই শাসন-ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার ব্যাখ্যার ভার বিচার বিভাগের হাতে অর্পিত হয়। ফলে বিচার বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পার্লামেন্টীয় সরকার বনাম রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার:

পার্লামেন্টীয় সরকার	রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার
(১) পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় ব্যবস্থা বিভাগের সহিত শাসন বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।	(১) রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থাবিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ বর্তমান থাকে।
(২) পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান থাকেন।	(২) রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসক প্রধান।
(৩) পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় পার্লামেণ্টই সার্বভৌম।	(৩) রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় আইনসভাকে সার্বভৌম বলা চলে না।
(৪) পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী থাকেন। মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন।	(৪) রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণতঃ কোন মন্ত্রিমণ্ডলী থাকে না এবং রাষ্ট্রপতি তাঁহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকেন না। তাঁহার দায়িত্ব জনসাধারণের নিকট।
(৫) পার্লামেণ্ট মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করিলে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়।	(৫) আইনসভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ইম্‌পিচমেণ্ট অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে বটে কিন্তু রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে না।

পার্লামেণ্টীয় সরকার বনাম রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

(৬) পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় পার্লামেণ্ট অর্থবরাদ্দের মাধ্যমে, মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের মাধ্যমে, মন্ত্রিমণ্ডলীর কাজের সমালোচনা করিয়া এবং মন্ত্রিগণের কাজের তদারক করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী অর্থাৎ শাসন-বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

(৬) রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় আইনসভা সরাসরি রাষ্ট্রপতির উপর নিয়ন্ত্রণ ধার্য করিতে পারে না। তবে রাষ্ট্রপতির কার্যাবলীর কিয়দংশ আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ থাকে বলিয়া রাষ্ট্রপতি যদৃচ্ছা কাজ করিতে পারেন না।

(৭) পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থা অস্থায়ী এবং বহুদলীয় ব্যবস্থায় ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। কারণ বহুদলীয় ব্যবস্থায় ঘন ঘন মন্ত্রিসভার রদ-বদল হইয়া থাকে।

(৭) রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী ও নিশ্চিত হইয়া থাকে, কারণ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না।

(৮) পার্লামেণ্টই সার্বভৌম, সুতরাং দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা সহজ। মন্ত্রিপরিষদ কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকে।

(৮) রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব নির্ণয় করা সহজ নয়। ক্ষমতা পৃথকীকরণ করিবার ফলে দায়িত্ব নির্ণয় করা কঠিন। ব্যবস্থাবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে বিরোধিতার ফলে কুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা থাকে।

(৯) পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা সময়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। প্রয়োজনবোধে শাসন-বিভাগের রদবদল করা চলে।

(৯) রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন-ব্যবস্থার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শাসন-বিভাগের রদবদল করা সহজ নয়।

পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ কতদূর বর্তাইবে তাহারই উপর নির্ভর করে ইহাদের সাফল্য। এই প্রসঙ্গে স্ট্রং বলেন যে, শাসনবিভাগকে হয় পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্ববদ্ধ হইতে হইবে যে, পার্লামেণ্টের আস্থা হারাইলে শাসনবিভাগকে পার্লামেণ্ট পদচ্যুত করিতে পারে, নচেৎ, সাময়িক-ভাবে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করার মাধ্যমে ইহাকে অতিদূর নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়। "The executive is either responsible to Parliament which has the power to remove it, should it lose the confidence of that body, or it is subject to some more remote check, as for example, by means of a periodical Presidential election"—*Strong*। তাই বলা হয়, বর্তমানে জনগণের নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই গণতান্ত্রিক সরকারকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যায়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় ধার্য করা যত সহজ রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় ধার্য করা তত সহজ নয়।

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা : পশ্চিমী গণতন্ত্রের মতে গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে বিরোধী দলের বিশেষ প্রয়োজন। একদলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ গণতন্ত্রে শাসকমণ্ডলীকে জন্য

গণের দ্বারা নির্বাচিত হইতে হয়। এই নির্বাচন ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে। নির্বাচনে স্বাধীনভাবে ভোট দিবার অধিকার স্বীকৃত হইবে। নির্বাচনে প্রার্থীহিসাবে প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দিতে হইবে। নির্বাচন প্রসঙ্গে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গতিবিধির স্বাধীনতা, সভা সমিতি করিবার স্বাধীনতা এবং সমালোচনা করিবার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে হইবে। গণতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি কখনও একদলীয় ব্যবস্থায় পালিত হইতে পারে নাই। সকল মানুষের পছন্দ একরকম নয়। সকল মানুষ এক মতাবলম্বী হইবে এমন কথা বলা যায় না। আবার সরকারী দলের দ্বারা সরকারকে সমালোচনা করা যায় না। নির্বাচনে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তবে তাহা একটি দলের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তাই বিরোধী দলের প্রয়োজন।

বিরোধী দল সরকারের কাজের সমালোচনা করে, সরকারের দৃষ্টি গোচরে দেশের বহু সমস্যা হাজির করে এবং সমস্যা সমাধানের পথ বলিয়া দেয়। যদি বিরোধীদল শক্তিশালী হয় তবে সরকারী দলের মধ্যে যে সকল উপদল সৃষ্টি হয় তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিরোধী দলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু বিরোধী দল না থাকিলে বা বিরোধী দল দুর্বল হইলে সরকারী দলের উপদলগুলি শক্তিশালী হইয়া সরকারী দলে ভাঙ্গন ধরায়। তাই সরকারী দলের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিবার জন্যও বিরোধী দলের প্রয়োজন।

দেশে একটি মাত্র দল থাকিলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া গণচেতনাও জাগ্রত হয় না। সরকারের ত্রুটি ধরা পড়ে না। বিরোধী দল না থাকার অর্থ মানুষের মত প্রকাশের গতিবিধির স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। সরকারী দলের সভ্যগণ ছাড়া আর কেহ সভা সমিতি করিতে পারিবে না।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের কার্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সমালোচনা করার অধিকার যে শাসন-ব্যবস্থায় নাই সেই শাসন-ব্যবস্থায় সরকার নিশ্চিতভাবেই স্বৈরাচারী হইবে। এই কারণে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে বিরোধীদলকে। বিরোধী দল সরকারী কার্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া সরকারকে সঠিকপথে রাষ্ট্রকে পরিচালিত করিতে সাহায্য করে। বিরোধীদল না থাকিলে ইহা সম্ভবপর হয় না।

অবশ্য ইহা উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না যে, যে সকল রাষ্ট্রে শ্রেণী বৈষম্য নাই সেই সকল রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা থাকিতে পারে এবং বিরোধীদলের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনৈতিক দলই কোন না-কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং যে রাষ্ট্রে মাত্র একটি শ্রেণীই আছে সেই রাষ্ট্রে একটি দল থাকিলেই রাষ্ট্রকার্য সঠিক-ভাবে চলিবে কারণ এই শ্রেণীর সরকার নিজের শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজই করিবে না। কিন্তু যে রাষ্ট্রে একাধিক শ্রেণী বাস করে সেই রাষ্ট্রে একাধিক দল ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। একশ্রেণীর রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, একশ্রেণীর দলীয় ব্যবস্থায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইরূপ একদলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় যদি গণতান্ত্রিক নীতি প্রযুক্ত হয় তবে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের ত্রুটি ধরা পড়ে। এবং ত্রুটির সমাধানও করা সম্ভবপর হয়।

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুসারে গণতান্ত্রিক সরকারকে (১) পার্লামেণ্টীয় ও (২) রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে বিভক্ত করা যায়।

পার্লামেণ্টীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল ঃ (১) একজন নামসর্বস্ব শাসক থাকিবে, (২) ব্যবস্থা-বিভাগের নিকট মন্ত্রিমণ্ডলী দায়িত্বশীল থাকিবেন, (৩) ব্যবস্থা ও শাসনবিভাগ সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করিবে, ইত্যাদি।

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণ ঃ (১) গতিশীল সমাজের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, (২) মন্ত্রিমণ্ডলী দায়িত্বশীল হয়, (৩) রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার হয়, ইত্যাদি।

পার্লামেণ্টীয় শাসনের ত্রুটি ঃ (১) ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুসৃত হয় না বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, (২) মন্ত্রিগণ জনগণের মনোহরণে ব্যস্ত থাকায় শাসনকার্যে রত থাকিতে পারেন না, ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা ঃ রাষ্ট্রপতি নিজেই নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসক। ক্ষমতা-পৃথকীকরণ এই শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই শাসন-ব্যবস্থার গুণ হইল ঃ ইহা স্থায়ী, ক্ষমতা পৃথকীকরণের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। আর. এই শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি হইল ইহা স্বৈরাচারিতার পথ প্রশস্ত করে। কারণ রাষ্ট্রপতি আইনসভার নিকট তাঁহার কার্যের জন্য দায়ী নহেন।

১০ | সরকারের বিভিন্ন রূপ

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

(Unitary and Federal Governments)

ক্ষমতা পৃথকীকরণের ভিত্তিতে যেমন পার্লামেন্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয় তেমনি আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তি বলিতে বুঝায় প্রত্যেক বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রে একটি জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার থাকিবে, আর থাকিবে কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার।

শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন শুধু ভৌগোলিক কারণেই হয় না, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রক্ষার্থে, রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসারকল্পে গণতান্ত্রিক আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য এবং আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষাকল্পেও শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন ব্যবস্থা থাকে। শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন আবার দুইটি পদ্ধতি অনুসারে হয়; যথা—(ক) **বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি** এবং (খ) **ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতি**।

বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র দ্বারা সমগ্র ক্ষমতা জাতীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এবং জাতীয় সরকার আঞ্চলিক সরকার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করে। শাসন-ব্যবস্থায় যদি বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation) নীতি অনুসৃত হয় তবে তাহাকে এককেন্দ্রিক (Unitary) শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়।

আর ক্ষমতা-বণ্টন নীতি অনুসারে শাসনতন্ত্র দ্বারা যদি জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার সৃষ্ট হয় এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয় তবে শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) শাসন-ব্যবস্থা।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary Government): এককেন্দ্রিক সরকারের সংজ্ঞানুসারে দেখা যায় জাতীয় সরকারই শাসন ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। প্রয়োজনবোধে জাতীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারগুলিকে পুনর্গঠিতও করিতে পারে এবং ক্ষমতা বাড়াইতে বা কমাইতেও পারে। কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকার-সমূহের ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধিও করিতে পারে। আবার প্রয়োজন হইলে আঞ্চলিক সরকারের বিলোপ সাধনও করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ প্রাধান্যের জন্য স্ট্রং (C. F. Strong) বলেন, সংবিধান মতে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটি সরকার ও একটি আইনসভা থাকে। এই সরকার হইল কেন্দ্রীয় সরকার আর এই আইনসভা হইল কেন্দ্রীয় আইনসভা ("The essence of a unitary state is that the power of the Central Government is unrestricted, for the constitution...does not admit any other law-making body than the central one.")।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান উদাহরণ হইল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের শাসন-ব্যবস্থা। ইংল্যাণ্ডের আঞ্চলিক সরকারগুলি ঐতিহাসিকভাবে গড়িয়া উঠিলেও

ইহাদের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। অগ্-এর ভাষায় বলা যায় যে, ইংল্যাণ্ডের আঞ্চলিক সরকারসমূহের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যাহাই মন্তব্য করা হউক না কেন ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবলভাবে ধার্য করা হয়। ফ্রান্সের আঞ্চলিক সরকার সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি প্রযোজ্য। ফ্রান্সের আঞ্চলিক সরকারসমূহের বড় একটা স্বাতন্ত্র্যাধিকার নাই।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : (১) এককেন্দ্রিক শাসনে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। কেন্দ্রের আইন ও নির্দেশ পালন আঞ্চলিক সরকারগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক। এইজন্য ডাইসি এই মন্তব্য করেন যে, এককেন্দ্রিক শাসনে একই কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা আইনগত সর্বপ্রধান কর্তৃত্বের স্বাভাবিক ব্যবহার হইয়া থাকে ("The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power."...)।

(২) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত ও অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে পারে।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উদাহরণ হইতে বিষয়টিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝানো যায়। ইংল্যাণ্ডে আঞ্চলিক সরকারগুলি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলির স্বাতন্ত্র্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে বটে কিন্তু অগ্ (F. A. Ogg) প্রমুখ এই মত পোষণ করেন যে, আঞ্চলিক সরকারের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ গভীর ও ব্যাপক। ফ্রান্সের সকল আঞ্চলিক সরকারই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। অগ্ বলেন : "বস্তুতঃ, ফ্রান্সে একটি মাত্র সরকার আছে এবং তাহা হইল কেন্দ্রীয় সরকার।'

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাগুণ : (ক) গুণ : (১) এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। ফলে ইহা শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা। এই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অপরাপর রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতার দ্বারাও সীমাবদ্ধ নয়।

(২) এই শাসন-ব্যবস্থায় একই নীতি ও আইন সমগ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থায় অনুসৃত হয় বলিয়া শাসনপদ্ধতি কার্যকর করা খুব সহজ ও দ্রুত হয়।

(৩) এই শাসন-ব্যবস্থায় রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আইন ও কার্যপদ্ধতি অনুসৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

(৪) এই ব্যবস্থায় অর্থের ব্যয়ও কম হয়, কারণ দ্বিবিধ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন ইহাতে হয় না।

(খ) ত্রুটি : (১) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে অস্বীকার করা হয়। ফলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ সমাধিস্থ হয়।

(২) কেন্দ্র আঞ্চলিক খুঁটিনাটি বিষয় সঠিকভাবে উপলব্ধি করিয়া কোন আইন পাস করিতে পারে না।

(৩) কেন্দ্র হইতে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইলে আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

উপসংহারে বলা যায়, উপরোক্ত ত্রুটিগুলি এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিলক্ষিত হইলেও যদি সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ও জাতীয়তা অভিন্ন হয় তবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

এককেন্দ্রিক	যুক্তরাষ্ট্রীয়
(১) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়।	(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভক্ত হয়।
(২) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের আইন ও নির্দেশের অধীন।	(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল নয় বা কেন্দ্রও আঞ্চলিক সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়।
(৩) এককেন্দ্রিক শাসনে কেন্দ্র আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে।	(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একে অপরের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।
(৪) এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত বা অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে পারে।	(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে হইবে।
(৫) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয় না।	(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বণ্টিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

(Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্র (Federation) : যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of Federation) : কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্র যুক্ত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে পারে। আবার ক্ষমতা-বণ্টন নীতি অনুসারে শাসনতন্ত্র দ্বারাই জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার সৃষ্ট হয় এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই সংবিধান কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার সৃষ্টি করে এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেয়। এইভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হয় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার কেহ কাহারও অধীন হয় না ("In Federal Constitution the powers of Government are divided between a Government for the whole country and Government for parts of the country in such a way that each Government is legally independent within its sphere."—*K. C. Wheare*)। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতা পরিবর্তন করিতে হইলে সংবিধানকে সংশোধিত করিয়া লইতে হয়। হোয়ারে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে বলেন : যুক্তরাষ্ট্রের নীতি বলিতে

যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা

আমি মনে করি ইহা হইল ক্ষমতা বণ্টনের সেই পদ্ধতি যাহাতে সাধারণ সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি প্রত্যেকেই স্ব স্ব সীমার মধ্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।"*

ডাইসিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রতত্ত্ব বলিতে বুঝায় এমন এক শাসন-ব্যবস্থা, যেখানে কেহ কাহারও অধীন নহে এবং অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা বণ্টিত হয়। আর প্রত্যেকের ক্ষমতার উৎস ও নিয়ামক হইল শাসনতন্ত্র।** এই সংজ্ঞাদ্বয় হইতে যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) যুক্তরাষ্ট্রে দুই স্তরের সরকার লক্ষ্য করা যায় ; যথা, (ক) কেন্দ্রীয় সরকার (Federal Government), (খ) অঙ্গরাজ্য সরকার (State Government)।

(২) এই দুইটি সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিখুঁতভাবে বণ্টিত হয়।

(৩) এই দুই স্তরের সরকার কেহ কাহারও অধীন হইবে না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেয়।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে। তাহারা কেন্দ্রেরও নাগরিক এবং অঞ্চলেরও নাগরিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব (Dual Citizenship) স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নাগরিকত্বের দায় ও অধিকারে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(৬) শাসনক্ষমতার বণ্টন নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত হইয়া থাকে।

(৭) আবার শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্বের জন্য ইহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় করা হয়।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রে নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া মতবিরোধ সৃষ্টি হইলে নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী তাহার নিষ্পত্তি করেন। একই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে (Federal Court) শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক (interpreter and guardian of the Constitution) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

(৯) যুক্তরাষ্ট্র এক অখণ্ড সার্বভৌমিকতাসম্পন্ন রাষ্ট্র। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারকে মিলাইয়াই যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তাহাই যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির কোন সার্বভৌমিকতা নাই। কেহ কেহ বলেন

* By federal principal I mean the method of dividing power so that the central and regional governments are each within a sphere co-ordinate and independent. —*K. C. Wheare.*

** "Federalism" means the distribution of the forces of the State among a number of co-ordinate bodies, each originating in and controlled by Constitution".

যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অখণ্ড হইলেও এখানে সার্বভৌমিকতার একটি বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক আইনসভাই অ-সার্বভৌম আইনসভা (Non-sovereign Law-making body)। কারণ, এখানে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক হোয়েরকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বলিতে এককভাবে কেন্দ্রীয় ও আইনসভার শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অক্ষমতাকেই বুঝানো হয়। আবার কেহ কেহ শাসনতন্ত্রকেই সার্বভৌমিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের ইতিহাস (History of the origin of a Federation): যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের ইতিহাস প্রসঙ্গে স্ট্রং (Strong) এই মত পোষণ করেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র দুইটি পদ্ধতিতে মিলিত হইয়াছে—এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে একটি হইল অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি (Integration by Absorption)। এই পদ্ধতি অনুসারে বিজিত রাষ্ট্র বিজয়ী রাষ্ট্রের অন্তভুক্ত হইয়াছে অথবা প্রবল জাতীয় ভাবের বশবর্তী হইয়া দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি (Federal Method)। এই পদ্ধতি অনুসারে কতিপয় রাষ্ট্র মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাষ্ট্রসকল স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখে। এই প্রসঙ্গে ডাইসির মতটি বিশ্লেষণ করিলে চারিটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; যথা, (ক) রাষ্ট্রগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একটি ভৌগোলিক সান্নিধ্য বজায় থাকিবে। (খ) এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এমন একটা জাতীয় ভাব থাকিবে যাহাতে জাতীয় ঐক্য সাধিত হইতে পারে। (গ) এই জাতীয় ভাবের জন্য তাহাদের মধ্যে একটা মিলনের স্পৃহা থাকিবে। (ঘ) কিন্তু তাহারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়া মিলিত হইবে না। যে রাষ্ট্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান মিলিবে তাহাকেই বলে যুক্তরাষ্ট্র।

হোয়ারেও অনুরূপ একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। ডাইসির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিবার পর একটি প্রশ্ন উঠে। প্রশ্নটি হইল একদিকে মিলনের ইচ্ছা, আর অপরদিকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ইচ্ছা কি কারণে হইয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে হোয়ারে বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, বহিরাক্রমণ প্রতিহত করিবার প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিবার ইচ্ছা মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে একই রাষ্ট্রের অধীনে মিলিত হইতে উদ্বোধিত করে। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতিকে ধরা যাইতে পারে। এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হোয়ারে ভাষা, ধর্ম ও উদ্ভবগত ঐক্যের কথা বলেন নাই। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনে এইগুলিকে তিনি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেন নাই।

উপরোক্ত আলোচনায় মিলনের আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হইয়াছে। এখন দেখা প্রয়োজন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি কেন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চায়। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। এই স্বাতন্ত্র্যকে রাজ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়া নিজেদের সত্তাকে লুপ্ত করিতে চায় না। আবার অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত, ভাষাগত, উদ্ভবগত ও ধর্মগত পার্থক্যের প্রভাব এবং ভৌগোলিক ব্যবধান অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে প্রেরণা যোগাইয়াছে। আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পার্থক্যের জন্যও স্বাতন্ত্র্য

রক্ষা করার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে উপযুক্ত নেতৃত্বের উপর।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য দুইটি শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়—একটি হইল কেন্দ্রাভিগামী (Centripetal) আর অপরটি হইল কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal)। ডাইসি প্রথমোক্তটির উল্লেখ করিয়াছেন। জাতীয় ঐক্য সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিলে কেন্দ্রাভিগামী শক্তি কার্য করে। এই কেন্দ্রাভিগামী শক্তির প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। আবার বর্তমানের ঝোঁক হইল কেন্দ্রাতিগ শক্তির দিকে। এই শক্তির প্রভাবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ভাঙিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়; যেমন, কানাডা ও ভারত। ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতি এই দ্বিতীয় পন্থায়ই যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণাগুণ: (১) লর্ড ব্রাইসের মতে যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিকভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা এমনভাবে হইয়া থাকে যাহাতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে এবং আঞ্চলিক অভাব অভিযোগের পূর্তি হয়।

(২) যুক্তরাষ্ট্র এই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও সামরিক ও অর্থবলে বলীয়ান হয় এবং স্বাধীনতাও সংরক্ষণ করে।

(৩) ইহা জাতীয় সংহতি সাধন করিবার প্রকৃষ্টতম উপায়। বিভিন্ন জাতি যখন একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এক জাতীয় সংহতি সাধিত হয়।

(৪) এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইতে পারে।

(৬) আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হওয়ায় জনসাধারণ রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং আগ্রহান্বিত হয় এবং লিখিত শাসনতন্ত্র থাকিবার ফলে ক্ষমতা ও অধিকার নির্দিষ্ট হয়।

(৭) এই ব্যবস্থায় শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে চালিত হয় এবং আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যও কম থাকে; কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাজের চাপ কম থাকে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ত্রুটি: (১) এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল দুই স্তরের সরকারী ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে।

(২) ডাঃ ফাইনার বলেন যে, এই ব্যবস্থায় অর্থনীতি, শিল্প-বিজ্ঞান, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যাহত হয়।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আইনের বৈশিষ্ট্য, অধিকার ও কর্মক্ষেত্র-সম্বন্ধে এক্তিয়ারগত সমস্যার ফলে প্রভূত মামলা-মোকদ্দমা হইয়া থাকে। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রভূত বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা-মোকদ্দমা হইয়া থাকে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া গতিশীল সমাজের সহিত ইহা তাল রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। আবার এই ব্যবস্থার বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরস্পর-বিরোধী আইনও প্রণীত হইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অপরাপর সমবায় রাষ্ট্রের পার্থক্য (Distinction between a Federation and other Composite States) : (ক) যুক্তরাষ্ট্র বনাম সমবায় রাষ্ট্র : পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। পূর্বোক্ত পদ্ধতি-গুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইতে পারে। তবে এই পদ্ধতিগুলি অনুসারে মিলনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র যে সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া গঠিত হয় সেই সকল বৈশিষ্ট্য আলোচ্য রাষ্ট্রগুলিতে থাকে না। কতকগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রসমবায়। এখানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সকল মিলিত হইয়া একটি রাষ্ট্রসমবায় সৃষ্টি করে। হল্ (Hall)-এর ভাষায়, রাষ্ট্রসমবায় হইল, "বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে কতক পরিমাণে তাহাদের কার্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য বিসর্জন দিতে সম্মত হইয়াছে এরূপ কতকগুলি রাষ্ট্রের সমবায়" (" A Confederation is a union of States which consent to forego permanently part of their liberty for certain specific objects.") ওপেনহাইম বলেন, "রাষ্ট্রসমবায় হইতেছে পূর্ণ সার্বভৌম কতিপয় রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সন্ধির দ্বারা গঠিত এমন এক সংঘ যাহা সদস্য রাষ্ট্রদের উপর কোন দাবি করিতে পারে না।"*

নিম্নে যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হইল :

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য

যুক্তরাষ্ট্র	রাষ্ট্র-সমবায়
(১) যুক্তরাষ্ট্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র।	(১) রাষ্ট্র-সমবায় হইল অনেক রাষ্ট্রের সমাবেশ।
(২) ইহার ভিত্তি হইল শাসনতান্ত্রিক আইন।	(২) ইহার ভিত্তি হইল পারস্পরিক চুক্তি।
(৩) ইহাতে উভয় সরকারই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বপ্রধান।	(৩) ইহাতে সংযোগী রাষ্ট্রগুলিই প্রধান।
(৪) যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী।	(৪) রাষ্ট্র-সমবায় অস্থায়ী।
(৫) যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির বাহির হইয়া যাইবার আইনসঙ্গত অধিকার নাই।	(৫) রাষ্ট্র-সমবায়ে অঙ্গরাজ্যগুলির সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার আছে।
(৬) যুক্তরাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়।	(৬) রাষ্ট্র-সমবায়ের অঙ্গরাজ্যগুলি স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পায়।
(৭) যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত নাগরিকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে।	(৭) রাষ্ট্র-সমবায়ের কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যগুলির মাধ্যমে নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারে।

*" A Confederacy consists of a number of full sovereign states linked together for the maintenance of this external and internal independence by a recognised international treaty into a union with organs of its own, which are vested with a certain power over the member states but not over the citizens of these states. —*Openheim*,

(খ) **যুক্তরাষ্ট্র ও শক্তিমৈত্রী (Federation and Alliance) :** আক্রমণমূলক উদ্দেশ্য (Offensive) অথবা প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্য (Defensive) অথবা শক্তির সমতা বিধানকল্পে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখনই শক্তিমৈত্রীর সৃষ্টি হয়। এই শক্তিমৈত্রী আবার ক্ষুদ্র আঁতাত (Little Entente) নামেও পরিচিত। এই মৈত্রীর ফলে যোগদানকারী রাষ্ট্রের সার্বভৌমকতা নষ্ট হয় না। ইহার উদাহরণস্বরূপে বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইতালি, জাপান ও অস্ট্রিয়া এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি শক্তিমৈত্রী চুক্তি হইয়াছিল। স্বার্থের সংঘাতের ফলে ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। পূর্ববর্ণিত রাষ্ট্রের সহিত ইহার বিশেষ সম্পর্ক নাই।

(গ) **ব্যক্তিগত ও প্রকৃত রাজ্যসংঘ (Personal and Real Union) :** যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনাকালে আরও দুইপ্রকারের শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহাদের একপ্রকার হইল ব্যক্তিগত রাষ্ট্র-বন্ধন (Personal Union) আর অপর প্রকার হইল প্রকৃত রাষ্ট্র-বন্ধন (Real Union)। ব্যক্তিগত রাষ্ট্র-বন্ধনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার, যুদ্ধ ও বিবাহ প্রভৃতির ফলে দুইটি স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা একই নৃপতির অধীনে চালু থাকে। উদাহরণস্বরূপে বলা যায়, ইংল্যাণ্ড ও হ্যানোভার ছিল একই নৃপতির অধীনে। এই ধরনের ব্যবস্থায় দুইটি রাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত করিতে পারিত।

(ঘ) প্রকৃত রাজ্যসংঘের (Real Union) ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজস্ব সার্বভৌমিকতা বজায় রাখিয়া নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। ইহাকে রাজ্য-সমবায়ও বলা হয়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্ব স্ব রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজ্যসংঘে একটির মাত্র সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হয়। সাধারণতঃ রাজতন্ত্রের আধীনেই রাজ্য-সংঘ গঠিত হইতে পারে। ১৯১৫ সালে এক চুক্তি দ্বারা নরওয়ে সুইডেনের নৃপতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার হস্তে বৈদেশিক ব্যাপার পরিচালনাসংক্রান্ত ভার অর্পণ করিয়া এইরূপ রাজ্যসংঘ গঠন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ (Variations of the Federal form) : ভিন্ন ক্ষমতা-বণ্টনের নীতি, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতিতে বিভিন্নতা এবং শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। শাসন-ক্ষমতা বণ্টনের দিক হইতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি পদ্ধতিতে শাসন-ক্ষমতা বণ্টিত হয়; যথা—(১) শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাকে অঙ্গরাজ্যগুলিকে প্রদান করার পদ্ধতি; (২) শাসনতন্ত্র দ্বারা অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলিকে কেন্দ্রকে প্রদান করার পদ্ধতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পদ্ধতিতে এবং কানাডায় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শাসন-ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকার-ভেদের কারণ।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্যও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডের উদাহরণ প্রাসঙ্গিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালত। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা ও

অভিভাবক। সুইজারল্যান্ডের আদালতের শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে ক্ষমতা অতিশয় সীমাবদ্ধ। ইহা আইনসভা প্রণীত কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নেও কেন্দ্রীয় আইনের ব্যাখ্যার ক্ষমতা আদালতের নাই। উহা অর্পণ করা হইয়াছে প্রেসিডিয়ামের হস্তে।

আবার সংবিধান পরিবর্তন প্রণালীও সকল যুক্তরাষ্ট্রের এক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সম্মতি ব্যতীত সংবিধানের কোন পরিবর্তন করা যায় না। সুইজারল্যান্ডে গণউদ্যোগের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব আসিতে পারে। এইভাবে উপরোক্ত তিন পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ করা যায়।

আবার আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থা বলিয়াও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ করা হয়। অধ্যাপক হোয়ারের মতে অনেক শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি সংবদ্ধ হয় কিন্তু বাস্তবে তাহা কার্যকর হয় না। আবার এমন অনেক শাসন-ব্যবস্থা আছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কার্যকর হয় কিন্তু শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে হোয়ারে বলেন, যে সকল শাসনতন্ত্র ও শাসন-ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি প্রধান হইলেও যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন নয় সেগুলিকে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় (Quasi-Federal) শাসনতন্ত্র বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদান কি ভারতে বর্তমান ? (Are those conditions present in India ?) ১৯৫৬ সালের রাজ্য-পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ১৪টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। বর্তমানে রাজ্যের সংখ্যা হইল ২২টি আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৯টি। অঙ্গরাজ্যগুলির ভৌগোলিক ঐক্যের উপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সাফল্য। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে এবং লাক্ষা ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জকে বাদ দিলে অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে অনেকটা ভৌগোলিক ঐক্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আবার পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদান সহজতর হওয়ায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। ভৌগোলিক ঐক্যের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সুদৃঢ় হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত এবং অর্থনৈতিক ঐক্য। ভারতবর্ষে এই সকল বিষয়ে ঐক্য নাই। কিন্তু শত শত বৎসর ধরিয়া একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করার ফলে ভারতবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালী, চিন্তাধারা এবং অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবন একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। আবার ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে এক-নাগরিকত্ব প্রবর্তন করিয়া এবং সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া এই শত শত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের আর একটি শর্ত হইল জাতীয়তাবোধ। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবোধ নাই বলিয়া মন্তব্য করা হয়। কিন্তু ইহাকে অভ্রান্ত বলা চলে না। কারণ দিন দিনই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ব্রিটিশ আমলে বিভেদমূলক নীতি (Divide and Rule) অনুসৃত হওয়ায় জাতীয়তা-বোধ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক মতভেদ দূরীকরণের জন্য আঞ্চলিক পরামর্শ সভা গঠন করিয়াছেন এবং

প্রায়ই দেখা যায় রাজ্যগুলির শাসনকর্তাদের সম্মিলিত বৈঠকের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সকল ব্যবস্থার মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে জাতি-বিভেদ তিরোহিত হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য আঞ্চলিক রাজ্যগুলির সমানাধিকার, পার্লামেণ্টে সমান প্রতিনিধিত্ব, রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদের ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমতার একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সমতার একান্ত অভাব। মধ্য-প্রদেশ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের লোকসংখ্যা, আয়তন ও সম্পদ অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা বেশী। ফলে পার্লামেণ্টে এই সকল রাজ্যের প্রতিনিধিও অনেক বেশীসংখ্যক। এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায়, ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে আঞ্চলিক রাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের অথবা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সর্বশেষে বলা যায়, নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষ যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন ভারতবাসীদের রাজনৈতিক শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয় নাই। কিন্তু স্বাধীনতা পাইবার পর এই দিক হইতে বিশেষ ভাবে প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে। নাগরিকদের শিক্ষার উপরই নির্ভর করে দায়িত্ববোধ ও কর্মপটুতা বৃদ্ধি পাওয়া-না-পাওয়া। আবার নাগরিকদের কর্মপটুত্বের উপরই নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য। ভারতবর্ষ এই দিক হইতে দিন দিনই সাফল্যলাভ করিতেছে। অতএব আশা করা যায় ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা সাফল্য-লাভ করিবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ (Future of Federalism)ঃ বর্তমানে প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড ও কানাডা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আর অপর দিকে আঞ্চলিক সরকারগুলি হীনবল হইয়া পড়িতেছে। এই কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁকের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ, আর্থিক সঙ্কট, বৃহৎশিল্প ও অধিকতর উৎপাদন, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি, আর্থিক পরিকল্পনা এবং সমাজকল্যাণ-মূলক কার্যাদির প্রসার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিতে অধিক সাহায্য করিতেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে পুনর্গঠিত করা এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়ে ভীত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের শক্তিশালী করার জন্য সমস্ত শক্তি ও অর্থ কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত করিতেছে। ব্যাপক বেকারাবস্থা, দুর্ভিক্ষ ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে জাতিকে বাঁচানোর জন্য বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে। পরিবহণ-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি এবং বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ।

আবার সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে মূলধন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত ও পুঞ্জীভূত হইয়া পড়ায় প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ফলে ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িতেছে। এতদ্ব্যতীত ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ব্যাপক বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে। পুঁজিপতিরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে বহি-র্বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়া এবং দেশের অভ্যন্তরে বলপ্রয়োগ ও সমাজকল্যাণকর কার্যা-

বলীর মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার সংকট হইতে মুক্তি পাইতে চান। কেন্দ্রীয় সরকার শক্তির সাহায্যে গণ আন্দোলনকে দমন করিয়া পুঁজিতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে চান।

উপরোক্ত কার্যগুলি করার জন্য প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করা। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে আঞ্চিক রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে নিঃশেষ হইয়া যায়। এই কারণে অনেক লেখক যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করেন। অবশ্য হোয়ারে প্রমুখ মনে করেন যে, যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি আবার আঞ্চিক রাজ্যগুলির শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির কথা ধরা যাইতে পারে। এই ক্যাণ্টনগুলি তাহাদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান সমস্যাসংকুল সমাজে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি এই কেন্দ্রীয় শক্তি পরিচালিত হয় তবেই মঙ্গল।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের পূর্বশর্ত (Conditions of Success of Federalism) ঃ মিল্-কে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে পারা যাইবে কিনা অথবা প্রবর্তিত হইলে উহা রক্ষা করিতে পারা যাইবে কিনা তাহা নির্ভর করে (ক) এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা জনসাধারণের আছে কিনা এবং (খ) ইহাকে কার্যকর করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের আছে কিনা, তাহার উপরে। ডাইসি, হোয়ারে এবং স্ট্রং প্রমুখ এই ধারণা পোষণ করেন যে, জাতীয় ঐক্যের সহিত অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সামঞ্জস্য বিধান করার উপরই নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য। তাহা হইলে দেখা প্রয়োজন কিভাবে এই সামঞ্জস্য-বিধান করা যায়। প্রথম প্রয়োজন সম্পর্কে হোয়ারে বলেন, "তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে চাহিবে কিন্তু এককেন্দ্রিক হইতে চাহিবে না" ("They must desire to be united but not be unitary")। জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হইতে চায় কারণ বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য, অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, আবার ভৌগোলিক সান্নিধ্য, রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রনৈতিক দৃঢ়তার জন্যও ঐক্যবদ্ধ হইতে চায়।

কিন্তু জনসমাজ তাহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের পার্থক্যের জন্য, ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য, জাতীয় সংস্কৃতি বজায় রাখিবার জন্য এবং বহুদিন ধরিয়া স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া স্বাতন্ত্র্যে অভ্যস্ত হইয়া পড়ায় তাহা বজায় রাখিবার জন্য এককেন্দ্রিক হইতে চাহে না।

পরিশেষে বলা যায়, যোগ্যতার উপরই নির্ভর করে জাতীয় সার্বভৌমত্বের সহিত অঙ্গরাজ্যগুলির সার্বভৌমত্বের সামঞ্জস্য বিধান করা। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্ব। অবশ্য ঐক্যের ইচ্ছা দৃঢ় হইলে ঐক্যবদ্ধ হইবার যোগ্যতাও জন্মগ্রহণ করে। একজাতীয়তাবোধ ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রেরণা সৃষ্টি করে। আবার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার দ্বারাই এই ঐক্যবদ্ধ হইবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে বিভিন্ন আঞ্চিক রাজ্যগুলি ঐক্যসূত্রে

আবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। সর্বোপরি স্মরণ রাখিতে হইবে, আঞ্চলিক রাজ্যগুলির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার উপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য।

সারসংক্ষেপ

আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে প্রভেদ করা হয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের দুইটি পদ্ধতি আছে। একটি হইল বিকেন্দ্রিকরণ আর অপরটি হইল ক্ষমতা বণ্টন। প্রথম পদ্ধতি অনুসৃত হইলে বলা হয়, এককেন্দ্রিক, আর দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হইলে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয়।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। ইহার কোন লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র নাই। ইহার সুবিধা হইল শাসন-ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে শাসন ক্ষমতা এমনভাবে বণ্টিত হয় যাহাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও প্রধান। যুক্তরাষ্ট্রে দুই স্তরের সরকার থাকে : (১) কেন্দ্রীয় এবং (২) আঞ্চলিক রাজ্যের সরকার। শাসনতন্ত্র হয় লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয়। ইহার একটি শক্তিশালী বিচারালয়ও থাকে।

সুবিধা হইল : (১) ইহা স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রকে প্রসারিত করিতে পারে ; (২) ইহা জাতীয় ঐক্য সাধন করে ; (৩) ইহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শক্তির সঞ্চয় হয়, ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায় এক নয়। যুক্তরাষ্ট্র হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের একটি যৌথ স্থায়ী সংস্থা। আন্তর্জাতিক আইন ইহাকে এককভাবে গ্রহণ করে। আর রাষ্ট্র-সমবায়ের রাষ্ট্রগুলি অধিকতর স্বাতন্ত্র্যশীল ও আন্তর্জাতিক আইন ইহার অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে পৃথকভাবে স্বীকৃতি দেয়।

ব্যক্তিগত ও প্রকৃত রাজ্যসংঘ : একই নৃপতির অধীন দুইটি বা তাহার বেশী রাজ্য এক সঙ্গে শাসিত হইলে উহাকে ব্যক্তিগত রাজ্যসংঘ বলা হয়। আর দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজ নিজ সার্বভৌমিকতা বজায় রাখিয়া চুক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে প্রকৃত রাজ্যসংঘের সৃষ্টি হয়।

২১

রাষ্ট্রনৈতিক দল
(Political Parties)

রাষ্ট্রনৈতিক দলের ইতিহাস (History of Political Parties) : বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক শাসন ব্যবস্থা দলীয় রাষ্ট্রনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দলীয় রাষ্ট্র-নীতির উদ্ভব ও প্রসার যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের ঘটনা কিন্তু প্রাচীন গ্রীস ও রোমের শাসন-ব্যবস্থায়ও বিভিন্ন বংশ ও গোষ্ঠীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি যে ধরনের কাজকর্ম করে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বংশ ও গোষ্ঠী সেই ধরনের কাজকর্ম করিত। তাহারাও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিত এবং সরকারী নীতি পরিচালনা করিত। মধ্যযুগে যে সকল অভিজাত সম্প্রদায় (The Nobles), পুরোহিত সম্প্রদায় (The Clergy) এবং সওদাগর শ্রেণীর (Burgess) সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারাও বর্তমানের দলগুলির মতোই কাজকর্ম করিত। শুধু পার্থক্য হইল প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব, অধিকার ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট হইত গোষ্ঠী, বংশ এবং শ্রেণীর ভিত্তিতে আর বর্তমানে এইগুলি নির্দিষ্ট হয় ব্যক্তি বিশেষের ভিত্তিতে। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয়, সামন্ততান্ত্রিক যুগে জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হইবার ফলে ভোটাধিকার প্রসারিত হয় এবং ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আবার ব্যক্তিবিশেষের উপর এতোটা গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতিনিধিত্ব, অধিকার এবং দায়িত্ব নির্ধারিত হইতে থাকে। এই অধিকার, দায়িত্ব ও প্রতিনিধিত্ব পালন করিবার জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অসংগঠিত জনসাধারণ কখনও কোন দায়িত্বপালন করিতে পারে না। উপরন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদানের জন্য যে শক্তি ও কর্মপ্রেরণা এবং শৃঙ্খলা প্রয়োজন তাহা কোন ব্যক্তি একাকী মিটাইতে পারে না। তাহার জন্য প্রয়োজন দলের। ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে বৃটেনে দলের সূচনা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে দুইটি দল সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। ইহারা হইতেছে হুইগ (Whig) ও টোরী (Tory)। এই দুইটি দলই উনবিংশ শতাব্দীর কনজারভেটিভ ও লিবারেল নামে খ্যাত। বিংশ শতাব্দীতে অবশ্য লেবার পার্টির উত্থানের ফলে লিবারেল দলের পতন ঘটে। এইভাবে বহু দেশে সামন্তযুগের শেষ ভাগ হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত বহু রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। বর্তমানে অনেক দেশের শাসনতন্ত্রে কোন দলের উল্লেখ আছে, আবার অনেক দেশের শাসনতন্ত্রে কোন দলের উল্লেখ নাই। কিন্তু, রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি যে বর্তমান বৃহদায়তন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অঙ্গ তাহা ম্যাক্‌আইভার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্বীকার করিয়াছেন।

প্রাচীন আর আধুনিক দলের মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা (Definition of Political Parties) : রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা সংখ্যাতীত। এখানে কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা হইল। এডমন্ড

বার্ককে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, যখন কোন জনসমষ্টি কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ প্রসারকল্পে মিলিত হয় তখনই একটি দলের সৃষ্টি হয়*। বার্কারও বার্ককে অনুসরণ করিয়া অনুরূপ একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। বার্কের সংজ্ঞার সহিত সর্বাধুনিক ধারণাকে যুক্ত করিয়া বলা যায়, রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল নাগরিকগণের এমন একটি লক্ষণীয় অংশ যাহাদের মধ্যে বিস্তারিত কার্যক্রমে মতভেদ থাকিলেও তাহারা প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে একমত পোষণ করে এবং এই মতাদর্শের মূলগত ঐক্যের ভিত্তিতে সমগ্র দেশের মঙ্গলকল্পে শাসন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে প্রচারকার্য চালাইয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিতে চেষ্টা করে।

বার্ক প্রদত্ত সংজ্ঞা

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে; তাহা হইল রাষ্ট্রনৈতিক দল আর অন্যান্য দল; যথা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দল প্রভৃতি এক নয়। অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক দল ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে দল গঠিত হয় তাহাকে অর্থনৈতিক দল বলা হয়। আর সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক বা অন্য কোন নীতির ভিত্তিতে যে দল গঠিত হয় তাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক দলের পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

বর্তমানে বলা হয় যে, রাষ্ট্রনৈতিক দল বিশেষ মতধারার দ্বারা পরিচালিত বটে কিন্তু ইহা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং ইহা সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া নির্বাচকদিগের সমর্থন পাইবার জন্য চেষ্টা করে ("A party is a particular body of opinion, which is nonetheless concerned with the general national interest, and which forms, and presents to the choice of the electorate, a programme of general national scope and width."

আবার রাজনৈতিক দল গঠনের ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতেও রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কোন কোন দল জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত হয়। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল একজাতি বিশিষ্ট মানুষের একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন। এই দল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের ভিত্তিতে দল গঠিত হয়। এই ক্ষেত্রে দল হইল রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত এক ধর্মাবলম্বী লোকের একটি সংগঠন। ভারতে মুসলীম লীগ ইহার উদাহরণ। মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে ইহা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রনৈতিক। আবার অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে দল গঠিত হয়। ম্যাডিসন (Madison) বলেন, স্বতন্ত্র স্বার্থ সম্পন্ন দলের উৎস হইল সম্পত্তি ("......the only durable source of faction is property."—*Madison*)। অধ্যাপক ল্যাস্কিও বলেন যে, অর্থনৈতিক স্বার্থই দলের ভিত্তি। ("The party is a mechanism to control pubilc opinion about property in the particular way its members deem desirable."—*Laski*)। অর্থনৈতিক

দল গঠনের ভিত্তিতে দলের সংজ্ঞা

*"Party is a body of men united for promoting by their joint endeavours the national interest upon some particular principle in which they are all agreed."

স্বার্থের ভিত্তিতে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধনবলে বলীয়ান শ্রেণী নিজ স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগায়। আর মেহনতী শ্রেণী চায় সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করিতে। এই দুইটি শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাতের মধ্য হইতে রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ (A party is a representative of a class.)। ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ হইতে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দল সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে আর শ্রমিক দল শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।

দল হইল শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ

পরিশেষে বলা যায়, প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য হইল সমাজের কল্যাণ করা। সমাজের কল্যাণকামী দলসমূহের সমাজ কল্যাণের পথ বিভিন্ন হইতে পারে। অবশ্য শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা শ্রেণীর কল্যাণই রাষ্ট্রনৈতিক দলের কাম্য হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Political Parties) : উপরোক্ত আলোচনা হইতে রাষ্ট্রনৈতিক দলের যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্যগণ প্রায় একমতাদর্শে বিশ্বাসী হয় এবং উক্ত মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

(২) রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শে পার্থক্য থাকিলেও ইহারা সকলেই সমাজের কল্যাণকামী।

(৩) প্রত্যেক দলই সরকার গঠনে ইচ্ছুক। ফলে অধিক সংখ্যক নির্বাচকের সমর্থন পাইবার জন্য সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে।

(৪) রাষ্ট্রনৈতিক দল নাগরিকদের একটি সমিতি বিশেষ। ইহার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ থাকে এবং আদর্শকে কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট একটি কার্যপন্থাও থাকে।

(৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল বৈপ্লবিক কোন পন্থায় ক্ষমতা দখল করিতে পারিবে না। বৈপ্লবিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করিবার কর্মসূচী গ্রহণ করিলে ইহা আর রাষ্ট্রনৈতিক দলের পর্যায়ভুক্ত হইবে না।

(৬) রাষ্ট্রনৈতিক দলকে দেশের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে এবং দলের মতকে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।

(৭) সমগ্র নির্বাচনকেন্দ্রব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংগঠন থাকা বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দল যদি অধিক সংখ্যক নির্বাচন কেন্দ্রে তাহার সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করিতে অসমর্থ হয় এবং অধিক সংখ্যক নাগরিকগণের সমর্থন লাভ না করিতে পারে তবে তাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক দলের মর্যাদা দেওয়া হয় না। পাশ্চাত্যদেশে এই শ্রেণীর আঞ্চলিক স্বার্থে উদ্‌বুদ্ধ কতিপয় নির্বাচকের সমর্থনপুষ্ট নাগরিকের সমিতিগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক দল না বলিয়া বলা হয় গোষ্ঠী (group)। ভারতবর্ষে কংগ্রেস, প্রজা-সোসালিস্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অপরাপর দলগুলি পাশ্চাত্য ধারণানুসারে 'গ্রুপ' (group) বিশেষ।

একাধিক দল গঠনের কারণ : উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে দেখা যায় যে, একটি রাষ্ট্রে একাধিক দল থাকিতে পারে। এই একটি রাষ্ট্রে একাধিক দল থাকার কারণগুলিকে নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করা যায় :

(ক) ম্যাডিসনের ভাষায় বলা যায়, "পৃথক স্বার্থ সম্পন্ন দলগুলির উৎস হইল সম্পত্তি" ("the only durable source of faction is property.")। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ধনিকশ্রেণী দলবদ্ধভাবে তাহার স্বার্থকে বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করে। আর শ্রমিকশ্রেণীও দলবদ্ধভাবে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ফলে মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রক্ষণশীল একটি দল এবং সর্বহারাদের একটি দল সৃষ্টি হয়।

(খ) রাষ্ট্রান্তর্গত কোন দল হয়ত চায় দ্রুত সংস্কার সাধন করিতে। আবার অন্য দল হয়ত চায় ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত এবং অতীতের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিতে ; ফলে রাষ্ট্রে একাধিক দল সৃষ্টি হয়।

(গ) ধর্মের ভিত্তিতে একাধিক দল গঠিত হইতে পারে।

(ঘ) বহুজাতিক রাষ্ট্রে বহুজাতি-ভিত্তিক দল সৃষ্টি হইতে পারে।

(ঙ) পরিশেষে বলা যায়, অনেক সময় দেখা যায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণীর মধ্যেই আবার দুইটি দল থাকে। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের টোরি (The Tory) এবং হুইগ (The Whigs)—পরে রক্ষণশীল (Conservative) ও উদারনৈতিক (Liberals)—এই দলগুলির সকলেই মালিকশ্রেণীর দল। এই ধরনের দলগুলির মধ্যে যে ঝগড়া হয় তাহা ঘরোয়া ঝগড়ার সামিল। অবশ্য, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও দল গঠিত হইবার পর সমস্বার্থে স্বার্থান্বেষী মালিকশ্রেণীর দলগুলির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ইংল্যান্ডের উদাহরণ হইতে দেখানো যায়, বর্তমানে লিবারেল দলের প্রভাবও ইংল্যান্ডে খুবই কম।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ বিভিন্ন প্রকারের। ফলে বার্ক যে সামগ্রিক ভাবে সমাজের কল্যাণ-সাধন প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত নয়। এই কারণে একটি দেশে বহু দল থাকিতে পারে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকিলেই বহু দল থাকিবে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী ও উপযোগিতা (Functions, Merits and Defects of Political Parties) : জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিভিন্ন মতাবলম্বী নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবার প্রয়োজন হয়। আবার স্বাধীনভাবে মতাদর্শকে বাছিয়া লওয়া এবং প্রতিনিধি নির্বাচন করা জনসাধারণের পক্ষে খুবই কষ্টকর। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রনৈতিক দলই এই কার্য করিতে পারে। আবার সমস্যাসঙ্কুল সমাজে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে বাছাই করাও জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দলই এই কার্য করিতে সক্ষম। নিম্নে দলীয় ব্যবস্থার গুণাবলী লিপিবদ্ধ করা হইল :

দলীয় ব্যবস্থার গুণাবলী (Merits of Party System) : (১) দলীয় ব্যবস্থা নীতি নির্ধারণ ও প্রার্থী নির্বাচনে সহায়তা করে। দলের কর্মসূচীকে জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়া জনসাধারণের নিকট দলের কর্মসূচীর গুণাগুণ প্রকাশ

করে। বিভিন্ন দল এই ভাবে তাহাদের কর্মসূচী পেশ করায় জনসাধারণ সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে একটি দলের প্রার্থীকে বাছাই করিয়া লইতে পারে।

(২) দলীয় ব্যবস্থা প্রচার ও সভা সমিতির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার করে।

(৩) দলীয় ব্যবস্থা থাকিলে স্বৈরাচারিতার উদ্ভব হইতে পারে না; কারণ, যে সকল দল সরকার গঠন করিতে অপারগ হইবে তাহারা সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতির তীব্র সমালোচনা করিয়া জনসাধারণকে সচেতন করিবে। সরকারী দলও ভবিষ্যৎ নির্বাচনে পরাজিত হইবার ভয়ে তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করিয়া লইবে। সুতরাং তাহাদের সংযত হইয়াই রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালিত করিতে হইবে।

(৪) জনমত কখনও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না যদি না কোন রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে। বিভিন্ন স্বার্থ সম্বলিত মানুষের বিভিন্ন দল তাহাদের মতবাদ প্রকাশ করিবে ইহাই দলীয় ব্যবস্থার সার্থকতা।

(৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল সাংবিধানিক উপায়ে এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন-সাধন করিবে। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে একমাত্র দলীয় ব্যবস্থাই তাহা প্রবর্তন করিতে পারে।

(৬) ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির ত্রুটিগুলি দলীয় ব্যবস্থায় সংশোধিত হয়। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার গ্রন্থিই হইল দল।

দলীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন উপযোগিতা ও গুণাবলী থাকিলেও ইহার প্রভূত ত্রুটিও আছে। নিম্নে দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির আলোচনা করা গেল:

(খ) রাষ্ট্রনৈতিক দলের ত্রুটি (Defects of Political Party): মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানই দোষশূন্য নহে। অতএব রাষ্ট্রনৈতিক দলের মনুষ্য সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে বহুবিধ দোষ রহিয়াছে। এই দলীয় ব্যবস্থায় দোষগুলি কি কি তাহাই এখানে উল্লেখ করা হইতেছে:

(১) দলগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে দলীয় ব্যবস্থা বিশেষ লক্ষ্য রাখে না।

(২) দলীয় স্বার্থকে বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি ন্যায়-নীতির মর্যাদা পদদলিত করিয়া অসত্য ও মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার ফলে দেশের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে।

(৩) দলীয় ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। ফলে, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদলের যে সকল যোগ্য ব্যক্তি থাকেন তাঁহারা সরকারের মধ্যে স্থান পান না। এই কারণে যোগ্যতমের সরকার গঠন সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

(৪) আবার দলভুক্ত ব্যক্তিগণকে দলের নীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হয় বলিয়া অনেক সময় সভ্যগণের নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। সুতরাং দলীয়-ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী।

(৫) দলীয়-ব্যবস্থা প্রচারভিত্তিক। প্রত্যেক দলই দেশকে আদর্শ লক্ষ্যে

পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রচার করিতে থাকে। এই প্রচারের মধ্য হইতেই দল গড়িয়া উঠে। এই প্রচার অনেক সময় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। ইহা কৃত্রিমতা, কপটতা ও ভণ্ডামির আশ্রয়স্থল।

(৬) এতদ্ব্যতীত নির্বাচনের সময় জনসাধারণের মধ্যে যে অবাঞ্ছিত উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করা হয় তাহাতে জাতীয় জীবনের মর্যাদার হানি ঘটে।

(৭) রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের গদী দখল করিবার লোভে দেশে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার বন্যা বহাইয়া দেয়। ফলে দেশের নৈতিক অবনতি ঘটে।

(৮) দলীয় ব্যবস্থার ফলে প্রায়ই যোগ্যতম ব্যক্তি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না।

দল ও উপদলীয় চক্র (Parties and Factions) : পূর্বে দলের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। তাই এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না। উপদল বলিতে বুঝায় বৃহৎ দলের অন্তর্গত এমন একটি ক্ষুদ্র চক্র যাহা বিশেষ ব্যক্তিসমূহের সংকীর্ণ স্বার্থ এবং সংকীর্ণ নীতিকে কার্যকর করিবার চেষ্টা করে। (' The term faction is commonly used to designate any constituent group of a larger unit which works for the development of particular persons or policies."—*H. D. Lasswell*)। রাষ্ট্রনৈতিক দলের মধ্যেও উপদল সৃষ্টি হয়। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠিত হয়। ক্ষুদ্র, নীচ, ব্যক্তিগত স্বার্থকে রাষ্ট্রনৈতিক দল জনসাধারণের নিকট পেশ করিতে পারে না। কিন্তু দলের মধ্যে যে দল বাসা বাঁধে তাহার উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থকে কার্যকর করা। দলীয় ব্যবস্থায় উপদল সৃষ্টি হইতে বাধ্য। তাই জর্জ ওয়াশিংটন, রুশো, হিউম প্রমুখ চিন্তাবীর দলীয় ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়াছেন। কিন্তু কালক্রমে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দলীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। দলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র প্রায় সমার্থবোধক হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বি-দলীয় বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থা

(Bi-Party vs. Multi-Party System)

দুইটি দলের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পর যে সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তাহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যখন সরকার গঠন করে তখনই দ্বি-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থায় একটি দল শাসন করে আর অপর একটি দল বিরোধিতার ভূমিকা অবলম্বন করে। বহুদলীয় প্রথায় বহুদলের শাসন বা সম্মিলিত মন্ত্রিসভা (Coalition Ministry) গঠিত হয়। অবশ্য, অনেকগুলি দলের মধ্যে একটি দল যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে একটি দল এককভাবেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারে। নিম্নে এই দুইটি ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হইল :

দ্বি-দলীয় বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থা

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণ

(১) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুইটি দল থাকে। একটি সরকার গঠন করে আর অপরটি বিরোধিতা করে।

(২) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুইটি পরিষ্কার বিকল্প নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে নীতি নির্বাচন সহজতর হয়।

(৩) দুই দলের মাত্র দুইটি কর্মসূচী আলোচনা করা সহজতর হয়। ফলে নির্বাচকমণ্ডলীকে দলীয় প্রার্থীদের পছন্দ করা সহজতর হয়। মাত্র দুইটি কর্মসূচীর মধ্যে একটিকে বাছাই করা সহজতর।

(৪) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। আর অপর একটি দল সুসংবদ্ধভাবে শাসকদলের কার্যের সমালোচনা করে। ফলে একদিকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্দিষ্ট ও শক্তিশালী হয়, তেমনি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বিরোধিতাও শক্তিশালী হয়।

(৫) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার স্থায়ী হয়।

বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণ

(১) বহুদলীয় ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়।

(২) বহুদলীয় ব্যবস্থায় পার্লামেণ্টকে সতর্কতার সহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

(৩) বহুদলীয় ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণের ইচ্ছানুসারে যে কোন দলকে নির্বাচন করিতে পারা যায়। ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কার্যকর হয়। বহুদল থাকিলে জনমতের গণতান্ত্রিক উপযুক্ত প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠে।

(৪) বহু দল থাকিলে বিভিন্ন স্বার্থ বিধানসভায় প্রতিফলিত হয়। স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা কঠিন হয়; কারণ একটি মাত্র দলের পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া শক্ত হয়। তাই প্রায়শই সম্মিলিত সরকার গঠিত হইতে দেখা যায়।

(৫) বহু দল থাকিলে পার্লামেণ্ট একদলীয় মন্ত্রিসভার আজ্ঞাবাহী হয় না।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি

(১) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সমাজে যে বিভিন্ন মতাদর্শ থাকে তাহা প্রকাশিত হয় না।

(২) অধ্যাপক রামসে মুয়রের মতে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় পার্লামেণ্ট এক-দলীয় মন্ত্রিসভার আজ্ঞাবাহী হইয়া পড়ে।

(৩) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ভোটদাতাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্বাচন দুই-দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বহুদলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি

(১) বহুদলীয় ব্যবস্থায় অনেক দল থাকে। একটি দল বা একাধিক দল সরকার গঠন করে আর অপরাপর দল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা সংগঠিতভাবে বিরোধিতা করে।

(২) বহুদলীয় ব্যবস্থার সম্মিলিত সরকার গঠিত হইতে পারে।

(৩) বহু দল থাকিলে নীতি-নির্বাচন করা নাগরিকদের পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি	বহুদলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি
(৪) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় একটি দলের সরকার ও একটি শ্রেণীর স্বার্থকেই কায়েম করা হয় কিন্তু সমাজ বহু শ্রেণীর স্বার্থ সম্বলিত। কারণ দুইটি দলের মধ্যে একটি দলই সরকার গঠন করে।	(৪) বহু দল থাকিলে সামান্য ভোটাধিক্যে সরকার গঠিত হয় বলিয়া সরকার দুর্বল হয়। আবার একটি দল যদি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারে তবে সম্মিলিতভাবে মন্ত্রিসভা (Coalition Ministry) গঠিত হয়। এই ধরনের সরকার মতানৈক্যের জন্য ক্ষণভঙ্গুর হয়।
(৫) দ্বি-দলীয় শাসন-ব্যবস্থার উদাহরণ হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেন।	(৫) বহুদলীয় শাসন-ব্যবস্থার উদাহরণ হইল সুইজারল্যান্ড ও ভারত।

উপসংহারে বলা যায়, বহুদলীয়-ব্যবস্থায় নির্বাচনের ফলাফল বাহির না হওয়া পর্যন্ত কোন্ দল শাসন করিবে তাহা বলা কঠিন হয়। বহুদলীয়-ব্যবস্থায় আইনসভায় বিভিন্নদলের মধ্যে আপস মীমাংসার মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। এখানে স্মরণযোগ্য যে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, শিল্পপতি ও জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন দল থাকে। আবার শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক দলের ন্যায় দলও থাকে। ধনিকশ্রেণীর বিভিন্ন দল তাহাদের স্বার্থকে বজায় রাখার ব্যাপারে সর্বত্রই ঐক্যবদ্ধ হয়। অতএব বহুদল থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের প্রশ্নে সমগ্র দলগুলিই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদিকে থাকে ধনিক শ্রেণীর দল আর অপর দিকে থাকে নিঃস্ব সর্বহারাদের দল। অতএব প্রকৃত দল সর্বত্রই দুইটি।

একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র

(The Party Rule and Democracy)

পশ্চিমী গণতন্ত্রের মতে একদলীয় ব্যবস্থায় কোন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ গণতন্ত্রে শাসকমণ্ডলীকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হইতে হইবে। এই নির্বাচন ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে। নির্বাচনে স্বাধীনভাবে ভোট দিবার অধিকার স্বীকৃত হইতে হইবে। নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দিতে হইবে। নির্বাচন প্রসঙ্গে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গতিবিধির স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা এবং সমালোচনা করিবার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে হইবে। গণতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি কখনও একদলীয় ব্যবস্থায় পালিত হইতে পারে নাই। সকল মানুষের পছন্দ একরকম নয়। সকল মানুষ এক মতাবলম্বী হইবে এমন কথা বলা যায় না। আবার সরকারী দলের দ্বারা সরকারকে সমালোচনা করা যায় না। নির্বাচনে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তবে তাহা একটি দলের দ্বারা করা সম্ভব নয়।

একাধিক দলের সমর্থনে যুক্তি

একাধিক দলের সপক্ষে যুক্তি : প্রথমতঃ এক দলের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে নির্বাচকমণ্ডলী ঐ দলের কর্মসূচীকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিবে না।

এইরূপ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহা হইলে ব্যক্তির প্রভাবই নির্বাচনের ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে। একাধিক দলের ক্ষেত্রে তাহা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, একদলীয় ব্যবস্থায় কোন নাগরিককে নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে প্রার্থীকে ঐ একটি দলেরই সভ্য হইতে হইবে, নচেৎ স্বাধীন ভাবে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করা শক্ত বলিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক এমন সকলকেই উক্ত দলের সভ্য হইতে হইবে। একাধিক দল থাকিলে প্রার্থীকে একটি দলের সভ্য হইতে হয় না।

তৃতীয়তঃ, নির্বাচন প্রসঙ্গে গণতন্ত্রে যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গতিবিধির স্বাধীনতা, এবং সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রতিটি নাগরিককে প্রদান করা হয়, একদলীয় ব্যবস্থায় তাহা আর প্রার্থী বা জনসাধারণের থাকে না। প্রার্থীকে দলের মতেই কথা বলিতে হয়। জনসাধারণের যেহেতু ভিন্নদল গঠন করার অধিকার নাই, অর্থাৎ ভিন্নমত গঠন করার সুযোগ নাই এবং একা কোন ব্যক্তির পক্ষে যেহেতু সভা ও শোভাযাত্রা করা সম্ভব নয় সেই হেতু ঐ একটি দলের মতকেই সমর্থন করিতে হয়। সুতরাং একদলীয় ব্যবস্থায় আর যাহাই হউক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের কার্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। সমালোচনা করার অধিকার যে শাসন-ব্যবস্থায় নাই সেই শাসন-ব্যবস্থায় সরকার নিশ্চিতভাবেই স্বৈরাচারী হইবে। এই কারণে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে বিরোধীদলকে। বিরোধীদল সরকারী কার্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া সরকারকে সঠিক পথে রাষ্ট্রকে পরিচালিত করিতে সাহায্য করে। একদলীয় ব্যবস্থায় ইহা সম্ভব নয়।

পঞ্চমতঃ, মানুষকে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্যই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয় একদলীয় ব্যবস্থায় মানুষ সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। নির্বাচনের সময়ে বহু প্রার্থী হইতে একজনকে বাছাই করার সুবিধা একদলীয় গণতন্ত্রে নাই। ঐ একটি দল যে প্রার্থীকে মনোনয়ন দিবে তাহাকে ভোট দিতে হইবে। সুতরাং ইহা একদলীয় নায়কত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

একদলীয় গণতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তি : প্রথমতঃ, কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে ধনিক শ্রেণী যে রাষ্ট্র-শাসন করে তাহা শ্রেণীগত একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীগত একনায়কত্বের অধীন ("All states in the world are in essence, class dictatorship.")। পশ্চিমী গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন গণতন্ত্র নাই। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দিয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের পথ রুদ্ধ করিয়াছে। আরও বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হইল, দল কি? দল হইল একটি শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ (A party is the representative of a class)। যেখানে একটি মাত্র শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে সেখানে একটি মাত্র দলই থাকিবে। বহুদলের প্রয়োজন শুধু

বহু স্বার্থবিশিষ্ট শ্রেণীর যেখানে অস্তিত্ব আছে সেখানে। জমিদার, শিল্পপতি, মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে বহু দল থাকিতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে জমিদার, শিল্পপতি প্রভৃতি শ্রেণী লুপ্ত হওয়ায় সেখানে একটি শ্রেণীর মাত্র অস্তিত্ব থাকায় একটি মাত্র দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। চীনে আজও যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে সুতরাং ঐ দেশে একাধিক দলেরও অস্তিত্ব আছে।

দ্বিতীয়তঃ, বলা হয়, রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তিসত্তা যখন মূর্ত হইয়া উঠে তখন ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, আত্মোপলব্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ রাষ্ট্রের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইবে। তাই রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যেই ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থাৎ একটি দলের গণতন্ত্রের দেশে ব্যক্তির ভোটাধিকার, ব্যক্তির জীবনের অধিকার, ব্যক্তির কর্মের অধিকার, বৃদ্ধ বয়সে অক্ষমতার ভাতা, বেকার ভাতা প্রভৃতি স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় তাহা সত্য নহে।

তৃতীয়তঃ, বলা হয় যে, প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব শুধু সেখানে যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য তিরোহিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের কোন মূল্য নাই। বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় যে শ্রেণী ধনবলে বলীয়ান তাহারাই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে এবং তাহাদের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। ফলে অপরাপর শ্রেণীর সকল গণতান্ত্রিক অধিকার ধনবলে বলীয়ান শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা গণতন্ত্রের অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছু নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দেশে, যেখানে একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহারে বলা যায়, গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। গণতন্ত্রের অর্থ যদি জনগণের সম্মতিতে সরকার হয় তাহা হইলে জনগণের মধ্যে যে আবার বহু শ্রেণী থাকিতে পারে তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। জনগণের মধ্যে ধনী, মধ্যবিত্ত, গরীব সকলেই পড়ে। এই তিন পর্যায়ের যে কোন পর্যায়ের মানুষের সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলা চলে না। ইহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকারকে বলা হয় গণতান্ত্রিক সরকার। স্বভাবতই গরীবের সংখ্যাই হইবে সংখ্যা গরিষ্ঠের সরকার। কিন্তু ধনীরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে কি গণতান্ত্রিক সরকার হইবে? অবশ্য ধনীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে না কারণ সকলেই যদি শোষক-ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় তাহা হইলে শোষিত হইবে কাহারা? সুতরাং গরীবের সংখ্যাই হইবে অধিক; কিন্তু তাহারা যদি সরকার গঠন করিতে না পারে, ছলে বলে কৌশলে, ধনবলের সাহায্যে শোষক সম্প্রদায় সরকার গঠন করে তবে তাহা গণতান্ত্রিক সরকার হইবে না। সুতরাং "Government of the poor, by the poor and for the poor"ই হইবে গণতান্ত্রিক সরকার। এই গরীবদের যদি একটি দল থাকে তবে একদলীয় সরকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে আর এই গরীবদের যদি একাধিক দল থাকে তবে একাধিক দলও সরকার গঠন করিতে পারিবে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সন্ধান যদিও প্রাচীনকালে পাওয়া যায় না, কিন্তু, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যে বংশ ও গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় তাহাও বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক দলের

মতো কাজকর্ম করিত। সার্বিক ভোটাধিকার প্রবর্তিত হওয়ার ফলেই বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রনৈতিক দল : সমগ্র জনসাধারণের একটা লক্ষণীয় অংশ যখন একটা নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে এবং সংযুক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থসাধন-কল্পে সম্মিলিত হয় তখনই রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল : (১) প্রায় সম মতাদর্শে নাগরিকের বিশ্বাস, (২) সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য চালানো, (৩) অধিক সংখ্যক নির্বাচকের সমর্থন লাভ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনের কারণ : (১) সংস্কারসাধন করার জন্য, (২) ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য, (৩) জাতীয়তার দাবি পূরণার্থে, (৪) অর্থনৈতিক দাবি পূরণার্থে দল এবং সরকার গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠিত হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী ও গুণাগুণ : (১) দলীয়-ব্যবস্থা বিশৃংখল জনসাধারণকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া জনসাধারণকে প্রতিনিধি নির্বাচনে সাহায্য করে, (২) জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবৃদ্ধিতে সাহায্য করে, (৩) স্বৈরাচারিতাকে প্রতিরোধ করে, (৪) সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার-সাধন করে, ইত্যাদি।

দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি : (১) দলীয়-ব্যবস্থা কৃত্রিম, (২) দলীয়-ব্যবস্থা নিয়মানুবর্তিতা ধ্বংস করে, (৩) দলীয় স্বার্থে জাতির নৈতিক অবনতি ঘটায়, (৪) দলীয় কোন্দলের ফলে যে মিথ্যা প্রচারকার্য চালানো হয় তাহাতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়, ইত্যাদি।

দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা : দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার বহুবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকার ফলে দ্বি দলীয় ব্যবস্থাকেই সমর্থন করিতে হয়।

একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র : পশ্চিমী গণতন্ত্র একদলীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি দল থাকিলেও সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া মন্তব্য করা হয়।

২২

জনমত ও গণতন্ত্র
(Public opinion and Democracy)

জনমতের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and nature of Public opinion) : রোমান ও গ্রীকদের আইন গ্রন্থে "জনমতের" ধারণার মতো ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যযুগেও "জনমতের" (*vox populi vox dei*) ধারণা প্রচলিত ছিল। মেকিয়াভেলী জনগণের মতকে ঈশ্বরের আদেশের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেই রুশো "জনমত" (*vox populi*) শক্তি ব্যবহার করিয়াছিলেন। বর্তমানে জনমতকেই গণতন্ত্রের প্রাণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে "জনমতের" ধারণাটি পরিস্ফুট হয়। বর্তমানে কোন সরকারই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসনকার্য চালাইতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের নীতি জনমতের দ্বারাই স্থির করা হয়। নির্বাচন, দলীয় সংগঠন, নীতি নির্ধারণ সব কিছুই জনমতের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই বলা হয় গণতন্ত্র ও জনমত সমার্থক।

জনমতের ইতিহাস

জনমতের তাত্ত্বিক আলোচনায় ধরিয়া লওয়া হয় যে, (ক) জনগণ সচেতন (খ) জনগণ জানে যে তাহারা কি চায় ; (গ) জনগণ সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করে ; (ঘ) জনগণ যাহা চায় তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখে এবং (ঙ) জনগণের ইচ্ছাই আইনে প্রকাশিত হয়। জনগণের এইরূপ চরিত্র ধরিয়া লইয়া জনমতের একটি সংজ্ঞা প্রদান করিতে হইলে ফাইনারের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফাইনার বলেন যে, জনমতের সংজ্ঞার নিম্নবর্ণিত তিনটি উদ্দেশ্যের একটি উদ্দেশ্য থাকিবে। এই উদ্দেশ্যত্রয় হইল (১) একটি ঘটনার বর্ণনা, (২) একটি বিশ্বাস, এবং (৩) একটি ইচ্ছা। একটি কোন ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই একটি জনমত গঠিত হইতে পারে। আবার আলোচ্য ঘটনাটি পরীক্ষা করিবার জন্যও জনমত গঠিত হইতে পারে। অথবা কোন একটি কার্য সম্পাদন করিবার জন্যও জনমত গঠিত হইতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জনমত গঠিত হয় "সরকারের কোন বিশেষ নীতি" গ্রহণ করিবার জন্য।

জনমতের বিশ্লেষণের উপকরণ

একটি প্রশ্ন উঠে, আমরা জনগণ বলিতে কাহাদের বুঝিব ? আবার এই মতই বা কাহাদের ? লর্ড ব্রাইস-এর মতে জনমতই "জগতের সকল জাতির সর্বকালের প্রধান সর্বশেষ ক্ষমতা"।* রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে "জনগণ" বলিতে উচ্ছৃংখল সংখ্যালঘুদিগকেও জনগণ বলা হয়। আবার জনমত বাস্তবও হইতে পারে আবার অবাস্তবও হইতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতও অবাস্তব ও অকল্যাণকর হইতে পারে এবং সংখ্যালঘুদের মতও কল্যাণকর হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের অধিকাংশ মানুষই রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে উদাসীন থাকে। কতিপয় মানুষ দলবদ্ধভাবে সরকারের নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত গড়িয়া তোলে। প্রকৃতপক্ষে এই যে একটি ক্ষুদ্র বা বড় গোষ্ঠী বা দল

জনমত কাহার মত কি মত ?

*"Opinion has really been the chief and ultimate power in nearly all nations as nearly all times."—*Bryce.*

জনমত গঠন করে তাহাকে আপাতদৃষ্টিতে জনমত বলিয়া চালানো হয়। মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জনগণের মধ্যে কোন বিষয়ে বড় একটা মতৈক্য হয় না। মতের একটা অমিল থাকিয়াই যায়। লিপম্যান জনমতের গঠন প্রণালীকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানোর চেষ্টা করিয়াছেন যে, মানুষের পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবের দ্বারাই জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক মত গঠিত হয়। মানুষের চেতনা, তার সংস্কার, পরিকল্পনা, এই মত গঠনে সাহায্য করে। রুশোর সমষ্টিগত ইচ্ছাকে (General will) বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহা কল্যাণকর মতের সমষ্টি। ইহা সকলের মতের গড় ফল নয়। ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও নয় বা সংখ্যালঘিষ্ঠের মতও নয়। জনমতও কল্যাণকর মতের সমষ্টি। ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠেরও হইতে পারে আবার সংখ্যালঘিষ্ঠেরও হইতে পারে। জনমতের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে হইবে, তবেই তাহা জনমত হইবে।

প্রকৃতি

সাধারণতঃ সমাজ সংক্রান্ত কোন অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন সূত্রে বিজ্ঞাপিত বা সমষ্টির কল্যাণকর বলিয়া প্রচারিত যে সকল মতামত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে সাহায্য করে তাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ জনমত বলিয়া অভিহিত করেন। আলোচ্য সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে জনমতের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় নিম্নে তাহা দেওয়া গেল :

সংজ্ঞা

(১) জনমত সমাজ সংক্রান্ত অবস্থা সম্পর্কে নাগরিকের মতামত বিশেষ। জনমতের মধ্যে সাধারণতঃ সমাজ সংক্রান্ত কোন অবস্থা সম্বন্ধে শুধু মন্তব্যই থাকে না। ইহার মধ্যে সমাধানের পথের নির্দেশও থাকে।

(২) অধ্যাপক লাওয়েলকে (Lowell) অনুসরণ করিয়া বলা যায় জনমত বলিয়া অভিহিত হইবার জন্য অভিমতকে সমগ্র সমাজের ঐক্যমত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, অপরদিকে আবার ইহার জন্য কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয় ("A majority is not enough and unanimity is not required")। সমাজ সংক্রান্ত প্রশ্ন সাধারণত জটিল হয় এবং ইহার সম্বন্ধে মতপার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য স্বার্থের বিভিন্নতার জন্যই এই মতপার্থক্য হইয়া থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হইল অবস্থার দৃঢ়তা।

(৩) জনমতকে প্রকাশিত হইতে হইবে বিভিন্ন মাধ্যমের মারফত। এই মাধ্যমগুলি হইল রেডিও, সংবাদপত্র প্রভৃতি।

(৪) জনমত কোন ব্যক্তি-বিশেষেরও হইতে পারে, আবার কোন জনসমষ্টিরও হইতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দল-প্রথার মাধ্যমেও জনমত গঠিত হইতে পারে।

(৫) আবার জনমতকে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হইতে হইবে।

(৬) জনমতকে জনসমর্থনলাভ করিতে হইবে। অবশ্য, তাই বলিয়া ইহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত না হইলেও চলিবে। কিন্তু জনমতকে দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ হইতে হইবে।

(৭) আদর্শের দিক হইতে বিচার করিলে জনমতকে কল্যাণকর হইতে হইবে কিন্তু জনমত সাধারণতঃ শ্রেণীস্বার্থের একটি বিশিষ্ট প্রকাশ মাত্র।

(৮) সর্বশেষে বলা যায়, জনমতকে সরকারের নীতি নির্ধারণে সাহায্য করিতে হইবে।

জনমতের সমালোচনা : (১) জনমত যে সর্বদাই কল্যাণকর হইবে এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য নানা কৌশলে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি অনেক সময় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনমত গঠন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা সত্য মত নহে।

(২) আবার যে বিষয়ে জনমত গঠিত হইবে সেই বিষয় সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় জনমত প্রকৃত জনমত হইয়া উঠে না। উহাকে ভ্রান্ত জনমত বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়।

এই সমালোচনা অতিশয়োক্তিদোষে দুষ্ট। জনমতের অর্থই হইল মঙ্গলকর ইচ্ছার প্রকাশ। যাহা মঙ্গলকর নয় তাহা জনমত নয়. জনমত উচ্ছৃংখল জনতার মত নহে। ইহা রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত, সংবাদপত্র দ্বারা প্রচারিত মত। অতএব জনমতের পশ্চাতে যে নেতৃত্ব থাকে, তাহার আদর্শের উপরই জনমত অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল।

উপসংহারে বলা যায়, দুই বিভিন্নধর্মী মতের সংঘর্ষে যে মতটি বাহির হইয়া আসে তাহা সত্যাশ্রিত হইতে বাধ্য। জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইলে বিভিন্নধর্মী মত প্রকাশিত হইবে। এই বিভিন্নধর্মী মতামতের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া সত্যাশ্রিত অংশটুকুকে গ্রহণ করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাই প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ। অতএব সরকারকে সেই প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

জনমত প্রকাশের মাধ্যম (Means of Expressing and Formulating Public Opinion) : গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি হইল জনমত। এই কারণে জনমতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু জনমতকে শুধু গুরুত্ব দিলেই গণতন্ত্র প্রকৃত হইয়া উঠে না। জনমতকে প্রকাশ করার কতকগুলি মাধ্যমকেও স্বীকৃতি দিতে হইবে কারণ জনমত যে সকল মাধ্যমের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয় সেই সকল মাধ্যমগুলির উপরই জনমত নির্ভর করে। জনমত ব্যক্ত করার মাধ্যমগুলি হইল (১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৪) সভাসমিতি, (৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল এবং (৬) বিধানসভা।

(১) মুদ্রাযন্ত্র (The Press) : সংবাদপত্রের মাধ্যমেই প্রধানতঃ জনমত প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জনসাধারণ তাহাদের দাবিদাওয়া প্রথম প্রকাশ করে। আবার সরকারের কার্যাবলীর সমালোচনাও এই সংবাদপত্রের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যাও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টিগোচর করিতে হয়। এই কারণে সংবাদপত্রকে বলা হয় গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

সংবাদপত্রের এতো গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থিত হয়, তাহা হইল সংবাদপত্র সমাজের কোন্ শ্রেণীর মত প্রকাশ করে? সংবাদপত্রের মালিক নিজে একজন পুঁজিপতি। সংবাদপত্রের আয় হয় পুঁজিপতিদের বিজ্ঞাপন হইতে। ফলে ধনতান্ত্রিক দেশের সংবাদপত্র ধনিকশ্রেণীরই মুখপত্র। এই সংবাদপত্র শ্রমিকশ্রেণীর মতকে প্রকাশ করে না বরং বিকৃতভাবে উহা সরকারের নিকট উপস্থাপিত করে। সত্য ঘটনাকে চাপিয়া অথবা বিকৃত করিয়া প্রকাশ করে; ফলে সংবাদপত্রের মালিক-

শ্রেণীর প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রকৃতি। একমাত্র জনসাধারণের মালিকানায় অথবা জনসাধারণের স্বার্থবাহী দলের সংবাদপত্রই জনমত প্রকাশের মাধ্যম হইতে পারে।

(২) চলচ্চিত্র ও বেতার (The Cinema and The Radio): চলচ্চিত্র ও বেতার সংবাদপত্রের মতোই বর্ণপরিচয়হীন জনসাধারণের নিকট সংবাদ পরিবেশন করে। জনসাধারণকে প্রভাবিত করিতে চলচ্চিত্রের মতো প্রভাবশালী মাধ্যম আর নাই। চলচ্চিত্র জনমতকে প্রকাশিত করিতে পারে এবং জনমতকে সংগঠিত করিতে পারে। কিন্তু তিনটি প্রভাব চলচ্চিত্রকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এই তিনটি প্রভাব হইল: (১) সরকারী নিয়ন্ত্রণ, (২) প্রেক্ষাগৃহের মালিকের স্বার্থ এবং (৩) ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন। এই প্রভাবগুলি হইতে অতি সহজেই বুঝা যায় চলচ্চিত্র কাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। সরকার বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের স্বার্থবাহী চিত্র প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করে। মালিকশ্রেণী টাকার জোরে তাহাদের স্বার্থবাহী বিজ্ঞাপন প্রচার করে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। প্রযোজক এমন চিত্র প্রযোজনা করিবে না যাহা তাহার শ্রেণীস্বার্থের বিরোধী। এই সকল কারণে চলচ্চিত্র জনমত প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না। চলচ্চিত্র ও বেতার সংবাদপত্রের পরিপূরক হইতে পারিবে শুধু তখনই এবং উপরোক্ত ত্রুটিগুলি হইতে মুক্ত হইতে পারিবে তখনই যখন বেতার ও চলচ্চিত্র জনসাধারণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions): শিশুমনে একবার যে আদর্শ, যে ধ্যান-ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়া একটা বিশিষ্ট আদর্শ গড়িয়া উঠে। এই আদর্শই তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যাবলীতে প্রতিফলিত হয়। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আজ যে ছাত্র, ভবিষ্যতে সেই দেশের নেতা। অতএব ভবিষ্যতের নেতৃত্ব, ভবিষ্যতের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে বর্তমান ছাত্রদের উপর। এই ছাত্রদল যদি কুশিক্ষার প্রভাবে দুষ্টচরিত্র লাভ করে তবে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। এই দিক হইতে বিচার করিলে জনমত গঠনে, আদর্শ সমাজগঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী পাঠ্যবস্তু নিয়ন্ত্রণ করে; কলেজকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এবং তাহাদের শ্রেণীস্বার্থের বিরোধী ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার গলদ উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে পুস্তকে তাহাকে ছাত্রদের দৃষ্টির আড়ালে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও জনমত প্রকাশের মাধ্যম বলা চলে না। সর্বোপরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ায় সরকার-বিরোধী কোন মতকেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় না।

(৪) সভা-সমিতি (The Platform): জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার আর একটি মাধ্যম হইল সভাসমিতি। সভা-সমিতির মাধ্যমে জনমত ব্যক্ত হয় এবং গঠিত হয়। এই কারণে সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু বৈষম্যমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজে এই স্বাধীনতা সমভাবে সমস্ত শ্রেণীর লোক ভোগ করিতে পারে না। দেখা যায়, ধনতন্ত্র যতই সংকটের সম্মুখীন হইতেছে, ততই শান্তি ও শৃঙ্খলার অজুহাতে জনসাধারণের আন্দোলনকে বন্ধ করিবার জন্য সভাসমিতির উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করা হইতেছে।

(৫) **রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties) :** পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রাষ্ট্রনৈতিক দল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে ; এখানে তাহার আর পৃথক আলোচনা করা হইল না।

(৬) **আইনসভা (The Legislature) :** আইনসভা হইল বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের বিশেষ কার্যক্ষেত্র। আইনসভায় বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সরকারী দল ও বিরোধী দল পরস্পরের দোষত্রুটিগুলি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরে এবং স্ব স্ব দলের উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়া জনমত গঠনের চেষ্টা করে। আইনসভার কার্যক্রম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার ফলে জনমত গঠনে সংবাদপত্র যে ভূমিকা গ্রহণ করে আইনসভা তাহা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না।

গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব (Importance of Public opinion in Democracy) : আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার মাত্রেই জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন সরকারই বেশীদিন শাসনকার্য চালাইতে পারে না। এমন কি একনায়কতন্ত্রেও জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র জনমতকে উপেক্ষা করিলে নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণ সরকারের পতন ঘটাইতে পারে।

বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় জনগণের শাসন-ব্যবস্থা এবং জনগণের দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা এবং জনগণের জন্য শাসন-ব্যবস্থা ("Government of the people, by the people and for the people.")। গণতান্ত্রিক সরকার যখন জনগণের সরকার তখন সরকারের স্থায়িত্ব জনগণের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

(১) স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকায় জনমত গঠিত হইতে পারে

অতএব গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সকল নাগরিকই বুদ্ধি বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত করিতে পারে। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার থাকায় প্রত্যেক লোকই তাহার অভিমত ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করিতে পারে। রাষ্ট্রও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জানিতে পারিয়া তদনুযায়ী রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও আইন কানুন প্রণয়ন করিতে পারে।

(২) সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না

গণতন্ত্রে জনসাধারণ সরকারী কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার পাইয়া থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে না। সরকার জনমতের এবং জনসাধারণের সমালোচনার ভয়ে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে পারে না। এই কারণে গণতন্ত্রে কখনও স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গণতন্ত্রে যে দল সরকার গঠন করে সেই দল জনমতকে এই কারণে ভয় করে যে, জনমত যদি সরকারের বিরুদ্ধে চলিয়া যায় তাহা হইলে পরবর্তী নির্বাচনে তাহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইবে। সুতরাং পরবর্তী নির্বাচনের ভয়ে সরকারকে জনমতের নির্দেশে চলিতে হয়।

(৩) জনমতের চাপে নীতির পরিবর্তন

অনেক সময় জনমতের চাপে সরকারকে নিজস্ব নীতি ও পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া জনমতের অনুপন্থী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৮৩২ সালে ইংল্যাণ্ডের সরকার জনমতের চাপেই যুগান্তকারী রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

আবার মানুষের অভাব অভিযোগ জনমতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় বলিয়া সরকারের পক্ষেও জনকল্যাণকর পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার সুযোগ ঘটে। গণতন্ত্র জনতার শক্তিতেই বিশ্বাসী। জনগণই গণতন্ত্রের বল। গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে, সমাজের উন্নতিতে প্রত্যেকেরই কিছু পরিমাণে দান করিবার ক্ষমতা আছে। এই কারণে গণতন্ত্রে প্রত্যেককে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার প্রদান করা হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক মত সৃষ্টি করিয়া সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

(৪) জনমতের দ্বারা অভাব ব্যক্ত ও সরকারকে অভাব জানিবার সুযোগ দান

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জনমত সৃষ্টিতে মতানৈক্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। বিরোধী দলের অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে সরকারী নীতির সহিত অনেক সময় বিরোধীদলের মতানৈক্য হয়। এই মতানৈক্য হইতে জনমত গড়িয়া উঠে। বিরোধীদলের অস্তিত্ব এবং সদাজাগ্রত সুস্থ ও বলিষ্ঠ জনমতের উপরই গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। জনমতের উপরই গণতন্ত্র নির্ভরশীল। মত-প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র নিষ্ফল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে রুশো যে সাধারণ ইচ্ছার (General Will) কথা বলিয়াছিলেন তাহা জনমতের মাধ্যমে প্রকাশিত মানুষের সাধারণ কল্যাণ ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সাধারণ কল্যাণ ইচ্ছাই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার অধিকারী। সুতরাং বলা যায় জনমতের মধ্যেই সার্বভৌমিকতা মূর্ত হইয়া উঠে। স্বেচ্ছাতন্ত্রে বা একনায়কত্বে জনমত গঠিত বা প্রকাশিত হইতে পারে না। জনমত গঠিত বা প্রকাশিত হইবার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন রাষ্ট্রীয় পরিবেশ। এই পরিবেশ একমাত্র গণতন্ত্রেই প্রকাশিত হইতে পারে। জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হইবার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন রাষ্ট্রীয় পরিবেশ যাহা একমাত্র গণতন্ত্রেই সৃষ্টি হইতে পারে।

(৫) সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম

(৬) গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনমতের উপর; রাষ্ট্র যদি গণতান্ত্রিক হয় কিন্তু জনমত যদি সদাজাগ্রত না হয় তবে সেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কার্যকর হয় না। জনমতের সচেতনতাই হইল গণতন্ত্রের প্রহরী। তাই বলা হয় জনমত ও গণতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৃটেনে গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে চালিত হইবার একমাত্র কারণ হইল ব্রিটেনের সদাজাগ্রত জনমত।

সর্বোপরি জনমত সরকারকে গতিশীল করিয়া রক্ষণশীলতার হাত হইতে মুক্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৮৩২ সালে ইংল্যাণ্ডের সরকার জনমতের চাপেই যুগান্তকারী রাষ্ট্রীয় সংস্কার আইন (Reform Act) প্রণয়ন করিতে বাধ্য হয়।

(৭) জনমত সরকারকে গতিশীল করে

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, সরকারের কাছে বিভিন্ন ধরনের জনমত আসিয়া উপস্থিত হয়। সরকার কোন্ মতটি গ্রহণ করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সরকার প্রথমে দেখিবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতটি মঙ্গলকর—না সংখ্যালঘিষ্ঠের মতটি মঙ্গলকর। যদি সংখ্যালঘিষ্ঠের মতটি মঙ্গলকর হয় তবে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতটি যদি অধিকতর মঙ্গলকর হয় তবে তাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। তাই সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায়

মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করিতে হইবে। আবার জনমতের প্রকাশের জন্য জনমতকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিয়া বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে প্রকাশ করিতে হইবে।)

সারসংক্ষেপ

জনমতঃ রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে সংগঠিত ও বিজ্ঞাপিত জনসাধারণের মতকে বলা হয় জনমত। গণতন্ত্র এই জনমতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজে বহু শ্রেণীর মানুষ বাস করে। এক একটি শ্রেণীর এক-এক ধরনের মত থাকে। সরকারকে এই বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করিতে হয়। আবার জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি স্বীকৃত না হইত তবে রাষ্ট্রে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইত।

জনমত প্রকাশের মাধ্যম ঃ জনমত প্রকাশের মাধ্যম হইল (১) সংবাদপত্র, (২) বক্তৃতা মঞ্চ, (৩) চলচ্চিত্র, (৪) বেতার, (৫) পুস্তক ও (৬) প্রচার পত্র প্রভৃতি।

২৩

নির্বাচকমণ্ডলী
(Electorate)

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে বর্তমান গণতন্ত্র কেন প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানের বিপুল জনসমষ্টি-সম্বলিত বৃহদায়তন রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই জনসাধারণের মধ্য হইতে বাছাই করা কতিপয় লোকের নির্দেশই গণতন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্য পরিচালনা করিবার জন্য এবং কর্মবিভাগের সুফল প্রাপ্তির জন্য, আর বিজ্ঞজনের আইন প্রণয়নে সহায়তা পাইবার জন্য প্রয়োজন পরোক্ষ গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থা। তাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পথ ছাড়িয়া পরোক্ষ গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন এই প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে কতকগুলি সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সমস্যাগুলি হইল (১) ভোটাধিকারের ভিত্তি, (২) নির্বাচন পদ্ধতি এবং (৩) সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব। নিম্নে এই সমস্যাগুলির আলোচনা করা গেল :

নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যা (Problems of Electorate) : পূর্বেই সমস্যাত্রয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্যাগুলিকে বুঝিতে হইলে নির্বাচকমণ্ডলীর একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন। নির্বাচকমণ্ডলী বলিতে বুঝায় সেই সমস্ত জনসাধারণকে যাহারা আইনগতভাবে ভোটদানের অধিকারী এবং এই ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচন সংস্থার (Electoral College) বা ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবে। এখন একটি প্রশ্ন উঠে, তাহা হইল এই যে ভোট দিতে পারিবে কাহারা? এই প্রসঙ্গে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ অনুসারে তাহারাই ভোটাধিকারী হইবে যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ যাহারা একটা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছিয়াছে (Universal Adult Franchise); আর দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে শুধু যোগ্য ব্যক্তিকেই ভোটাধিকার দেওয়া হইবে।

(ক) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের গুণাগুণ
(Merits and Defects of Universal Adult Franchise)

(১) অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচারিত হইল, তখন বলা হইল যে, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সার্বভৌমিকতা জনসাধারণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই ভোটাধিকারের দ্বারা জনগণ সার্বভৌমিকতা ব্যবহার করিতে পারিবে।

(২) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে আর একটি যুক্তি হইল সরকারী নীতি যখন প্রত্যেক মানুষের জীবনকেই স্পর্শ করে তখন প্রত্যেককেই সরকারী নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার প্রদান করা উচিত।

(৩) আরও বলা যায় যে, গণতন্ত্র যদি সাম্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়

তবে গণতন্ত্র অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। গণতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন একমাত্র বয়সের পার্থক্য ছাড়া অন্য সকল পার্থক্য-নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভোটাধিকার প্রদান করা।

(৪) নৈতিক যুক্তিতেও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে সমর্থন করা হয়। বলা হয় যে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্যই প্রত্যেককে ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। ভোটাধিকার ছাড়া মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন পরিপূর্ণ হইতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার।

(১) বিপক্ষে যুক্তি: লেকী, মিল, ব্লুন্টসলি ও হেনরী মেইনের মতে ভোটাধিকার জন্মগত অধিকার নহে। ইহা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা যোগ্য তাহাদিগকে দেওয়া উচিত। আরও বলা হয়, রাষ্ট্রের যে সকল লোক ভোটের মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে না এবং ইহাকে ব্যবহার করিতে জানে না তাহাদিগকে ইহা প্রদান করা নিরর্থক।

(২) 'প্রাপ্তবয়স্ক' শব্দটি অস্পষ্ট। কারণ, প্রাপ্তবয়স্কের মানদণ্ডে যদি ভোটাধিকার প্রদান করিতে হয় তবে সমাজের দেউলিয়া, উন্মাদ, চৌর্য-কার্যে রত ব্যক্তিকেও ভোটাধিকার দিতে হয়। অতএব সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতিকে সমর্থন করা যায় না। ভোটাধিকার দিতে হইবে শুধু তাহাদের যাহারা সুস্থ মস্তিষ্ক লইয়া সমাজের মঙ্গলকার্যে ব্যাপৃত থাকিবে।

(৩) যোগ্যতার মাপকাঠিতে ভোটাধিকার: মিলকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যোগ্যতার ভিত্তিতেই ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত। আবার শিক্ষাই হইল এই যোগ্যতার মাপকাঠি। মিল বলেন যে, প্রথমে সার্বিক শিক্ষার বিস্তার করা প্রয়োজন। তারপর সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা কর্তব্য ("Universal teaching must precede Universal enfranchisement")।

(৪) আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, সম্পত্তিকে মানদণ্ড ধরিয়া ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। কারণ হিসাবে বলা হয়, যাহারা সম্পত্তিহীন তাহারা কর প্রদান করে না। আবার যাহারা কর প্রদান করে না তাহারা অমিতব্যয়ী হয়। তাই মিল এই মতবাদকে সমর্থন করিয়া বলেন যে, সাধারণ লোক অপরের অর্থ ব্যবহারে অমিতব্যয়ী হইয়া উঠে বলিয়া বিত্তহীনদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়।

সমালোচনা: (১) সমালোচনায় বলা যায় যে, অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিই নির্বাচন ব্যাপারে কাম্য। কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া ভোটাধিকার দিলে গণতন্ত্রেরই ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। আবার মিল যে প্রাথমিক শিক্ষার মানদণ্ডে ভোটাধিকার দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অভিজ্ঞতার সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজের বুদ্ধি ও বিচার ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়াই ভোট দিয়া থাকেন। অতএব আক্ষরিক শিক্ষাকে বড় করিয়া ধরিবার প্রয়োজন হয় না।

আবার সম্পত্তিকে মানদণ্ড ধরিয়া ভোটাধিকার দেওয়াও অবাঞ্ছনীয়, কারণ দেখা গিয়াছে বিত্তহীনেরাই রাষ্ট্রের প্রতি অধিকতর দরদী হয়। সম্পত্তিকে মানদণ্ড ধরিয়া ভোটাধিকার প্রদানের রীতি সামন্ততান্ত্রিক যুগেই প্রচলিত ছিল। কারণ, তখন শুধু বিত্তবানেরাই কর দিত। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষ করের বোঝা বিত্তবান ও বিত্তহীন নির্বিশেষে সকলকেই বহন করিতে হয়।

উপসংহারে বলা যায়, গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সার্বিক ভোটাধিকারকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; কারণ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ছাড়া ব্যক্তি-সত্তার বিকাশসাধন করা যায় না। আর প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দিয়া তাহাকে রাষ্ট্রের সমস্যা-সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই কাম্য।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার: স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Universal Adult Franchise: Women Suffrage): স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমস্যা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সমস্যার সহিত জড়িত। যদি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্করেই ভোটাধিকার দিতে হয় তবে নারীকেও ভোটাধিকার দিতে হইবে। অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার লইয়া সর্বপ্রথম আন্দোলন আরম্ভ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬১ সালে। ১৮৯৮ সালে ইংল্যাণ্ডে ৩০ বৎসর বয়স্ক নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। পরে ১৯২৮ সালে নারী ও পুরুষের ভোটাধিকার প্রাপ্তির বয়স সীমা সমান করা হয়। ১৯৪৭ সালে জাপানে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। সম্প্রতিকালে সুইজারল্যাণ্ডে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ইউরোপের আরও কতিপয় রাষ্ট্রে আজ পর্যন্তও নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর নারী ও পুরুষের সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে সমান ভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এমন কি নারীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনেও নির্বাচিত করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে নারী-পুরুষ অপেক্ষা রাষ্ট্রনীতিতে কম পারদর্শী নয়। শ্রীলঙ্কায়ও নারীকে প্রধান-মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হইয়াছে। আজ ইংল্যাণ্ডেও নারীকে মন্ত্রিত্বের আসনে নির্বাচিত করা হইয়াছে।

নারীর ভোটাধিকারের ইতিহাস

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। একদল নারীর ভোটাধিকারকে সমর্থন করেন আর একদল ইহাকে সমর্থন করেন না। নিম্নে ইহাদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হইল:

সপক্ষে যুক্তি: (১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে একদল এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ। মানুষ হিসাবে পুরুষের যদি ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়, তবে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত না হইবার কোন যুক্তি নাই। (২) আরও বলা হয় যে, দৈহিক বলে বলীয়ান পুরুষ যদি ভোটাধিকার পাইতে পারে তবে দুর্বল নারী বরং নানাবিধ অসুবিধার জন্য পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিকতর ভোটাধিকার পাইতে পারে।

(৩) বর্তমানকালে স্ত্রীলোকগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই পুরুষের সহিত সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা করিতেছে। অতএব রাষ্ট্র-

নৈতিক ক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করার কোন যুক্তি নাই। (৪) আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই যুক্তি উপস্থিত করেন যে, পুরুষের পৌরুষ, স্বার্থপরতা, আক্রমণমুখিতা এবং শোষণ-পরায়ণতাকে সংযত করিবার জন্যই নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নারী ভোটাধিকার পাইলে সর্ববিধ আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। (৫) নারী ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইলে পুরুষের ভোটাধিকারের দ্বিত্বকরণ হইবে বলিয়া যে যুক্তি দেখানো হয় তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, নারী যে সকল ব্যাপারেই পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে এমন ধারণা পূর্ব হইতেই ধরিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কোন স্ত্রীলোক হয়তো তাহার স্বামী যাহাকে ভোট দিবে তাহাকেই ভোট দিতে পারে, কিন্তু সেই কারণে যদি তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে প্রকৃত স্বাধীনতা অস্বীকার করা হইবে। নারীকে আত্মোপলব্ধির সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

নারীর ভোটাধিকারের সপক্ষে যুক্তির নির্যাস

বিপক্ষে যুক্তি : প্রথমতঃ, নারীর ভোটাধিকারের বিপক্ষে এই যুক্তি দাঁড় করানো হয় যে, স্ত্রীলোককে ভোটাধিকার দিলে নারী নারীত্ব হারাইবে এবং পুরুষের সহিত তাহার পার্থক্যসূচক চরিত্রগুলি আর বজায় থাকিবে না। এই যুক্তি সমর্থন-যোগ্য নয়। কারণ নারী ভোটাধিকার পাইলেও সে নারীই থাকে; সে পুরুষ হইয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, বলা হয়, মাতৃত্বেই নারীত্ব প্রকাশিত হয়। তাহার নির্দিষ্ট স্থান হইল গৃহাভ্যন্তরে। স্ত্রীলোক যদি রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তবে সে তাহার মাতৃত্ব হারাইবে। এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, অভিজ্ঞতা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, নারীকে ভোটাধিকার দিলে নারীর মাতৃত্ব নষ্ট হয় না।

তৃতীয়তঃ, বলা হয়, সংসার সুখের হয় নারীর জন্য। সেই নারীর ভোটাধিকারের স্বীকৃতির অর্থ পারিবারিক জীবনে সংহতি ও শান্তিকে বিঘ্নিত করা। স্ত্রীলোককে স্বাধীনভাবে প্রার্থীকে নির্বাচিত করিবার সুযোগ দিলে সে যদি তাহার স্বামীর সহিত একমত হইতে না পারে তবে পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হইবে। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, যদি নারীর স্বাধীনতা রক্ষার্থে কলহের সৃষ্টি হয় তবে সেই কলহকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

চতুর্থতঃ, এই যুক্তি দেখানো হয় যে, স্ত্রীলোক যদি তাহার স্বামীর মতানুসারেই ভোট দেয় তবে ভোট দ্বিখণ্ডিত হইবে মাত্র। কিন্তু স্ত্রীলোক যে তাহার স্বামীর মতানুসারেই ভোট দিবে, ইহা পূর্ব হইতেই ধরিয়া লওয়া যায় না।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, যাহারা যুদ্ধে যোগদান করিয়া দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ নয়, তাহাদের ভোটাধিকার পাইবার কোন দাবি নাই। এই যুক্তিতে স্ত্রীলোকগণ যেহেতু যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে না সেইহেতু তাহাদের ভোটাধিকার পাইবারও অধিকার নাই। এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ, বর্তমানে হাজার হাজার নারী যুদ্ধে যোগদান করিয়া সেবার কার্যে নিযুক্ত থাকে।

উপসংহারে ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদত্ত হইলে রাষ্ট্র সম্পর্কিত আগ্রহ শুধু বিত্তবানদিগের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইবে। আবার বিদ্যার মান কি প্রকারের হইলে ভোটাধিকার প্রাপ্তির মতো যোগ্যতা অর্জন করা যাইবে তাহা স্থির করা হয় নাই বলিয়া যোগ্যতার মানে নির্বাচকদিগকে স্থির করা যায় না। আইনভঙ্গকারী দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভোটাধিকারচ্যুত করা বাঞ্ছনীয়, তবে এই দণ্ড সামান্য কয়েকটি অপরাধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।

ভোটদানের পদ্ধতি : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (Method of Election : Direct & Indirect) : প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতির উপরও গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে। প্রতিনিধি নির্বাচনের দুইটি পদ্ধতি আছে; যথা (ক) প্রত্যক্ষ, (খ) পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকগণ প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সরাসরি ভোট দিয়া নির্বাচন করে। আর পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচকগণ প্রথমে একটি নির্বাচক সংস্থা (Electoral College) মনোনয়ন করে। তারপর এই মধ্যবর্তী নির্বাচন সংস্থার সভ্যেরা প্রতিনিধি নির্বাচন করে। কোন কোন সময় ব্যবস্থাপক-সভা নির্বাচন সংস্থার কাজ করে। আবার বিশেষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন সংস্থাও গঠন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করিবার উদ্দেশ্যেই নির্বাচন সংস্থা গঠন করা হয়। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করিবার জন্য পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ এবং বিধানসভাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া একটি নির্বাচন সংস্থা গঠন করা হয়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ : এই নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচন হইলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিনিধি ও নির্বাচনকারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়। জনমত বিরোধী কোন আইন পাশ করা সম্ভব হয় না, কারণ তাহা হইলে নির্বাচকগণ পরবর্তী নির্বাচনে আর বর্তমান প্রতিনিধিকে সমর্থন করিবে না। ইহাতে দুর্নীতির আশংকাও কম থাকে। কারণ সমগ্র নির্বাচককে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব নয়।

এই পদ্ধতির ত্রুটি হইল জনসাধারণ সাধারণতঃ অজ্ঞ। তাই তাহারা যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে না। এই পদ্ধতিতে নানা প্রকার অসাধু উপায় অবলম্বিত হয় বলিয়া যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় না। ফলে, ব্যবস্থাপক সভায় কখনও কোন গুণীলোক প্রবেশ করিতে পারে না।

পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির গুণাগুণ (Merits and defects of Indirect Election) : প্রথমতঃ, পরোক্ষ নির্বাচনের ফলে দলীয় উত্তেজনা হ্রাস পায়। এই পদ্ধতিতে প্রকৃত প্রার্থীকে জনসাধারণ নির্বাচন করে না বলিয়া দলের প্রচারকার্যও কম হয় এবং দলীয় কর্তৃত্বও হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং অল্পসময়েই নির্বাচন কার্য শেষ করা যায়।

তৃতীয়তঃ, ইহা দাবি করা হয় যে, অজ্ঞ জনসাধারণ বিজ্ঞজনকে নির্বাচন করিতে পারে না। এই কারণে প্রকৃত প্রতিনিধিকে নির্বাচন করার ভার কতিপয় লোকের হস্তে অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। বলা হয় যে, জনসাধারণের বুদ্ধি, বিবেচনা ও শিক্ষা অতি সামান্যই। সুতরাং তাহাদের সিদ্ধান্তের উপর আইনসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ সভার সদস্য নির্বাচনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

সমালোচনা ঃ গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবে। কিন্তু জনসাধারণকে যদি প্রকৃত প্রতিনিধির নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হয় তবে গণতন্ত্রের মূলনীতি ব্যর্থ হইবে। আবার জনসাধারণকে অজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ যদি এতোই অজ্ঞ হয় তবে তাহারা মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় মধ্যবর্তী নির্বাচন সংস্থায় অজ্ঞদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করিবে। তাহারা আবার পরোক্ষভাবে অজ্ঞদিগকেই প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করিবে। কিন্তু আসলে ইহা হয় না। আরও বলা হয় যে, জনসাধারণকে যদি প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে না দেওয়া হয় তবে তাহাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়।

আবার দলীয় ব্যবস্থায় দলগুলি নির্বাচন সংস্থার নির্বাচনের সময় প্রস্তাবিত প্রকৃত প্রতিনিধির নাম পূর্ব হইতে ঘোষণা করে। ফলে যাহারা দলীয় সমর্থনে নির্বাচন সংস্থায় প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয় তাহারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী মোটেই ভোট প্রদান করিবে না। দল যাহাকে ভোট দিতে বলিবে তাহাকেই তাহারা ভোট দিবে। অতএব প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে যে নির্বাচিত হইত পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতেও সেই নির্বাচিত হইবে। মাঝখানে শুধু নির্বাচন পদ্ধতিকে জটিল করিয়া তোলার জন্য পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আবার নির্বাচন সংস্থার প্রতিনিধিগণ যেহেতু স্থায়ী নয়, সাময়িক, শুধু কয়েকজনকে নির্বাচন করিবার জন্যই নির্বাচিত হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহারা সাধারণতঃ বিশেষ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইবে না ; আবার উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা অল্পসংখ্যক প্রতিনিধিকে ক্রয় করিয়া প্রভাবশালী বিত্তবান ব্যক্তি নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতে পারে। এই পদ্ধতি ব্যয়বহুল এবং এই পদ্ধতিতে নির্বাচন হইলে অতি ধীর গতিতেই নির্বাচনকার্য সমাপ্ত হয়।

উপসংহারে বলা যায়, বর্তমান বৃহদায়তন রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন করা অসুবিধাজনক। তাই পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির যথেষ্ট ত্রুটি থাকিলেও এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য, 'গণভোট', 'গণউদ্যোগ', 'পদচ্যুতি' প্রভৃতির মতো ক্ষমতা জনসাধারণকে দিতে হইবে যাহাতে তাহারা প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (Minority Representation) ঃ গণতন্ত্রের অর্থ হইল সর্বসাধারণের সরকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে গণতন্ত্র হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার। সংখ্যালঘিষ্ঠদের যদি কোন প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকে তবে গণতন্ত্র প্রকৃত হইয়া উঠে না। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ যদি সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর শতকরা ৪৯ ভাগও হয় তথাপি তাহারা প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না যদি না সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিকে আইনসভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রুশোকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় আইন হইল জনসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ ; কিন্তু আইন-প্রণয়নকারীরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি হন তবে আইন হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ। তাহা হইলে দেখা যায় আইনসভায় যদি সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিদের কোন স্থান না থাকে তবে উক্ত আইন সর্বসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ হইবে না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা প্রণীত আইনকে যদি সর্বসাধারণের আইন বলিয়া প্রচার করা হয় তবে সংখ্যালঘিষ্ঠরা তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে এবং এমন কি আইনকে নাও মান্য করিতে পারে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বকে সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের যুক্তি হইল সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হইলে নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইবে। দল ও স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিলে প্রত্যেক নির্বাচক সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হইতে জাতীয় সমস্যার আলোচনা করিবে। আবার এই ব্যবস্থা অতিশয় জটিল।

পরিশেষে বলা যায়, শত জটিলতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের জনগণের একটা বিরাট অংশকে বাদ দিয়া যে গণতন্ত্র তাহা গণতন্ত্রই নয়।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods of Minority Representation) : সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে ; যথা, (ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, (খ) সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি, (গ) স্তূপীকৃত ভোট পদ্ধতি, (ঘ) দ্বিতীয় ব্যালট ভোট পদ্ধতি এবং (ঙ) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন।

(ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) : এই পদ্ধতি অনুসারে জাতিগত, ভাষাগত ও সম্প্রদায়গত দিক হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর প্রত্যেকের জন্য সমান অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। লেকী এবং জন স্টুয়ার্ট মিল এই সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বকে সমর্থন করেন। লেকী ও মিল সাম্যের ভিত্তির উপর সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বকে সমর্থন করেন। বলা হয়, সংখ্যালঘুরা যদি আইনসভায় প্রতিনিধি না প্রেরণ করে তবে গণতন্ত্র নিরর্থক হইবে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের আবার দুইটি পদ্ধতি আছে। যথা, (১) হেয়ার স্কিম (The Hare Scheme), (২) তালিকা পদ্ধতি (The List System)। হেয়ারের পদ্ধতিকে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বলা হয়। নিম্নে এই দুইটি পদ্ধতির আলোচনা করা গেল :

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন (Proportional Representation by Single Transferable Vote) : (১) হেয়ার স্কিম (The Hare Scheme) : এই নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি বৃহৎ অঞ্চলে ভাগ করিয়া এক একটি অঞ্চল হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থীকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইতে হইবে। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটকে বলা হয় ইলেকটোরেল কোটা (Flectoral Quota)। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা কোটা বাহির করার নিয়ম হইল :

$$\frac{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের বৈধ ভোট}}{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের আসনসংখ্যা}} = \text{নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট।}$$

এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতাকে নির্বাচন প্রার্থিগণের নামের একটি তালিকা দেওয়া হয়। আর প্রত্যেক ভোটদাতার একটি মাত্র ভোট দিবার অধিকার থাকে। প্রদত্ত তালিকার ভোটদাতাগণ যে প্রার্থীকে অধিক যোগ্য মনে করেন তাহার নামের পাশে '১' লিখিয়া দেন। আবার ভোটদাতা তাহার পছন্দ মতো অন্য পার্থিগণের নামের পাশে যোগ্যতা অনুসারে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫ লিখিয়া দিতে পারেন। এই সংখ্যাগুলি হইতে ভোটাধিকার পছন্দের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

ভোট গণনার সময় যে সকল প্রার্থী ভোটদাতাগণের প্রথম পছন্দ অনুসারে পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাহারা নির্বাচিত হইবেন। আবার এই নির্বাচিত ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকেন তবে যে পরিমাণ অধিক ভোট তিনি পাইবেন সেই অধিক ভোট দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হস্তান্তর করা হইবে। তারপর দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইবেন তাঁহারা নির্বাচিত হইবেন। আবার তাঁহাদিগের অতিরিক্ত ভোটগুলি তৃতীয় পছন্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হস্তান্তরিত হইবে। এইরূপে সকল আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভোট এইভাবে হস্তান্তরিত হইতে থাকিবে।

এই পদ্ধতিকে ত্রুটিহীন করার জন্য আসনসংখ্যার সহিত ১ যোগ করিয়া সেই সংখ্যার দ্বারা বৈধ ভোটকে ভাগ করিতে হয় এবং ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিতে হয়।

$$\frac{\text{বৈধ ভোটসংখ্যা}}{\text{আসনসংখ্যা} + ১} + ১ = \text{নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট}$$

সুবিধা: এই পদ্ধতি অনুসারে ভোট প্রদত্ত হইলে (১) সংখ্যালঘু দল আইনসভায় তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে। (২) সাধারণ পদ্ধতিতে কোন প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পাইলে ভোটদাতার ভোটটি কার্যকরী হয় না কিন্তু, আলোচ্য পদ্ধতিতে ভোটদাতার অন্ততঃ একটি পছন্দ অর্থাৎ একটি ভোট কার্যকরী হইবেই। অর্থাৎ, ভোটদাতার প্রথম পছন্দ কার্যকরী না হইলে, দ্বিতীয় পছন্দ কার্যকরী হইবে। আবার দ্বিতীয় পছন্দ যদি কার্যকরী না হয় তবে তৃতীয় পছন্দ কার্যকরী হইবে। (৩) এই পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন হইলে যোগ্যতর ব্যক্তির নির্বাচন সম্ভব হয়। ফলে আইনসভায় যোগ্যতর ব্যক্তি আসন লাভ করিতে পারে। কারণ যোগ্যতর ব্যক্তি হয় প্রথম পছন্দ না হয় দ্বিতীয় পছন্দ, তাহা না হইলে তৃতীয় পছন্দ, এইভাবে কোন-না-কোন পছন্দের অন্তর্ভুক্ত হইবেই।

অসুবিধা: এই পদ্ধতির বহুবিধ গুণ থাকিলেও এই পদ্ধতি অতিশয় জটিলতাপূর্ণ। এই পদ্ধতি অনুসারে ভোট-গণনা করিতে দীর্ঘ সময় লাগে। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ এবং সাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নয়।

(২) তালিকাপ্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন (Proportional Representation by List System): এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেকটি দলই প্রতিটি নির্বাচন অঞ্চলের জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করে এবং ভোটদানকারী সেই বিভিন্ন বিকল্প তালিকার যে কোন একটি তালিকাতে ভোট দিতে পারে। পরে কোন্ তালিকার কত সমর্থক সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটি তালিকা হইতে সেই অনুপাতে প্রতিনিধিগণ আইনসভায় স্থান পায়।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ধরা যাক নির্বাচনে ৬০ হাজার ভোটদাতা আছে। আর আসনসংখ্যা আছে ৬টি। ৩টি বিকল্প তালিকা বিভিন্ন দল কর্তৃক পেশ করা হইয়াছে। ধরা যাক ১নং দলের তালিকা ৩০ হাজার ভোটদাতা কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। ২নং দলের তালিকা ২০ হাজার ভোটদাতা কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। ৩নং দলের তালিকা ১০ হাজার ভোটদাতা কর্তৃক

সমর্থিত হইয়াছে। এখন, আনুপাতিক তালিকা পদ্ধতি অনুসারে ১নং দলের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়, ২নং দলের প্রথম ও দ্বিতীয় এবং ৩নং দলের প্রথম এই ৬জন নির্বাচিত হইবে।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে নির্বাচন হইলে নির্বাচন জটিল হইবে। এই প্রথায় আইনসভায় সদস্যদের সহিত নির্বাচনী কেন্দ্রের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ক্ষীণ হইবে। এই প্রথায় নির্বাচন হইলে যদি বহুদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান থাকে তবে একের পর এক দুর্বল সরকার গঠিত হইবে। আবার উপনির্বাচনের মারফত নিয়মিতভাবে জনমতের গতি নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়। এই প্রথা উগ্র দলীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে।

(খ) **সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি :** সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের জন্য আরও তিনটি পদ্ধতি আছে, যথা, সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি ও স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি এবং ব্যালট পদ্ধতি। সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতিতে নির্বাচকদের সকলের ভোট থাকে না। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে সব আসন জয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

(গ) **স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি :** স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি (Cumulative vote System) অনুসারে যতগুলি আসন থাকে প্রতিটি ভোটদাতার সেই সংখ্যক ভোট থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারে ভোটদাতা পছন্দমত প্রার্থীদের একটি করিয়া ভোট না দিয়া একজন প্রার্থীকেই সমস্ত ভোট দিতে পারেন অথবা কয়েকজন প্রার্থীর মধ্যে ভোট ভাগ করিয়া দিতে পারেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ধরা যাক ১০ জন প্রার্থী আছেন। ভোটদাতা ১০ জনকে একটি করিয়া ভোট না দিয়া ১ জনকেই ১০টি ভোট দিতে পারেন অথবা ৩/৫ জনের মধ্যে ১০টি ভোট ভাগ করিয়া দিতে পারেন। এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘুরা একজনকেই সব ভোট দিয়া জয়ী করিবার সুযোগ পায়।

(ঘ) **দ্বিতীয় ব্যালট ভোট পদ্ধতি (Second Ballot System) :** এই পদ্ধতি অনুসারে ভোটগণনায় যদি কেহ পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারে তবে সর্বনিম্ন ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম বাদ দিয়া দ্বিতীয়বার ভোট প্রদানের ও ভোট গণনার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বারের নির্বাচনে কোন একদল পূর্ণ-সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

কিন্তু এই তিনটি পদ্ধতিই বিশেষ কার্যকর নহে। সংখ্যালঘুদের নির্বাচন করার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধতি জটিল হইলেও অধিক নির্ভরযোগ্য।

(ঙ) **সাম্প্রদায়িক নির্বাচন (Communal Representation) :** এই পদ্ধতিতে নির্বাচনে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচন প্রবর্তিত করা হয় অথবা যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দিষ্ট রাখিয়া এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

ভৌগোলিক এবং কর্মগত বা পেশাগত প্রতিনিধিত্ব (Territorial and Functional or Occupational Representation) : সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র দেশকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্বাচনী অঞ্চলে (Constituency) বিভক্ত করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেকটি নির্বাচনী অঞ্চলে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পান তাঁহাকেই

নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থানুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভোটপ্রার্থী নির্বাচিত হন। ফলে এই ব্যবস্থানুসারে নির্বাচন এলাকার মধ্যে বসবাসকারী ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সার্বভৌম শক্তির আধার। এইরূপ ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের প্রধান যুক্তি হইল নির্বাচন এলাকার মধ্যে বসবাসকারী সকল লোকের স্বার্থ প্রায় একই ধরনের। অতএব এলাকার প্রতিনিধি এলাকার স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে।

কিন্তু এইরূপ প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রধান হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ নির্দিষ্ট অঞ্চলে সকল বসবাসকারীর স্বার্থ এক নয়। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ, বিভিন্ন স্বার্থের লোক একই অঞ্চলে বসবাস করে। অতএব একটি অঞ্চলে সমস্বার্থের লোকের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। একজন অধ্যাপকের প্রতিনিধি একজন অধ্যাপকই হইতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে একজন অধ্যাপকের প্রতিনিধি হইবে একজন বণিক। ফলে আইনসভায় প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব হইবে না। এই কারণে ফরাসী লেখক ডুগো (Duguit), শেফ্লে (Shafle), ইংরেজ লেখক কোল (G.C.H.Cole) প্রমুখ পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করেন। ডুগো বলেন যে, সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমেই সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশিত হইতে পারে। জাতীয় জীবনে যত প্রকার পেশা আছে প্রত্যেক প্রকার পেশার তরফ হইতেই বিধানসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত। সমস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব লইয়া আইনসভা যদি আইন প্রণয়ন করে তবে সমাজের মধ্যে যে শ্রেণী-বিন্যাস অথবা কর্মগত বা পেশাগত বিভাগ দেখা যায় তাহা আইনসভায় প্রতিফলিত হইবে।

সমালোচনা : (১) ফরাসী লেখক ইজমে এই বলিয়া সমালোচনা করেন যে, ইহা এক অলীক ও ভ্রান্ত নীতি। ইহাকে প্রবর্তন করিলে অর্থাৎ পেশাগত প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন করিলে সমাজে সংঘর্ষ, বিশৃংখলা এমন কি অরাজকতা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে (The principle of representation of interests is "an illusion and a false principle, which would lead to the struggles, confusion and anarchy.")। প্রত্যেকটি পেশাগত প্রতিনিধি নিজ নিজ শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া সংঘর্ষ করিলে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবে। (২) এইভাবে বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘাত বাধিলে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হয়। (৩) বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থকে বজায় রাখিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা নিয়ত ঝগড়া ও বিতর্ক করিলে আইনসভা বিতর্কসভায় পরিণত হয়; ফলে আইনসভার দক্ষতাও অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্র-সম্মত নয়, কারণ নির্দিষ্ট অঞ্চলের সকল বাসিন্দাদের স্বার্থ এক রকমের নয়। সমাজ বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষকে লইয়া গঠিত। কিন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে একজন প্রতিনিধি কৃষক, মজুর, ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক সকল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থকে আইনসভায় উপস্থিত করিতে পারে না। অবশ্য, ইহা স্বীকার্য যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আঞ্চলিক নির্বাচন-ব্যবস্থা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী মঙ্গলজনক। অবশ্য, আইনসভায় এমন কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা বাঞ্ছনীয় যাহাতে প্রত্যেক

পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির স্বার্থ সম্বন্ধে বলিবার জন্য আইনসভায় প্রতিনিধি থাকে। পরিশেষে ল্যাস্কির মন্তব্য উধৃত করা গেল। ল্যাস্কি বলেন: সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিরুদ্ধতার মধ্যে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচন অঞ্চল হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা আইনসভার গঠনই প্রকৃত উপায় ("The territorial assembly built upon universal suffrage seems the best method of making final decisions in the conflict of wills within the community."—*H. J Laski*)।

নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সম্পর্ক (Control of Representative & Relation between Representative and his Electorates): গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভার সদস্যগণকে নির্বাচিত করিয়া থাকে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে রাজ্যপালগণও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কোন কোন রাষ্ট্রে বিচারকগণও নির্বাচিত হন। গণতন্ত্রেই নির্বাচন প্রথা চালু থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিকল্প সরকার গঠন এবং সরকারের পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। নির্বাচনের মাধ্যমেই এই পরিবর্তন সম্ভবপর হয়। রুশো জনগণের রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়াছেন। জনগণের রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই জনগণের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জনগণ যদি নির্বাচনকালে ভোটদান করিয়া তাহাদের রাষ্ট্র কার্য শেষ করেন তবে দুই নির্বাচনের অন্তর্বর্তীকালে তাহাদের আর কোন কাজ থাকে না, কিন্তু রুশোর মতে জনগণ সর্বদাই প্রতিনিধিগণকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সার্বভৌম অধিকারকে কার্যকর করিবে; অর্থাৎ দুই নির্বাচনের অন্তর্বর্তীকালেও তাহারা প্রতিনিধিগণকে যদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে তবেই জনগণের সার্বভৌমিকতা কার্যকর হইবে।

গণতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব

বর্তমানে অনেক বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এই নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে প্রতি ৪/৫ বৎসর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই ৪/৫ বৎসরের জন্য নির্বাচকগণের সহিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সম্পর্ক কিভাবে স্থির হইবে তাহাই আলোচ্য বিষয়। প্রশ্ন উঠে প্রতিনিধিগণ কি নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করিবে, না—নির্বাচকমণ্ডলীর আজ্ঞাবাহক হিসাবে কাজ করিবে? আবার প্রশ্ন উঠে, যদি কোন প্রতিনিধি কোন দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহা হইলে তিনি কি তাঁহার দলের নির্দেশ মতো কাজ করিবেন, না—নির্বাচকমণ্ডলীর আজ্ঞাবাহক হিসাবে কাজ করিবেন? বার্কের (Burke) মতে প্রতিনিধির ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা অকাম্য। তাঁহার মতে "পার্লামেন্টের একজন নির্বাচিত সদস্য নির্বাচকগণের প্রতিনিধি বটে কিন্তু নির্বাচকগণের ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূ নহেন" (······a member of Parliament is a representative and not a delegate.)। তিনি নিজের বিবেচনা মতো দেশের সেবা করিবেন। তিনি নির্বাচকগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেন না। তাঁহার কাজে তাঁহার এলাকার স্বার্থ ব্যাহত হইলেও দেশের সামগ্রিক স্বার্থের জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র এলাকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইতে পারে। ফরাসী দেশের নির্বাচকমণ্ডলী তাহাদের প্রতিনিধিগণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিত যে, অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও প্রতিনিধিগণ করধার্যের প্রস্তাব পাস করিতে পারিত না। সুইজারল্যান্ডের

"গণভোট" "গণউদ্যোগ" আইনপ্রণয়ন ক্ষেত্রে আইনসভার প্রতিনিধিগণকে নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "পদচ্যুতির" মতো নীতি প্রতিনিধিগণের ক্ষমতা, স্ববিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা সীমিত করিয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি প্রতিনিধিগণের ক্ষমতা খর্ব করিয়া প্রতিনিধিগণের কাজে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। বার্কের মত অনুসারে নির্বাচকগণ প্রতিনিধিগণকে একবার নির্বাচিত করিয়া দিলে পর আর তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রতিনিধিগণকে স্ববিবেচনা মতো কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

বার্কের এই মতবাদকে বর্তমানে অনেকেই সমর্থন করেন না। ল্যাস্কির মতে প্রতিনিধিগণ তাঁহার নির্বাচকদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূ নন বটে, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রতিনিধিগণকে মূলত জনমতের অনুবর্তী হইয়াই চলিতে হইবে। তাই যাহাতে প্রতিনিধিগণ জনমতের অনুবর্তী হইয়া চলেন তার জন্য সীমাবদ্ধ পদচ্যুতি পদ্ধতি (Limited recall) কার্যকর থাকা বাঞ্ছনীয়। ল্যাস্কির মন্তব্যের পক্ষে যুক্তি হইল অনেক সময় প্রতিনিধিগণ ও তাহাদের দল জন-সম্মতি হারাইয়া ফেলে। এইরূপ ক্ষেত্রে দুইটি নির্বাচনের অন্তর্বর্তীকালে প্রতিনিধিদের সচেতন করিয়া দেওয়া দরকার যে, আগামী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই জনগণ তাহাদের পদচ্যুত করিতে পারে। পদচ্যুতির এইরূপ আশংকা প্রতিনিধিগণকে জনগণের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিতে সাহায্য করিবে।

আংশিক নিয়ন্ত্রণ কাম্য

আবার স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক প্রতিনিধিকেই নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট তাহাদের জন্য কল্যাণকর কাজ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। নির্বাচকমণ্ডলী সেই প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্যই ভোট দিয়া থাকে। এখন নির্বাচিত হইবার পর প্রতিনিধিকে সেই প্রতিশ্রুতি মতোই কাজ করিতে হইবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকিতেও উহা রক্ষা না করিলে নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে যদি প্রতিনিধিকে গদিচ্যুত করিবার ক্ষমতা থাকে তবে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিকে গদিচ্যুত করিবে। আবার দলীয় স্বার্থরক্ষা না করিলেও প্রতিনিধির বিপদ। কারণ পরবর্তী নির্বাচনে তাহার পক্ষে দলের মনোনয়ন পাওয়া কষ্টকর হইবে। প্রতিনিধি যদি দলের মাধ্যমে নির্বাচিত হইয়া থাকে তবে তাহাকে দলীয় স্বার্থ বজায় রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। আর যদি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করিয়া থাকে তবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যতটা সম্ভব ততটাই সে করিবে। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিনিধিদলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবেই নির্বাচিত হউক আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবেই নির্বাচিত হউক জনগণের সহিত সম্পর্কচ্যুত প্রতিনিধির ক্ষমতা খুবই কম। আবার নাগরিক কল্যাণ বিরোধী কাজ করিয়া কখনও কোন প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত তাহার সম্পর্ক হইল নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে, তাহার কল্যাণে নিজের বুদ্ধিমতো যতটা পরিমাণ নির্বাচকমণ্ডলীর দুঃখদৈন্যের কথা প্রতিনিধিসভায় পেশ করা যায় তাহাদের জন্য ততটাই করা। প্রতিনিধিগণকে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে তাহার দল জনকল্যাণকর কার্যের নির্দেশই তাহাকে দেয়। তাহা হইলে দলীয় নির্দেশ পালন করাও তাহার পক্ষে সহজতর হইবে এবং দলও জনসমর্থন হারাইবে না।

দলের প্রার্থী প্রতিনিধির অসুবিধা

পরিশেষে বলা যায়, যে নাগরিক সাধারণতঃ যে এলাকার অধিবাসী সেই এলাকা হইতেই তিনি নির্বাচিত হন। এই নিয়ম চালু থাকার পক্ষে যুক্তি হইল ইহার ফলে প্রতিনিধির এলাকার উপর আকর্ষণ থাকিবে। আবার ইহার বিপক্ষে যুক্তি হইল একই এলাকায় দুইজন প্রতিভাধর পুরুষ থাকিলে উভয়ের পক্ষেই নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ চার্চিলের কথা বলা যাইতে পারে। চার্চিল ম্যাঞ্চেস্টারের হারিয়া ডাণ্ডিতে গিয়া প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন এবং জয়লাভ করিয়াছিলেন। ফলে প্রার্থীদের বসবাসের এলাকার ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীতি সর্বক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয়।

এখানে বলা বাহুল্য যে, প্রতিনিধিগণ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি। তাই তাঁহারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগেই কাজ করুন, বা দলীয় নীতি নির্দিষ্ট হইয়াই কাজ করুন, বা একদলের নামে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়া অন্য দলের হইয়া কাজ করুন, নির্বাচকমণ্ডলী দেখিবে তাহাদের প্রতিনিধিগণ জনস্বার্থবিরোধী কোন কাজ করিতেছেন কিনা। এইজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে এমন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা দরকার যাহার দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিগণকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া জনস্বার্থবিরোধী কার্য হইতে তাঁহাদিগকে বিরত করিতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী অন্যায় কার্যে লিপ্ত প্রতিনিধিদের পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত না করিতে পারে। কিন্তু দুই নির্বাচনের অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিনিধিদের কাজের উপর কি ভাবে নির্বাচকমণ্ডলী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করিতে পারে তাহাই রাষ্ট্রনীতিবিদের নিকট সমস্যা। নিম্নে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : (১) প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি : এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রার্থী ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক-নৈকট্য হয়। আর পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রার্থী ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে দূরত্ব বজায় থাকে। ফলে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর নির্বাচনের দ্বারা একটি নির্বাচন সংস্থা গঠিত হয় মাত্র যে সংস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা প্রকৃত প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে। সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলীর ও প্রতিনিধির মধ্যে নির্বাচক সংস্থা থাকে বলিয়া সরাসরিভাবে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না।

(২) নির্বাচন কাল : গেটেলের মতে প্রতিনিধিদের কার্যকাল খুব সংক্ষিপ্তও হওয়া উচিত নয় আবার খুব দীর্ঘও হওয়া উচিত নয়। এমন একটা সময়ের ব্যবধান হওয়া উচিত যাহাতে অন্ততঃপক্ষে প্রতিনিধিদের নির্বাচন উদ্দেশ্যেও নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিতে হয়।

(৩) গণভোট, গণউদ্যোগ, প্রত্যাহার আজ্ঞা এবং কার্যবিবরণী প্রদান : জনগণের আস্থাহীন প্রতিনিধির নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সদস্যপদ বাতিল করিবার ক্ষমতা কয়েকটি দেশে স্বীকৃত হইয়াছে। এই ক্ষমতাই হইল প্রত্যাহার আজ্ঞা (Recall)। নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন প্রতিনিধির কার্যে সন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার সাহায্যে প্রতিনিধির সদস্য-পদ বাতিল করিতে পারেন। রাশিয়ায় ও অপর কোন কোন দেশে প্রতিনিধিবর্গকে বাধ্যতামূলক ভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট প্রতিনিধির কার্যবিবরণী পেশ করিতে হয়।

বাধ্যতামূলক কার্যবিবরণী পেশ করার ব্যবস্থাটি একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

সুইজারল্যাণ্ডে গণভোট ও গণউদ্যোগ এই দুইটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত। গণ-উদ্যোগ ও গণভোট প্রচলিত থাকায় আইনসভার সদস্যগণ তাহাদের খেয়াল খুশিমতো আইন পাশ করিতে পারে না।

(৪) **জনগণের সদাজাগ্রত সতর্কতা ঃ** গণতন্ত্রের প্রহরী হইল জনগণের সদাজাগ্রত সতর্কতা। জনগণ যদি তাহাদের স্বার্থ সম্পর্কে সতর্ক হয় তাহা হইলে প্রতিনিধিবর্গের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করা কণ্টকর হয় না। এতদ্ব্যতীত জনমত গঠনকারী বাহকগুলিকেও সতর্ক ও সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী হইতে হইবে।

গণতন্ত্রে ভোটাধিকারের গুরুত্ব ঃ এখানে ভোটাধিকারের অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, কারণ ভোটাধিকারের উপরই গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভোটাধিকার হইল জনমতকে কার্যে পরিণত করিবার একটি সক্রিয় উপায়। আবার ভোটাধিকারের সাহায্যেই জনগণ শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। লক্ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু মনীষী মনে করেন যে, শাসিতের সম্মতির উপরই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণ তাহাদের এই সম্মতি প্রকাশ করে তাহাদের প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে। এই প্রতিনিধিগণই রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে এবং রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং জনগণের ভোটাধিকার যদি স্বীকৃত না হয় তবে আর যাহাই হউক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে না। কারণ ভোটাধিকার স্বীকৃত হইলেই গণসম্মতি প্রকাশ করিতে পারা যায়।

ভোটাধিকারের গুরুত্ব

জনগণের ভোটাধিকার যদি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে শাসকবর্গ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। গণতন্ত্র প্রকৃত হইয়া উঠে শুধু তখনই যখন স্বেচ্ছাচারিতার পথ রোধ করিয়া জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়। ভোটাধিকার স্বীকৃত হইলে জনগণ অকর্মণ্য, স্বেচ্ছাচারী সরকারকে অপসারণ করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে। তাই যে সরকার প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক গঠিত হয়, সে সরকার অপসারিত হইবার ভয়ে জনগণের দাবিকে পদদলিত করিয়া স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে না।

অবশ্য, ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নাগরিকগণকে নির্বাচনের সময় প্রতিটি ভোটের গুরুত্বকে উপলব্ধি করিতে হইবে। নাগরিকগণ যদি ভয়ে, হুজুগের বশে ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভোট দেয় তবে ভোটাধিকারের লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে। নব্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে গণতন্ত্র হইল এমন এক শাসন-ব্যবস্থা যাহার মাধ্যমে নির্বাচন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। এব্রাহাম লিংকনের ভাষায় গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন-ব্যবস্থা, জনগণের দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা, এবং জনগণের জন্য শাসন-ব্যবস্থা (Government of the people, by the people and for the people)। এই ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এবং ইহাকে কার্যকরী করিতে হইলে জনসাধারণের ভোটের যে কত গুরুত্ব তাহা সহজেই অনুমেয়। যেহেতু জনসাধারণের ভোটপ্রাপ্ত অর্থাৎ সম্মতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই আইনসভায় প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়া সরকার গঠন করিতে পারেন সেইহেতু ভোটাধিকারী ব্যক্তিই সর্বক্ষমতার মূল। তাই গণতন্ত্রে ভোটের গুরুত্ব সর্বাধিক।

ভোটাধিকার স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ করে

সারসংক্ষেপ

নির্বাচকমণ্ডলীর উপর নির্ভর করে গণতন্ত্রের সফলতা। নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান তিনটি সমস্যা হইল ঃ (ক) ভোটাধিকারের ভিত্তি, (খ) নির্বাচন পদ্ধতি এবং (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব ঃ গণতন্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসাবে কেহ কেহ বলেন, শিক্ষার মান, সম্পত্তির মালিকানা প্রভৃতির মানদণ্ডে যোগ্যতা বিচার করিয়া ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। আবার কেহ কেহ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারকে সমর্থন করেন।

নির্বাচনের দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির অর্থ প্রতিনিধি নির্বাচনের পর, প্রতিনিধিরাই প্রকৃত শাসককে নির্বাচন করে। বর্তমান বৃহদায়তন রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা প্রায় অসম্ভব। তাই পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য সংখ্যালঘুদের বক্তব্যকে শুনিতে হইবে। এইজন্য সংখ্যালঘুদের নির্বাচনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা-গুলি হইল (ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, (খ) সীমাবদ্ধ ভোটপদ্ধতি, (গ) স্তূপীকৃত ভোটপদ্ধতি এবং (ঘ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি এবং (ঙ) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন।